ঐরূপই ঘটে ;—তবে এবার আধারের গুণে আধেয়ের কিছু অধিক গৌরব হইয়াছে। গৃহ মধ্যে কেবল ঝাঁটাই বিরাজমানা—পৃষ্ঠপাতক কেহই নাই। তবে পরদার উপর পূর্ব্ব মত কয়েক পংক্তি গদ্য চিত্রিত আছে ;—

"আমার স্ত্রী কোন ক্রমেই নির্ব্বোধ নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে ; আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে—আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেন"। আর কি করেন, তা ইনিই জানেন।—সম্মার্জনী সংগ্রাহক।

[ভ্রান্তিবিলাস, উপাখ্যান ভাগ—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।]

নদীয়ার নারিকেলি বা নাগরী সম্মার্জনীও সাধারণ ধরণের। তবে শুনিলাম, এবার আধারের গুণে নহে ধারিণীর গৌরবে সম্মার্জনী গৌরবান্বিতা।

এমন ঐতিহাসিকী সম্মার্জনী—বাঁকা, টেরা, ঝুলান, দোলান যে কত রহিয়াছে, তাহা গণিতে পারিলাম না—বিশেষ কৌতূহলও হইল না।

সংস্কারণী সম্মার্জনী মধ্যে সুরাবারিণী অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। কাটিগুলি বেউড় বাঁশের শলা—তবে আগা-গোড়া ক্লোরাইড্ মাখান। বড় দুর্গন্ধ। মনে করিলাম ঝাঁটাতেও হোমিওপ্যাথি আছে নাকি—Like cures like ?

'সভা নিবারণী' ও 'বক্তৃতা বারিণী' সম্মার্জনী উভয়েই নূতন আবিষ্কৃত। যুবতীরা স্বয়ং ক্রয় করিলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন, বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। মনে করিলাম, এখন অর্দ্ধমূল্য, পরে অবশ্য উপহার হইবে ; সেই সময়ে কোন আত্মীয়াকে সঙ্গে আনিতে পারিলে, চলিবে। তবে বিশেষ আত্মীয়াকে আনা হইবে না—কাজ কি, শেষে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিব কি ?

তাহার পর 'মূল দোষ নিবারিণী" অনেক প্রকার সম্মার্জনী দেখিলাম। মূলের মধ্যে নানা প্রকার আলুই বেশী। কিন্তু আর ঘুরিতেও পারিলাম না। পরদার চিহ্নিত গদ্য পংক্তি কয়টি মনে পড়িতে লাগিল। ম্বার দেশের বিরাট সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদে বিবিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

// নবজীবন।

৩য় ভাগ। } মাঘ ১২৯৩। { ৭ম সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

ষষ্ঠ ভাগ—চোর বড়, না, দারোগা বড় ?

চোরের অনুসন্ধানশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ এবং অব্যর্থ, তাহা যাঁহারা সে কর্ম্মের কর্ম্মী নহেন, তাঁহারা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন না।

আমাকে একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার বাসস্থানের নিকট এক গ্রামে ইদাজোলা নামক একজন অতি বৃদ্ধ মনুষ্য ছিল; তাহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে এমন চোর ও ডাকাইত ছিল, যে তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল জেলখানায় অতিবাহিত হইয়াছিল, ইদা যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইত, তখন সে অন্যান্য কয়েদিদিগকে বলিয়া আসিত যে "ভাই দেখিস্, তোরা যেন আমার ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি"। বাস্তবিকও সে জেলখানা হইতে নির্গত হইয়া, কখন ১০।১৫ দিবস এবং অধিক হইলেও দুই তিন মাস বাহিরে থাকিয়া, পুনরায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাবদ্ধ হইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হইয়া সে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত হয়। এই সময় তাহার হাঁপানী কাশীর পীড়া হওয়াতে এবং কবিরাজে ভাল পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, ইদা ঐ পুরাতন ঘৃতের জন্য সেই ভদ্রলোকটির নিকট আসিল, তিনি জানিতেন যে তাঁহার নিকট ঐ দ্রব্য নাই, তাহাতে ইদা বলিল যে "কি ঠাকুর? আপনি আমাকে কি জন্য প্রবঞ্চনা করিতেছেন? আমি নিশ্চয় জানি যে আপনার ঘরে

যেমন পুরাতন ঘৃত আছে, এমন অন্য কোন স্থানে নাই”। তাহাতেও তিনি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে, ইদা জোলা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল যে “আপনি যদি সত্য সত্যই পুরাতন ঘৃতের বিষয় অনবগত থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাইয়া আপনার অমুক ঘরে অমুকদিকের কোণের নিকট মাটি খুঁড়িয়া দেখুন, এক ভাঁড় বহুকালের ঘৃত পাইবেন”। গৃহস্বামী সেইস্থানে অনুসন্ধান করাতে যথার্থ ঘৃত আবিষ্কৃত হইল। ইদা কহিল, যে সে অবগত ছিল, যে সেই ভদ্রলোকের পিতামহ তাঁহার নিজের পীড়ার জন্য সেইস্থানে ঘৃত পুরাতন করিবার জন্য একটা ভাঁড়ে মাটির মধ্যে এক সের ভাল গাওয়া ঘৃত পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। দেখুন গৃহস্বামী নিজে যাহা জানিতেন না, তাহা ভিন্ন গ্রামের একজন চোরে জানিত। ইহাত গেল আমার শুনা কথা, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও বড় সামান্য নহে। বিবৃত করিতেছি, কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক বেটা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ যুগী ছিল; দেখিতে দরিদ্র, দুই খানা পুরাতন জীর্ণ চালা ঘর মাত্র তাহার বিত্ত, এবং পরিবারের মধ্যে কেবল এক বিধবা ভগিনী। লোক দেখান দুই এক জোড়া নূতন কাপড় বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিত। প্রতিবাসীরাও সকলে তাহাকে বিত্ত হীন এবং ধনহীন বলিয়া জানিত, কিন্তু একজন চোর জানিতে পারিয়াছিল, যে “ইহার ধুকড়ির ভিতর খাশা চাউল আছে”। একরাত্রে ১০।১৫ জন অস্ত্রধারী মনুষ্য তাহার গৃহ আক্রমণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাতে আমার নিকট সংবাদ আসিলে আমি ঘটনার স্থানে যাইয়া যুগীর ঘর বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না যে নিকটে অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী থাকিলেও ডাকাইতেরা কি জন্য সেই সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এমন দরিদ্রের বাড়ী ডাকাইতি করিতে আসিল। যুগীও প্রথমে আমার নিকটে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; কিন্তু তাহার ভগিনীর পরামর্শে সে অবশেষে প্রকাশ করিল, যে অন্যান্য স্থানে তাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং তদ্দ্বারা সে অনেক নগদ সম্পত্তি আহরণ করিয়া তাহার এই দুই ভাঙ্গা গৃহে মাটির ভিতর গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ডাকাইতেরা তাহা জানিতে পারিয়া প্রায় সহস্রাধিক টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সোণা রূপার গহনা ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে

বলিতে পারে না। ডাকাইতেরা মুখে কালী চূণ মাখিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

যদিও এই ডাকাতি কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে হইয়াছিল তথাপি নগরের সীমানার মধ্যে হওয়াতে আমার ও অধিবাসীগণের অত্যন্ত আতঙ্ক হইল; ভাবিলাম যে এই কার্য্যের কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিতে এবং শাস্তি দিতে না পারিলে, তাহারা যে পুনরায় অন্যদিকে এবং অন্যের বাড়ীতে হস্ত-প্রসারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আমার চর অনুচরদিগকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম। আমি প্রত্যহ দুই বেলা যুগীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিতাম কিন্তু দুই তিন দিবস নিষ্ফলরূপে কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। এক দিন প্রাতে আমি যুগীর বাড়ী ঐরূপ যাইতেছিলাম, দেখিলাম যে নেঙটিয়া সেখ নামক একজন প্রতিবেশী পথের মধ্যে আমাকে দেখিয়া বিলক্ষণ সঙ্কুচিত চিত্তে অন্য দিকে যাইবার চেষ্টা করিল। যদিও আমি বেশ জানিতাম যে দারোগা দেখিলে ইতর লোক স্বভাবত সঙ্কুচিত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি সেই সময়ে নেঙটিয়ার ঐরূপ ভীরুভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ এক প্রকার সন্দেহ হইল। তাহাকে ডাকিয়া সে কি জন্য আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে ভালরূপে আমার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইল এবং আমার বোধ হইল, যেন তাহার কথা গুলি তাহার গলায় বাধিয়া থাকিতেছে, মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রাগান্ধভাবে "কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল "যে মহারাজ আমি চুরি করি নাই"। আমার সঙ্গে আমার প্রধান গোয়েন্দা বুদ্ধু বরকন্দাজ ছিল; সে নেঙটিয়ার কথা শুনিয়া "ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাইনে, তুই চুরি করিস নাই, তবে কে করিয়াছে রে ব্যাটা? চল্ আমার আমার সঙ্গে থানাতে চল্, এখনি দেখাইয়া দিব, কেমন তুই চুরি করিস নাই" বলিয়া সে নেঙটিয়ার হাত ধরাতে নেঙটিয়া আমার পা ধরিয়া বলিল যে "দোহাই দারোগা মহাশয়! আমাকে মারিবেন না, আমি যাহা জানি বলিতেছি!" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাহার ঘর হইতে অপহৃত

সুবোধ সে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া দিতে সম্মত হইল। আমরা যুগীকে সঙ্গে লইয়া নেঙটিয়ার গৃহে যাওয়াতে, তাহার ঘরের মধ্য হইতে একটা বড় হাঁড়ীতে চাউল দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েক জোড়া নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল এবং যুগীও তাহা তাহার দ্রব্য বলিয়া চিহ্নিত করিল। নেঙটিয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করে, তাহাদের সকলের নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল এবং সকলেই বলিল যে চিত্রশালী নিবাসী মুন্সী সেখ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সর্দার ছিল এবং অপহৃত সোণা রূপার অধিকাংশ দ্রব্য তাহারই নিকট আছে।

মুন্সী সেখ থানায় ধৃত হইয়া আসিবামাত্রই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে তাহার নিকট কোন অপহৃত দ্রব্য নাই, তবে তাহার সঙ্গীগণ তাহাদের নিজ নিজ অপরাধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহার নাম করিয়াছে। ফলে মুন্সীর ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হইল, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যথার্থ, প্রবঞ্চনা নহে। আমি তাহার কথা গুলি যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সেই লিপিসহ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

তখন বি পামর নামে একজন যুবা সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া এইবার প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও তিনি জানিতেন না, কিন্তু হিন্দিতে তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। চরিত্রও খুব তেজস্বী ছিল। প্রজাদিগের যাহাতে শান্তি হয় এবং বদমায়েস এবং কুচরিত্রের লোকেরা যাহাতে দমন থাকে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি এক দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অশ্ব পৃষ্ঠে সমস্ত কৃষ্ণনগর ভ্রমণ করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরের কোন স্থানে কোন গোলমাল দেখিতে না পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এক অশ্বের উপরে বসিয়া তিনি এক ঘণ্টা কাল আমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন। তাহার মধ্যে একটি উপদেশ তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা এই যে "Daroga never shew your teeth before you bite." অর্থাৎ "দারোগা কামড়াইবার পূর্ব্বে কখন দাঁত দেখাইও না"।

এই মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি মুন্সীকে তাহার একরার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আইনের নিয়ম ছিল এবং তাহা অন্যান্য সকল মাজি-

ষ্ট্রেটকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, যে থানা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকৃত কিম্বা অস্বীকৃত জবাবের সহিত একবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট থানা হইতে প্রেরিত হইলে, সে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া সেই জবাবের পোষকতা করুক, কিম্বা না করুক, সে আর থানায় পুনঃপ্রেরিত না হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইত কিম্বা জামিন দিয়া শেষ বিচার পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পাইত। কিন্তু পামর সাহেবকে তাহার বিপরীত করিতে দেখিলাম। মুন্সী সেখকে কাছারি পাঠাইবার কিছুকাল পরেই দেখিলাম, যে বরকন্দাজ তাহাকে লইয়া পুনরায় থানায় আনিল এবং প্রকাশ করিল যে সাহেবের নিকট মুন্সী উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ অস্বীকার করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া আমলাদিগকে বলিলেন, যে "দারোগা আমার নিকট কি আসামি পাঠাইয়াছে? এ দেখিতেছি, একরার করে না; তবে ইহাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যক কি ছিল? ইহাকে পুনরায় থানায় পাঠাইয়া দেও।" তখন আমি বুঝিলাম, যে মুন্সী সেখকে আমি যেরূপ সবল ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, সে সেরূপ নহে; অতএব তাহাকে খুব করিয়া প্রহার করিতে বরকন্দাজদিগকে শিখাইয়া দিলাম। পর দিবস প্রাতে মুন্সী পুনরায় কাছারিতে যাইয়া যথার্থ কথা বলিতে চাহিবায়, আমি তাহাকে পুনরায় সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম কিন্তু পুনরায় মুন্সী তঞ্চকতা ব্যবহার করাতে সাহেব তাহাকে আবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুন্সীকে এইরূপ উপর্য্যুপরি দুইবার তঞ্চকতা ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্ত করিল যে "আমি জানিতাম, যে পুলিশ-আমলারা আসামিকে একরার করাইবার নিমিত্ত থানায় যন্ত্রণা দিয়া থাকে, কিন্তু একবার করুক কিম্বা না করুক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে হাজতে প্রেরণ করেন এবং হাজতে গেলে আসামির কারারুদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট কিম্বা জালা যন্ত্রণা থাকে না। আরও আমি জানিতাম যে শুদ্ধ একরার করাইবার এবং চোরা মাল পাওয়ার নিমিত্ত পুলিশ আমলারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, আসামী একরার করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া দিলে, তাহাকে থানায় কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আমি থানায় আসিবা মাত্রই একরার করিয়াছিলাম এবং আপনিও তজ্জন্য প্রথমে আমাকে কোন কষ্ট না দিয়া কাছারিতে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে জানিতাম, সেই খানে যাইয়া

অস্বীকার করিলে আমার থানায় একবার বৃথা হইয়া যাইবে এবং আমি হাজতে প্রেরিত হইব; কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, সাহেব দুইবার আমাকে থানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রকমের আইন হইয়াছে না কি? নচেৎ কেন এইরূপ হইল! যাহা হউক, সাহেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনার যাহা করিতে হয় করিয়া দেখুন।” আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে এক দিন এক রাত্রি সম্পূর্ণ রূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এক্ষণে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা পরমেশ্বর! সেই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি! “বরমেব ভিক্ষা তরু তলে বাস” তথাপি যেন ভদ্রসন্তানেরা পুলীশের চাকরি না করেন!!!

এইরূপ দুই তিন দিবস ধরিয়া ব্যবহার করিলাম, কিন্তু মুন্সী সেখ অটল হইয়া রহিল। খাইতে না পাইলে, খাইতে চাহে না এবং প্রহার করিলে নিষেধ করে না। অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া এক নির্জ্জন সময়ে মুন্সীকে হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার বুঝাইলাম এবং বলিলাম যে “দেখ্ মুন্সী আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার করিতেছি, কি করিব, যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছাড়েন না, তখন তোর একবার করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।” তাহাতে মুন্সী সেখ যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন এবং সে কত বড় দরের চোর তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এত দীর্ঘকাল পরে, আমার তাহার বাক্যগুলি ঠিক স্মরণ নাই, মর্ম্ম প্রকটন করিতেছি শ্রবণ করুন। “আমি নূতন কিম্বা কাঁচা চোর নহি, আমার এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইল কিন্তু ইহার মধ্যে আমি চুরি ডাকাইতি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করি নাই, অতএব ভাল রূপে আমি জানি, যে আমি নিজে অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া না দিলে, আমার সহস্র সঙ্গী তাহাদের স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিলে, জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কিছু করিতে পারিবেন না, আমি সেই জন্য কখনও একরার করি নাই এবং তন্নিমিত্ত কখনও দণ্ডনীয় হই নাই। আমি অনেক জেলায় বড় বড় গুরুতর মোকদ্দমায় ধৃত হইয়া অনেক দারোগার হস্তে মার খাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দারোগা আমাকে একবার করাইতে পারেন নাই।” এই

স্থানে সে তাহার জানুর কাপড় উঠাইয়া কএকটা কাল দাগ দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন যশোর জেলার এক ব্যাটা পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমার জানুর মাংস চড়্ চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওযাসফদ্দীণ দারোগা এক্ষণে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন; তিনি আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই; আর অন্যান্য কত দারোগার কাছে কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিযাছি, তাহা আমি কত বলিব! কিন্তু কেহ আমাকে দিয়া একবার করাইয়া লইতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনার হস্তে পড়িয়াছি, দেখি আপনিই বা কি করিতে পারেন? আপনারও বড়, নাম শুনিয়াছি, দেখিব যে চোর বড়, কি দারোগা বড়? কিন্তু আপনি ধ্রুব জানিবেন যে মারপিট করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, প্রহার আমার শরীরে বিলক্ষণ সহ্য হয়, তবে অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা যদি আপনি চোর অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, তাহা অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন।" এই কথোপকথনের পরে মুন্সীকে যন্ত্রণা দেওয়া অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি বরকন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্র আমার মনে ঐ চিন্তা জাগরূক রহিল। ভাবিলাম যে এই দুস্য ব্যাটা যদি আমাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় লজ্জা ও বিপদের বিষয়। লজ্জা আমার, বিপদ সমাজের।

পর দিবস বুধবার থানায় গ্রাম্য চৌকিদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে মুন্সীর নিজ গ্রামের চৌকিদারকে দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি এক ভাব উদয় হওয়াতে, আমি তাহাকে মুন্সীর পরিবারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে সে কহিল যে মুন্সীর বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কাল হইল স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং মুন্সী তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি স্ত্রী লোককে নিকা করিয়া চিত্রশালী গ্রামের প্রান্তে এক ঘর উঠাইযা তাহাকে লইয়া বাস করে। মুন্সীর বাড়ীতে কেবল তাহার মাতা থাকে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই চৌকীদারের সঙ্গে এক জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া মুন্সীর নিকার স্ত্রীকে থানায় আনিতে আদেশ করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই স্ত্রী লোকটি থানায়

উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম, যে সে ভদ্র লোকের মেয়ের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সও ২০।২২ বৎসরের অধিক নহে; ক্রোড়ে একটি ৬ মাসের শিশু কন্যা। মুন্সীর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া আমার পায়ের উপরে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, মুন্সী বদমায়েস, বিবাহের আগে জানিতে পারিলে আমি কখন তাহাকে বিবাহ করিতাম না, মুন্সীর মাতাই সকল অনর্থের মূল এবং সেই জন্য আমার শাশুড়ির সহিত আমার বনিবনাও না হওয়াতে মুন্সী আমাকে গ্রামের বাহিরে স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিয়াছে, আমি মুন্সীকে চুরি ডাকাইতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকি বলিয়া সে আমার নিকট সকল কথা গোপন করে। আমার কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি যে আমি কিছুই জানি না, আমার শাশুড়িকে আপনি ধরিয়া আনিয়া খুব শাস্তি দিলেই সকল কথা তাহার নিকট জানিতে পারিবেন।" এই স্ত্রী লোকের কথার উপরে আস্থা করিয়া তাহাকে ভাল স্থানে রাখাইয়া মুন্সীর মাতাকে আনিতে পাঠাইলাম। পর দিবস সকলে বেলায় মুন্সীর মাতা আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিলাম, যে তাহার ক্লিষ্টা শরীর, চক্ষু কোটরস্থ; সরল অন্তকরণ বিশিষ্ট স্ত্রী লোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহার নিকট মুন্সীর স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে উভয়ে ভারি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে বৌ চোরণী এবং বৌকে শাশুড়ি বেশ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশেষে মুন্সীর স্ত্রীকে স্থানান্তর করিয়া তাহার শাশুড়িকে ধমকাইতে লাগিলাম এবং থানার তুড়ুমের নিকট টানিয়া লইলাম। তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম্‌ শব্দ ফরাসিস ভাষা, ইংরাজিতে ইহাকে stocks বলে। দুই খানা লম্বা ভারি কাষ্ঠ এক দিগে শক্ত লোহার কবজা দ্বারা আবদ্ধ, অন্য দিক খোলা, কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিগের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক, কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় এমন ভাবে ছিদ্র করা আছে যে এক খানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয় খানা পাতিলে, দুই ছিদ্রে একটা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা এক খানি কাষ্ঠের দুই ছিদ্রের ভিতরে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানসে থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী

দুই ছিদ্রে পা না দিয়া, এক ছিদ্র মধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকা-ইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। রাত্রি কালে দুরন্ত আসামিদিগকে নিশ্চিন্ত রূপে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সকল থানাতেই ইহার এক একটা ডুড়ুম্ ছিল। মুন্সীর মাতাকে এই ডুড়ুমের নিকট আনিয়া তাহার উপরি-ভাগের কাষ্ঠটা টানিয়া উঠাইয়া নিম্ন কাষ্ঠের উপরে ছাড়িয়া দিলাম; তাহাতে ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে, মুন্সীর মাতা কাঁপিয়া উঠিল এবং আমিও তাহাকে রাগান্ধ ভাবে বলিলাম যে "দেখ বেটী, তুই যদি এই যুগীর দ্রব্য গুলি বাহির করিয়া না দিস্ তাহা হইলে, এই ডুড়ুমের মধ্যে এক ফুকর অন্তরে তোর পা আটকাইয়া ফেলিয়া রাখিব এবং সমস্ত দিন তোকে প্রহার করিব।" মুন্সীর মাতা আমার রাগান্ধ ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল যে "বাবা তাহা হইলেত আমার মুন্সী মারা যাইবে।" সন্তানের প্রতি মাতার যে কি গাঢ় স্নেহ, তাহার ইহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মুখে যন্ত্রণার এক ভয়ানক যন্ত্র, পশ্চাতে যমদূতের ন্যায় দারোগা এবং বরকন্দাজেরা তাহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে এবং যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি মুন্সীর মাতার মনে মুন্সীর যাহাতে অমঙ্গল না হয়, তাহাই প্রবল চিন্তা। মুন্সীর মাতার মুখে এই রূপ বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিলাম। স্ত্রী লোকের এবং সাধারণ লোকের মনে ধারণা আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতি কারককে শাস্তি দিতে না চাহে, তবে আদালত তাহাকে মুক্ত দিতে বাধ্য। আমি ইহা জানিয়া মুন্সীর মাতাকে বলিলাম যে "যুগী আমাকে বলিয়াছে যে সে তাহার সমুদয় দ্রব্য গুলি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে কোন আসামিকে সে শাস্তি দেওয়াইতে চাহে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমি যুগীকে ডাকাইয়া আনিয়া মোকাবেলা করিয়া দিব।" ভাগ্য ক্রমে যুগীও সেই সময়ে থানায় উপস্থিত ছিল। সে আমার ইঙ্গিত মতে মুন্সীর মাতাকে ঐরূপ আশ্বাস দিল; কিন্তু চোরের মা শুদ্ধবাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া বলিল যে "তবে যুগী সেতাম্বর কাগজে এক খানা দরখাস্ত দাখিল করুক।" অনভিজ্ঞ লোকে ষ্টাম্প কাগজকে সেতাম্বর কাগজ বলে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাক্স হইতে এক তক্তা ফুলিস্কেপ্ কাগজ বাহির করিয়া মুন্সীর মাতাকে তাহার মধ্যে জলের মার্কা দেখাইয়া প্রতীত করিলাম, যে যথার্থ উহা ষ্টাম্প কাগজ এবং তাহা আমার নায়েব দারোগার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার দ্বারা

মুন্সীর মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী দরখাস্ত লিখাইয়া, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া, মুন্সীর দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলাম এবং আমরাও কয়েক জন তাহাতে সাক্ষী স্বরূপে স্বাক্ষর করিলাম। স্ত্রীলোকটির মনে তখন বিশ্বাস হইল, যে অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিলে মুন্সীর কোন ক্ষতি হইবে না এবং তখন সে মাল দিতে সম্মত হইয়া নায়েব দারোগার সঙ্গে চিত্রশালী যাত্রা করিল।

এ পর্য্যন্ত মুন্সী সেখ এই সকল ঘটনার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই। মুন্সীর মাতা থানা হইতে বাহির হওয়ার পরক্ষণেই আমি বরকন্দাজি গারদে যাইয়া মুন্সীকে বলিলাম যে "কেমন মুন্সী এখন ত মাল পাইলাম, তুই দিলি না কিন্তু তোর মা দিতে চাহিয়াছে, এখন তোরা মায়ে পোয়ে ফাটক খাটিবি।" এই কথা শুনিয়া মুন্সী অবাক্ হইয়া তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিল, আমি তাহাকে দ্বারে আনিলাম। কোতরালীর সম্মুখস্থিত রাজবর্ত্মটি অতি সরল, থানার দ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকে অনেক দূর দৃষ্টি হয়। মুন্সীকে যখন দ্বারে আনিলাম, তখন তাহার মাতা প্রায় ৫০০ হাত (যাঁহারা সেই স্থান দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে পুরাতন কলেজের হাতার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট) গিয়াছে। মুন্সী তাহার মাতাকে চিনিয়া বলিল যে "এখন কি হইবে মহাশয়! আমার মাতাকে কি প্রকারে বাঁচাইব!" আমি বলিলাম "এক উপায় আছে, তুই যদি এখন নিজে মাল বাহির করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট যাইয়া একরার করিস্, তাহা হইলে তোর মা বাঁচিতে পারে, কেমন মুন্সী তোর মাকে ফিরাইব না কি?" মুন্সী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল যে "না ফিরাইবার দরকার নাই। ও ত চোরের মা, সে যে সহজে মাল বাহির করিয়া দিবে, এমন কথা আমার মনে লয় না, যাহা হউক আর কিছুকাল বিলম্বেই টের পাইব। এখন গাঙের মাঝে ঢেউ দেখিয়া কিনারায় নৌকা ডুবাইলে, কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আপনি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব, চলুন এখন থানায় ফিরিয়া যাই।" মুন্সী এমনই শক্ত চোর, যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার মাতা এমন কাঁচা কর্ম্ম করিবে। বেলা ৪টার সময় নায়েব দারোগা মুন্সীর মাতাকে ও একটা বড় পুরাতন কালা হাঁড়ীর মধ্যে অপহৃত যাবতীয় সোণা রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকা গুলি সম্মুখে আনিয়া, ব্যক্ত করিল, যে, যে কৌশলে

সকল দ্রব্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহাতে উহারা দুই জন ভিন্ন আর কাহারও তাহা আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের বাহিরে একটা মাঠের মধ্যে এক শিমুল ও খর্জ্জুর গাছের তলে, মাটির একটা অদৃশ্য গহ্বর আছে তাঁহার মধ্যে হাঁড়িটা উপুড় করিয়া রাখিয়া সকলের উপরে পাতা ও ঘাসের চাপড়া আচ্ছাদন করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। মুন্সীকে ডাকিয়া দেখাইলাম, সে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমার পা দুইখানা ধরিয়া তাহার মাতাকে রক্ষা করিতে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে "এখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি সমুদায় করিব"। আমি তাহার মাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হইয়া বিস্তারিত রূপে তাহার দ্বারা একবার লিখাইয়া লইলাম এবং মুন্সী দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়ায় কথাও তাহাতে স্বীকার করিয়া লইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আণ্ডা ঘরে আণ্ডা খেলিতে ছিলেন; মুন্সী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল এবং তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া মুন্সীর প্রার্থনা মতে সেই রাত্রিটা তাহাকে ফাটকে প্রেরণ না করিয়া, থানায় রাখিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি মুন্সী তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অতিবাহিত করিল এবং পর দিবস প্রাতে কান্দিতে কান্দিতে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া জেলখানায় গেল। যাইবার সময় তাহাতে আমাতে এই রূপ কথোপকথন হয়;—

মুন্সী। দারোগা। মহাশয় আপনি আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আমার পায়ে কখনও বেড়ী উঠে নাই এইবার উঠিবে। আমি এখন দেখিতেছি, যে আপনি দারোগাই বড়।

দারোগা। দারোগা বড় নহে, ধর্ম্মই বড় মুন্সী সেখ।

মুন্সী। ঠিক বলিয়াছেন, এবার যদি খোদার মেহেরবাণীতে ফাটক খাটিয়া প্রাণ লইয়া বাড়ী আসিতে পারি, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি করিব না।

দারোগা। সব্ সে ওহি ভালা।

মুন্সীর সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের সহিত কারাবাসের দণ্ড হয়।

আনি পিসী।

আনি পিসী কেবল আমার পিসী নহে, আমার বাবার পিসী, পুত্রের পিসী, চাকর চাকরাণীর পিসী, গোমস্তা সরকারের পিসী, পুরোহিতের পিসী—ফলে গ্রামের আবার বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত লোকেরই তিনি পিসী ছিলেন।

তাঁহার পিতা রাজা রাম বাবু গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইলেও, এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কোটা বাড়ী, জমি জমাত, নগদ ধন এবং লোক জন যথেষ্ট ছিল। বিষয় বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ ছিল এবং তজ্জন্য গ্রামের সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান করিত। রাজা রামের ৪০ বৎসর বয়সের পর তাঁহার প্রথম স্ত্রী তিনটি পুত্র ও একটি পৌত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। শুনিয়াছি যে তাহাতে রাজারাম বিস্তর শোক প্রলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পরে তিন মাস অতীত না হইতে হইতেই তিনি আর একটি বিবাহ করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের দোষটা লোকে প্রায়ই বৃদ্ধা মাতা, খুড়ী জেঠাই ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপরে দেয়, রাজারাম ও তাহাই করিয়াছিলেন। বলিতেন নাকি যে, বিবাহ করিতে তাঁহার নিজের নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল কিন্তু কি করিবেন বৃদ্ধা মাতার অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না সুতরাং বিবাহ করিয়াছেন। ভাই! স্বীয় দোষ ঢাকিবার নিমিত্ত অনর্থক কেন বৃদ্ধা মাতার স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপ কর? বৃদ্ধা মাতা খুড়ী জেঠাই কিম্বা ভগিনীর ত আজন্ম ধরিয়া শত শত অনুরোধ উপরোধ অবহেলন করিয়া আসিয়াছ এবং ভবিষ্যতে আরও কত করিবে, তবে কি কেবল বিবাহটার বিষয়েই তাঁহাদের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলে না? ইহা কোন কার্য্যের কথা নহে। বিবাহ করিতে তোমারই নিজের বিলক্ষণ শখ; তবে লোক নিন্দার ভয়ে জননীকে অনর্থক নিমিত্তের ভাগী করিতেছ কেন?

রাজারাম ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমং।" রাজা রামের স্ত্রীর ২০ বৎসর বয়স হইয়া উঠিল কিন্তু এখনও একটি সন্তান হইল না। সপত্নী তিন পুত্র রাখিয়া মরিয়াছে এমন অবস্থায় তাহার একটি সন্তান না হইলে কেমন করিয়া চলে? অতএব অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং কবজ মাদুলী ধারণ করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনেক স্ত্রী

বিবেচনা করেন, যে তাঁহাদের বাপের বাড়ীর কাকটাও কোকিল। রাজা রামের স্ত্রীরও ঠিক সেইরূপ ধারণা ছিল। অতএব তিনি রাজারামের শান্তি স্বস্ত্যয়ন নিষ্ফল হইল দেখিয়া বলিলেন, যে তাঁহার পিত্রালয় হাঁসপুরে এক জন দৈবজ্ঞ আছেন, তাঁহার মন্ত্র—তিনি কথা কহিতে দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন! বলুন দেখি, আপনি ১০ বৎসর বয়সের কালে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন, এক্ষণ ২০ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে, ইহার মধ্যে আপনি ত বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ মেকং নগচ্ছতি।" তথাপি আপনি দেখিয়াছেন বলিলেন!! যাহা হউক আমরা রাগ করিলে কি হইবে? রাজারাম সেই দৈবজ্ঞকে আনাইয়া স্বস্ত্যয়ন করাতে দুই তিন মাসের মধ্যে কাণাকাণি হইল যে তাঁহার স্ত্রী সসত্ত্বা হইয়াছেন। গৃহে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল এবং দৈবজ্ঞ ঠাকুরটি দম্ভ করিয়া বলিলেন যে নিশ্চয়ই একটি পুত্র সন্তান হইবে; নচেৎ তিনি পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু রাজারামের আন্তরিক ইচ্ছা, যে তাঁহার অনেক গুলি পুত্র সন্তান আছে, এক্ষণে একটি কন্যা হইলে তাঁহার আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু স্ত্রীর নিকট এই ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেন না। যথা সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দাই মাসী "খোকা" হইয়াছে বলিয়া রাজারামের নিকট তৎক্ষণাৎ এক মোহর বকসিস লইল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই আসল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল, যে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। রাজারামের স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেও, ধূমধামের ত্রুটি হইল না। রাজারামের বংশের পদ্ধতি মতে পুত্রের ন্যায় কন্যারও অন্নপ্রাশন হইল। কন্যাটির নাম রাখা হইল অন্নদা সুন্দরী। ইনি ই আমাদের অন্নদা পিসী।

অন্নদার দিব্য মুখশ্রী, ফর্সা রং এবং গঠন গতি সুন্দর হইল। রাজারামের পৌত্রগুলি অন্নদার সমবয়স্ক ছিল, তাহারা অন্নদাকে অন্ন পিসী বলিয়া ডাকিত। পৌত্রদিগের দেখাদেখি রাজারাম এবং তাঁহার স্ত্রীও সোহাগ করিয়া অন্নদাকে অন্ন পিসী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহের পরিজন সকলেও কর্ত্তা গৃহিণীর অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত অন্ন পিসী নাম ব্যবহার করিতে লাগিল। বালিকাকে সকলে পিসী বলে শুনিয়া রাজারামের গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিরা তাহাকে পিসী বলিত। এই রূপে গ্রামের সকলের নিকট অন্নদা সুন্দরী অন্ন পিসী হইল। যত দিন অন্নদার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার ঘরের গৌরব ছিল, তত দিন লোকে অন্ন পিসী শব্দ ব্যবহার করিত কিন্তু রাজারামের মৃত্যুর পরে, বিশেষ অন্নদার

চরিত্র বয়স সহকারে যত বিকশিত হইতে লাগিল ততই লোকে অন্ন পিসীর পরিবর্ত্তে অনি পিসী বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং সেই নামটি তাঁহার মরণ কাল পর্য্যন্ত জারি ছিল।

বঙ্গদেশে তখন স্ত্রী শিক্ষার প্রথা কিছু মাত্র প্রচলিত ছিল না, অনেক বঙ্গবাসী হিন্দুর ধারণা ছিল যে স্ত্রী লোক বিদ্যাশিক্ষা করিলে, অবশ্যই অচির বৈধব্যদশার অধিকারিণী হইবে। রাজারাম বাবুর পৌত্র দিগের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত রামনাথ সরকার নামে এক জন গুরু মহাশয় নিয়োজিত হয়। সে রাজারামের বাহির বাড়িতে এই উপলক্ষে গ্রামের আরও কয়েকটি বালক সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠশালা সংস্থাপন করে। অন্নদা মধ্যে মধ্যে তাহার ভাইপোদিগের সঙ্গে পাঠশালাতে আসিত। গুরু মহাশয়ও তাহাকে কোলে বসাইয়া প্রথমে দোয়াত কলম দিয়া খেলা করিতে দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আদর করিয়া মুখে মুখে বর্ণমালা পড়াইতেন। গুরু মহাশয় দেখিলেন যে অন্নদার মেধা শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, একবার যাহা শুনে তাহা আর ভুলে না। রাজারামের পৌত্র কিম্বা অন্য বালক যাহা এক শত বার আবৃত্তি না করিলে, কিম্বা দুই চারি বার মার না খাইলে মনে রাখিতে পারিত না, অন্নদা সুন্দরী তাহা সহজে কণ্ঠস্থ করিতে পারিত। ইহা দেখিয়া রামনাথ সরকার এক দিবস বাড়ীর মধ্যে ভোজন করিতে বসিয়া, অন্নদার মাতা শুনিতে পান এমন করিয়া কন্যার গুণ কীর্ত্তন করিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দেওয়ায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই দিন সরকার মহাশয় ভোজনের নিয়মিত দ্রব্যের অতিরিক্ত এক বাটী দুগ্ধ ও কয়েক খানা বাতাসা উপহার পাইলেন। বৈকালে রাজারাম পাঠশালায় আসিয়া অন্নদাকে শিক্ষা দেওয়ায় নিমিত্ত সরকারকে অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই অবধি অন্নদা অন্য বালক ছাত্রের ন্যায় প্রত্যহ যথা সময়ে পাঠশালায় আসিয়া তাহাদের সঙ্গে রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালায় গতি বিধি করাতে তাহার অন্ন পিসী নামটা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। যাহা হউক অল্প কালের মধ্যে অন্নদা, রামনাথ সরকারের পেটের সমুদায় বিদ্যার অধিকারিণী হইয়া উঠিল এবং তাহার হস্তের লেখাও অতি সুন্দর হইল। ইহাতে পিতা মাতা সকলের নিকট অন্নদার গুণ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত গৌরব বিবেচনা করিতেন। গুরু মহাশয়ের পাঠশালার বিদ্যা যত দূর শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা অন্নদা সংগ্রহ করিয়া অবশেষে এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের নিকট

পঞ্জিকা দেখিতে এবং শুভ দিন ক্ষণ নির্ব্বাচন কবিতে ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। অন্নদার কেবল লেখা পড়ায় ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল এমন নহে। আলপনা পিঁড়ি চিত্র আদি সেকালের আবশ্যকীয স্ত্রীলোকেব জানিবাব যোগ্য শিল্প কার্য্য সমস্তেও তাহাব নিপুণতা হইল। তদ্ভিন্ন অন্নদাব গলার স্বব বড় মিষ্ট ছিল এবং স্ত্রী মণ্ডলীতে তাহাব গানের বড় আদব ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নদা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা না হইযা বর্ত্তমান সময়ে যদি তাহাব জন্ম হইত, তাহা হইলে সে এক জন বৃহদাকারেব শিক্ষিত বঙ্গমহিলা হইয়া মহামান্য হইত। অন্ন পিসীব এক প্রকৃতি ছিল, সে বালিকাকালে কখনও বালিকাদিগেব ন্যায় কাপড পবিত না, বালকের ন্যায কোঁচা কাছা দিয়া ধুতি পবিধান কবিতে এবং জুতা পায দিতে ভাল বাসিত। তাহার পিতার সঙ্গে নিজ গ্রামে কিম্বা গ্রামান্তবে কোন নিমন্ত্রণ কিম্বা সভায় যাইতে হইলে, সে পুরুষেব ন্যায় ধুতি, নিমকাবা, চাদব, জুতা এবং মস্তকে জরিব টুপি পবিয়া যাইত। কিন্তু তাহা বলিযা সে স্ত্রী লোকেব অলঙ্কাব ব্যবহার করিত না এমন নহে ববং তাহা প্রচুব পরিমাণে অঙ্গে পবিত।

সে কালে পিতা মাতাবা সৎবংশজাত বালক দেখিয়া কন্যাদান কবিতেন। পাস ফাসের এলাকা বাখিতেন না। তবে সৎবংশজাত বালক শ্রীমন্ত এবং লেখা পড়ায উত্তম ও বুদ্ধিমান হইলে অধিক আদরণীয় হইত। রাজারাম তাঁহার আহ্লাদেব কন্যা অন্নদা সুন্দরীর নিমিত্ত সেই রূপ গুণবিশিষ্ট এক পাত্র নির্ব্বাচন কবিয়া তাহার সহিত অন্নদার বিবাহ দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রথম হইতেই স্বামি স্ত্রীর মধ্যে এক দিবসের জন্যও মনের মিল হইল না। উভয়ে কেহ কাহাকে দেখিতে পারিত না। স্বামীব প্রতি অন্নদাব বিরক্তি ভাব হওয়ার কিছু কারণ ছিল বটে কারণ তাহার স্বামী তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান, শ্রুতিধর এবং সুন্দর না হওয়াতে অন্নদা তাহাকে তাহার স্বামির উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে না কবা সম্ভব, কিন্তু স্বামী কেন এমন সুন্দরী এবং গুণবতী স্ত্রীকে দেখিতে পাবিত না, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। অন্নদা যে পরিমাণে তাহার স্বামীব উপবে বিবক্ত ছিল ববং তাহার অধিক পরিমাণে তাহাব স্বামী তাহাব উপরে বিরূপ ছিল। ইহার ফল এই হইল যে অন্নদা কখনও তাহার শশুর বাড়ী গেল না এবং অন্নদার স্বামীও কখন রাজা-রামের বাড়ী আসিল না। প্রথমে উভয় স্থানের লোকে এই বিচিত্র

ঘটনার কথা লইয়া আন্দোলন করিত কিন্তু ক্রমশ তাহা সকলে ভুলিয়া গেল।

ফল এই হইল, যে অন্নদা তাহার জন্মটা ধর্ম্মের ষাঁড়ের ন্যায় পিতার আশ্রয়ে কাটাইলেন। প্রাতে উঠিয়া পিতা মাতার পূজার জন্য, নানাস্থান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া পূজার এবং আহারের আয়োজন করিয়া দিতেন। বৈকালে দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া কখন সুসজ্জিত বেশে কখন বা আলুলায়িত কেশে, গ্রামের মধ্যে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস ছিল না এবং অবাধে গ্রামের সকল স্থান এবং সকল মনুষ্যের সম্মুখ দিয়া একাকী চলিয়া যাইতেন; ইহাতে কিছু মাত্র লজ্জা বা আশঙ্কা জ্ঞান করিতেন না। পথি মধ্যে জ্যেঠা খুড়া কিম্বা তত্তুল্য মান্য পর্য্যায়ের কোন ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাহার পদ ধুলি লইতেন, কাজেই তাঁহারা অন্নদার প্রতি বিলক্ষণ সন্তুষ্ট থাকিতেন। পক্ষান্তরে সময়বস্ক কোন ব্যক্তি অন্নদাকে কোন উপহাস কিম্বা রসিকতা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপরে কট্ কট্ করিয়া এমন কয়েকটা কথা শুনাইয়া দিতেন, যে সে আর কখনও তাহার প্রতি ও রূপ ব্যবহার করিতে সাহস পাইত না। বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইলে সমবয়বস্কা ঝি বউড়িরা অন্নদাকে পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইত। "আয় অন্ন পিসী বস্ বস্" বলিয়া সকলে সম্ভাষণা করিত, কিন্তু অন্নদার হস্তে যেন কতই কর্ম্ম এই রূপ দেখাইয়া সে যাইতে চাহিত, কিন্তু তাহারা তাহা না শুনিয়া কেহ অন্নদার হাত, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া বসাইত, এবং গৃহে ভাল কোন আহারের দ্রব্য থাকিলে আনিয়া অন্ন পিসীকে খাওয়াইত এবং খাওয়াইয়া অন্ন পিসীর মুখে একটি গান শুনিতে চাহিত। গ্রামে যাত্রা কিম্বা পাঁচালির দল আসিলে অন্নদার আহার নিদ্রা থাকিত না। ঢোলকে টোকা দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পালার শেষ পর্য্যন্ত অন্নদা একটি ভাল স্থানে বসিয়া শুনিত এবং নূতন এবং উৎকৃষ্ট গান গুলি যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। পর দিবস গ্রামের সকল বাড়ীর বৌ ঝির নিকট তাহা গান করিয়া ফিরিত। অন্নদা জল খাবার খাইয়া এক গাল পান মুখে করিত এবং ওষ্ঠ রাঙ্গা হইয়াছে কি না তাহা দুই আঙ্গুলে টানিয়া ধরিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে, গান গাইত আরম্ভ করিত। সকল গান অপেক্ষা চিন্তা ময়রার এই দুইটি সখী সম্বাদ "ওহে কাল শশী তুমি গোকুলবাসী, তোমার কাশীতে কি প্রয়োজন?" এবং "ও কে চন্দ্রচূড় ধর, এলো যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর ব্রজ পুরে?"

অন্নদা সুন্দররূপে গাইতে পারিত এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা মোহিত হইত। তদ্ভিন্ন অন্নপিসীর বক্তৃতা-ক্ষমতাও প্রচুর ছিল, অতি তুচ্ছ কথা সে এমন বাক্য বিন্যাস করিয়া সজ্জিত করিতে পারিত, যে তাহা শুনিয়া লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইত। অন্নপিসী যে কেবল তাহার সমবয়স্কাদিগের নিকটে আদরণীয় ছিল এমন নহে, বৃদ্ধা খুড়ী জ্যেঠাই সকলে তাহাকে আদর করিত। বৃদ্ধারা কয়েক জন একত্রিত হইয়া অন্নদাকে আহ্বান করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া শুনাইতে অনুবোধ করিত এবং অন্নদাও তাহাদের নিকট বসিয়া প্রথমে প্রত্যেকের পদধূলী মস্তকে ছুঁয়াইয়া এমন মিষ্ট কণ্ঠে এই সকল পুস্তকের ছন্দ পাঠ করিত, যে তাহাতে শ্রোত্রী সকলের অশ্রুপাত হইত। পুরুষেরাও কখন কখন তাঁহাদের যাত্রার দিনক্ষণ অন্নদাকে ডাকিয়া স্থির করিয়া লইতেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া, অন্নপিসী সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিত এবং রাত্রিতে যে স্থানে বসিয়া তাহার পিতা ও তাঁহার অনুচরগণ বৈষয়িক ব্যাপার সকলের আলোচনা করিতেন, সেইখানে অন্নদা যাইয়া তাহা শ্রবণ করিত। যাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকে, সে সকল বিষয়েই উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারে। রাজারামের এই সকল মন্ত্রণায়, অন্নদা মধ্যে মধ্যে এমন কূট পরামর্শ দিত, যে তাহা শুনিয়া তাহার পিতা ও তাঁহার পারিষদেরা অবাক হইতেন; অবশেষে রাজারাম তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই অন্নদার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না। এইরূপে অন্নদার যুবত্বকাল কাটিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত তাহাকে সকলে অন্নপিসী বলিয়া ডাকিত।

অন্নদা ৩০। ৩৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইল। রাজারামের মৃত্যুর পরে অন্নদার সহিত তাহার বৈমাত্র ভ্রাতাদিগের সদ্ভাব না থাকে, এই আশঙ্কায় রাজারাম তাহাকে গ্রামের মধ্যে একখানি বাটী করিয়া দিলেন, পৃথক একটি পুত্র আনিয়া দত্তক রাখিয়া দিলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত তাঁহার পৈতৃক বিত্ত হইতে বার্ষিক ছয়শত টাকার আয়ের একখানা তালুক নির্ব্যূঢ়রূপে দান করিয়া অন্নদাকে পৃথকরূপে স্থাপিত করিয়া দিলেন। কি নৈসর্গিক কারণে তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু গৃহ, পুত্র এবং বিত্ত পাইবার পর হইতেই, অন্নদার মস্তিষ্ক যেন কিছু দূষিত হইল। সে গোপনে তাহার পিতার গৃহ হইতে গৃহস্থের আবশ্যকীয় অনেক

দ্রব্যজাত আনিয়া স্বীয় গৃহ পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তাহার বৈমাত্র ভ্রাতৃবধূদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইত কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। বিধবা হওয়ার পরে অন্নদা প্রতি দিন পূজা করিতে লাগিল। রাজারাম তাঁহার নূতন বাড়ীতে একটি দীঘী কাটাইয়া ছিলেন, তাহার জল অতি সুন্দর হইযাছিল এবং গ্রামের সকল লোকে সেই জল খাইত এবং তাহাতে স্নান করিত। অন্নদা এখন হইতে প্রত্যহ এক ধামা ফুল বিল্বপত্র লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া পূজা করিতে বসিত, কিন্তু যতক্ষণ অন্নদার পূজা সাঙ্গ না হইত, ততক্ষণ কাহারও সেই ঘাটে স্নান কিম্বা জল ব্যবহার করার ক্ষমতা হইত না। স্নান করিতে আসিয়া পুরুষেরা গামছা কাচিবে, এবং গামছার জলের ছিটা তাহার গায়ে লাগিবে, চাকর চাকরাণী জল লইতে আসিলে যদি তাহাদের স্পৃষ্ট জল তাহার ফুল বিল্ব-পত্রে লাগে, তাহা হইলে সমুদয় অশুচি হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অন্নপিসী কাহাকেও ঘাটে নামিতে দিত না। অন্নদা নির্ভয়ে বলিত "আমার বাবার দীঘী, আমার বাবার ঘাট, আমি ইহাতে যদেচ্ছা আচরণ করিব, লোকের আবশ্যক হয়, অন্য ঘাটে যাউক কিম্বা একটা দীঘী কাটাইয়া লউক।" অন্নদা কেবল তাহার পিতার পুষ্করিণীর ঘাটে এই রূপ দৌরাত্ম্য করিত, এমত নহে। ফুল বিল্বপত্র লইযা ঘাটে আসি-বার এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করার সময়ে পথের মধ্যে কেহ অন্নপিসীর জ্বালায় হাঁটিতে পারিত না। "দেখিস, ছুঁবি।" বলিয়া দশ হাত অন্তর হইতে পথিকদিগকে সাবধান করিত। চণ্ডাল, মুসলমান দেখিলে অধিক কোপ করিয়া তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে খেদাইয়া দিত। হীনজাতীয় মনুষ্যের ছায়া অঙ্গ স্পর্শ করিলে, যেন অন্নদার জাতি ধর্ম্ম লোপ হইবে এইরূপ ভাবে ব্যবহার করিত। পাছে কোন অপবিত্র দ্রব্য তাহার পদদেশে লাগে তজ্জন্য সে পথের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া হাঁটিত। যদি কখন কোন বালক পথের ধারে মলত্যাগ করিত, তাহা হইলে সেই দিবস গ্রামে একটা হুল্ স্থুল্ পড়িয়া যাইত। অপরাধীকে দেখিতে কিম্বা ধরিতে পারিলে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত, স্বহস্তে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া, কিম্বা বিশেষ ক্ষমা করিলে, তাহার চৌদ্দ পুরুষকে গালি দিয়া ছাড়িত। অপরাধীর অনুসন্ধান না পাইলে, গ্রামস্থ সকলকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে ওলাবিবির নিকট প্রার্থনা করিত।

অন্নদা তাহার গৃহের সম্মুখে কয়েকটা পুষ্পের ও লাউ কুমড়াব গাছ লাগাইয়া ছিল. পাছে পাঁটা খাসীতে খাইয়া তাহা নাশ করে, সেই নিমিত্ত অন্নদাব বাড়ীব নিকট দিয়া পশ্বাদিব চলিবার ক্ষমতা ছিল না। অন্নদা কত পাঁটাব পা ভাঙ্গিল, কত খাসী বান্ধিয়া বাখিয়া সমস্ত দিন অনাহারে ক্লেশ দিল, তাহাব অন্ত নাই। কিন্তু অবশেষে তাহাব দত্তক পুত্রেব একটা খাসী পুষিবাব ইচ্ছা হওযাতে অন্নদা একটা খাসী আনিল। সে খাসী অন্নদা বান্ধিযা বাখিত ন', ছাড়িযা দিত। খাসী সকলেব ফসল খাইতে আরম্ভ কবিল এবং অন্নদাব নিকট প্রতিবাদ কবিলে, অন্নদা ক্রন্দন স্বরে বলিত "আমাব ছেলেটি একটি খাসী পুষিয়াছে, তাহা আব পোড়া লোকেব গায সহে না।" সেই খাসীটা সর্পাঘাতে মরে; পবে আব একটি খাসী আনিযাছিল। তাহাও অল্পকালেব মধ্যে মবিয়া যায়। ইহা দেখিযা গ্রামেব দুষ্ট বালকেরা জনবব তুলিল, যে খাসী বাস্তবিক মবে নাই, অনিপিসী তাহা মাবিযা গোপনে ভক্ষণ কবিয়াছে। এক ছোঁড়া কবিতা রচিল যে,—

"অনিপিসী—
লুকিযে খায খাসী ;
বলে, কবি একাদশী।"

অনি পিসী এই কবিতা শুনিযা প্রথমে গালি, পবে প্রহার আবম্ভ কবিল, কিন্তু ছোঁড়াবা ছাড়িবাব পাত্র নহে। অবশেষে বালকেবা অনিপিসীকে দেখিয়া কেবল ভ্যাভ্যা শব্দ করিলেই অনিপিসী ক্ষেপিযা উঠিত। কিছু কালেব মধ্যে গ্রামে ওলাউঠা বোগ উপস্থিত হওযাতে উহাবই মধ্যে একটি বালকেব মৃত্যু হইল; অনি পিসী বালকদিগকে শুনাইয়া বলিতে আবম্ভ কবিল, যে "দেখ আমি কেমন সতী মাযেব সতী কন্যা, আমাব নামে সেই ছোঁড়া মিথ্যা কথা বটাইযা ছিল বলিযা তাহাকে যমে লইয়াছে; তোবাও সেইরূপ শীঘ্র যাইবি।" সেই পর্য্যন্ত বালকেবা ভযে অনি পিসীকে আব ক্ষেপাইত না। এক দিবস আমাব একটি অল্পবযস্ক পুত্র আসিয়া আমাকে বলিল, যে "বাবা! অনি পিসীব কি জানি কি হইযাছে, দেখিলাম দুই জন চাকবাণী তাহাকে ধরিযা লইয়া রাজারাম বাবুব বাড়ী হইতে লইযা যাইতেছে এবং অনি পিসী তাহাদেব একজনের স্কন্ধে মাথা দিযা কাঁদিতে কাঁদিতে অতি মৃদুগতিতে তাহার বাড়ীর দিকে

যাইতেছে।” আমি বাজাবামেব বাড়ী গিয়া শুনিলাম, যে অনি পিসীব “তাবা” নাম্নী একজন খুড়তাত ভগিনীব স্বামীব মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে অত্যন্ত দুঃখিত হইযা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ অনি পিসীকে সান্ত্বনা করাব জন্য তাহাব গৃহে গমন কবিলাম। সেখানে যাইযা দেখি যে কিসেব কান্না? অনি পিসী কোমরে তাহার অঞ্চল জড়াইযা একটা ঝাঁটা হস্তে কবিয়া তাহার চাকবাণীকে প্রহাব কবিতেছে ও যৎপবোনাস্তি গালি দিতেছে। শুনিলাম যে, ঐ চাকরাণী দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে শুনিয়াছিল যে তাহার কর্ত্রী তাঁহাব বাপেব বাড়ীতে ক্রন্দন কবিতেছে তাহা শুনিয়া, সে তাড়াতাড়ি দুগ্ধেব কড়াইটা অসাবধানে বাখিযা তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে একটা বিড়াল আসিযা সেই দুগ্ধেব কতকটা খাইযা গিযাছে। অন্নদা বাড়ী আসিযা তাহা দেখিতে পাইয়া, চাকবাণীকে সেইরূপ লাঞ্ছনা কবিতেছিল। কিন্তু বহস্য এখনও শেষ হয নাই। আমাকে দেখিবামাত্র অনি পিসী হস্তেব ঝাঁটা টা ত্যাগ কবিযা, কোমব হইতে আচঁল টানিযা লইযা, তদ্বারা তাহাব চক্ষু আচ্ছাদন কবিয়া, উচ্চ স্ববে “তারা লো তাব,” বলিয়া ক্রন্দন কবিতে আবম্ভ কবিল। আমি ইহা দেখিযা হাসিব কি কাঁদিব কিছু স্থির কবিতে না পাবিযা, শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান কবিলাম।

গ্রামস্থ কাহাবও পীড়া কিম্বা কোন বিপদ হইলে, অনিপিসী দেখিতে কিম্বা সান্ত্বনা কবিতে যাইতেন, যাইয়া বোগীব কিম্বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিব সহিত উচ্চ স্ববে কথা কহিতেন, যেন বাড়ীব সকল লোকে জানিতে পাবে, যে অনি পিসী দেখিতে আসিয়াছে। পবে আপন গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে সকলেব বাড়িতে যাইযা ভাবগতিকে জানাইযা যাইতেন, যে তিনি বোগীকে দেখিতে গিযাছিলেন। অনি পিসী এক বাব বৈদ্যনাথ তীর্থে গিয়াছিলেন ফিবিযা আসিলে তিন চাবি দিন ধবিযা তাঁহাব মুখে “বোম বৈদ্যনাথ” ভিন্ন অন্য কোন কথা ছিল না। কাহাবও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বৈদনাথেব নাম প্রথমে উচ্চাচবণ না কবিযা, অন্য কথা বলা হইত না এবং “বোম বৈদ্যনাথ” বাক্য এমন জোবে উচ্চাবণ কবিতেন, যে অকস্মাৎ শুনিলে শ্রোতাব হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। পথে—বোম বৈদ্যনাথ, ঘাটে—বোম বৈদনাথ, সকল স্থানেই ঐ শব্দ। ফলে কয়েক দিন অনি পিসী বোম বৈদ্যনাথ বলিযা গ্রামটা মাথার কবিযা তুলিযাছিলেন। অনী পিসীব মনে মনে অহঙ্কাব ছিল যে তিনি হিন্দী

কথা ভাল কহিতে পারিতেন। ধারণা ছিল, যে বাঙ্গালা কথার শেষে "মে" বাক্য বসাইলেই হিন্দী ভাষা হয়। আমার বাড়িতে এক জন নূতন খোট্টা চাকর রাখিয়াছিলাম। অনিপিসী এক দিবস তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের বাড়ীর স্ত্রী লোকদিগের নিকট তাঁহার হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার মানসে সেই চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, যে " ওহে মে চাকর মে, তোমার মে, ঘরমে কোথায় মে? হামি মে, যে, তোমাদের মে, মুলুক মে, গিয়াছি মে। সকল মে অবগত মে, আছি, মে।" চাকর ব্যাটা অনি পিসীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল এবং আমি তাহাকে এই বিভ্রাট হইতে উদ্ধার করার নিমিত্ত, ডাকিয়া অন্য কর্ম্মে পাঠাইয়া দিলাম।

অনি পিসীর দত্তক পুত্রের একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়াতে ক্রমশ বালিকার বয়স অধিক হইয়া উঠিল। অবশেষে একটি এল, এ, পাশ বালক পাইয়া তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। বালকের অবিভাকেরাও অনি পিসীকে কন্যার নিমিত্ত ছয় শত টাকা পণ স্বরূপ দিতে সম্মত হইয়া অগ্রিম ১৫০ টাকা দিয়াছিল। গায় হলুদ প্রভৃতি হইয়া গেল, কিন্তু বিবাহ যে রাত্রিতে হইবে, সেই দিবস প্রাতে এক 'তেজ বরে' বিয়া পাগলা ডিপুটী কলেক্টর অনি পিসীর নাতিনীটি বয়স্থা বালিকা শুনিয়া অনি পিসীকে দুই হাজার টাকা দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। কন্যার পিতা প্রতিবাদ করিল এবং কন্যাটিও বুড়াবরের কথা শুনিয়া ছাদের উপর হইতে পড়িয়া আত্ম হত্যা করিতে প্রস্তুত হইল, আত্মীয় সজনেরাও কন্যাটি অন্য পূর্ব্বা হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রের ভয় দেখাইল, কিন্তু অনি পিসী অটল। পুত্রকে ধমকাইয়া, কন্যাকে এক ঘরে বন্ধ করিলেন এবং অবশেষে সেই বুড়ার হস্তে নাতিনীকে অর্পণ করিলেন। কোথায় ৬০০, কোথায় ২০০০ টাকা—ইহার লোভ কি অনি পিসী ভুলিতে পারেন? কিন্তু সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রথম পাত্রের নিকট অনি পিসী যে অগ্রিম ১৫০ টাকা লইয়াছিলেন, তাহা তাহাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া সেই টাকার জন্য আদালতে নালিশ করিল এবং অনি পিসীর বৈমাত্র ভ্রাতারা আপনাদের সম্মান রক্ষা করার নিমিত্ত, নিজ হইতে সেই টাকা দিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন। কিন্তু অনি পিসী সে টাকা দিল না।

এই বিবাহের এক বৎসর পরে অনি পিসী তাহার নাতীন জামাইয়ের আহ্বান মতে কলিকাতায় গঙ্গা স্নান করিতে ও সেই উপলক্ষে নাতিনীকে দেখিতে, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলগাড়ি আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। নাতীন জামাতা তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া দিয়াছিল কিন্তু অনি পিসী তাহাতেও কিঞ্চিৎ লাভ করিবার নিমিত্ত সকলের নিম্ন শ্রেণীর টিকিট লইয়াছিলেন। পথি মধ্যে আড়ংঘাটার গাড়ির ঠেকাঠেকি হইয়া যে ভীষণ ব্যাপার হয়, তাহা সকলেই জানেন; অনি পিসী সেই ট্রেনে ছিলেন এবং তাঁহার সেই পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁহার পুত্র ও নাতীন জামাতা অনেক তল্লাস করিয়াছিল কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না। সকলের বিশ্বাস যে এঞ্জিনের অব্যবহিত নিকটে এক নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে থাকাতে অনি পিসীর দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্য কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। মৃত্যুর নিশ্চয় সংবাদ অভাবে শ্রাদ্ধাদি হইতে পারে না, অতএব অনি পিসীর শ্রাদ্ধ হইল না। দ্বাদশ বৎসর বাদে হইবে। শক্রবা বলে যে ইহা কোন কার্য্যের কথা নহে। নাতিনীর বিবাহের টাকা গুলির কিছু অংশ নাতিনীর পিতা মাতাকে দিতে হইবে বলিয়া অনি পিসী লুকাইয়া রহিয়াছে। পরে সময় বুঝিয়া সে গুপ্ করিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার কোন্ কথা সত্য, আমি জানি না,—ভগবান্ জানেন।

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ।

"হিন্দু কাহাকে বলে?" এই পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসের নবজীবনে ঐ প্রবন্ধগুলির উপসংহার হইয়াছে। আমি এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

বুঝিবার দোষে শাস্ত্র, অশাস্ত্র বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে তারাপ্রসাদ বাবুরও এই দোষ ঘটিয়াছে। নানা কারণে আমি তারাপ্রসাদ বাবুকে বিশেষ সম্মান করি। আরও অনেকে করেন। সেই জন্যই তারাপ্রসাদ বাবুর ভুল দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকেরই নাকি কিছুমাত্র গুরুকরণ নাই, অথচ স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ নাকি আজি কালি অল্প স্বল্প শাস্ত্রের আলো-

চনা করিতেছেন, সে জন্যও মান্য ব্যক্তির ভুল শুধরাইয়া দেওয়া আবও আবশ্যক। নচেৎ তাবাপ্রসাদ বাবুর কথার উপর কথা কহিতে আমি ধৃষ্টতা মনে করিতাম।

তারাপ্রসাদ বাবু কেবল নিজের বিবেচনা অনুসারে যে সকল মতামত প্রকাশ কবিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রযোজন দেখি না; কেবল শাস্ত্রীয় কয়েকটি বচন প্রমাণের তিনি যে বিকৃত অর্থ কবিয়াছেন, তাহাই দেখাইব।

তাবাপ্রসাদ বাবু বলেন—"জ্ঞানীব জন্য এক পন্থা এবং জ্ঞানহীনের জন্য পৃথক পন্থা. তাহার ভূরি ভূবি প্রমাণ আছে।" এই বলিয়া কতক-গুলি বচন প্রমাণ তোলা হইযাছে এবং তাহাব এক রকম অর্থও করা হইযাছে। কিন্তু তাঁহাব লেখা অনুধাবন কবিয়া আমাব বোধ হইতেছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের শাস্ত্রীয প্রভেদ তিনি উপলব্ধি কবেন নাই। কি জন্য আমি এ প্রকাব বোধ কবি, তাহা দেখাই।

বিহায নাম রূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পবিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্ম বন্ধনাৎ॥

তাবাপ্রসাদ বাবুব অর্থ—"যিনি নিত্য ও নিশ্চল পবব্রহ্মে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি) কোন নাম না দিয়া, এবং কোনরূপ (রক্তবর্ণ চতুরানন, কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ, বজতবর্ণ পঞ্চানন ইত্যাদি) আরোপ না করিয়া, তাঁহাব তত্ত্ব যথার্থরূপে জানিযাছেন, তিনিই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।"

"নাম না দিয়া" "রূপ আবোপ না কবিয়া" এ দুই কথা ত মূল বচনে নাই। তাবাপ্রসাদ বাবু তবে কোথায় পাইলেন? "বিহায়" শব্দের অর্থ পবিত্যাগ কবিযা; তদ্দ্বাবা আবোপেব কোন আভাস পাওয়া যায় না। বাস্তবপক্ষেও নাম এবং রূপ জীব কর্ত্তৃক আবোপিত নহে। সমস্ত সৃষ্টি যাহাব কল্পিত, জীবেব গতিব জনা নাম এবং রূপও তাঁহারই কল্পিত। মায়াব অধীনে থাকিয়া জীব যাবৎ আত্মস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান থাকে, তাবৎকালই সেই অজ্ঞান নষ্ট কবিবাব জন্য অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কবে। ক্রমে কর্ম্মেব দ্বারা কর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানোদয় হয়। তখন অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মায়াব মোহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জীব সৃষ্টির মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করে এবং নাম ও রূপের নানাত্ব লইয়া যে সৃষ্টি, সেই নাম ও রূপের মিথ্যাত্ব জানিয়া আপনাআপনি তাহা

পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ নামরূপাত্মক মানস্থ, স্বপ্নদৃষ্ট গজরথাদিবৎ সহজেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান এবং সহজেই পরিত্যক্ত হয়। জগৎ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হইলেই নিশ্চল অর্থাৎ অজগৎ এবং নিত্য যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে জীব তখন পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হয় এবং তদ্রূপ হইলে তখন কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

তারাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত বচনের ইহাই প্রকৃত অর্থ। বুদ্ধিমান হইলে জ্ঞানী হয় না। ইংরেজি, ফারসি পড়িয়া কৃতবিদ্য হইলেও জ্ঞানী হয় না, আর আমি জ্ঞানী মনে করিলেও জ্ঞানী হইতে পারা যায় না। মায়ার বশীভূত আমরা, মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে, কখনই জ্ঞানী হইতে পারি না। জ্ঞানের অবস্থা, তুরীয় অবস্থা। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া তুমি অগ্রাহ্য কর, অন্যের তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইলে, এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই চলিতে হইবে, নহিলে ভ্রম হইবেই হইবে।

তারাপ্রসাদ বাবু আরও অনেকগুলি বচন প্রমাণ তুলিয়া সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর গোলে পড়িয়াছেন। সব গুলির বিচার নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সময় নষ্ট হইবে মাত্র। বুদ্ধিমন্ত লোকমাত্রেই উপরের ইঙ্গিত ধরিয়া বুঝিলেই তারাপ্রসাদ বাবুর ভ্রম দেখিতে পাইবেন। তবু অল্প স্থানের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটি ভুল যাহা হইয়াছে, তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥

তারাপ্রসাদ বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন—"মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু আদির মূর্ত্তিকে যে ঈশ্বর বোধ করে, তাহার তপস্যা ক্লেশের কারণ হয়। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।"

অন্য দোষের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। তারাপ্রসাদ বাবুর কৃত অর্থ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। মূর্ত্তৌ—সপ্তমীর প্রয়োগ; "মূর্ত্তিকে" বলিয়া অনুবাদ করা ভুল। ক্লিশ্যন্তস্তপসা——এটুকুর অর্থ করা হইয়াছে "তপস্যা ক্লেশের কারণ হয়।" নেহাৎ জবরদস্তি। বচনটির শব্দার্থ—মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু প্রভৃতি মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং তপস্যা দ্বারা ক্লেশ করিতেছে যে জীবগণ, তাহারা জ্ঞান না হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত

হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ হয় না; কর্ম্মের পর জ্ঞান, তাহার পর মুক্তি।

আর একটি অর্থ বিকারের দৃষ্টান্ত দিব।

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাবভাষণং।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পবদাভিমর্ষণং॥
বীভৎসং মবণং ক্ষোভং দুষ্ক্রিয়া বিবিধঃ (?) কলৌ।
পাষণ্ডিনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

তারাপ্রসাদ বাবুর অর্থ—"কলিযুগে পাষণ্ডগণ বিশুদ্ধ পবমাত্মাতে জন্মাপবাদ, দ্রোহ, মিথ্যা কথন, * * * ও বিবিধ দুষ্ক্রিয়া আবোপিত করিবে।"

এইটুকু বলিয়া তাবাপ্রসাদ বাবু মন্তব্য কবিতেছেন—"কেবল কলিযুগের গ্রন্থে কেন, যে সমস্ত পুবাণ অন্যান্য যুগে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতেও ঐ দোষ আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির উপব নিন্দনীয় কার্য্য আবোপিত কবিয়া পুরাণকাবগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল বচনে পুবাণকাবদের কোন দোষেব কথা নাই, পাষণ্ডিদেব কথাই আছে। নিত্য বিচাব কার্য্যে লিপ্ত তারাপ্রসাদ বাবু এক জনেব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন, ইহা কি বিস্ময়েব কথা নহে? ফলে আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, গুরুকবণ ব্যতীত শাস্ত্রার্থ করিতে গেলে, এই রূপ বিড়ম্বনাই ঘটে। বাস্তবিক কোন পুবাণকাব বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্মাপবাদ ইত্যাদি আবোপ কবেন নাই। যাহাবা এইরূপ আরোপ কবে, তাহাবাই পাষণ্ডী। এ কথার অর্থ ভাল কবিয়া বুঝিতে হইলে পুবাণ পাঠ করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেব বাস লীলাদির বর্ণন আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেব পুবাণকাব শ্রীকৃষ্ণে কখন কামেব আবোপ করেন নাই। যাহাবা পাষণ্ডী, তাহাবাই ভগবল্লীলাব মর্ম্ম অবগত হইবার অধিকারী না হইয়া ভগবানে কামাদিব আবোপ কবিয়া থাকে। তাহাবাই পাষণ্ডী।

শাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সুতবাং কাম তাঁহাতে সম্ভবে না। ভগবান মায়াব বশীভূত নহেন, মায়াই তাঁহাব বশ। তাঁহার কর্ম্ম নাই এবং ভোগও নাই। তিনি বাঞ্ছা কল্পতরু, সর্ব্ব কর্ম্ম ফলদাতা এবং দ্বন্দ্বাতীত। সুতবাং ভগবানেব জন্ম অসম্ভব, মরণও অসম্ভব, কাম ক্রোধাদি জন্য কর্ম্মও অসম্ভব। মায়াধীন জীবের দৃষ্টিতে জীবের হিত সাধন জন্য, তিনি কর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবপক্ষে কর্ম্মে নির্লিপ্ত।

রাসবিলাসাদিতে কৃষ্ণপ্রাণা, ভক্তিময়ী, সংসারসন্ন্যাসিনী গোপিকাদের ভোগ আছে, মনোরথের পূরণ আছে। কিন্তু ভগবানের মনোরথও নাই, ভোগও নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করুন, এই মীমাংসা তাহাতেই পাইবেন। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, সর্ব্বত্রেই এই রূপ। কিন্তু অজ্ঞান, অনধিকারী, বৈদিকানুষ্ঠানবর্জ্জিত বেদনিন্দুকেরা এ ব্যাপার বুঝিতে অসমর্থ। শাস্ত্রে ইহারাই পাষণ্ডী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দোষ পুরাণকারদের নহে, দোষ, পাষণ্ডীদের। তারাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত উপরি লিখিত বচনে কলিযুগের সেই পাষণ্ডীদের ব্যবহারই বর্ণিত হইয়াছে। সহজে বুঝিলেইত হইত যে, পুরাণেই পুরাণকারের নিন্দা থাকিবে কেন?

শাস্ত্রের মনগড়া অর্থ করিলে বড়ই অত্যাচার হয়। আমার মনের সঙ্গে যে অংশ মিলে না, তাহা ভুল, আমার মনের সঙ্গে যাহা মিলে, তাহাই ঠিক, এ ভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয় না। এরূপ করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে, সাহসের সহিত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজের মনোমত একটা নূতন শাস্ত্র তৈয়ার করা বরং ভাল। নচেৎ শাস্ত্রে অযুক্তি দোষ ঘটে। অযুক্তি ঘটাইলে অধর্ম্ম হয়। অন্তত শাস্ত্রকারদের মতে অধর্ম্ম হয়। প্রমাণ আছে,

"যুক্তি হীন বিচারেণ ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে।"

শাস্ত্রের যুক্তি অর্থাৎ বেদানুসারী সমগ্র শাস্ত্র-গ্রন্থের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক বিচার না করিলে, কেবল বিচ্ছিন্নভাবে শাস্ত্রের একাংশ অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিতে গেলে, শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। তাহাতে কেবল অনর্থই হয় এবং সেই অনর্থের অনুসরণ করিয়া অধর্ম্ম মাত্র তাহার ফল স্বরূপে লাভ করা যায়। এই কারণেই, কেবল সত্যের অনুরোধে তারাপ্রসাদ বাবুর প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি।

১। সাধারণ কথা।

মনুষ্য স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে, অথচ স্বভাবেরই অনুকরণ করে। স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে স্বভাবের অনুকরণ করে। প্রকৃতির

উপকরণ লইয়া, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে, বা প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করে অথবা প্রকৃতির প্রয়োজন সাধন, সম্পাদন বা পূরণ করে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করা অর্থে প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা অর্থে প্রকৃতির অনুকরণ করা, অনুকরণ করিয়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন বা পূরণ করা। প্রকৃতির উপকরণ লইয়াই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করা যায়। বাহ্য এবং অন্তর প্রকৃতি ভিন্ন মানুষ আর কোথায় কি পাইবে? অতি-প্রকৃতি তাহার আয়ত্ত নয়। একটু অনুধাবন করিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে।

জ্ঞান বিজ্ঞান,—প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, শিল্প সাহিত্য সেই পর্য্যালোচনার সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থ অর্থে গ্রন্থি, চিত্র অর্থেও তাই। প্রকৃতি পর্য্যালোচনার ফল, অনুধাবন অনুকরণ ও বহু দর্শনের ফল, শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষার ফল, গ্রন্থে "গেরো" দিয়া গেঁথে রাখা হয়—বর্ত্তমানের স্মরণার্থ, অতীতের গৌরবার্থ, ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থ, সভ্যতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত। পরন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য গ্রন্থিত বা গ্রন্থিযুক্ত করা হয়,—জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যেরই ক্রমে বিকাশের সাহার্য্যার্থ এবং ভিত্তি স্বরূপে। স্তরের উপর স্তর তার উপর স্তর। এক স্তরের ফল আর এক স্তর, অথবা এক স্তরে বসিয়া আর এক স্তর নির্ম্মাণ করা হয়। এসব সহজ কথা, সকলেই বুঝি। তবে সময়ে সময়ে স্মরণ করিয়া নিতে হয় এই মাত্র।

শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাবেরই অনুধাবন বা অনুকরণ। সাহিত্য, না হয় শিল্পেরই অন্তর্গত হইল, না হয় এক প্রকার শিল্পই হইল, সে কথা হইতেছে না। কথাটা এই হইতেছে যে, উহা স্বভাবের অনুকৃতি বটে। সাহিত্যই আমাদের, এস্থলে প্রধান বিচার্য্য। অতএব সাহিত্য কথাই এখান হইতে ব্যবহার করা ভাল। সাহিত্য, স্বভাবের অনুকৃতি। অনুকৃত বটে কিন্তু অতিরিক্তও বটে। সাহিত্য, স্বভাবের একটু অতিরিক্ত নয় কি? অতিরিক্ত হইলেই যে বহির্ভূত হয়, অন্তর্ভূত হয়না,—তা নয়। স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত। কাথাটা হঠাৎ শুনিতে কতকটা আত্মবিরোধী বটে, কিন্তু তথাচ কথাটা ঠিক। শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক, সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক। শিল্প এবং সাহিত্য উভয়ই স্বভাবের অনুকৃত বা অন্তর্ভূত অথচ অল্পাধিক পরিমাণে স্বভাবাতিরিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে একেবারেই "ছনিয়া ছাড়া" তা নয়। স্বভাবের মালমসলা লইয়াই স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি

হয়। যাহা স্বভাবের বহুস্থানে, বহুখণ্ডে বিন্যস্ত, তাহার একত্রীকরণ, সারাংশ সামঞ্জস্য ও সমষ্টিকে এক অর্থে স্বভাবাতিরিক্ত বলা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা বা তত্ত্বপ্রকৃতিতে যাহা সচরাচর বা কখনও একাধারে একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। স্বাভাবাতিরিক্ত অর্থে অস্বাভাবিক নয়, সৃষ্টির বহির্ভূতও নয়। ষোল আনা স্বাভাবিক এবং সম্যক প্রকারে সৃষ্টি সম্ভূত। সৃষ্টি সম্ভূত ও স্বাভাবিক, অথচ সৃষ্টি ও স্বভাবের কিছু অতিরিক্ত। অতিরিক্ত টুকু কোথায়? তাহা স্বভাবের সামগ্রীকে মানুষের সাজাইবার কৌশলে,—সংগ্রহ করিবার মুন্সি আনায়। মোটের উপর ধরিলে, মোটামুটি হিসাব করিলে, এই কৌশল বা মুন্সি আনাই—শিল্প সাহিত্য। রূপরস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ, দোষ, গুণ, দৃশ্য,—সুন্দর মনোহর, ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদর্য্য,—মহতের মহৎ, নীচের নীচ—সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। শিল্প বা সাহিত্য সেই 'সব' হইতে 'রকমারি' বাছিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া ছাটিয়া,—চোস্ত দোরস্ত করিয়া, যারপর যেটি বসিলে মানুষের চোখে মানায়, মনের মত হয় ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, অথচ স্বভাবের সহিত ষোল আনা সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজের বক্ষে ধারণ করেন। সাহিত্যের কাট-ছাট এমনতর হওয়া চাই, যে একদিকে তাহা মানুষের মনে 'মানাইবে' আর একদিকে স্বভাবের সহিত খাপিবে। উভয়ের কোনটির ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না। মনের "মানানসই" না হইলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সাধিত হইবে না, স্বভাবের সহিত অখাপস্ত হইলেও সেই রূপ ব্যর্থ হইবে, যাহা স্বভাবের সহিত অখাপস্ত—তাহা অস্বাভাবিক। যাহা অস্বা-ভাবিক বা নেহাত অতি স্বাভাবিক, তাহা মানুষের মনে ভাল ধরে না। মানু-ষের মনে ধরে, যাহা স্বভাবাতিরিক্ত অথচ স্বাভাবিক, শিল্প এবং সাহিত্য মানুষের কৃত, এবং মানুষেরই জন্য। যাহা মানুষের মনে ধরার উপযোগী শিল্প এবং সাহিত্যকে তাহাই সংগ্রহ বা সৃষ্টি করিতে হয়। শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাব হইতে সামগ্রী লইয়া স্বভাবাতিরিক্ত আর এক সংসার সৃষ্টি করেন। শিল্প-সাহিত্য সংসারে আমাদের এই 'ঘর-সংসারেরই' অতিরিক্ত সব থাকে, অথচ তাহা এ সংসারের অতিরিক্ত আর এক সংসার। এ সংসারের উদ্দেশ্য কি? আবশ্যকতা কি? উদ্দেশ্য অনেক। আবশ্যকতাও অনেক। মানুষের 'মানুস' হইতে, তাহার পর মানুষ হইয়া দেবতা হইতে,

কত কি না আবশ্যক? মানুষের মার্জ্জিত এবং উন্নত হইতে অনেক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়; কাজেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যও অনেক। আবশ্যকতার অনুপাতেই উদ্দেশ্য। ঐ পরাকৃত সংসারের উদ্দেশ্য, অবশ্য সাধারণত, বলিতে গেলে, মানুষের মনের তুষ্টি ও তৃপ্তি সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে যুগপৎ মহদাদর্শ সংস্থাপন, উচ্চ উপদেশ বিজ্ঞাপন, এক কথায়, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব সংগঠন। কিন্তু উদ্দেশ্য বা আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদের আপাতত বেশী কথা নাই। কথা হইতেছে, সাহিত্য সম্ভূত সংসার লইয়া। বলিয়াছি যে, সে সংসার স্বাভাবিক, অথচ অল্প বিস্তর স্বভাবাতিরিক্ত। স্বাভাবাতিরিক্ত না বলিয়া সংসারাতিরিক্ত বলিলে আমাদের এথাটি আরও বিশদ হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও সেই সঙ্গে স্বভাবাতিরিক্ত বা সংসারাতিরিক্ত সৃষ্টির অবতারণা করার প্রথাটি সাহিত্যে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে।

কথাটা আর এক দিয়া দেখা যাউক। মানুষে যাহা কিছু নির্ম্মাণ করে, চিত্র করে, লেখে বলে, বর্ণনা করে, রচনা করে সকলেতেই স্বভাবের অনুলিপি লয়। অনুলিপি লয় কিন্তু তাহা অবিকল লয় না। লইলে চলে না, লইতে পারে না, লওয়া উপযোগী নয়, সম্ভবও নয়। চিত্রে এক 'পোঁচ' বেশীও হয়, এক পোঁচ কমও পড়ে। লেখা বা বলায় এক আখর কমও হয়, দু-আখর বেশীও হয়। প্রকৃত প্রতিলেখা অবিকল অনুলিপী সম্ভবেও না—ভাষা ও সাহিত্যে তাহা থাপেও না। ভাষা-বদ্ধ বা সাহিত্যভুক্ত করিতে হইলে, লম্বা বিষয় খাট করিয়া লইতে হয়, আবার সংকীর্ণকেও একটু প্রশস্ত করিতে হয়। আবৃতকে অনাবৃত ও অনাবৃতকে আবৃত করিতে হয়। অস্ফুটস্তকে ফুটন্ত, ফুটন্তকে আরও ফুটন্ত করিতে হয়; আবার জ্বলন্তকেও নিবাইতে হয়। উলঙ্গ অনাচ্ছাদিতের উপর আচ্ছাদন দিতে হয়। পরন্তু এই আবৃত ও অনাবৃত করণ প্রণালীকেও সীমা বদ্ধ করিতে হয়। এসব না করিলে চলে না। করাতেই ভাষার ভাষাত্ব রক্ষা হয়, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিলেখ্য লওয়া অসম্ভব, কারণ লিপীকর অপূর্ণ। লওয়া উপযোগী নয়, তাহারও ঐ কারণ। সাহিত্যে প্রকৃতির প্রকাণ্ড স্থূল শরীর ধরে না, স্বভাবের বিরাট দেহের স্থান সাহিত্যে হইতে পারে না। তবে কি সাহিত্য স্বভাবকে সম্যকরূপে প্রতিফলিত করে না?

করে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে। সাহিত্য স্বভাবের "সূক্ষ্ম শরীর"। প্রকৃতির প্রকাণ্ডতাও সাহিত্য প্রতিফলিত করে,—যেমন মানুষের সূক্ষ্ম শরীরে তাহার স্থূল শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকার বিষয় কথিত আছে। পরন্তু সূক্ষ্ম শরীর যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

যাহা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাত্যহিক, তাহা মনুষ্য চক্ষে পুরাতন, সাধারণত আকর্ষণ শক্তি বর্জ্জিত, কাজেই অল্লাধিক পরিমাণে অগ্রাহ্য। তাহাতে নবীনত্ব নাই; বিশেষত্বও নাই, কাযেই মনোরঞ্জন বা চিত্ত আকর্ষণ করে না। সাহিত্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক, এই জন্য নবীনত্ব ও বিশেষত্ব বিবর্জ্জিত সাধারণ প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র সংকলন করিয়া লয়েন এবং তৎসহযোগে বিশেষত্ব-নবীনত্ব-সমন্বিত, চিত্ত আকর্ষণ ও মনোমোহন-ক্ষম আদর্শ প্রকৃতির সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাহার উনকোটী 'খুটীনাটী' সাহিত্য গণনা করেন না, তাহা করেন, বিজ্ঞান; তাও বিশেষ বিশেষ স্থলে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনা, ইঞ্চি ফুট, বট বৃক্ষ মাপিয়া মাপিয়া তাহার হিসাব নিকাশ করা, সাহিত্যের কাজ নয়। অন্তত সে কাজ সাহিত্য এত কাল করেন নাই। করিবার আবশ্যক বুঝেন নাই। আদর্শ চিত্র বা চরিত্র আঁকিয়াই সাহিত্য নিশ্চিন্ত, সে চিত্র বা চরিত্রকে স্বাভাবিক অথচ স্বাভাবাতিরিক্ত করিতে সচেষ্টিত; মধুমক্ষিকার মত সৌন্দর্য্য-মধু আহরণ করত, ভাব বৈভব সংগ্রহ করত, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া সাহিত্য গৌরবান্বিত। শব্দাড়ম্বর বিরহিত, শব্দ-সম্পদ-সুসজ্জিত, একটি উপমা বা দুইটি অলঙ্কার দ্বারা, সাহিত্য অসংখ্য শব্দ, ভূরি ভূরি ভাব, প্রকৃতির অনেকটা অংশ প্রকাশে সুপটু ও যত্নবান। সাহিত্য এই নিয়মে এতকাল চলিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। কাব্য কবিতা, সংগীত বক্তৃতা, নাটক নবেল, কাহিনী উপন্যাস আদি সূক্ষ্ম সুকুমার সাহিত্য, সমগ্র রসময় শাস্ত্র, এদেশ সে দেশ সকল দেশেই, উক্ত নিয়মে চলিযাছে। এখনও যে না চলিতেছে তা নয। এখনও চলিতেছে এবং পরেও বোধ করি চলিবে। তবে নিয়মটা সম্বন্ধে ইদানী একটা কথা উঠিয়াছে; প্রতিকুল, সমালোচনাও একটা চলিতেছে। বহু কালের এই পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে আর একটা নূতন নিয়ম, অভিনব প্রণালী—অবলম্বন করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন স্তরের উপর

বসিয়া একটা নূতন স্তব প্রস্তুতের জন্য বিস্তর উদ্যোগ হইতেছে। উদ্যোগটা অবশ্য হইতেছে, ইয়ুরোপে। তবে ইয়ুরোপই নাকি আজি কাল সকল পৃথিবীর পৃথিবী; সকল দিক্ দেশের অধিনেত্রী; আর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের "আঁচ" নাকি আমাদের এখনকার সাহিত্যের গায় বিশেষরূপে লাগিয়াছে, লাগিতেছে, লাগিবে,—অন্তত লাগিবারই নাকি বিশেষ সম্ভাবনা, আর সে "আঁচ" নাকি আমরা এড়াইতে পারি না, এড়াইতে চাই না, তাই অদ্যকার এই আলোচনা। নহিলে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথায় কি হইল, কোন স্তরের পর কোন স্তর উঠিল বা উঠিবার উপক্রম হইল, তাহার অন্বেষণ বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমাদের প্রয়োজন কি? উপরোক্ত অভিনব প্রণালীর বিশেষ কথা পর প্রস্তাবে বক্তব্য।

সারদা—সঙ্গীত।

(আড়ানা।)

কে বিহারে উজালে।
ধবলে ধীময়ি বালে॥

স্বয়ম্ভু শিরসি-স্বরা, জ্ঞান-বিগঠিতা বরা
সিত প্রতিভা প্রখর কর জালে।

আদি অশেষ অম্বর মহা সরসে,
প্রথম স্ফোট বিশ্ব বিকচ রচন তত্ত্ব তামরসে
দিব্য বিদ্যাম্বরা মণি মন্ত্রময়ী মা ব'সে,
ভাব-ভূষণ গল-মালে।

বিচিত্র চরণ কিরণ সাজে,
বত কলপনা ক্রীড়ন কাজে,
উদিত নব নব ভাবের জগত, সঞ্জীবন্ত উছালে।

সুবদ্ধ জগযন্ত্র মিলন গুণে,
অঙ্গুলি বিতাড়নে বিশ্ব বীণে,
কখন কি রাগ বাজাও মা রাগময়ি কেবা জানে!

কভু, পত্র ফল ফুলে ফুল্ল রসিত বসন্ত,
দেখি, দীপ্ত দীপকে দিগ দিগন্ত,
ঝর ঝর বরষা শরত হেমন্ত,
ফুটে ভৈরব শ্রী, হিন্দোলে।
মহ্লারে আসারে ঢালে॥

অশেষ তব সুর গ্রামে গ্রামে,
ভরিয়া ভুবন চরাচর ধামে,
জীবন্ময় নানা রাগিণী রাগ
মূর্ত্তিমান ভ্রমে অবিরামে।

সকল রসালাপ তরু লতা নরে,
বায়ু বহ্নি সর্ব্বজীব জড়ে ধরে,
একতান-বদ্ধ ভুবনে পরস্পরে,
মা পুর এ তাল নিত্য সকল কালে।

শারদে শত শরদেন্দু হাসে,
বিমোহ মালিনা তমান্ধ নাশে,
পরম কারণ রস পিয়াসে
মা পূর্ণ পীযূষ পিয়ালে।

কারণ কবিতা সঙ্গীত বন্দে,
সুকণ্ঠে উত্থিত প্রকৃতিচ্ছন্দে,
পদ আন্দোলে ধরিছ মধু মন্দে,
নিখিল নিয়ামক শুভ সঙ্গত তালে।

দূর দিব্য দৃষ্টি-ভেদী অনাদি অনন্তে,
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম পরিণামে প্রশান্তে,
সৃষ্টি, রসায়ন, গুণ, ভাব, ভক্তি
পবিত্র, রস, প্রীতি, মধুরিত সান্তে—
কবিত্ব-বিভ্রান্ত দ্বি-পদ্ম লোচন বিশালে।

কুন্তল কলাপ ঘোর কূট কাদম্বে,
তব পৃষ্ঠ নিবেশিত তমসিত অম্বে.
অজ্ঞান তরঙ্গ আপাদ বিলম্বে
আধ-প্রচ্ছন্ন-প্রসন্ন মা মোহাম্বরালে ॥

কে বিহারে উজালে !
ধবলে ধী-মণি বালে ॥

সৃষ্টিতত্ত্ব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

(১)

সৌর-নীহারিকা হইতে ভূমণ্ডলের উৎপত্তি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী ইতিহাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

দেখিয়াছি আদিতে ভূমণ্ডল কেবল উত্তপ্ত তরল বা বাষ্পময় পিণ্ডমাত্র ছিল। এক্ষণে ভূমণ্ডলের আধুনিক অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক।

(২)

ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা।

সকলেই জানেন পৃথিবী কমলালেবুর ন্যায় গোল ও মেরু প্রদেশে কিঞ্চিৎ চাপা। পৃথিবীর অভ্যন্তর অগ্নিময়; ভূপঞ্জর, (যাহার অভ্যন্তরে সেই অনলপিণ্ড বর্ত্তমান,) শীতল ও কঠিন। ভূপঞ্জরের পৃষ্ঠদেশ ঠিক সমতল নহে, কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নীচ। কমলালেবুর উপরের ত্বক্ যেমন মসৃণ নহে, ভূপৃষ্ঠও সেইরূপ মসৃণ নহে, অতিশয় বন্ধুর।

এই সুকঠিন আবরণ ত্বক্ বা ভূপঞ্জরের উপর একটি তরল স্তর বিছাইয়া আছে। প্রায় সমগ্র ভূপৃষ্ঠ জলে আবৃত; তবে অতিশয় বন্ধুরতা প্রযুক্ত যে স্থান অতিশয় উচ্চ, তাহাই জলের উপর জাগিয়া আছে; অবশিষ্ট অংশ জলের নীচে নিমগ্ন। এইরূপে ভূপৃষ্ঠ মহাদেশ ও মহাসাগরে বিভক্ত রহিয়াছে।

---

* এই বৎসরের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সৃষ্টি তত্ত্বের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

তরল স্তরের উপরি একটি বাষ্পীয় স্তর রহিয়াছে। বায়ু মণ্ডল সমুদয় ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীর কেন্দ্র (?) হইতে পৃষ্ঠের দিকে আসিতে হইলে, ক্রমে চারিটি প্রধান স্তর পার হইতে হইবে।

১।	উত্তপ্ত	কঠিন স্তর—	প্রায়	৪০০০ মাইল।
২।	শীতল	কঠিন স্তর (ভূপঞ্জর)		৩০ মাইল।
৩।	শীতল	তরল স্তর (মহাসাগর)		৪ মাইল।
৪।	শীতল	বাষ্পময় স্তর (বায়ু মণ্ডল)		৩৮ মাইল।

(৩)

স্তর চতুষ্টয়ের রাসায়নিক প্রকৃতি।

১। অনিশ্চিত, সম্ভবত মৌলিক ধাতব পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান।

২। নানাবিধ ধাতুর সহিত অম্লজানের সমবায়ে জাত যৌগিক পদার্থ।=বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর।

৩। উদজান নামক ধাতুর সহিত অম্লজানের সংযোগ জাত যৌগিক পদার্থ—জল। (লবণ,চূণ, প্রভৃতি দ্বিতীয় স্তরের ধাতব উপাদান ও কিয়ৎ-পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে।)

৪। অম্লজান বাষ্প ও যবক্ষার জান বাষ্প=বায়ু। তৃতীয় স্তরের জলের কিয়দংশ বাষ্পীয় অবস্থায় এই স্তরে বায়ুর সহিত মিশিয়া আছে।)

(৪)

স্তর চতুষ্টয়ের ইতিহাস।

বিকীর্ণ হওয়াই উত্তাপের ধর্ম্ম। গরম জিনিষ মাত্রই ক্রমে তাপ বিকী-রণ করিয়া শীতল হয়। আবার তৎসঙ্গে তাহার শরীরও সঙ্কুচিত হয়। বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তরল হয়, এবং ক্রমে কঠিন হইয়া পড়ে। তবে আবার সকল জিনিষ সমান উষ্ণতায় সমান অবস্থায় থাকে না। বায়ু স্বভাবতই বাষ্প, জলকে বাষ্প করিতে হইলে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়; তৈল বা পারদকে বাষ্পাকারে নীত করিতে হইলে, আরও উত্তাপের প্রয়োজন; তাম্র লৌহাদিকে বাষ্পভাবাপন্ন এমন কি তরল করাই কষ্টসাধ্য। অঙ্গারকে তরল করা আবার অতীব দুরূহ। আবার জল অতি সহজেই বরফ হয়। কার্বনিক এসিড প্রভৃতি বাষ্পকে কিছু আয়াস

সহকারে তরল বা কঠিন অবস্থায় লওয়া যাইতে পারে। আবার এমন কতক-গুলি বাষ্প আছে, যে গুলিকে পূর্ব্বে কেহ তরল অবস্থায় আনিতে পারে নাই; অতি অল্পদিন মাত্র তরল করিতে পারা গিয়াছে।

ভূমণ্ডলের পরিণতি আলোচনার সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে।

সৌর-নীহারিকাচ্যুত বাষ্পময় ভূবৃত্ত কালক্রমে শীতল হইলে, কোন কোন উপাদান তরল হইয়া ভার বলে কেন্দ্রগত হইল। লঘুতর উপাদান তখনও বাষ্পাকারে সেই কেন্দ্রবর্ত্তী পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া রহিল। কালক্রমে সেই জলন্ত তরলপিণ্ডের পৃষ্ঠভাগ শীতল কঠিন ত্বকে পরিণত হইল। অন্তর্বর্ত্তী তরল পিণ্ড তখনও সঙ্কুচিত হইতেছে, কিন্তু কঠিন ত্বক্ আর সে পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় না, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি দেখা যাউক।

একটি সুপক্ক সরল ফল, যাহার ত্বক্ দিব্য মসৃণ, যদি কিছুকাল রৌদ্রের আতপে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার ত্বকের মসৃণতা একবারে লুপ্ত হয়। রৌদ্রের তাপে অন্তঃস্থ সরস ভাগ সঙ্কুচিত হইযাছে; অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ সে পরিমাণে সঙ্কুচিত না হওয়ায়, আর সরসভাগের উপর তেমন চোস্ত হইয়া লাগিতেছে না; কাজেই একটু উচু নীচু, একটু কর্কশ, একটু বন্ধুর হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই এই কারণে সরল সজল দ্রব্য মাত্রই শুকাইলে ফাটিয়া যায, বা বন্ধুর হয়।

ঠিক সেই কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তর যতই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, ততই ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ বন্ধুর, ক্রমশ উচু নীচু, কোন স্থান পর্ব্বতে, কোন স্থান গহ্বরে পরিণত হইল। এই রূপ সাধারণত পর্ব্বতাদির উৎপত্তি।

কালক্রমে যখন ভূমণ্ডল আরও শীতল হইল, তখন বায়ুমণ্ডলস্থ জলীয় বাষ্প তরল হইয়া ভূপৃষ্ঠের নিম্নভাগ ডুবাইয়া দিল। এইরূপে সাগ-রের উৎপত্তি।

পৃথিবীর তপ্তগর্ভ আজিও সঙ্কুচিত হইতেছে, সেই সঙ্কোচন কালে ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা আজিও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত অংশ ক্রমশ উত্তোলিত হইতেছে; আবার কোন কোন অংশ ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে।

অনেকে ভাবিতে পারেন, হিমালয়াদির মত উচ্চ পর্ব্বত কখনও সামান্য বন্ধুরতার ফল বলা যাইতে পারে না, কিন্তু দেখা উচিত, পৃথিবীর কোন

পর্ব্বতই ৬ মাইল উচ্চ নহে, অর্থাৎ সকলেরই উচ্চতা পৃথিবীর ব্যাসের ১৩০০ ভাগ মাত্র। সুতরাং তুলনায় দেখিলে কমলালেবুর ত্বকের বন্ধুরতা অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা কখনই বেশী নহে।

বহুকাল হইল ভূপৃষ্ঠ কঠিন হইয়াছে; বহুকাল হইল ভূপৃষ্ঠে জলের সঞ্চার ও নদী পর্ব্বত সাগরাদির উৎপত্তি হইয়াছে, আজিও কিন্তু পৃথিবী সর্ব্বত সেই আদিম বাষ্পময় ভাব পরিত্যাগ করে নাই। সেই আদিভূত বাষ্পপিণ্ডের কিয়দংশ আজিও বায়ুমণ্ডলরূপে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

আমরা ভূমণ্ডলের প্রধান স্তর চতুষ্টয়ের উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করিলাম। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে বা ভূপঞ্জরে কি বিশেষ রূপান্তর হইয়াছে দেখা যাউক।

ভূপঞ্জরের ইতিহাস।

(৫)

ভূপঞ্জর প্রধানত দুই কারণে রূপান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

১। ভূগর্ভস্থ উত্তাপ।

২। পৃষ্ঠস্থ জলরাশি।

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভূগর্ভস্থ উত্তাপই ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতার প্রধান কারণ। সেই ভয়ঙ্কর শক্তিবলে ভূপঞ্জর কোনস্থলে একেবারে বিদীর্ণ হইয়াছে; কোনস্থানে ন্যুব্জীকৃত, কোথাও উৎক্ষিপ্ত, উত্তোলিত, কোথাও বা সঙ্কোচিত হইয়াছে। ভূপঞ্জরের কোন অংশ সেই তাপবলে দ্রবীভূত হইয়াছে, কোনস্থানে বা দ্রবীভূত অগ্নিপিণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নিগিরির ভীষণ লীলা দেখাইতেছে। ধীরে ধীরে সেই মহাশক্তি সাগরগর্ভকে উত্তোলন করিয়া পর্ব্বত শিখরে পরিণত করিতেছে, কখন বা আকস্মিকরূপে প্রতীয়মান হইয়া ধরাপৃষ্ঠে মুহুর্মুহুঃ ভীমবেগে আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে।

২। ভূপঞ্জরে জলের কাজও সামান্য নহে। বর্ষে বর্ষে সূর্য্যের তাপে রাশিপ্রমাণ সাগরের জল বায়ুরাশিতে মিশিয়া যায়; পুনরায় আবার বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠ ভাসাইয়া লইয়া সাগরে গিয়া মিলিত হয়।

ভূগর্ভের সঙ্কোচন যেমন ভূপৃষ্ঠের বন্ধুর ভাব ক্রমেই বাড়াইতে চায়, জলের ক্রিয়া সেইরূপ বন্ধুরতা ঘুচাইয়া সমতল করিতে চেষ্টা করে।

নদীর জলে পর্ব্বত ও স্থলভাগ ধৌত হইয়া কর্দ্দমরূপে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদ্রগর্ভে সমতল প্রদেশ গঠিত হয়। সকলেই জানেন এইরূপে হিমালয় চূর্ণ লইয়া বঙ্গদেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি নদীর মুখেও এইরূপে নূতন দেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃতি ধীরে ধীরে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া নগর বসাইতেছে; এবং মহাসাগর গর্ভে লোক সঙ্কুল জনপদ নির্ম্মাণ করিতেছে। কাহাকেও দেখিতে হয় না, কাহাকেও প্রয়াস পাইতে হয় না, প্রকৃতি ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদবিক্ষেপে আপন মহাকার্য্য সাধন করিতেছে; এক তিলের জন্যও বিশ্রাম নাই।

এইরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসরে সাগরগর্ভ মহাদেশে পরিণত হইয়া পুনরায় আবার আভ্যন্তরীণ শক্তিবলে নামিয়া যাইতেছে; তদুপরি আবার এক স্তর জন্মিতেছে। এইরূপে স্তরের উপর স্তর তদুপরি স্তর জমিয়া ভূপঞ্জর বর্ত্তমান অবস্থা পাইয়াছে। প্রশস্ত অধিত্যকা তুষার-রাশির প্রচণ্ড-বলে ক্ষীয়মাণ হইয়া শৃঙ্গ উপত্যকাদি বিশিষ্ট পর্ব্বতের আকার ধারণ করিতেছে; পর্ব্বত আবার জলস্রোতে ধৌত হইয়া সাগরগর্ভে স্তর নির্ম্মাণ করিতেছে। সেই স্তরের প্রত্যেকের উপরি বসুন্ধরার বিচিত্র ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইতেছে। জীবদেহ, উদ্ভিদ দেহ, সেই স্তর মধ্যে রক্ষিত হইয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রকৃতির স্বহস্ত লিখিত সেই মহাগ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সেই ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেছেন; স্তরাবলীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে জলদক্ষরে সেই প্রাচীন কথা লিখিত দেখিতেছেন। মহেশ্বরের বক্ষের উপরি মহাশক্তির মহানৃত্য জনিত চরণ চিহ্নের স্ফুটচ্ছবি অঙ্কিত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছেন।

সেই ইতিহাসে পরিচ্ছেদ বিভাগ।

(৬)

ভূপঞ্জরে স্তরাবলি প্রধানত পাঁচটি প্রধান যুগে সংগঠিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। প্রত্যেক বিভাগেই নানাজাতীয় জীবের অবশেষ দেখা যায়; তন্মধ্যে কোন কোন জাতির বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে। জীবসৃষ্টি অধ্যায়ে সে বিষয় বিশেষরূপে বলা যাইবে। নিম্নে পাঁচটি প্রধান যুগের নাম দেওয়া গেল।

(১) আদিম যুগ—জলচর মেরুদণ্ডহীন জীবপ্রধান। স্তর পরিমাণ—৭০০০০ ফুট।

(২) প্রথম যুগ—জলচর মেরুদণ্ডযুক্ত মৎস্য প্রধান—স্তর ৪২০০০ ফুট।
(৩) দ্বিতীয় যুগ—স্থলচর সরীসৃপ প্রধান স্তর—১৫০০০ ফুট।
(৪) তৃতীয় যুগ—স্তন্যপায়ী প্রধান—স্তর—৩০০০ ফুট।
(৫) চতুর্থ যুগ—মনুষ্য প্রধান স্তর ৬০০ ফুট।

মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

আমি কাঙ্গাল—দুট মিষ্ট কথার কাঙ্গাল। মিষ্ট কথা শুনিতে পাইলেই আমার কাণ জুড়ায়,—প্রাণ শীতল হয়,—অভাব দূর হয়। আমার হৃদয়ে একটু শূন্য আছে। অর্থে তাহা পূর্ণ হইবে না,—জ্ঞান গরিমায় তাহা ঘুচিবে না। আমি যে মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

দুর্ভাগার দুর্ভাগ্য নানা দিকে। সোণা বলিয়া ধরি, দেখিতে পাই ছাই! আমি দুঃখের কথা বলিতে যাই—অভাব বুঝাইতে যাই,—প্রাণের যাতনা প্রকাশ করিতে যাই,—লোকে বুঝে না। বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে। আমার দুঃখ না কমিয়া, বাড়িয়া উঠে। আমার দুঃখে কাহারও সহানুভূতি নাই, ইহা মনে করিয়া, আরও বেশী কষ্ট ভোগ করি।

আমি গরিব,—অর্থের জন্য লালায়িত নই। আমি মূর্খ—পাণ্ডিত্য লাভের অভিলাষ আমার নাই। আমি আভিজাত্য হীন,—কৌলীন্য লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র নহি। আমি কুরূপ—সুরূপে আমার প্রয়োজন নাই। আমি হীন পদস্থ—উচ্চপদে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কখনও চাই না। চাই কেবল দুট অকৃত্রিম, সরল মিষ্ট কথা। অর্থ, আমার কাছে—অনর্থ, পাণ্ডিত্য—মূর্ত্তিমান দম্ভ, কৌলীন্য পাপের বিলাসক্ষেত্র, সুরূপ—বিলাসিতার রঙ্গভূমি; উচ্চপদ—অত্যাচার, পর পীড়ন, অধর্ম্মের লীলা স্থান। আমি এ সকল চাই না। চাই দুট মিষ্ট কথা। কবিরা বলেন চাঁদ সুধার ভাণ্ডার—আমার সুধার ভাণ্ডার মিষ্ট কথা। পৌরাণিকগণ স্বর্গ যেখানেই বলুন না কেন—আমার স্বর্গ মিষ্ট কথায়। সংস্কৃত দেব ভাষা,—আমার দেবভাষা মিষ্ট কথা। মিষ্ট কথা, চাঁদের কিরণ অপেক্ষা শীতল, কুসুমের রেণু অপেক্ষা কোমল। উহা মলয়ানিল অপেক্ষা মনো-

হয়, চন্দনরস অপেক্ষা স্নিগ্ধকর। তাই আমি মিষ্ট কথার জন্য কাঁদিয়া আকুল।

কোকিল মিষ্ট কথা জানে,—মিষ্ট কথা কয়। শুনিয়া সাধ হইল. কোকিলকে ধরিয়া হৃদয়ের এক পাশে বসাইয়া রাখি। তাহার মুখে দুট মিষ্ট কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াই,—হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। কোকিলকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি,—প্রাণের সখা করিয়া প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া রাখি। মিষ্ট কথা শুনিব বলিয়া কোকিলের কাছে গেলাম। আমায় দেখিয়া তাহার সুর থামিল,—মিষ্ট কথা বন্ধ হইল,—সে আকাশের অনন্ত গর্ভে, কাননের অনন্ত তরুরাজিতে তাহার মধুর কথা গুলি লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল। মানুষেই আমাকে স্নেহ করে না, দুট মিষ্ট কথা শুনায় না; কোকিলত বনের পাখী। সে শুনাইবে কেন? চলিয়া—যাইবেইত।

মিষ্ট কথা জগতের জিনিষ নহে—মানুষের জন্য নহে। উহা স্বর্গের,—উহা দেবতার। দেবতারা প্রাণ ভরিয়া মিষ্ট কথা বলিতে পারে,—তাহারা প্রাণ ভরিয়া মিষ্ট কথা শুনিতে পায়, ঐ টুকুই দেবতার দেবত্বের সুখ। আমি মানুষ, আমি মিষ্ট কথা বলিতেও পারি না, শুনিতেও পাই না। কাজেই আমি মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

সত্যই কি মিষ্ট কথা জগতে নাই? ভিখারী হইয়া মিষ্ট কথা খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভিখারী দেখিয়া সকলেই দূর্ দূর্ করে,—তাড়াইয়া দেয়,—কত কর্কশ, কত রুক্ষ কথা প্রয়োগ করে। হরি, হরি, হরি,—আমার মলিন বসন, মলিন বদন, আকুল হৃদয় দেখিয়া কোথায় লোকের দয় হইবে,—না, তাহারা আমায় তাড়াইয়া দেয়। কোথায় দুট মিষ্ট কথা বলিয়া আমার সন্তপ্ত, দুঃখিত, উন্মত্ত হৃদয়কে একটু সান্ত্বনা করিবে, কোথায় দুট সদুপদেশ দিয়া, দুট মধুর কথা কহিয়া আমার হতাশ হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার করিবে,—না, উল্টে আমায় মারিতে চায়,—গালি দেয়। হে দেব! মানুষের কি হৃদয় নাই, তাহাদিগকে কি তুমি হৃদয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছ? হৃদয় থাকিলে আমার অবস্থা দেখিয়া, তাহাদের অশ্রু বহিল না কেন? আমার দুঃখে তাহাদের হৃদয় গলিল না কেন?—আমার দুর্দশা দেখিয়া, আমার শূন্য-প্রাণ নিরীক্ষণ করিয়া, আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, প্রাণের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিল না

কেন?—হায় হায়! ভিখারী দেখিয়া জগতের লোকের ক্রোধ হয়! অনাথ দেখিয়া তাহাদের বিরক্তি জন্মে! জগদীশ্বর তুমি অনর্থকর অর্থ দিয়া, লোক ভুলাইয়া রাখিয়াছ। মিষ্ট কথারূপ অমূল্য রত্নের যে অক্ষয় ভাণ্ডার' তাহাদিগকে দিয়াছ,—তাহার ব্যবহার শিখাও নাই কেন?—বুঝিলাম ভিখারীর কপালে মিষ্ট কথা নাই,—জগতে ভিখারী কর্কশ কথারই পাত্র।

মিষ্ট কথা শিখিব, মিষ্ট কথা শুনিব,—মনে বড়ই সাধ। পণ্ডিতের কাছে গেলাম। আমি মূর্খ। পণ্ডিত মিষ্ট কথা শিক্ষা দিয়া,—ঈশ্বরারাধনার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, আমার মূর্খতা দূর করিবেন, হৃদয়ের তলে তলে এইরূপ ফল্গু নদীর মত একটা আশার স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু কপাল যে ভাঙ্গা—আশা সফল হইবে কেন?—পণ্ডিত আমার মূর্খতা লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আমার মূর্খতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিল না, চোখের জল ঝরিল না,—দুট মিষ্ট কথা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন না। মূর্খ, নির্ব্বোধ, অজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে আমাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন,—হতাশ হৃদয়টাকে আরও হতাশ সাগরে ডুবাইয়া দিলেন। আমার কাঙ্গালত্ব ঘুচিল না—মিষ্টকথা পাইলাম না।—

হতাশ হৃদয়ে শূন্য মনে, বন-পোড়া হরিণের মত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। মিষ্ট কথার জন্য আমি পাগল। আমার বিশ্বাস, মিষ্ট কথাই ঈশ্বর সাধনার মূল মন্ত্র। জগদীশ্বর মিষ্ট কথার বশ। যুধিষ্টির মিষ্ট কথায় জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন; রাম মিষ্ট কথায় শত্রুকে মিত্র করিয়াছিলেন—কৈকেয়ীকেও কাঁদাইয়া ছিলেন; যীশুখৃষ্ট মিষ্ট কথায় অর্দ্ধজগতে নূতন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন; বাল্মীকি মিষ্ট কথায় দস্যুর দস্যুতা, ক্রুরের ক্রুরত্ব, নৃশংসের নৃশংসতা দূর করিয়া ছিলেন। তাই মিষ্ট কথার জন্য আমি পাগল! আমার মনে হয়, উহাতেই জগতের মধুরতা, উহাতেই সুর লোকের মূল, উহাতেই লোক অমর হইতে পারে। কিন্তু আমার প্রাণের ধনটি কোথায় মিলিবে? কার কাছে গেলে অমৃত পান করিয়া—দুটা মিষ্ট কথা শুনিয়া—প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?

পোড়া কপাল হইলে এই রূপই হয়। বন্ধুও আমাকে দেখিয়া ভয় পায়। যাহাকে প্রাণের মত দেখিতাম, প্রাণের মত ভাবিতাম,—সেও

আমাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, চক্ষু নিমীলিত করে, মুখ ফিরাইয়া থাকে। যাহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, তাহার এই ব্যবহার! যাহাকে হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন মনে করিতাম তাহার এই আচরণ! যাঁহাকে মুখের অর্দ্ধগ্রাস খাওয়াইয়াছি, পরণের অর্দ্ধবাস পরাইয়াছি, যাহাকে নয়নের মণি, আনন্দের খনি ভাবিয়াছি; যাহার বিচ্ছেদে মরণ, মিলনে হাতে স্বর্গ অনুভব করিয়াছি—তাহার এই প্রতিদান। যাহাকে দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা বোধ করিতাম, যাহার কথা শুনিয়া কর্ণের সফলতা মনে করিতাম, সে আমাকে ঘৃণা করে। আমার প্রতি বিরক্তি-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে,—দেখিলে সরিয়া যায়; ভয়—পাছে আমি কিছু চাই। আমি আজ গরীব, নিঃস্ব, দুর্দ্দশাপন্ন। আমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট,—বসন মলিন, দেহ মলিন, মুখ মলিন। দেহের কমনীয় কান্তি নাই—মুখের সুকুমার লাবণ্য নাই। তাই বন্ধু আমাকে দেখিয়া ভয় পায়! কিন্তু বন্ধো! আমি ত কিছুই চাই না—খাইতে পাইনা বলিয়া অন্ন চাই না, নিঃস্ব বলিয়া অর্থ চাই না; নিরাশ্রয় বলিয়া আশ্রয় চাই না। চাই কেবল দুটা মিষ্ট কথা। তুমি যদি আমায় তাহা দিতে, তবেই আমি কৃতার্থ হইতাম। স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইতাম, স্বর্গীয় -সুধায় অনন্ততৃষা মিটাইতাম, অমৃত সিঞ্চনে দগ্ধ হৃদয় শীতল করিতাম। আমার আশা মিটিল না,—জগত খুঁজিয়া দুটা মিষ্ট কথা যুটিল না। আমি সেই কাঙ্গাল—কথার কাঙ্গাল!

* * * *

অনেক কালের পর মায়ের কথা মনে হইল। মনে হইল, লোকে চোখ থাকিতে চোখের মর্ম্ম বুঝে না—কহিনুর হাতে পাইয়া চিনিতে পারে না। আমি আজ দুটা মিষ্ট কথার জন্য ঘরে ঘরে ফিরিতেছি, কাঁদিয়া আকুল হইতেছি। আমার চোখে জল দেখিয়া কাহারও বিরক্তি হইতেছে, কাহারও আনন্দ হইতেছে। কিন্তু যিনি আমার মুখ মলিন দেখিলে, দরবিগলিত ধারে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, "বাবা কি হয়েছে" বলিয়া সুধার ভাণ্ডার ছাড়াইয়া দিতেন, তিনি আজ কোথায়। আমার চোখের এক ফোঁটা জল যাঁহার সমস্ত হৃদয় গলাইয়া দিত, তিনি আজ কোথায়? সেই মিষ্ট কথার ভাণ্ডার, স্নেহের উৎস, মা আমার কোথায়? যাঁহার মিষ্ট কথার তরঙ্গে ডুবিয়া, একটি কথার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি

নাই,—সেই মা এখন একটি মিষ্ট কথা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন কি?—মা—একবার সুধামধুর স্বরে তোমার সেই সুধামাখা মিষ্ট কথায় এ কাঙ্গালকে ডাক মা। হায়। আমি অকৃতি, পামর পাষণ্ড। মার মিষ্ট কথা আমার মত পাষণ্ডের জন্য নহে। যখন মা মিষ্ট কথায় আমার হৃদয় প্রফুল্লিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তখন কখনও ক্রুদ্ধ হইতাম, কখনও সুধাময়ী জননীর উপর কটূক্তি করিতাম। বুঝিতাম না, আমি দেবীর অবমাননা করিতেছি,—মা মরুভূমিতে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন। যজ্ঞের চরু অপকৃষ্ট জীবের হাতে পড়িলে যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, অমৃত অসুরের হাতে পড়িলে যেরূপ লাঞ্ছিত হয়, মায়ের অমৃতপূর্ণ, মধুরতা পূর্ণ কথাগুলি আমি পামরের হাতে পড়িয়া ততোঽধিক লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত, অবমানিত হইল। তাই আজ আমি দুটা মিষ্টি কথার কাঙ্গাল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক্ ফুলাইলাম—চোকের জলে বুক ভাসাইলাম। আত্মাকে কত তিরস্কার করিলাম,—কত ধিক্কার দিলাম। হৃদয়টা যেন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া উঠিল। জীবনটা যেন আকাশ অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জগৎটা যেন মহাশ্মশানের মত হইয়া উঠিল। জগতে যেন প্রাণী নাই, প্রাণীর যেন হৃদয় নাই। লোকের কথা যেন নরকের কোলাহল,—জগতের হাসি তামাসা, আমোদ প্রমোদ যেন কালকূট হলাহল। আমার মনে হইতে লাগিল আমি মিষ্ট কথার আধার মাতার সম্মাননা করি নাই,—এখন আমার ভাগ্যে মিষ্ট কথা যুটিবে কেন?—মা যখন কাছে নাই,—অমৃতের ভাণ্ডার যখন নিকটে নাই,—অমৃত কোথায় পাইব, মিষ্ট কথা কোথায় শুনিব। মহাশ্মশানে কেবল শিবাকুলের ভৈরব নাদ। কোকিলের কলনাদ শ্মশানে নাই। শ্মশান জগতে মিষ্ট কথা কোথা পাইব। আমি কাঙ্গাল————

হঠাৎ আমার কাণে যেন কে অমৃত ধারা ঢালিয়া দিল, তাপিত প্রাণে যেন কে শীতল সুধাসেচন করিল বলিল "কাঁদিও না"। যে হৃদয় এতদিন মরুভূমি ছিল,—হঠাৎ যেন নন্দন-কানন হইয়া উঠিল,—অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়াকাশে যেন অমৃত ভাণ্ডার চাঁদের মাধুরী ফুটিয়া উঠিল, হতাশ প্রাণটা যেন শান্তির নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিল। গভীর নিশীথের বংশী ধ্বনির মত বালক কালের মধুর লীলা লহরীর মত দূরস্থ সঙ্গীতের মধুর নিনাদের মত, পারিজাত পুঞ্জের সুরভি পরিমলের মত—কি যেন—কি অনুভব করিতে লাগিলাম।

কি শুনিলাম, কি অনুভব করিলাম?—কোথা হইতে আমার অশান্ত, অস্থির হৃদয়ে শান্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল? আবার শুনিলাম—"কাঁদিও না, এসো তোমার চোকের জল মুছাইয়া দিই,—কাঁদি ও না"—প্রতি ধ্বনি বলিল কাঁদিও না, সমীরণ বহিল "কাঁদিও না"—কল্পনা বলিল "মিষ্ট কথা পাইলে, কাঁদিও না।" কে আমার তাপিত প্রাণ ঠাণ্ডা করিলি রে—কে আমার হৃদয়ের আগুণ নিবাইলি রে—কে আমাকে জগতের নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া গোলোকধামের মধুরতা আস্বাদে মোহিত করিলি রে—সম্মুখে একটী শিশু কচি হাতের কচি আঙ্গুল দিয়া আমার চোকের জল মুছাইতেছে, আর বলিতেছে "কাদিও না, তোমায় যে মেরেছে, আমি তাকে মারিব।"

শিশু রে আয়—তুই আমার হৃদয়ে আয়। তুই মানুষ নহিস, তুই দেবতা। এই শ্মশানে পরের দুঃখে তোরই হৃদয় গলে, তোরই প্রাণ কাতর হয়। আমাকে জগৎ মারিয়াছে, তুই কাকে মারিবি বাছা। তুই আমার কাছে থাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে,—জগত আমাকে আর মারিতে পারিবে না। আয়, তুই আমার হৃদয়ে আয়। তুই আমার কাছে থাকিলে এখানেই আমার স্বর্গ। তুই যত দিন জগতে আছিস, মা যত দিন জগতে, আছে, তত দিন আমার মত হতাশেরও আশা আছে। তুই মিষ্ট কথার কল্প তরু; আয় আমার কোলে আয়, আমি মিষ্টি কথার কাঙ্গাল।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।

গুরু। জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, যে প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকীয়তা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধূনা গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয়

খ্রীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়াসের ভাস্কর্য্য, জর্ম্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীত প্রণেতৃগণের সঙ্গীত, উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে * কিন্তু প্রতিমা গঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমা পূজার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী

---

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা ইংরাজিতে বর্ত্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the Sudjective Ideal to its objective Reality Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty, in power, and in purity must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way, the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as Justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the Human realized in art is admiration. The homage me owe to the ideal of the Divine realized in Idolatry is worship."

Statesman, Sept 28, 188'.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনে "ষোড়শোপচারে পূজা" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে একপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপবিধৃত দুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দেবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না এবং প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলিব, এমন ইচ্ছাও আছে।

বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য গ্রীক ও রোমকে ধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে, যে অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মে যে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণীবৃত্তি গুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে, যে চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য বাদ্য গীত, এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন, এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্ন প্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না, বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সর Inscrutable Power in Nature বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত হইতেছে, এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি তাহাকে, চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্ব্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা। বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ, অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্ব মাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই "সৎ" অর্থে সতের গুণও বটে?

গুরু। হঁা, কেননা সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্য জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমান জন্য জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি গুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত Reflective এবং Contemplative faculties মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামক বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সর্ব্বব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। সেও অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা contemplative faculties বলা

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক। নীচে আরও কিছু বলা যাইতেছে।

হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা?

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না, অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশীলন এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম, যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যে ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদ সংহিতার ধর্ম্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্, বা উপকারী, বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্তের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্মে চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সত্তের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই।

এক্ষণে যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমনি আনন্দস্বরূপ, অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃতধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য। হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য, যে ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন তবে তাঁহার সকল গুণই আছে, কেন না তিনি সর্ব্বময়, এবং তাঁহার সকলগুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণ বিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ম্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্ত্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে

ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে, ঘোরতর নারকী পাপাত্মা।

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে তদ্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত, যে যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা "আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্য রচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই," এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয় কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইয়ুরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয় কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন নাকি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি

সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যে রূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেই রূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

য়ুরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার।

আধুনিক ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ প্লেতোর পাণ্ডিত্যকে গৌরবের এত উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত করিয়াছেন যে, বোধ হয় যেন তৎসদৃশ জ্ঞানাপন্ন লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা কখন কেহ শুনে নাই। (১) কিন্তু প্লেতোর "রিপব্লিকা" এতদ্দেশীয় প্রাচীন সাংখ্য দর্শনের অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, ত্রৈগুণ্যস্ প্রভৃতি সূত্রের মূল তাৎপর্য্য বহন করিতেছে; সুতরাং কিরূপে বিশ্বাস করিব, যে প্লেতো পূজ্যপাদ ঋষিদিগের ন্যায় জ্ঞানী ছিলেন।

নর নারী সৃষ্টি বিষয়ে প্লেতো যে অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার চিন্তাশীলতা আর্য্য প্রণালীর নহে। (২) তত্ত্ববিদ্গণ অসত্য আড়ম্বরের পরম বিরোধী; প্লেতো তত্ত্বজ্ঞ হইলে অদ্ভুত মতের আড়ম্বর করিবেন কেন? অনাবর্ত্ত চক্ররূপী যুগল মনুষ্য ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ত্রী পুরুষ রূপ হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে যদি এ প্রকার মত প্রকাশ কেহ করেন সত্য সত্যই পণ্ডিত সমাজে তিনি অপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পিথাগোরসের ন্যায় প্লেতো কল্পিত নাম কিনা জানিনা, (৩) ফলত বিজ্ঞ লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার নাম প্রচলিত অনেকগুলি

---

(১) "A philosophy," says Professor Butler, "which whether regarded in itself or with reference to its influence upon the history of reflective man rises before us in all the dignity of the mightiest and most permanent monument ever erected by unassisted human thought or exercised upon human destinies."

(২) রহস্য সন্দর্ভ।

(৩) "The whole chronology of Pythagoras and of the stories connected with him is extremely vague. His story travelled through tradition to be afterwards treated as an historical romance That this was the case in some degree with the disciples of Plato and Aristotle, but still more so with the new Pythagoreans and Neo-Platonists is I think unquestionable

Hist. of Phil. Ritter. P. 327.

গ্রন্থ প্লেতো রচনা করেন নাই, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি প্লেতোর রচিত বলিয়া প্রচার আছে। (৪) ইহাতে বোধ হয় ঐ গুলি তাঁহার নিওপ্লেতনিষ্ট শিষ্যদের কৌশল মাত্র। বৌদ্ধ তত্ত্বে অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ প্রধান লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, বাসনা, ক্লেশ ইত্যাদি হইতে অনচ্ছিন্ন হওয়াই নির্ব্বাণ। প্লেত-তত্ত্বে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

অনর্থ প্রসবিনী মায়া দ্বারা আত্মা উন্মার্গগামী হয়, মায়া আশ্রয় করিলে ভ্রম, অহঙ্কার, বেদনা দ্বারা আত্মার অবসাদ জন্মে, সুতরাং নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ হয় না। প্রকারান্তরে প্লেতো তাহাই স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ বিষয়ে হিন্দু দর্শনের সহিত তাঁহার মতের একতা দৃষ্ট হইতেছে। (৫) হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; বৌদ্ধেরা ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু গ্রীকদিগের মধ্যে ও প্রাচীন খ্রীষ্টীয় প্রেরিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতেন। প্লেতোর মতে আত্মা দুই প্রকার। (৬) তিনি পূর্ব্ব জন্ম ও পর জন্ম মানিতেন। (৭) সাংখ্যের মতে জীবোৎপত্তির কারণ "জড়" এবং "প্রধান"। প্লেতো বলিয়াছেন যে মন হইতেই জড়ের কার্য্য সাধিকা শক্তি জন্মে, এ সম্বন্ধে সাংখ্য বা প্লেতোর মতের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা

(৪, "The genuineness of many of the pieces which bear his name, has been disputed." Ibid.

(৫) ১২৯২ চৈত্রের আলোচনা দেখুন।

(৬) "Plato distinguishes two components of the soul; the divine or rational, that which participates in the knowledge of the Eternal and the mortal or the irrational, that which participates in the motions and changes of the body and is perishable."

(৭) "In order to establish the doctrine of pre-existence he distinguishes between ideas drawn from the senses and those conceptions which sense could never furnish, but which exist in the mind from the very commencement of conscious existence."

করিবেন। (৮) রিপু সম্বন্ধে প্লেতোর কিরূপ মত ছিল, তাহা অনেক অবগত নহেন, কিন্তু বস্তুত তাহা এতদ্দেশীয় দর্শনানুরূপ বলিয়াই বোধ হয়। (৯) প্লেতো বৌদ্ধদিগের ন্যায় ঈশ্বর মানিতেন না। বৌদ্ধেরা স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোক প্রভৃতি মানিতেন, প্লেতোর মতেও স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোক আছে।

সাংখ্য ও বৌদ্ধ তত্ত্বে অধিক বিভিন্নতা নাই। (১০) বৌদ্ধেরা সাংখ্যের আলোক লইয়া ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে দূরবর্ত্তী দেশে গতায়াত করিতেন। (১১) তাঁহাদিগের স্থাপিত ইতালীয় সমাজ হইতেই ইউরোপে তত্ত্ব বিদ্যার সবিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে ইউরোপের মধ্যে কোন জাতির দর্শন শাস্ত্র ছিল না। গ্রীক্ দর্শনের প্রারম্ভ কাল আয়োনীয় দর্শনের সৃষ্টি অবধি। উক্ত দর্শন এশিয়া মাইনর হইতেই সৃষ্ট হয়। ইতিহাসজ্ঞ লোকদিগের অগোচর নাই যে, যৎকালে এশিয়া মাইনরে আয়োনীয় তত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে উক্ত স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং

---

(৮) "Nous (mind) the principle of life which imparted motion and form to the material elements"

(৯) "It is difficult to say what idea Plato had of the Deity. But whether he regarded him as a personal being it is impossible to say"

"He maintained the existece of two beings God and man"

(১০) "Collebrooke himself found greater points of coincidence or affinity between the Sankhya phylosophy and Budhism Schlegel's Phil of His Vol. 1. P. 210.

"The doctrines of the Buddhists are founded on the Sankhya system which they carry out into all its consequences both in their religion and politics." Ibid.

(১১) "The chiefs of the Buddhistic faith were driven to take refuge beyond the reach of their oppressors, carrying with them into Bactria, Persia, Asia Minor, Greece, Phoenecia and Great Britain the devotion of their early sages." Pocock P 26

"The first colonists of Greece were unquestionably from the East and brought with them into their new settlements a genuine oriental character

বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। (১২) দর্শন পুরাবৃত্ত লেখক প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত রিটার, সেলিগেলের ন্যায় চাপা লোক ছিলেন না, তত্ত্ব বিদ্যার পুরাবৃত্ত লিখিবার সময় স্পষ্ট রূপে মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইউরোপের সভ্যতা বল আর দর্শন বিদ্যাই বল, এ সমস্তের মূল প্রাচ্য দেশ। কিন্তু কোন্ সূত্র হইতে যে ইউরোপের দর্শন পুরাবৃত্ত স্থিরীকৃত হইবে, তাহা আমি নিরাকরণ করিয়া উঠিতে অক্ষম। (১৩) তিনি বলেন, গ্রীস দেশীয় সভ্যতার মূল আসিয়া খণ্ড, ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু ইহা পণ্ডিতবর্গের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। (১৪) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারই ইউরোপের সভ্যতা বিকাশের মূল।* বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে

---

(১২) See Lassen.

(১৩) "We are unable to discover any historical thread for the guidance of our researches and they are consequently but loosely grouped together" Hist. of Phil. Ritter P 40.

(১৪) "That the primary seeds of Greek civilization were brought from the East." Ritter. Hist. of Phil P. 40

"It being clear that the rudiments of many arts and sciences flowed into Europe from Asia, the conjecture has been hazarded that the case may have been so also with philosophy. No one has yet proved it, but the matter is assuredly well worth discussion." Ritter Page 48

"It is impossible for a history of philosophy to neglect the consideration of the oriental; for the Eastern philosophy, must greatly modify our estimate of the Greecian, if we should see reason to refer it to an eastern source or discover in it any traces of oriental influence" Riter. P 48.

* লেখক কর্তৃক পূর্ব্বে উপক্রম নামে এই বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপক্রম বা ভূমিকামাত্র বলিয়া, এবং সেই সকল কথা ক্রমে ধীরে ধীরে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া, এস্থলে আর সেই সকল কথার পুনরুল্লেখ হইল না। কথাটা এই যে সাংখ্য তত্ত্ব প্রভৃতি, প্রথমে বৌদ্ধ ও পরে নিওপ্লেটনিষ্টগণ কর্তৃক য়ুরোপে প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা এই কথা কতদূর প্রতিপন্ন হইবে, তাহা এখন বলা যাইতে পারে না। [ন. স.।]

সঙ্গেই ইতালীয় সমাজ স্থাপিত হয়, উক্ত ইতালীয় সমাজ হইতেই অন্যান্য মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, প্লেতো ইতালীয় সমাজের শিষ্য ছিলেন, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞ লোকেরাই স্বীকার করিয়াছেন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে পিথাগোরসের শিষ্য বলিয়া যে সমাজ ছিল, তাহাই ইতালীব নামে অভিহিত হইত। এই ইতালীয় সমাজ মধ্যে বৌদ্ধ আচার, বৌদ্ধ অনুষ্ঠান, বৌদ্ধমত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এ বিষয়টি পাশ্চাত্য কোন দূরভিজ্ঞ লোকেই চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, এইজন্য প্লেতকে সক্রেতিসের শিষ্য বলিয়া নব্য লেখকেরা স্থির করিয়া থাকেন, কিন্তু বোধ হয় প্লেতো তত্ত্ব কোন্ মূল হইতে উদ্ভূত, ইহা কোন চিন্তাশীল লোক গবেষণা করিলে, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা দূর হইত, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

এখন দেখিতে হইবে খ্রীষ্টীয়তত্ত্বে প্লেতোর অপরিসীম প্রভাব কি কি হেতু বশত হইয়াছে। কারণ এই যে, প্লেত যে মূল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, শিষ্যেরা সেই মূল উপদেশ তাঁহার নিকট লাভ করেন, সুতরাং ইতালীয় তত্ত্বের মত উভয়ই গুরু শিষ্যে মান্য করিয়াছিলেন। (১৫) কিন্তু খ্রীষ্টীয়তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব প্লেতনিষ্ট শিষ্যগণ হইতেই হয়। সুতরাং তাঁহারা যখন খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে তাঁহারা স্ব স্ব মতানুসারে উহার মধ্যে প্রাচীন বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিয়া গুরুর প্রভুত্ব স্থাপনে ত্রুটি করেন নাই। এই নিমিত্তই প্লেতোতত্ত্বের এত প্রভুত্ব খ্রীষ্টীয়তত্ত্বে দৃষ্ট হয়। ইহা আপাতত অনেকের বিশ্বাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদিগের অনুমান বা কল্পিত বাক্য নহে। খ্রীষ্টীয় সমাজের পুরাবৃত্ত লেখক সুপ্রসিদ্ধ ল্যাঙ্গসাহেব ও অপরাপর ব্যক্তিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে প্লেতোশিষ্য এথিনাগোরাসই সর্ব্বপ্রথমে প্লেতোর মত সকল খ্রীষ্টীয়তত্ত্বে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। • (১৬) খ্রীষ্টীয় সমাজের অপর পুরাবৃত্ত লেখক সুপ্রসিদ্ধ মোসিম্ সাহেব বলিয়াছেন যে, ইহা অভ্রান্তরূপেই জানা যাইতেছে যে প্লেতো শিষ্য এথিনাগোরোস্ কর্ত্তৃক প্রথমত খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব রচিত

---

(১৫) Plato applied himself to the society of Pythagorean philosophers and to the study of their system." Ibid.

"In his system of philosophy, he (Plato) followed the metaphysical opinions of Pythagoras. Bibliothica. Classica.

(১৬) "Lange and others say that Athenagoras was the first who applied Platonism to Chistianity." Ibid.

হইয়াছিল। (১৭) তৎপরে তাঁহার শিষ্য ক্লেমেন্স অব্ আলেকজাণ্ড্রিয়া খ্রীষ্টীতত্ত্ব ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। (১৮) এক্ষণে বিবেচক পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, পাশ্চাত্যের ইতালীয় সমাজের শিষ্য ও উপশিষ্যগণ দ্বারা খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল কি না।

---

(১৭) "It however seems certain that Athenagoras was among the first who philosophised about Christianity

Mosheim.

(১৮) "Mosheim calls him an eclectic philosopher (that is a Neo-platonist.)

Sidete also asserts that Clemens of Alexandria was a disciple of Athenagoras.

ব্রিটেনিয়া
সমীপে
ইণ্ডিয়া।

(৩৭৮ পৃষ্ঠার পর।)

৩০

কিন্তু গো এখন আর নাহি মম বল,
নাহি সে প্রতাপ সূর্য্য যাহার কিরণে,
ছিলাম তপন তলে অতীব উজ্জ্বল,
মহাতেজে তেজস্বিনী সবার নয়নে।
সে রবি হয়েছে অস্ত হলো বহু দিন,
তদবধি আছি পড়ে হয়ে দীন ক্ষীণ॥

৩১

তদবধি নিদারুণ কতই বিপ্লব,
গেছে বয়ে মম'পরি যেন ঝঞ্ঝাবাত,
ঘটেছে নিষ্ঠুর ভাবে কত উপদ্রব,
সয়েছি পাতিয়া বক্ষ কতই উৎপাত,
পশেছে হৃদয়ে কত বিষ মাখা শর,
কেঁদেছি কতই মা গো হইয়া কাতর।

৩২

কালে কালে আসি কত অরাতি দুর্জ্জন
লয়েছে রতন কত করিয়া হরণ,
পৈশাচিক পিপাসায় কত শত্রুগণ,
হৃদের শোণিত মম করেছে শোষণ।
এখন অদৃষ্ট চক্রে আবর্ত্তিত হয়ে,
আসিয়া পড়েছি মা গো তোমারআশ্রয়ে॥

৩৩

সৌভাগ্য বলিয়া ইহা ভাবি ব্রিটানিকে,
ভাবি বিধি অনুকূল পুন মমপ্রতি,
শুভ গ্রহগণ পুন এলো মম দিকে,
অবশ্য ঘুচিবে মম সকল দুর্গতি।
অবশ্য হইবে মম সুদিন উদয়,
তুমি দয়াময়ি যদি হও গো সদয়॥

৩৪

মহীয়সী শক্তি তব, মহীয়সী মতি,
সাধিতে পরের হিত সদা অভিলাষ,
আমারে অধীন তব করি, বিশ্বপতি
করেছেন মম প্রতি করুণা প্রকাশ।
অস্তমিত সুখ সূর্য্য, তোমার শাসনে
উঠিবে আবার মম অদৃষ্ট গগনে॥

৩৫

সবল মনেতে আমি ডুবেছি আশায়,
তোমার মহত্ত্ব'পরি করিয়া বিশ্বাস,
আবার হর্ষের হাসি হাসিব ধরায়,
আবার নাচিবে হৃদে আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সতেজ শোণিত পুন তোমার কৃপায়,
প্রবাহিত হবে মম শিরায় শিরায়॥

৩৬

হইয়াছে পুত্রদের যেরূপ দুর্দ্দশা,
জড় ভাবে রহিয়াছে যেরূপ নিশ্চল,
উদিত না হয় মনে এমন ভরসা,
আবার আমার তারা সাধিবে মঙ্গল,
গভীর নিদ্রায় আছে সবে অচেতন,
অসাড় শরীরে ধরি অসার জীবন।

৩৭

ভুলে গেছে নিজ মান নীচাশয় হয়ে,
মনের উৎসাহানল করেছে নির্ব্বাণ,
নিস্তেজ ভাবেতে আছে নিষ্প্রভ হৃদয়ে,
হারায়ে জাতীয় জ্যোতি সংসারে সম্মান,
আঁধারে জীবন কাল কাটে কোনরূপে,
মণ্ডুক মণ্ডলি যথা তমোময় কূপে॥

৩৮

নাহি আর ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণের কুলে,
ক্ষত্রগণ হারায়েছে সাহস সমরে,
উন্নতি বাণিজ্য-বৃত্তি বৈশ্য গেছে ভুলে,
কত বা লিখেছে তব পুত্রগণ হবে।
নিরাশ নির্জীব সবে, কাজেতে বিমুখ,
কেবল পরের পদ লেহিতে উৎসুক।

৩৯

পুত্রগণে হেন রূপ হীনদশা হ'তে,
উদ্ধার করিতে দেবি তব কৃপাবল,
দেখি আমি এক মাত্র উপায় জগতে,
তব কৃপা ভিন্ন আর সকলি বিফল।
তোমার যতনে আর তোমার শিক্ষায়,
জাগিয়া উঠিতে পারে আবার ধরায়।

৪০

স্মিতহাসিনি দেবি দয়াশীলা হয়ে,
কৃপায় কটাক্ষপাত কর মম পরে,
অতুল আনন্দে মম পুত্রগণ লয়ে,
আরোহিব পুনরায় সৌভাগ্য শিখরে।
সুখের পয়োধি পুন হয়ে উচ্ছসিত,
শোকদগ্ধ হৃদে মম হবে প্রবাহিত॥

৪১

দুর্ব্বলা দেখিয়া হেয় ক'রো না আমায়,
এক কাল অবনীর ছিলাম ভূষণ,
অতুল্য ছিলাম বলে, বিখ্যাতা বিদ্যায়,
সভ্যতা চন্দ্রমা ছিল ভুবন রঞ্জন।
উন্নতি হয়েছে ভবে যতই প্রকার,
সকলেরি যেন দেবি আমি মূলাধার॥

৪২

ভগবতী সরস্বতী জ্ঞানের ঈশ্বরী
এখন দেখ গো যিনি যুরোপ সমাজ
অপরূপ বিদ্যালোকে আলোকিত করি,
মহোল্লাসে সদা তথা করেন বিরাজ,
আমার উদরে জন্ম লন ক্ষিতিতলে,
ভারতী বলিয়া তাই সম্বোধে সকলে।

৪৩

বিভাসি শৈশবে ইনি নবীন মাধুরি,
থাকিতেন মম অঙ্ক করি সুশোভন,
রূপের ছটায় দীপ্ত করি মম পুরী,
তিমিরে অপর দেশ আচ্ছন্ন যখন ;—
বাড়িলেন দিনে দিনে আমার পালনে,
সিত পক্ষে বাড়ে যথা সিতগু গগনে॥

৪৪

দেবলোক হতে হন অবতীর্ণা ভবে,
করিবারে দেবতুল্য মানবে মহীতে,
বুঝিয়া মহিমা তাঁর আর্য্য ঋষি সবে,
আরম্ভিল ভক্তি ভাবে যতনে পূজিতে।
সারদার পদে সবে অর্পি অনুরাগ,
সরস্বতী তীরে করে সারস্বত যাগ॥

৪৫

আর্য্যদের অর্চ্চনায় ভারতে ভারতী,
অপার করুণা গুণে প্রসন্না হইয়া,
করিলেন সকলেরে আনন্দিত অতি,
ঋষিদের রসনায় নাচিয়া গাইয়া,
যাচিল যেজন যাহা দেবীর গোচর,
তুষিলেন তারে তিনি দিয়া সেই বর।

৪৬

সেই বরে পূর্ব্বতন ঋষিবরগণ,
সুধা মাখা সামগীত গাইলেন ভবে,
ঋক্ মন্ত্রে করিলেন প্রকৃতি পূজন,
দেবতা কাহিনী কত বলিলেন সবে।
করিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব যত্নে নিরূপণ,
সুবিমল উচ্চতম ধর্ম্মের জীবন॥

৪৭

মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাস আমারি সন্তান,
অদ্যাপি গর্ব্বিত আমি তাঁহাদের যশে,
গেয়ে গেছে কিবা তারা পৌরাণিক গান
মাতাইয়া মহীতল কাব্য সুধারসে।
আজ পিয়ে সেই রস যত্নে নরকুল।
যত পিয়ে তত তারা তৃষায় আকুল।

৪৮

ঋষি ছাড়া আরো কবি উদরে আমার,
জন্মেছিল কালে কালে কত কব নাম,
তার মাঝে কালিদাস অগ্রণী সবার,
বরদার বর পুত্র, কল্পনার ধাম।
বিদ্যার বিনোদ বনে সুকণ্ঠ কোকিল।
করিল মধুর গীতে মোহিত অখিল।

৪৯

ভুবন রঞ্জন গীত অতি চমৎকার,
শত ধারে সুধাধারা ক্ষরে তাহা হ'তে,
কিবা ভাব কিবা ভাষা কিবা রস তার,
উপমায় অনুপম সাহিত্য জগতে।
কত তাহে কল্পনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
প্রকৃতির কত বিধ প্রতিমা প্রকাশ॥

৫০

ভারবি শ্রীহর্ষ মাঘ ভবভূতি আর,
এরাও বিখ্যাত অতি সারদা কৃপায়,
গেছে সবে আলো করি সাহিত্য সংসার,
কবিতার কমনীয় কনক আভায়।
ভাসায়ে দিয়াছে কাব্য প্রেমের তরঙ্গে,
কবিবর জয়দেব জন্ম লয়ে বঙ্গে॥

৫১

এদিকে রাজর্ষি মনু আদি তপোধন,
সুদূরদর্শিতা আর বিদ্যাশক্তি বলে,
করি যত্নে বহুবিধ বিধি প্রণয়ন,
গেছেন সমাজ বাঁধি অপূর্ব্ব কৌশলে।
সেই সব বিধি যেন বিধির প্রণীত,
তারি বলে আর্য্যগণ অদ্যাপি জীবিত॥

৫২

আর দেখ, কণাদাদি দার্শনিক যত,
জড় রাজ্যে মনোরাজ্যে গবেষণা করি,
নানাবিধ গূঢ়তত্ত্ব, নানাবিধ মত,
রেখেছেন ভারতীর রত্নাগার ভরি;
সেই সব তত্ত্ব আর সেই সব মত,
য়ুরোপ মানিছে আজি করি শিরোনত॥

৫৩

এইরূপে সরস্বতী আমার উদরে,
জনমিয়া অবতীর্ণা হন বসুধায়,
বাড়িলেন দিন দিন আমার আদরে,
আলো করি মম পুরী রূপের ছটায়;
মম পুত্রগণ সবে পূজিয়া তাঁহায়,
নরকুলে নরদেব হইল ধরায়॥

৫৪

তাঁহার কৃপায় মম সুকৃতি গগনে
সুশোভিল জ্ঞান-শশী অতি চমৎকার,
আলোকিত হলো ধাম কৌমুদী কিরণে,
পলাইয়া গেল দূরে অজ্ঞান আঁধার;
দেশে দেশে সেই আভা হয়ে বিস্তারিত,
সাধিল অশেষ বিধ মানবের হিত॥

৫৫

এরূপে ছিলাম দেবি অতি সমুজ্জ্বল,
প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে আর ধর্ম্ম বিভূষণে,
সভ্যতার সাজ তায় কিবা ঝলমল,
অতি মনোহর মূর্ত্তি সুরম্য দর্শনে।
তখন কে দেখে দেবি গৌরব আমার,
গরীয়সী গর্ব্ব ভূমি ছিলাম ধরার॥

ক্রমশঃ।

পঞ্চাশী-পরব।

আশ্বাসে বিশ্বাস।

(প্রস্তাবনা)

"মা আমায় ঘুবাবি কত ?
ও গো চোক্ ঢাকা বলদেব মত।

*　　*　　*

এমা ভ্রান্তি ঠুলি　　দে মা খুলি
হেবি তোমাব অভয পদ।"

(সূত্রধাব)

খুলি দে মা ভ্রান্তি ঠুলি,
বুকেব কবাট তুলি,
মুখের এ মুখ-বন্ধ আইনের ভয,
মুখ ফুটি ছুটি কথা
বলিব, জানাব ব্যথা,
দোহাই জননি তোব দে গো মা অভয।

(নট)

পঞ্চাশী পবব দিনে
বাজিছে মৃদঙ্গ বীণে,
তাআজা বতাজা সুব নঅও বে-নও,
কেন তবে আজি আব,
হেন তব ব্যবহাব,
প্রসাদে বিষাদ বার্ত্তা কেন আজি কও ?

(সূত্রধাব)

সে কি কথা বল ভাই
আবাব শুনিতে চাই।
কপটতা উৎসবেব অঙ্গ আভবণ ?
বুকেতে পাষাণ চাপা,
মনোদুখ মনে ছাপা
সেওকি নাচিবে যাব জীবনে মবণ ?

(নট)

মিছাদোষ কেন দেহ,
ও কথা বলে না কেহ ?
বাতাসেব সঙ্গে কেন কবহ বিবাদ ?
মনে যাব ভাব আছে,
নাহি গায, নাহি নাচে,—
নাহি যেন কবে সেই আহ্লাদে বিষাদ।

বিবাহ বাসব ঘবে
কে বা বল শোক কবে ?
হাসিতে ভাসিতে পাবে, সেই যায তথা,
শোকে যাব ভবা বুক,
সেত না দেখায মুখ,
আপনাব ঘবে বসি ভাবে নিজ কথা।

উৎসবে উৎসাহ দিতে,
যদি নাহি ভায চিতে,
আপনাব মনে বাখ আপনাব দুখ,
দশ জনে নাচে গায,
বাধা কেন দিবে তায় ?
কেন ঘটাইবে বল সুখেতে অসুখ ?

(সূত্রধাব)

বিবাহ বাসব পব,
ববকন্যা যাবে ঘব,
কৌতুকে যৌতুক দেয সকলেই বটে,
উল্লাসে সবাব মন,
থাকে বটে নিমগন
বাহিবেতে সে সময জানত কি ঘটে,—

কাঙ্গালিবা বাজপথে,
জনে জনে শতে শতে,
আপনাব দুঃখ সুবে কবে নিবেদন,—

"বাস বিনা দেহ নগ্ন,
অন্ন বিনা মনোভগ্ন,
এই অন্নবস্ত্র দুঃখ করহ মোচন।"

ভিক্ষা আমাদের শিক্ষা,
ভিক্ষা মন্ত্রে আছে দীক্ষা,
ভিক্ষুকের ভিক্ষা কার্য্যে দিন ক্ষণ নাই,
আনন্দ বা নিরানন্দ,
নাহি বুঝি ভাল মন্দ,
সমারোহ দেখিলেই দান মাগি ভাই।

চাও মা সন্তানগণে,
ডাকিতেছি জনে জনে,
সুদীন সন্তানগণে হের মা চাহিয়ে,
নাহি জ্ঞান, নাহি অস্ত্র,
নাহি অন্ন, নাহি বস্ত্র,
পালন পোষণ রক্ষা কর ভিক্টোরিয়ে।

(বিষ্কম্ভক)

একাধিক শতবার,
গুড়ুম্ গুড়ুম্‌কার,
দুর্জয় দুর্গের অঙ্গে গর্জ্জিছে বিষম।
হুহুঙ্কারে সহস্রাগ্নি,
নয়নে নিকলে অগ্নি,
নিশ্বাসে ছাড়িছে ধুম রাক্ষসের সম।

(নট)

গাও জয় ব্রিটানিয়া,
জয় জয় ভিক্টোরিয়া,
রাইস্‌রয় জয় জয়, গাও সবে সুখে।

(সূত্রধার)

অন্নকষ্টে চীৎকার,
বস্ত্রকষ্টে শীৎকার
ছাপায়ে বিষম বোল গাও লক্ষ মুখে।

(বিষ্কম্ভক)

বাজে বাদ্য ব্যাণ্ড ড্রম্,
ভোঁপো ভোঁপো গম্ গম্
মাতনি নাচনি তায় তাণ্ডব রীরের,
রৈরা রৈরা রৈরা রুম্,
আঁকা বাঁকা ঝুম্ ঝুম্
পটতালে নটরঙ্গ লাস্য উল্লাসের!

(সূত্রধার)

ভয়ে ভয়ে কথা কই,
সদা জড় সড় রই,
কোন মতে মাথা গুঁজি
থাকি প্রাণে প্রাণে,
মুখ ফুটিবারে চাই,
বলিবার সাধ্য নাই,
এ দুর্দ্দশার কথা কি মা শুন নাই কাণে।

লক্ষ্মীক্ষেত্রে নাহি শস্য
কে বুঝিবে এ রহস্য?
সর্ব্বস্ব যায় যে মা গো তোমার সদরে,
শস্যের রপ্তানি বাড়ে,
সেই সঙ্গে লক্ষ্মী ছাড়ে,
ধন গেলে ধনবৃদ্ধি কহেন আদরে।

সকলেরি মনে জাগে,
তোমার রাজত্বে আগে,
গ্রামে গ্রামে ছিল গোলা
হাজারে হাজার;
দায় বা অদায় হলে,
মহাজন কুতূহলে
জীবন করিত রক্ষা দরিদ্র প্রজার।

বলিব কি মা গো আর,
কিছু মাত্র নাহি তার,
খামারে কামার ভাঙ্গা, গ্রাম গোলা শূন্য,
উঠিলে উৎসব কথা,
সবে পায় মনোব্যথা,
লাগে নাক কিছু ভাল দেহ মন ক্ষুণ্ণ।

গোচরে পড়িল চাস,
গাভী নাহি পায় ঘাস,
গো-সেবা ভুলিল হিন্দু আত্মসেবী দায়,

গাভী হল দুগ্ধ-হারা,
দুগ্ধ-গত প্রাণ যারা
দুর্ব্বল দুর্ম্মনা হয়ে অকালে শুকায়।

(বিষ্কম্ভক)

গুম্‌গুম্‌ ফুটে বোম্‌,
কাঁপিতেছে ভূম ব্যোম,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া গুরু গরজনে।
শোঁও শোঁও লাখে লাখ,
উঠিছে বাবুই ঝাঁক,
রক্ত পীত নীল বর্ণ উজলে উজলে।

চরকির আবর্ত্তন,
তুবড়ির প্রস্রবণ,
হাউয়ের আস্ফালন চক্ষু মনোরম।
ফাটিছে আশ্‌মান তারা,
নীল পীত রক্ত ঝারা
ছায়িছে গগন গায়ে ইন্দ্রজাল সম।

মহারাণী ব্রহ্মমূর্ত্তি,
জয়ন্তীর কিবা স্ফূর্ত্তি।
মস্তকে মুকুট মাণ কোহিনূর জ্বলে,
ওদিকে ডফ্রীণ লাট,
সস্ত্রীক সুন্দর ঠাট,
জয় জয় জুবিলির ঘোষিল সকলে।

(সূত্রধার)

নিবিছে আতস কুঞ্জ,
বাড়িছে ধূমের পুঞ্জ,
মাঠ বাট একাকারে ধূম ধূলা ঘিরে।
কোথা সেই ধূমধাম ?
কেবল কুযাসা ধাম,
তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।

(নট)

সুপ্রভাত বৃহস্পতি,
দশমীর দিনপতি,
ভারত ভুবনে আজি উঠিল গম্ভীরে,
দেয় আজান ইস্লাম,
হিন্দু স্মরে দেব নাম,
ঘণ্টা করে মন্দরব খ্রীষ্টান মন্দিরে।

(সূত্রধার)

জয় জয় বিক্টোরিয়া !
জয় নব-দেব-প্রিয়া !
ভারত-ভুবনেশ্বরী সাগর আসনা!
পঞ্চাশী পরব দিনে,
চাহ মা গো দীন হীনে,
তুমি না পূরালে মাকে পূরাবে বাসনা।

তোমার চরণ সেবে,
অস্থিচর্ম্ম সার এবে,
প্রজার কর্ত্তব্য মা গো হয় না পালন।
সবে থাকি ব্যতিব্যস্ত,
কর দায়ে সদা ত্রস্ত,
তোমার সেবায় মা গো ত্রুটি সর্ব্বক্ষণ।

লাইসেন, শ্বেতাম্বর,
টোল, টেক্স, টীকা-কর,
আয় কর, ব্যয় কর, ফীচ্‌, কমিশন।
পাশ, পর্ম্মিট্‌, পাটয়ারি,
মাসুল মশীল তারি,
ডাক-ঋণ, ফেরি-ঋণ, কত শত ঋণ॥

রাজস্বে সর্ব্বস্ব হার,
সুদ, শেষ,—বার তার,
জমিদারি খাজনায় কেবল নিরীখ,
জল, কল, বাড়ী, ঘর,
মিউনিসিপাল কর,
ডিউটি, দেউটি কর, চারিদিকে দিক।

বাণিজ্যে টাকার বাট্টা,
সেত বড় নয় ঠাট্টা,
তোমার ছবির ছাপে ছআনা ছেলামি।
কেন মাগো ছাপ মুখ,
নারি যে দেখাতে মুখ,
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" কেবল ক্ষেপামি।

(মা গো) শত করে শত মুখ,
ক্ষত অঙ্গ, ছিন্ন বুক,
অঝোরে শোণিত ঝারা ঝরে অবিরল।
(তাহে) বিদেশীয় অর্থচারী,
সদাগরি, সৈবকারি,
বসি বুকে, শত মুখে শোষে মা কেবল।

নড়িবার সাধ্য নাই,
পড়িবার নাহি ঠাঁই,
দুর্দ্দশার রসাতলে বসায়েছে কাল;
মেদ মাংস খণ্ড খণ্ড,
হৃদি পিণ্ড লণ্ড ভণ্ড,
যক্ষ্মাশ্বাস বহে কণ্ঠে জীবন-জঞ্জাল।

ত্রাহিমা পারি না আর,
বহিবারে এই ভার,
বিধির এ বিড়ম্বনা বিলম্বিত প্রাণ।
বিধি-বর-পুত্রী তুমি,
তাই এই যক্ষ্মা ভূমি,
বিধাতার দুহিতার চিকিৎসার স্থান।

হৃদয়ে গরল ঢালা,
শরীরে নরক জ্বালা,
কোন্ খানে ফুলমালা পরিব জননি!
আনন্দে আতস আলো,
ধূপ দীপ জ্বালো জ্বালো,
অন্ধের সকলি সম দিবস রজনী॥

(বিষ্কম্ভক)

মিটি মিটি টীপ্ টীপ্,
জ্বালিছে জুবিলী দীপ্,
দশমীর দিবাকর এখনো উপরে;
ধরাতে তারার মেলা
তাহাতে রোদের খেলা,
খেলাইয়া দিন-দেব ঝাঁপিলা সাগরে।

জ্বলিল দীপের সারি,
লক্ষ লক্ষ রকমারি,
প্রাচীর প্রাসাদ ছাদ-গম্বুজ ঘেরিল।
স্বর্ণাক্ষর ঝক্‌ঝক্,
ইলেক্‌ট্রিক ধবক ধবক্,
ফুলমালে আলোমালা জড়ায়ে বেড়িল।

বাহিরিল বড় লাট,
সম্মুখে সোয়ার ঠাট,
সঙ্গীন্ রঙ্গীণ বেশ দেখে সবে স্তব্ধ;
পশ্চাতে শকট ঠাঠ,
ঢাকিয়াছে ক্রোশ বাট,
ঘর্ঘর চলেছে সব, চট চট শব্দ।

চারিদিকে শব্দ হয়,
রাজ-প্রতিনিধি জয়,
জয় জয় রাইস্বর চিরজীবী ভব।
জয় রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া,
পঞ্চাশী পরব ক্রিয়া,
সুমঙ্গলে সমাধান হল আজি তব।

(সূত্রধার)

হলো মা হলো মা তব,
পঞ্চাশী পর্ব্বোৎসব;
আশীর্ব্বাদ করে মা গো কাঙ্গালিনী শুন।
"কুমার পঞ্চাশ বর্ষে,
করিলে রাজত্ব হর্ষে,
দ্বিতীয় জুবিলি মা গো হয় যেন পুন।

আয়র্লাণ্ডে হোমরুল,
দিয়া কর সুপ্রতুল,
দেব অঙ্গে নাহি রাখ বাম দক্ষ ভাব।
ব্রহ্মে স্থাপ ব্রহ্মবংশ,
হোক রুষ চিরধ্বংশ,
ফরাসী পুরুষী সঙ্গে চিরসখ্য লাভ॥

মিসরে রাখিয়া মান,
তুরস্কে অভয় দান
দিয়া কর, ইস্‌লামে বিশ্বাস স্থাপন।
ষোলগুণ রৌপ্যমূল্য,
করিয়া স্বর্ণের তুল্য
সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র কর দ্বিধাতু মুদ্রন।

মনে রেখ মহামায়ে,
সুদূরে চরণ ছায়ে,
আছে এক কাঙ্গালিনী যক্ষ্মা জীর্ণ দেহ,
ত্রাহি বলি প্রাণে প্রাণে,
চাহি তব মুখ-পানে
মরিয়া বাঁচিয়া আছে, যাচি তব স্নেহ।

রহে সে জীবন ভার,
মারিবে মারিতে পার,
দেব কন্যা নহে ধন্যা তাহে হবে তুমি,
যদ্যপি বাঁচাতে পার,
জয় জয় জয়কার,
গাবে তাহে চিরকাল এই বিশ্ব ভূমি।"

(নট)

জয় জয় জয় গান,
জননী পাইবে প্রাণ,
জননীর জননী যে দিয়াছে আশ্বাস।
তাইত আলোর ধুম,
বোম ফুটে দুম্ দুম্
উঠহ, দেখহ, আজি করহ বিশ্বাস।

(সূত্রধার)

এইত, তাইত বটে.
সবাই সে কথা বটে,
নহিলে বা এ উল্লাস হইবে বা কেন?
কে এমন মূর্খ আছে?—
শ্মশানেতে পায় নাচে,—
আশ্বাসে বিশ্বাস করি হইয়াছে হেন।

বিশ্বাসে মিলিবে প্রাণ,
তর্কে ওষ্ঠাগত জ্ঞান,
সুদৃঢ় ভক্তিতে আজি হৃদয় অটল।
কোথা মা গো বিক্টোরিয়ে,
বিধি-পুত্রী দেব-প্রিয়ে।
তোমায় বিশ্বাসে হলো আমাদের বল।

উঠ উঠ চল ভাই,
পঞ্চাশী-পরব গাই,
ঊর্দ্ধ হস্তে, উচ্চ কণ্ঠে মনের আনন্দে;
তালে মানে সুরে লয়ে,
তালে তালে বয়ে বয়ে,
গদ্য পদ্যে বাদ্য ভাণ্ডে মন্দ মন্দ ছন্দে।

(উভয়ে)

গাও জয় ব্রিটানিয়া,
জয় জয় বিক্টোরিয়া,
বাইস্ বয় জয় জয় গাও সবে সুখে।
পঞ্চাশী পর্ব্বাহোৎসবে,
আশ্বাসে আশ্বস্ত সবে,
জয় জয়, জয়-গান বিংশ কোটি মুখে।

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } ফাল্গুন ১২৯৩। { ৮ম সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৭ম ভাগ—খড়ে পারের রাবণ রাজা।

কৃষ্ণনগর জেলায় নাকাশী পাড়া একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে অধিক লোকের বসতি নাই এবং গ্রামও বড় নয়, কেবল এক ঘর জমিদারের বাস, কিন্তু তাঁহাদের জন্যই গ্রামখানি অনেকে চিনে। এই জমিদার বাবুরা রাজপুত বংশীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। কিম্বদন্তি আছে যে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজের অধীন চাকরি করিয়া অনেক সম্পত্তি উপার্জ্জন করত স্বদেশ প্রত্যাগমন না করিয়া এই নাকাশী পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সন্তানেরা সেই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে কৃষ্ণনগর জেলার জমিদারগণের মধ্যে এক ঘর গণ্য মান্য জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাকাশী পাড়ার জমিদার বাবুদিগের আদি পুরুষ পশ্চিম দেশস্থ ব্যক্তি ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সন্তানেরা ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ যাবৎ বাঙ্গালায় বাস করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে রজপুতের রক্তের গুণ এখনও সম্যক্ রূপে লোপ পায় নাই। এখনকার ছোকরা বাবুদের কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার সহিত নাকাশী পাড়ার যে সকল বাবুদিগের আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ বলবীর্য্য-শালী পুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকের তিন চারিটি করিয়া ভাল জাতীয় অশ্ব থাকিত এবং কেহ পারতপক্ষে পাল্কি কিম্বা হস্তী চড়িয়া স্থানান্তর গতিবিধি

করিতেন না, ঘোঁড়াই তাঁহাদের প্রিয় বাহন ছিল; এবং কৃষ্ণনগর জেলার বাঙ্গালির মধ্যে কেহই নাকাশী পাড়ার বাবুদিগের ন্যায় অশ্বারোহণে মজবুৎ ছিল না। নাকাশীপাড়া গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র এবং চতুর্দ্দিকে মাঠের মধ্যে স্থিত। ইহা পূর্ব্বে কাটোয়া মহকুমার অধীন অগ্রদ্বীপ থানার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পরে নিজ নাকাশীপাড়াতেই থানা সংস্থাপিত হইল। যে কারণে নাকাশীপাড়ায় থানা স্থাপিত হয়, তাহা বিবৃত করাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

এই গ্রামে কেবল বাবুদিগের এবং বাবুদিগের স্থাপিত কয়েক ঘর প্রজার ও নবশাখের বাস। বাবুদিগের বাড়ী বৃহৎ অট্টালিকা। সে কালে, দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত যে কৌশলে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা নাকাশী পাড়ার জমিদারদিগের গৃহ দেখিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এই গ্রামে বাবুরা সুন্দর জলাশয় খনন এবং বিলাস ভোগের নিমিত্ত কয়েকটি বাগিচা প্রস্তুত করিয়া গ্রামের শোভা-বর্দ্ধন করিযাছিলেন। নাকাশীপাড়ার কিয়দ্দূর পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে গোটপাড়া নামক একটি গ্রাম আছে। নাকাশীপাড়ার এবং সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের গঙ্গাস্নান, শবদাহ এবং অন্যান্য পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের জন্য গোটপাড়ায় আসিতে হয় এবং গোটপাড়াও এই বাবুদিগের অধিকার ভুক্ত। আমি যখন নাকাশীপাড়া দেখিযাছি তখনও রায় বাবুদিগের জমি, জমা, গোলাবাড়ী ইত্যাদি বিপুল বিত্ত বিভোগ ছিল। কৃষ্ণনগর সহরের নীচে খড়িয়া নদীর উত্তর পারে, মায়াকোল ধুবুলিয়া গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত অনেক স্থানেই ইহাঁদিগের অধিকার ছিল এবং কলিকাতা হইতে বহরমপুর যাইবার যে সৈনিক রাজবর্ত্ম আছে, তাহার দুই পার্শ্বে এই পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে অন্য দুই একজন ভূম্যধিকারী থাকিলেও ঐ সকল স্থানে নাকাশী পাড়ার বাবুদিগেরই একাধিপত্য ছিল। ইহাঁদিগের যেমন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি তেমনই নগদ টাকাও অধিক ছিল। প্রবাদ আছে যে ইহাঁদের গৃহের মধ্যে এক ধনাগারে বহু মুদ্রা ও অধিক মূল্যের প্রস্তরাদি স্তূপী-কৃত ছিল। সেই ধনাগার বেষ্টন করিয়া শরীকেরা তাঁহাদের অন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই ধনাগারে যাইতে হইলে বাবুদিগের বাহির ও অন্দর বাড়ী সকল অতিক্রম না করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে কেহ সমর্থ হইত না।

ধনাগারের এক শক্ত কবাট ছিল এবং তাহাতে সকল কর্ত্তার পৃথক পৃথক এক তালা দেওয়া ছিল, যে, ধনাগার খুলিতে হইলে সকল শরীক একত্র এবং সম্মত না হইলে, তাহা খুলিবার উপায় ছিল না। ধনাগারে কত টাকা ছিল, তাহা তখনকার কর্ত্তারাও সকলে জানিতেন না। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর ধনাগারে যে পরিমাণে মুদ্রা ছিল, নাকাশীপাড়ার ধনাগারে অবশ্যই সেই পরিমাণে টাকা থাকা অসম্ভব, তথাপি ইহাতে যে বহুধন ছিল, তাহা এক সময়ে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিশেষ, পরের ধন ও নিজের আয়,—কেহই কম দেখে না; তাহাতে ধনাগারের নাম শুনিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, এই ধনাগারে না জানি কতই বা ধন লুক্কায়িত আছে। অংশাদিগের মধ্যেও অনেকের সেইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং যতদিন ধনাগার পরীক্ষিত না হইয়াছিল ততদিন রায় বাবুদিগের সম্মান ও গৌরবের সীমা ছিল না। সহসা কেহ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিত না, কারণ, সকলে বিবেচনা করিত, যে আবশ্যক হইলে, ইহাঁরা ধনাগার খুলিয়া যত ইচ্ছা ধন ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু চরমে পরীক্ষায় এই ধনাগারের প্রতিষ্ঠা টিঁকিল না।

এক পক্ষে চন্দ্রমোহন রায়, কেশবচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায় ও অন্য পক্ষে সর্ব্বচন্দ্র রায় ও ঈশানচন্দ্র রায়দিগের পরস্পর মহা মনোবাদ এবং সেই সূত্রে মহা কলহের সৃষ্টি হইল এবং ধনাগার সম্বন্ধে ঈশান বাবুর দলের সন্দেহ হওয়াতে, তাহা খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত ধন বণ্টন অথবা বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজদ্বারে ক্রোক রাখার জন্য আবেদন করা হইল। এই বিবাদই চরমে এই ধনাঢ্য বংশের ধ্বংশের মূল হইয়া উঠিল। উর্পরি উক্ত প্রার্থনা মতে কৃষ্ণনগর হইতে কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীরা নাকাশাপাড়ায় গমন করিয়া সকল অংশীগণের সমক্ষে ধনাগার খুলিলেন এবং দেখিলেন যে তাহাতে কয়েক শত পুরাতন টাকা ও সিকি, আধুলী ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলে অবাক্, বাবুরা, বিশেষ ঈশান বাবুরা অনেক ধন পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এককালে ভগ্ন হৃদয় এবং মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ দর্শকবৃন্দও নিরুৎসাহ হইল। কেশব বাবুর পক্ষে বলিল, যে ধনাগারের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই

এইরূপ এবং তাহাতে যে কিছু ধন ছিল, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধনাগারে পাওয়া গেল। কিন্তু বিপক্ষ ঈশান বাবুর দলের বিশ্বাস সেরূপ নহে, তাঁহারা বলেন, যে ধনাগারে বাস্তবিক বহুসংখ্যক মুদ্রা ছিল, কিন্তু কেশব ও বিহারী বাবু গোপনে তাহা বাহির করিয়া লইয়া ধনাগার শূন্য এবং অন্যান্য শরীকগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু সন্দেহ ভিন্ন এই অপবাদের দ্রষ্টব্য কোন প্রমাণ না থাকাতে, কেশব বাবুর বিরুদ্ধে তাঁহারা কিছু করিতে পারিলেন না। কেবল দুই পক্ষের মনে পরস্পর মর্ম্মান্তিক রোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল এবং ইহকালে সেই বিচ্ছেদ আর জোড়া লাগিল না এবং এ জন্মে তাহারা কেহ কাহারও সহিত পুনরায় আর বাক্যালাপ করিলেন না। এই বিবাদ অগ্নি দুই পক্ষের কাহারও প্রাণ থাকিতে নির্ব্বাণ হইল না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের লাঠির ভয়ে সকল জমিদার ও নীলকুঠীর সাহেবেরা পর্য্যন্তও তটস্থ ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহারা আপনা আপনি পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। যদি শুদ্ধ দেওয়ানী কিম্বা কালেক্টরিতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নাকাশীপাড়ার বাবুরা ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তত ক্ষতি ছিল না কিন্তু কেবল মোকদ্দমায় রজপুতের রক্তে শান্তি বোধ হইত না। যুদ্ধ করার নিমিত্ত ইহাঁদের শরীর কামড়াইত। অন্যান্য বাঙ্গালী জমিদারেরাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেন বটে, কিন্তু তাহারা কেবল টাকা দিয়া খালাস। লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা সংগ্রহ করিয়া, অধিক বেতন দিয়া, একজন নাক-কাণকাটা কারাগার-বাসে-অভ্যস্ত দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকে সেই দলের কাপ্তেন অর্থাৎ নেতা নিযুক্ত করত, তাহার অধীনে লাঠিয়ালদিগকে দাঙ্গা করিতে পাঠাইতেন, আপনারা নিজে তাহার ত্রিসীমানায় যাইতেন না এবং রাজদ্বারে দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য, দাঙ্গার দিবসে কিম্বা তাহার অগ্রে কোন সহর কিম্বা জেলার সদর স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাফাই অর্থাৎ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। যে কিছু আপদ বিপদ কিম্বা শাস্তি হইত, তাহা তাহাদের কর্ম্মচারীগণের এবং অধিক পরিমাণে সেই কাপ্তেনের উপরে ন্যস্ত হইত। কিন্তু নাকাশীপাড়ার রজপুত জমিদার বাবুরা সেরূপ ভীরু স্বভাবের মনুষ্য ছিলেন না।

তাঁহাদের কার্য্যে পেসাদার কাপ্তেন কিম্বা সর্দ্দারের আবশ্যক হইত না। বেতনভোগী কাপ্তেনের কার্য্যে তাঁহারা সন্তুষ্টও হইতেন না। আপনারা লাঠিয়াল লইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে যাইতেন এবং সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। নাকাশীপাড়ার একটি যুবা জমিদার আমার নিকট কথায় কথায় ব্যক্ত করিয়া ছিলেন যে তিনি কয়েকবার এইরূপ যুদ্ধের নেতা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে শতাবধি অস্ত্রধারী লোক লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন এবং যোদ্ধাদিগের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘোড়া যখন নাচিতে নাচিতে শত্রুদলের দিকে ধাবমান হইত, তখন তাঁহার মনের মধ্যে এমন এক উল্লাস জন্মিত, যে তদ্রূপ উল্লাস তিনি আর কিছুতেই উপভোগ করেন নাই। বীরবংশের বীর পুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে।

এই বীরপুরুষদিগের আত্মকলহ সাধারণের প্রতি যে কত অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে গ্রামে গ্রামে স্থানে স্থানে দুইটি করিয়া দল সংস্থাপিত হইল। প্রজা ও কর্ম্মচারীরা কেহ কেশব বাবুর এবং কেহ বা ঈশান বাবুর পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়িল। নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও থাকিবার উপায় ছিলনা, কারণ তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে উভয় পক্ষের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য মোকদ্দমা ও দাঙ্গা উপস্থিত হইতে লাগিল এবং বহুলোক খুন জখম হইয়া গেল। ইহাতে বাবুদিগের যে কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এবং নিয়ত তাহাদিগকে কেবল অশান্তিভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া অসাধ্য। অধিক টাকা, অস্ত্রধারী লোকের বেতনেই ব্যয় হইত। আমি শুনিয়াছি যে এক এক পশ্চিমা সর্দ্দারকে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং এই সকল অস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগকে কেবল একটি কার্য্যের জন্য অল্প সময় ধরিয়া রাখা হইয়াছিল এমন নহে, বিবাদের সূত্র হইতে আমাদিগকে (পোলিসকে) আক্রমণ করা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ ইহারা বাবুদিগের স্কন্ধে বিরাজ করিয়াছিল। এই সকল দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অনেক দিন যাবৎ অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহারা একস্থানে সমবেত থাকিলে অনেক অনিষ্টের কারণ হইত না কিন্তু ইহাদিগকে দলে দলে বাবুদের ভিন্ন ভিন্ন মফঃসল কাছারীতে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখাতে

নানা স্থানে তাহাদের দৌরাত্ম্য ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। পথিকদিগের নিরাপদে কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর যাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

এই দুই দলের প্রত্যেক দলে যদিও কয়েক জন করিয়া বাবুরা ভুক্ত ছিলেন, তথাপি একপক্ষে কেশববাবু এবং পক্ষান্তরে ঈশান বাবুর নামই বিখ্যাত ছিল। এই দুই ব্যক্তি দুই পক্ষের নেতা এবং কর্ত্তা ছিলেন এবং এই দুই জনের মধ্যে কেশব বাবুই সর্ব্বসাধারণের নিকট আদরিত ছিলেন। ইনি যেমন বলবীর্য্যশালী, তেমনই মুক্ত হস্ত ছিলেন। হাপ, দাপ, রব-রবায় কেশবের তুল্য তাঁহার বংশের মধ্যে কেহই ছিলেন না। ইহাঁর প্রখর বুদ্ধি এবং শ্রম-সহিষ্ণুতা সমতুল্য ছিল। কেশব বাবু অপরিমিত সাহসী ছিলেন, ভয় কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেই নিমিত্ত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যোদ্ধারা যোদ্ধাকেই ভালবাসে। কেশব বাবুর অধীনে চাকরি করা লাঠিয়ালদের বিবেচনায় অতি গৌরবের কথা ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাহারা এই বাবুর দলভুক্ত হইতে অগ্রসর হইত। কেশব বাবু যে লড়াইয়ে নিজে যাইতে সংকল্প করিতেন, তাহাতে তাঁহার যোদ্ধাগণ নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইত। কেশব বাবু খুব দীর্ঘ-চ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বলিষ্ঠকায় ছিলেন। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং মুখ খানা গোল ছিল। গম্ভীর স্বরে কথা কহিতেন, দেখিলে লোকে তাঁহাকে সম্মান এবং ভয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন এবং যে যেমন ব্যক্তি, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতে জানিতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার দোষও অনেক ছিল কিন্তু মৃত ব্যক্তির দোষ লইয়া আলোচনা করা হিন্দুর বিধেয় নহে। কেশববাবু শ্রমে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন এবং অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। শুনিয়াছি যে দুইজন বলবান ভৃত্যে তাঁহার শরীরে অনেক ক্ষণ ধরিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং চপেটাঘাত না করিলে, তাঁহার তৃপ্তিজনক নিদ্রা হইত না। ঈশান বাবুও বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন কিন্তু স্থূলতা-বশত অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ফলে কেশব ও ঈশানে অনেক বিষয়ে অনেক প্রভেদ ছিল। কেশব বাবুই সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত ছিলেন কিন্তু ঈশান বাবুকে লোকে কেবল কেশব বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জানিত, তাঁহার নিজের কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

কেশব ও ঈশানের বিবাদে কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে এমন অশান্তির ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ কেশব বাবু ঈশান বাবুর এক খানা গ্রাম জ্বালাইয়া দিলেন, কাল্ ঈশান বাবু কেশবের গ্রাম লুঠ করিলেন। এক দিন এক দাঙ্গাতে কেশবের দশ জন লোক জখম হইল, তাহার পর দিবস আর এক যুদ্ধে ঈশানের দুই জন লাঠিয়াল খুন হইল। অদ্য ঈশান বাবুর এক প্রজাকে নির্যাতন করার উদ্দেশে কেশব তাহার ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া লইয়া আসিলেন, কল্য কেশব বাবুর এক গোলাবাড়ীর গোলা লুটিয়া ঈশান তাহার প্রতিশোধ লইল। এক স্থানে এক জন প্রজা নিরুদ্দেশ হইল, আর এক স্থানের কয়েক জন অধিবাসীকে প্রতিপক্ষ ধরিয়া আনিয়া খুব প্রহার করিল এবং কয়েদ করিয়া রাখিল। এই রূপে ফৌজদারী আদালত উভয় পক্ষের রাশি রাশি দরখাস্তে এবং মোকদ্দমায় ভরিয়া গেল। তখন সি, টি, মণ্ট্রেসর সাহেব কৃষ্ণ নগরের মাজিষ্ট্রেট ও হিউএট নামক এক জন সাহেব কটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হিউএট সাহেবকে আমি কেবল এক বার মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়াছিলাম; বিশেষ তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয়ও আমি অধিক অবগত নহি সুতরাং এই হাকিমের সম্বন্ধে আমি এই স্থানে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মণ্ট্রেসর সাহেবের কথা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি খুব তেজস্বী এবং প্রখর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরে যত সাহেব মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মণ্ট্রেসর সাহেব এক জন অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। চোর ডাকাইতদিগকে একরার অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করাইতে মণ্ট্রেসর সাহেব অনেক কৌশল জানিতেন এবং বিবাদ প্রিয় জমিদারদিগকেও তিনি দমন করার নিমিত্ত নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহার কার্য্য দোষে, তাঁহার সদভিপ্রায় গুলি অত্যাচারে পরিণত হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন তেজস্বী এবং দক্ষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবও নাকাশা পাড়ার জমিদারদিগের বিবাদের জটিলতায় দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন। নানা স্থানে পুলিস আমলা মোতায়েন করিলেন এবং জমিদারদিগকে কঠিন দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইলেন, কিন্তু বিবাদের শান্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সকল বাবুদিগকে কৃষ্ণনগর তলব দিয়া, তাঁহার কাছারিতে উপস্থিত করিলেন এবং

আদেশ করিলেন যে তাঁহার অনুমতি না লইয়া কেহ কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তর গমন করিলে, তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন। তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা প্রাতে বেলা ৬টা হইতে ৯।১০টা পর্য্যন্ত নিজের কুঠিতে অর্থাৎ গৃহে খাস্ কাছারী করিতেন। সেই স্থানে কয়েক জন প্রধান আমলা উপস্থিত হইয়া জেলার থানা সমস্ত হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট সকল তাঁহাকে শুনাইয়া হুকুম লিখিয়া লইত এবং অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যও সেই সময় সম্পাদিত হইত। পরে দুই প্রহরের সময় কাছারীতে আসিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই শেষ কাছারী কোনও দিন শেষ বেলা এবং কোনও দিন সন্ধ্যার পরে বাতি জ্বালাইয়াও হইত। মণ্ট্রেসর সাহেব নাকাশী পাড়ার বাবুদিগকে কৃষ্ণ নগরে আনিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহারা প্রত্যূষে খাস কাছারীতে হাজির হইয়া আমলাদিগের সহিত বাসায় যাইবেন এবং আহার করিয়া পুনরায় আম কাছারীতে উপস্থিত থাকিয়া কাছারী ভাঙ্গিবার কালে তাঁহাকে সেলাম করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিবেন। বাবুদিগকে এইরূপ নজর-বন্দী কয়েদ রাখিবার কারণ এই যে, মণ্ট্রেসর সাহেব জানিতেন যে রায় বাবুরা নিজেই দাঙ্গা করিয়া থাকেন, কাপ্তেন নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে দাঙ্গার স্থলে লাঠিয়াল পাঠাইবার অভ্যাস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব তিনি মনে করিলেন যে তাঁহাদিগকে সমস্ত দিন রাত্র কৃষ্ণনগরে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করিলে দাঙ্গা হইতে পারিবে না। বিশেষ কৃষ্ণনগর হইতে নাকাশীপাড়া প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধান, সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারিতে থাকিয়া রাত্রি কালে বাবুরা দশ দশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া নাকাশী পাড়ায় যাইতে পারিবে না এবং পারিলেও তাহারা পুনরায় পর দিবস প্রাতে যথা সময় কৃষ্ণনগর আসিয়া তাঁহার কুঠিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে না। তদতিরিক্ত তিনি গোয়াড়ির খেয়াঘাটের ইজারদারকে বাবুদিগের কাহাকেও তাঁহার বিনা হুকুমে খড়িয়া নদী পার করিয়া দিতে দৃঢ় রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং কোতয়ালীর দারোগাকেও বাবুদিগের প্রতি গোপনে দৃষ্টি রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। এই রূপ আট্ ঘাট্ বন্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মণ্ট্রেসর সাহেব মনে করিলেন, যে তিনি এক্ষণে শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন, বাবুরা আর কেহ কোন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু ও হরি! তাঁহার সাহেবী মন্ত্রণা ও কৌশল সকলই কেশব বাবুর কাছে বৃথা হইয়া পড়িল।

বিখ্যাত পলাসীর যুদ্ধ ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে মিড়া নামক একটি গ্রাম আছে; সেই গ্রামের সন্নিকটেই ক্লাইব সাহেবের সহিত নবাব সেরাজুদ্দৌলার সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহার অনতি দূরে লক্ষাবাগ নামক আম্র বাগিচা ছিল, তাহার মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তোপ খানা স্থাপিত ছিল। সেই লক্ষাবাগ এখন আর নাই, নদীর ভাঙ্গনে সেই স্থানটী ভাগীরথীর গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। যেখানে এমন পাপের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, বসুন্ধরা বোধ হয়, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে লজ্জা বোধ করিয়া, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে তাহা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। সেই বাগানে নাকি বাঙ্গালার নবাবদিগের অর্জ্জিত নানা প্রকার সুখাদ্য এক লক্ষ আম্র বৃক্ষ ছিল এবং সেই জন্যই তাহার নাম হয় লক্ষাবাগ। এক লক্ষ গাছের মধ্যে এখন একটি গাছও নাই। আমি যখন মিড়ায় গিয়াছিলাম, তখন মিড়ার কয়েক জন অধিবাসীর নিকট শুনিলাম যে লক্ষাবাগের শেষ বৃক্ষটি তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে নাকি তাহারা গোলার দাগ দেখিয়াছিল, কিন্তু এই কথা বড় সত্য বলিয়া বোধ হইল না। মিড়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল মাঠ আছে, তাহাতে কৃষকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লাঙ্গলের মুখে কামানের গোলা পাইত এবং আমি তখনও দুই এক জনের ঘরে ঐরূপ কয়েকটা গোলা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার একটা গোলা হস্ত গত করিয়া আনিতে আমার বুদ্ধি হয় নাই। বোধ করি যাঁহাদিগের পুরাতন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করার সখ আছে, তাঁহারা এখনও যত্ন করিলে ঐ গ্রামের কোনও না কোনও অধিবাসীর নিকট পলাসী যুদ্ধে ব্যবহৃত দুই এক লৌহ বর্ত্তুল সংগ্রহ করিতে পারেন।

মিড়া গ্রাম বহরমপুরের সৈনিক রাজবর্ত্মের পশ্চিমধারে কৃষ্ণনগরের প্রায় বিশ ক্রোশ উত্তরে স্থিত। তাহাতে কয়েক ঘর সঙ্গতিপন্ন মুসলমান কৃষকের বাস এবং তাহা নাকাশী পাড়ার জমিদারদিগের অধিকার ভুক্ত। মিড়াতে ঈশান বাবুর এক কাছারী ও গোলাবাড়ী ছিল এবং প্রজারা প্রায় সকলেই ঈশান বাবুর পক্ষ। এই গ্রামে কেশব বাবু তাঁহার নিজের প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য প্রথম হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু ঈশান বাবুর সতর্কতায় এত দিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদের সকলকে নজরবন্দী করাতে ঈশান বাবুর মনে বিশ্বাস হইয়াছিল, যে তাঁহাদের এই অবস্থায় কেহ কাহারও প্রতি কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং বোধ

হয় সেই বিশ্বাসে ঈশান বাবু মিড়াতে পূর্ব্বে যে সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক রাখিয়াছিলেন তত লোক এখন রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাহাদের অনেককে মিড়া হইতে স্থানান্তর করিয়াছিলেন। কেশব বাবু এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেই অবকাশে মিড়ার বিপক্ষ প্রজাদিগকে দমন ও গ্রামখানা আপনার করতলে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ বিবেচনা করিলেন এবং সেই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া তলে তলে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের ও পারে মাগাকোল হইতে মিড়ার দক্ষিণে দেবগ্রাম নামক এক গ্রাম পর্য্যন্ত সমদূর তিন চারি স্থানে দুই দুইটা করিয়া বলবান অশ্ব রাখিতে এবং বিক্রমপুর ও ঐ দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে তিন চারি শত লাঠিয়াল ও অস্ত্রধারী লোক প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে কেশব বাবু নিয়ম মত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারী ভাঙ্গিলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অন্য দিন অপেক্ষা সেই দিবস অধিক বিনীতভাবে সেলাম ঠুকিয়া বিদায় হইলেন। পথে পালকী আরোহণ না করিয়া প্রধান প্রধান কয়েকজন আমলার সঙ্গে পদব্রজে বাসায় গেলেন। অবশেষে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাত্রে একটি মেরজাই দিয়া ও স্কন্ধের উপরে একখানা চাদর ফেলিয়া ধীরে ধীরে গোয়াড়ির খেয়া ঘাটের দিকে বায়ু সেবন করিতে গমন করিলেন এবং খেয়াঘাট হইতে নদীর ধার দিয়া ঘূর্ণী নামক কৃষ্ণনগরের এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, ঠিক প্রদোষকালে সেই স্থানে এক ধীবরের নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়া ভদ্রলোকের দুর্গম প্রায় দুই ক্রোশ মাঠের রাস্তা হাঁটিয়া যে স্থানে তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব প্রস্তুত ছিল, সেইখানে পৌঁছিলেন। লম্ফ দিয়া একবার অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে পারিলে, কেশবকে আর কে পায়? তোমার আমার পক্ষে যেমন এক পোয়া আধ পোয়া রাস্তা বিচরণ করা অক্লেশের কার্য্য, অশ্ব পৃষ্ঠে দশ বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করাও কেশবের পক্ষে তদ্রূপ। সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রাজপুত মর্দ্দ একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বায়ুবেগে ১৫ ক্রোশ পথ পার হইয়া বিক্রমপুর এবং দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে যে সকল অস্ত্রধারী লোক তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কেশব বাবুকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিল এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে মিড়াতে

যাইয়া পৌঁছিল। ঈশান বাবুর কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে না পারিয়া, আক্রমণের জন্য সম্যকরূপে অপ্রস্তুত ছিল এবং সেই কারণে কেশব তাহাদিগকে যদৃচ্ছা জয় করিতে পারিলেন। ঈশান বাবুর কাছারী ও কয়েক জন প্রধান প্রজার বাড়ী প্রথমে লুঠ করিয়া পরে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিলেন এবং নিজের কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক ও একজন কর্ম্মচারীকে মিড়া গ্রামে বসাইয়া গ্রাম দখল করিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধান্তে কেশব কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বেলপুকুরে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং কৃষ্ণনগর আসিয়া যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন, তখনও আমলারা সেখানে আসে নাই। সেই দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার কিছুমাত্র সংবাদ পাইলেন না; কারণ, মিড়া হইতে ডাক ভিন্ন একজন পদাতিক এক দিনে কৃষ্ণনগর আসিতে পারে না। পর দিবস পুলিসের রিপোর্ট ও ঈশান বাবুর দরখাস্ত পাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কেশবকে ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেশব জজ সাহেবের নিকট এই বলিয়া আপীল করিল যে "মেট্রেসর সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া পর দিবস প্রত্যূষে তাঁহার আমলাদের অগ্রে তাঁহার কুঠিতে হাজির হইয়াছিলাম, তবে কি প্রকারে আমি একরাত্রি মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ যাইয়া কথিত অপরাধ করিয়া পুনরায় সেই রাত্রি মধ্যে বিশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম? এমন কার্য্য মনুষ্যের অসাধ্য অতএব অভিযোগ মিথ্যা। আমাকে খালাস দিতে আজ্ঞা হউক।" জজ সাহেব তাঁহার রায়ে লিখিলেন যে "কেশব বাবু যে হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্য ব্যক্তির পক্ষে বলবৎ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা কেশবের অসাধ্য কার্য্য নহে কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে কেশব এক দিন কিম্বা একরাত্রি মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অনায়াসে ৪০ ক্রোশ কেন, তাহার অধিক পথও অতিক্রম করিতে পারে, অতএব তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহবের হুকুম বাহাল রাখিলেন।" কিন্তু কেশব সদর নিজামত আদালতে আপীল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেশবের অত্যন্ত হাপ দাপ রবরবা ছিল। সামান্য লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিত। এমন কি তাঁহার শব্দ শুনিলে তাঁহার ভৃত্য এবং প্রজারা ভয়ে কম্পবান হইত। কেবল তাঁহার চাকর এবং প্রজা নহে, তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকেও তাঁহাকে বড় ভয় করিত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমি এইস্থানে ব্যক্ত করিব।

কেশবের বিরুদ্ধে ঈশান বাবু কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক অভিযোগ করায়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কেশব বাবুকে তাঁহার আদালতে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত আদেশ করেন। কেশব বাবুও সেই আদেশমতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইয়াছিলেন। ইহা বলা অনাবশ্যক, যে ভারতবর্ষে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় তখন সাক্ষীর জবানবন্দী বিচারকের স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল না। সাক্ষী উপস্থিত হইলে, একজন আমলা বিচারকের দৃষ্টি চলিতে পারে, কাছারী ঘরের এমন এক স্থানে বসিয়া সাক্ষীর মূল জবানবন্দী লিখিয়া লইত এবং তাহা লেখা শেষ হইলে, বিচারকের সমক্ষে তাহা পঠিত হইলে, তাহার উপরে বিচারক এবং দুই পক্ষের উকীল মোক্তারের কূট প্রশ্ন হইত। কেশব আদালতগৃহে প্রবেশ করার পূর্ব্বে ঈশানের দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী একজন আমলা কাছারী ঘরের মধ্যে বিচারকের সম্মুখে একস্থানে লিখিয়া লইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল, যে তাহারা স্বয়ং কেশব বাবুকে ঘোড়া চড়িয়া দাঙ্গা করিতে দেখিয়াছে। এমন সময় কেশব বাবু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সাক্ষীদ্বয় এইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। শুনিবামাত্র কেশব বলিয়া উঠিল যে "কি রে ব্যাটারা কি বলিতেছিস্।" সাক্ষীরা এতক্ষণ কেশব বাবুকে দেখিতে পায় নাই কিন্তু তাঁহার শব্দ শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া কেশব বাবুকে দেখিতে পাইয়া "ওমা কেশববাবু" বাক্য উচ্চারণ করিয়া এক লম্ফে আদালতের গৃহ হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। বলিলেন যে "দেখ দেখ, ইহারা আমার সম্মুখ হইতে কেশবের ভয়ে পলায়ন করিল।"

কেশব বাবুর যেমন অন্যদিকে দৌরাত্ম্য ছিল, তেমন এ দিকে বিলক্ষণ দানশীলতাও ছিল। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে তাঁহার বেশ

প্রবৃত্তি ছিল এবং সাধারণের উপকারজনক কার্য্যের নিমিত্ত তিনি মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর জেলায় অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। সাঁওতাল যুদ্ধের সময় এখনকার ন্যায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই। এই যুদ্ধে এক সময় গবর্মেণ্টের এমনও আশঙ্কা হইয়াছিল, যে সাঁওতালেরা বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ সহর আক্রমণ করিবে এবং সেই আশঙ্কায় ঐ স্থান হইতে কলিকাতায় শীঘ্র সংবাদ পৌছিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত শীঘ্র, একহারা টেলিগ্রাফের তার ঝুলান আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তখন গবর্মেণ্টের ভাণ্ডারে টেলিগ্রাফ তার ঝুলাইবার উপযুক্ত মাল মসলা ছিলনা এবং ধাতুময় স্তম্ভ প্রভৃতি উপকরণ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষ রেলপথের অভাবে আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্ত বাঞ্ছিত সময়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ারও উপায় ছিল না। তদ্ভিন্ন এই টেলিগ্রাফ স্থায়ীরূপে সংস্থাপন করার আবশ্যক ছিল না। সাঁওতালদিগকে দমন করার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই এই টেলিগ্রাফ উঠিয়া যাইবে। সুতরাং যেন তেন প্রকারে ইহা খাড়া করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাখিতে পারিলেই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই নিমিত্ত অন্য কোন প্রকার স্থায়ী স্তম্ভ ব্যবহার না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উচ্চ বংশ খণ্ড সকল পুতিয়া সেই গুলার মাথার উপর তার ঝুলাইবার প্রস্তাব হইল। অন্যান্য অনেক স্থানে মূল্য দিয়া গবর্মেণ্টকে বংশ ক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সেই কার্য্যের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন। এক দিবস কেশব বাবুর সহিত এই সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হওয়াতে তিনি ব্যক্ত করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুমতি করিলে, তিনি নিজ ব্যয়ে খড়িয়া নদীর ওপার হইতে কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বাঁশ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে, তাঁহার একজন কর্ম্মচারী সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল, সে তাঁহাকে এই ঝঞ্ঝাটে হস্তক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিল। তাহাতে কেশব বাবু তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন, যে তাঁহার নিজের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, যেমন তিনি তাঁহার প্রজাদিগের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা করেন, সেইরূপ তাঁহার রাজাকেও তাঁহার সাহায্য করা উচিত, না করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। মহতের মহৎ উক্তি!! ইহা বলা

অনাবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি আহ্লাদের সহিত কেশব বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে কেশব বাবুর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্রেরা খুব সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন ধুমধাম, পক্ষান্তরে সেই শ্রাদ্ধে তেমন বিভ্রাটও ঘটিয়াছিল। কেশব বাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে বিবেচনা করিয়াছিল যে এখন বাবুদিগের আত্মকলহ মিটিয়া যাইবে এবং এমনও জনরব উঠিয়াছিল, যে কেশবের মরণে ঈশানবাবু বিস্তর শোক ও খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবু অভাবে তিনি আর কাহার সহিত বিবাদ করিবেন? তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর কে আছে? কিন্তু রায় বাবুদিগের মনে মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব এমনই দৃঢ় হইয়া রহিয়াছিল, যে তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না। কেশব বাবুর শ্রাদ্ধের দিবস কি এক কথা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যে বিবাদ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর লাঠিযুদ্ধে মিটিল না। অবশেষে দুইপক্ষে বন্দুক বাহির করিয়া পরস্পরের উপরে গুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাহাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তথাপি অনেকে গুরুতর আঘাতিত হইয়াছিল। ইহাকেই বলে শ্রাদ্ধ গড়ান। যুদ্ধের পরে উভয় পক্ষে জ্ঞান জন্মিল এবং সকলে মনে মনে ভীত হইলেন। বুঝিলেন, যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া রাজার কাণে এই বিষয় উঠাইলে, উভয় পক্ষের নিস্তার নাই; গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে। অতএব দুই পক্ষই পরামর্শ করিয়া এক বাক্যে নালিশ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। কিন্তু বাবুরা ক্ষান্ত থাকিলে কি হয়, ধর্ম্মের ঢোল বাজিতে ক্ষান্ত থাকে না। ক্রমশ এই যুদ্ধের আভাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে উঠিল। তখন এ, জে, এলিয়ট নামক একজন যুবা সিবিলিয়ান কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট। তিনি কমিশনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলেন এবং কমিশনর সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে দৃঢ়রূপে দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নাকাশীপাড়ায় যাইয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিতে হুকুম দিলেন কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এক পক্ষকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে

এলিয়ট সাহেব আমাকে সেই কার্য্যে ব্রতী করিয়া নাকাশীপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে চরমে আমার যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আর এক প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

এই কেশব বাবুকেই কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোকে "খড়ে পারের রাবণ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত।

শাক্যসিংহের শুদ্ধোদনের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ।

রাত্রি গভীর, পুরবাসিগণ নিদ্রিত, কেবল কুমার সিদ্ধার্থ একাকী সেই নিঃশব্দ নিশীথ সময়ে মনে মনে নিষ্ক্রমণ চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, পিতা শুদ্ধোদনের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুজ্ঞায় পুর পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে। করিলে অকৃতজ্ঞতা ও অন্যায় করা হয়। অতএব আমি পিতার নিকট অনুজ্ঞাত হইয়াই নিষ্ক্রান্ত হইব।

অনন্তর তিনি সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে একাকী অলক্ষ্যে পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। তাঁহার গমনে শুদ্ধোদনের শয়ন কক্ষ আলোকময় হইল এবং রাজাও তৎপ্রভাবে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। শুদ্ধোদন নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখেন, গৃহ আলোকময় হইয়াছে। ব্যগ্র হইয়া কঞ্চুকীকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কঞ্চুকিন্! সূর্য্য উদিত হইয়াছে? কঞ্চুকী প্রত্যুত্তর করিল, মহারাজ! এখনও রাত্রের শেষ অর্দ্ধ ব্যতিক্রান্ত হয় নাই। সূর্য্যপ্রভা উদিত হইলে ভিত্তিতে ছায়া দর্শন হয়, শরীর উষ্ণ হয়, দেহে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়, হংস, ময়ূর, শুক, কোকিল, চক্রবাক্ প্রভৃতি পক্ষিগণ রব করে, এ সকল লক্ষণ এখনও লুপ্ত আছে। মহারাজ! এ প্রভা সূর্য্য প্রভা নহে, এ প্রভা সুখ-স্পর্শা ও মনোহারিণী। আমার জ্ঞান হইতেছে, গুণধর রাজপুত্র এখানে আসিতেছেন।

রাজা শুদ্ধোধন চকিত নয়ন বিস্ফারিত করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই দেখিলেন, কুমার গুণধর তাঁহার, অভিমুখে দণ্ডায়মান। রাজা তখন সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে অভ্যাগত পুত্রের সম্মানার্থ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, কুমার সিদ্ধার্থও পিতৃ গৌরবে নিমন্ত্রিত হইয়া তদীয় চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত কর পুট বিধানে বিনম্র বাক্যে বলিতে লাগিলেন।—

"মহারাজ! আমার বাধা দিবেন না। আমার জন্য খেদ করিবেন না। হে দেব! আপনি আমায় রাজ্যের সহিত, স্বজনগণের সহিত ক্ষমা করিবেন, আমার উপযুক্ত নিষ্ক্রম-কাল আগত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধি নির্ব্বিঘ্ন হয়।"

শুনিয়া রাজা শুদ্ধোধন বলিতে লাগিলেন—

"তমশ্রুপূর্ণ নয়নো নৃপতির্বভাষে
কিঞ্চিৎ প্রয়োজন ভবেৎ বিনিবর্ত্তনে তে।
কিং যাচসে মম বরং বদ সর্ব্ব দাস্যে
অনুগৃহ্য রাজকুল মাঞ্চ ইদঞ্চ রাষ্ট্রম্॥"

রাজা শুদ্ধোধন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"পুত্র! তোমার বিনিবৃত্তি বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য আছে, বল। তুমি আমার নিকট কি বর চাও—বল, আমি সমস্তই দিব। যাহা চাহিবে তাহাই দিব—অন্যথা করিব না। এই রাজকুলের প্রতি, আমার প্রতি এবং এই রাজ্যের প্রতি অনুগ্রহ কর—অন্যথা করিওনা।

"তদ বোধিসত্ত্ব অবচী মধুর প্রলাপী
ইচ্ছামি দেব। চতুরো বর তাম্মি দেহি।
যদি শক্যতে দদিতু মহ্য বসোতি তত্র
তত্রক্ষসে সদ গৃহে ন চ নিষ্ক্রমিষ্যে।"

"ইচ্ছামি দেব! জর মহ্য ন আক্রমেয়া
শুভবর্ণ যৌবনস্থিতো ভবি নিত্য কালং।
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবি নোচ ভবেত ব্যাধি
রমিতায়ুষশ্চ ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ॥"

"সম্পত্তিতশ্চ বিপুলা ন ভবেদ্বিপত্তী
রাজা শুনিত্ব বচনং পরমং দুখার্ত্ত।
অস্থান যাচসি কুমার! ন মে হত্র শক্তিঃ
জর ব্যাধি মৃত্যু ভয়তশ্চ বিপত্তিতশ্চ॥"

* * * *

"কল্পস্থিতীয় ঋষয়ো হি ন জাতু মুক্তাঃ।"

শুনিয়া মধুরভাষী ভগবান্ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, দেব! যদি পারেন ত আমাকে চারিটি মাত্র বর দিউন। যদি আপনার শক্তি থাকে, আর আমাকে পশ্চাদুক্ত বর চতুষ্টয় দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি গৃহবাসে থাকিতে পারি এবং তাহা হইলে আপনিও আমাকে সর্ব্বদা গৃহে দেখিতে পাইবেন, আমি নিষ্ক্রান্ত হইব না।

হে দেব। আমি ইচ্ছা করি, যেন জরা আমাকে আক্রমণ না করে, অভিভূত না করে। শুভবর্ণ (লাবণ্য শোভী) যৌবন যেন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থির থাকে। (১)

আমি অরোগিতা প্রাপ্তি ইচ্ছা করি, কোনও কালে যেন আমার ব্যাধি না হয়। (২)

আমি অপরিমিত আয়ু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঞ্ছা করি, কখনও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৩)

আমি বিপুল সম্পত্তি ইচ্ছা করি, সে সম্পত্তি যেন অন্যের অতুল্য হইয়া চিরস্থায়িনী হয়, কোনও কালে যেন তাহাতে বিপত্তি না হয়। (৪)

বোধিসত্ত্বের ঈদৃক্ বাক্য—ঈদৃক্ প্রার্থনা—শুনিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখকাতর হইলেন। বলিলেন, পুত্র! যাহা হইবার নহে—পাইবার নহে—তুমি তাহাই চাহিতেছ। আমি ঐ বর দিতে অশক্ত। জরা ব্যাধি মৃত্যু ভয় হইতে ও বিপদ প্রাপ্তি হইতে উদ্ধার করিতে অক্ষম। কল্প কল্পান্ত কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া ঋষিরাও ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার বলিলেন,——

> "হন্ত শৃণুষ্ব নৃপতে! অপরং বরৈকম্
> অস্যাচ্যুতস্য প্রতি সন্ধি ন মে ভবেয়া।"

মহারাজ। যদি ঐ বর দিতে না পারেন, তবে অন্য এক বর দিউন। সে বর এই যে, আমি এই সংসার হইতে প্রচ্যুত হইলে আপনি কাতর হইবেন না ও আমার যেন পুনর্ব্বার এ বিষয়ে (সংসার বিষয়ে) প্রতিসন্ধান না হয়।

> "শ্রুত্বৈব মেব বচনং নর পুঙ্গবস্য
> উগ্রা তনুঞ্চ করি ছিন্দতি পুত্রস্নেহম্।
> অনুমোদনী হিতকরা জগতি প্রমোক্ষম্
> অভিপ্রায় তুভ্য পরি পূর্য্যতু যন্মতস্তে॥"

রাজা তখন নিতান্ত কাতর হইয়া দীর্ঘশ্বাসসহকারে পুত্র স্নেহ চ্ছেদ করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে হিতকর! তুমি যে জগতের মোক্ষ ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার সে ইচ্ছা—অভিপ্রায়—পূর্ণ হউক, তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হউক।

নিষ্ক্রমণ রাত্রের অন্য একটি বৃত্তান্ত। সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শাক্যসিংহ পিতৃভবন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। এই কার্য্য বা এই ঘটনা পৌরজনের অজ্ঞাতসারেই সাধিত হইল। রাজা অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া কিযৎক্ষণ কর্ত্তব্যচিন্তা করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাত্রার্দ্ধ সময়ে সমুদয় শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ব তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমার কুমার নিশ্চিত পুরপরিত্যাগকরিবে—নিষ্ক্রান্তহইবে—এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শাক্যগণ বলিল, মহারাজ! ভয় কি, আমরা রক্ষা করিব। ভাবিয়া দেখুন, আমরা অনেক, কুমার একক। তাঁহার কি শক্তি আছে যে তিনি বলপূর্ব্বক গৃহ বহির্গত হইতে পারিবেন?

অতঃপর সেই রাত্রেই নগর দ্বারে শত শত কৃতাস্ত্র শাক্যকুমার স্থাপিত হইল। অন্তঃপুর পথে ও বহিঃপুর পথে প্রধান পুরুষেরা বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ নিযোজিত হইলেন। রাজা স্বয়ং স্বগৃহে জাগরিত থাকিলেন।

এদিকে অন্তঃপুর মধ্যগতা মহাপ্রজাবতী চেটীদিগকে ডাকিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন, সমস্ত অন্তঃপুর আলোকিত কর, কোনও স্থানে যেন অল্প-মাত্রও অন্ধকার না থাকে এবং তোমরা সর্ব্বদা সাবহিত হইয়া রাত্রি জাগরণ কর।

"সঙ্গীতি যো জয়থা জাগরথ অতন্দ্রিতা ইমাং রজনীং
প্রতি রক্ষথা কুমারং যথা অবিদিতো ন গচ্ছেয়া॥"

সঙ্গীত আরম্ভ হউক, রাজা রাজপুরুষ ও পুরবাসীগণ তন্দ্রাশূন্য হইয়া জাগরণ করুক, কুমারকে রক্ষা করুক। যাহাতে কুমার অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে গমন করিতে না পারে, সকলে সতর্ক থাকিয়া তাহাই করুক।

ক্রমে সেই নিষ্ক্রমণরাত্রি অতি ভীষণাকার ধারণ করিল। অন্তঃপুরে ও নগরে শোক, মোহ, ভয়, বিষাদ ও হাহাকার প্রবিষ্ট হইল। নগরদ্বার,

পুরদ্বার, গৃহদ্বার, সমস্তই অবরুদ্ধ। দ্বারে দ্বারে, পথে পথে, গৃহে গৃহে, রক্ষিপুরুষ নিযুক্ত। দীপের উজ্জ্বল আলোকে কপিলবস্তু নগর আজ দিবা তুল্য হইয়াছে। সকলেই শোক মোহে ব্যাকুল, কর্ত্তব্য বিমূঢ় ও মৌন হইয়া ঘোর বিপদ অনুভব করিতেছেন।

ললিত বিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান শাক্যসিংহ যেরাত্রে পুরপরিত্যাগ করেন,—সে রাত্রে অন্য এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। সমস্ত শাক্যকুল সর্ব্ব প্রকার চেষ্টার সহিত সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়াও বোধিসত্ত্বকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে নাকি এক অভূত পূর্ব্ব দেবমায়া প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত নগরকে হতচেতন করিয়াছিল এবং সেই কারণে তাঁহার পুর-নিষ্ক্রমণ বা গৃহ পরিত্যাগ কেহ জানিতে পারে নাই। ললিত-বিস্তর গ্রন্থে এই স্থানটিতে এইরূপ বর্ণনা আছে—

কপিলবস্তু নগরের সেই শোকরাত্রি যারপর নাই ভীষণভাব ধারণ করিলে দেবগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল।

ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ বলিলেন, দেবগণ। অদ্য ভগবান নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তোমরা তাঁহার পূজার্থে সাহায্য কর।

ললিতব্যূহ-নামক দেব পুত্র বলিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই কপিল বস্তু নগরের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ—সকলকে মহাপ্রস্বাপনে নিমগ্ন করিব।

শান্ত সুমতি নামক দেব পুত্র বলিল, আমি হয় হস্তী প্রভৃতির শব্দ অন্তর্হিত করিব।

ব্যূহমতি নামক দেব পুত্র বলিলেন, আমি আকাশে পথ সৃষ্টি করিব, সেই পথে ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

হস্তিরাজ ঐরাবত বলিলেন, আমি আমার শুণ্ডাগ্র ভাগ বিস্তীর্ণ করিব, তাহাতে চতুর্দোল থাকিবে, ভগবান্ তদুপরি আরোহণ করিয়া পুর-নিষ্ক্রমণ নির্ব্বাহ করুন।

ইন্দ্র বলিলেন, আমি স্বয়ং নগরদ্বার বিবৃত করিব এবং পথ দেখাইয়া অনুগামী হইব।

ধর্ম্মচারী নামক দেব পুত্র বলিলেন, আমি আজ রাজান্তঃপুর বিকৃত ও বীভৎস ভাবে পরিণত করিব। তাহা হইলে অবশ্যই বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রমণার্থ ত্বরাবান্ হইবেন।

সঙ্কোদক নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি ভগবান্‌কে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিব।

পরে বরুণ ও সাগর প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন, আমরাও বোধিসত্ত্বের পূজার্থ সময়ানুরূপ সাহায্য করিব এবং চন্দনচূর্ণ বর্ষণাদি করিব।*

অনন্তর সেই মধ্যরাত্র সময়ে ভগবান্ সিদ্ধার্থস্বীয় শয়নকক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র, সর্ব্বজীবের হিত ও প্রাণিগণের সংসার-গতি ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে কপিলবস্তু মহানগরে মহাপ্রস্বাপন উপস্থিত হইলে দেবমায়াবিভূত জীবগণ যেন মহানিদ্রায় হতচেতন হইল এবং ধর্ম্মচারি নামক দেবপুত্র সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুরগত নব নারীর বৈকৃত্য উৎপাদন করত নিম্নলিখিত গাথাবাক্যের দ্বারা ভগবানকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন।

"কথং তবাস্মিন্নুপজায়তে রতিঃ
শ্মশানমধ্যে সমবস্থিতস্য।"

গাথাগান শ্রবণ করিয়া ভগবান শাক্যমুনি অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বেদ দ্বিগুণিতবেগে পরিবর্দ্ধিত হইল। যাহা দেখিলেন, তাহা সমস্তই বিসংজ্ঞ, বীভৎস।

যে সকল রমণী শাক্যপুরে সুন্দরী বলিয়া প্রথিত ছিল, মায়া নিদ্রার প্রভাবে আজ তাহারাও ঘোররূপা হইয়াছে। ফলত সকল নারীই চেতনহারা হইলে বিকৃত হয়। বোধিসত্ত্ব দেখিতেছেন—কেহ বিবস্ত্রা, কেহ বিকৃতবস্ত্রা, কাহার কেশ স্রস্ত, ভ্রষ্ট, লুণ্ঠিত, কাহার অলঙ্কারভরণ বিকীর্ণ ও বিশীর্ণ, কেহ ভ্রষ্ট মুকুট, কেহ বিহত স্কন্ধা, কেহ ঘৃণ্য দেহা, কাহার মুখ বিকৃত, কাহার চক্ষু বিবর্ত্তিত, কাহার মুখদিয়া লালস্রাব হইতেছে, কেহ বিকৃত আস্যে হাস্য করিতেছে, কাহার মুখদিয়া প্রলাপবাক্য নির্গত হইতেছে, কেহ দন্ত কড়মড় করিতেছে, কেহ বিকৃতমুখে নিদ্রিত, কাহার রূপ বিগলিত, কেহ হস্ত লম্বমান করিয়া পতিত আছে, কেহ বদন বাঁকাইয়া আছে, কেহ শীর্ষ উচ্ছ্রিত করিয়া আছে, কেহ মুখের অবগুণ্ঠন মস্তকে

* এই সকল দেবতা বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধ। বৌদ্ধরা বলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্বকালের বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধ-দেবতা।

দিয়াছে, কাহার গাত্র ভুগ্ন, কাহার মুখ বিবর্ত্তিত, কেহ কুব্জ, কেহ খুব খুব করিয়া কাসিতেছে, কাহার কণ্ঠ ঘড় ঘড় করিতেছে, কাহার নাসাবায়ু প্রবল-শব্দে নির্গত হইতেছে। কাহারও বা অপান বায়ু ঘোরশব্দে নির্গত হইতেছে, কেহ মৃদঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরিবর্ত্তিত মস্তকে পড়িয়া আছে, কেহ দন্তদ্বারা বদনস্থ বংশ চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ বিবৃতাস্য—হাঁ করিয়া পতিত আছে, এবং কেহ বা বিবর্ত্তিত নয়নে চাহিয়া আছে।"

এই সকল দেখিয়া বোধিসত্বের মনে অধিকতর ঘৃণা উৎপন্ন হইল। তিনি তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার সেই অন্তঃপুরকে শ্মশান বলিয়া স্থির করিলেন। ভাবিলেন, হায়! আমি এতদিন এই রাক্ষসীগণের রতিতে বৃথা মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি। আরও ভাবিলেন, মূর্খেরাই এই সংসারে বধ্যের ন্যায় বিনষ্ট হয়। অজ্ঞানীরাই বিষ্ঠাপূর্ণ চিত্রঘটে অনুরক্ত হয়—মূর্খেরাই চোরের ন্যায় অবরুদ্ধ হয়—বরাহের ন্যায় অশুচিমধ্যে নিমগ্ন থাকে—কুকুরের ন্যায় অস্থিকঙ্কর মধ্যে নিবিষ্ট থাকে—পতঙ্গের ন্যায় দীপশিখায় পড়িয়া মরে—ইত্যাদি। * অনন্তর স্বীয় শরীরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন, "অশুচি সমুত্থিতমশুচিসম্ভবমশুচিস্রবন্নিতাম।" শরীর মাত্রেই অশুচি পদার্থে সৃষ্ট, অশুচি পদার্থে জন্মে, অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদাই ইহাতে অশুচি নিস্রাব হইতেছে।

এই সময়ে আকাশ প্রদেশে নিম্নলিখিত গাথা গীত হইতে লাগিল।—

"কর্ম্মক্ষেত্ররুহং তৃষ্ণাসলিলজং সৎকায় সংজ্ঞীকৃতং
অশ্রু স্বেদক দাহ মূত্র বিকৃতং শোণিত বিন্দ্বাকুলং
বস্তি পূর বসাস্থ মস্তক বসৈঃ পূর্ণং তথা কিল্বিষৈঃ
নিত্য প্রস্রবিতংহ্যমেধ্য সংকুলং দুর্গন্ধি নানাবিধং
অস্থীদন্ত সকেশরোম বিকৃতং চর্ম্মাবৃতং লোমশং
অন্তঃপ্লীহ যকৃত বসোঘ রসনৈ রিভিশ্চিতং দুর্ব্বলম্
মজ্জা স্নায়ু নিবদ্ধ যন্ত্র সদৃশং মাংসেন শোভীকৃতং
নানাব্যাধি প্রকীর্ণ শোককলিলং ক্ষুত্তর্ষ সম্পীড়িতং
জন্তূনাং নিলয়ং অনেক সুষিরং মৃত্যুং জরাঞ্চাশ্রিতং
দৃশ্যাকোঽপি বিচক্ষণো রিপুনিভং মান্য শরীরং স্বকং?

* ললিত বিস্তর গ্রন্থে এইরূপ অনেক কথা আছে।

এটা কি ?—শরীরটা কি ? ইহা তৃষ্ণারূপ সলিলের সিঞ্চন কর্ম্মরূপ ক্ষেত্রে উৎপন্ন, "সৎ" এতদ্রূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, অশ্রু স্বেদ মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি বিকারে বিকৃত বা প্রপূরিত শোণিত বিন্দুতে আচিত, বস অসৃক ও মস্তকরসে পরিপূর্ণ, পাপ পরিপূর্ণ, সর্ব্বদা স্রবমান, অমেধ্য ব্যাপ্ত, দুর্গন্ধময়, অস্থি দন্ত কেশ ও রোম প্রভৃতিতে রচিত, চর্ম্মে আবৃত, উপরে লোম, ভিতরে প্লীহা যকৃত বস রক্ত ও মল প্রভৃতি কুৎসিত পদার্থে পরিপূর্ণ, দুর্ব্বল, মজ্জা স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতিতে গ্রথিত বা আবদ্ধ যন্ত্রের ন্যায়, মাংসের দ্বারা শোভিত বা সজ্জিত, নানা প্রকার ব্যাধি ও শোক প্রভৃতিতে আবিল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রপীড়িত, কীট সমূহের আলয়, নরকের আধার, বহুছিদ্র, মৃত্যু ও জরার আশ্রয়। এবম্বিধ শরীর শত্রুতুল্য মহাপকারী, ইহা দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া গুনিয়া, কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ ইহাকে আপনার বস্তু মনে করিতে পারে ? কে ইহাকে আমি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ?

শ্রীরামদাস সেন।

সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি।

২। বিশেষ কথা।

ইয়ুরোপে নবেল নামে এক শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থের পূর্ব্বাবধিই প্রাদুর্ভাব আছে। আজিকালি বিশেষ প্রাদুর্ভাব। নবেল নানা শ্রেণীর, নানা প্রকৃতির। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ধর্ম্মমত, সামাজিক-সংহিতা, কবিত্ব রহস্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ, প্রকৃতিচিত্র, চরিত্রচিত্র, সমস্তই নবেল নামক গদ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নবেল আর সম্বাদপত্র ইয়ুরোপের আজিকালিকার সাহিত্যে অতীব প্রবল। আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাত কাপড়টা যেরূপ সকলেরই চাই, নহিলে কাহারই চলে না, সেইরূপ ইয়ুরোপে ঘর গৃহস্থালি করিতে, দৈনিক জীবন নির্ব্বাহার্থে, অন্নবস্ত্রের ন্যায় নবেল, নিউস-পেপার, একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিদিনে, প্রায় প্রতি প্রহরে নবেল নিউস-পেপার প্রকাশিত প্রচারিত হয; না হইলে যেন চলেই না; হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে। উচ্চ মধ্য নিম্ন-

শ্রেণীর নবেল নিউস-পেপার, যে যেমন সমাজের, শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের লোক, যে যেমন শিক্ষা-রুচি বা রসের লোক, যে যতটা সার বা অসার লোক, তার তেমনি নবেল নিউস-পেপার, তার জন্য তেমনি নবেল নিউস-পেপার প্রকাশিত হয়। অতএব বলা বাহুল্য যে অধুনা ইয়ুরোপে সুকুমার সাহিত্যের চিন্তা ও কল্পনা স্রোত নবেলের ভিতর দিয়া অনেকটা প্রবাহিত হইয়া থাকে। সুকুমার সাহিত্যের প্রধান আলম্বন কাব্য নাটকের স্থান এখন নবেলে প্রধানত অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্বাভাবিক ও সংসারাতিরিক্ত চিত্র-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছি, সেই পুরাতন প্রণালীতে, পূর্ব্ব প্রচলিত সাবেক নিয়মে, যে সকল নবেল লিখিত হয় ইয়ুরোপে তাহার নাম 'রোমানটিক' (Romantic); আর আধুনিক অভিনব নিয়মের কথা যে বলিতেছিলাম, সে নিয়মে যে সব নবেল লিখিত হইতেছে তাহার নাম "রিয়ালিষ্টিক" (Realistic)। 'রোমানটিকের' বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে তাহাই ধরিয়া লউন 'রোমানটিকের' অর্থ। কিন্তু "রিয়ালিষ্টিক" জিনিসটা কি, দেখিতে হইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটা আনুসঙ্গিক কথা বলা আবশ্যক। 'রিয়ালিষ্টিক' ধাতুর রচনা ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে যে আজি নূতন দেখা দিয়াছে, তাহা নয়। কাব্য নবেল প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা পূর্ব্ব হইতে কিয়ৎপরিমাণে চলিতেছিল। সর ওয়ালটর স্কট প্রভৃতি বড় বড় নবেলিক কোবিদদিগের গ্রন্থেও উহার বিলক্ষণ 'আমেজ' আছে। স্কটের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের গ্রন্থেও উহার অস্তিত্ব আছে। তবে তখনকার এখনকার মত নয়। তখনকার রিয়ালিষ্টিকের সঙ্গে রোমানটিকের এত মাখামাখি, যে প্রথমোক্তকে শেষোক্তের অংশ বিশেষ বলিলেও চলে। আর তখনকার রিয়ালিষ্টিক প্রণালীর রচনা স্বাভাবিক ও স্বভাবাতিরিক্তের নিয়ম উলঙ্ঘন করিত না, ষোল আনা সেই নিয়মে চলিত। প্রকৃতি-সঙ্গতি-প্রণালী ঔপন্যাসিক আদর্শ চিত্রকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র খাট করিত না, তাহার ঔৎকর্ষই বাড়াইত। রোমানটিকের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রে পশ্চাতে রিয়ালিষ্টিক থাকিয়া, রচনা বড়ই মনোজ্ঞ মধুর সুন্দর সতেজ করিত। ঔপন্যাসিক রচনাকে স্বাভাবিক সুন্দর ও সতেজ করিবার জন্যই যেন তখন প্রকৃতি-সঙ্গত রচনা তাহাতে

"বুকনি" স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখনকার যে রিয়ালিষ্টিক বা প্রকৃতি-সঙ্গত বচনার কথা আমরা বলিতেছি, তাহা প্রাগুক্ত প্রকার নয়। তাহাব অবয়ব ও উদ্দেশ্য উভয়ই স্বতন্ত্র। এই প্রকৃতির Realistic বা প্রকৃতি-সঙ্গত রচনা ও ভাব ফ্রেঞ্চ নবেল উপন্যাসেই বড বেশি বেশি। আব ফ্রেঞ্চ নবেলেব আদরও অনেক স্থলে যেন বেশি বলিয়া বোধ হয়। উপন্যাসেও আমাদের "সত্যিকার" ঘব সংসাবের মত কাণ্ড কাবখানা বকম-সকম থাকা সম্ভবে, তাহা অবশ্য আব বুঝাইযা বলিতে হইবে না। আমাদেব নিজেব ভাষাব কাব্য উপন্যাস নাটক নবেলের পাঠকগণ অবশ্যই তাহা বুঝেন।

Real মানে যা Realistic মানে (অবশ্য বাঙ্গালা কবিতে গেলে) তাই। Real বা Realistic মানে, এক কথায়,—যথার্থ বা প্রকৃত বা সত্য বা ঠিক বা খাটি। এই কটা কথাব যেটা ইচ্ছা সেইটা বলিলে Realistic এব বাঙ্গালা কবা হয়। যে যথার্থ বা সত্য বা প্রকৃত অর্থে 'নিত্য' বুঝায় এ তা নয়। বিয়ালিষ্টিক জ্ঞাপক এ 'যথার্থ' মানে কেবল বক্ত মাংসেব যাথার্থ্য, ঘব গৃহ স্থালী অন্ন বস্ত্র রুটী তবকাবি প্রতিপাদ্য যাথার্থ্য ; এ যথার্থ মানে চর্ম্ম চক্ষের 'ঠিক', গজে মাপা 'খাটি।' সংক্ষেপত এ যথার্থ অর্থে আমাদেব সেই ছেলে বেলার 'সত্যিকাব।' চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাত্বক, মন বুদ্ধি অহঙ্কাব দ্বাবা যাহা ঠিক ঠাওবান যায়,—তাই। ইহা জড় সম্বন্ধীয যথার্থতা, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সাংসাবিক, মনবুদ্ধি অহঙ্কাব ইন্দ্রিযের সুগোচব ঘটনা। যেমন আমবা খাই শুই ঘুমুই, বকাবকি কবি, ভয় পাই, ভাল বাসি, হিংসা কবি, টাকা কামাই, বোগে ভোগি, শোকে পুডিযা মবি, সন্দেহে দগ্ধ হই, সুখ সম্পদে সাঁতাব দিই, দুঃখ দাবিদ্র্যে কষ্ট পাই, প্রলাপ ভাবি, প্রলাপ বকি, ইত্যাদি। সংক্ষেপত সংসারেব ঘব কান্না কবিতে, এই মল-মূত্র-পুরীষময় জীবন ধারণ কবিতে, আমরা যা কিছু করি, তাই মানে বিয়ালিষ্টিক বা প্রকৃতি-সঙ্গত। তদতিরিক্ত যা কিছু, আদর্শ চিত্র চরিত্র বা ঘটনা সমন্বিত তাহা বিয়ালিষ্টিক নহে,—তাহা আইডিয়ালিষ্টিক (Idealislic) বা বোমানটিক অর্থাৎ কল্পনা-মূলক।

প্রকৃতি সঙ্গত উপন্যাসকার বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির মাপজোঁখ কবিয়া তবে তাহাব বর্ণনা করেন। কত ফুট লম্বা, কত ইঞ্চি চওড়া, কয় বুরুল স্থূল, কি পবিমাণে খাড়াই, কতটা গভীর ইত্যাদি, চৌঘট্টী খুটিনাটি ঠিক

ঠিক বর্ণনা করা চাই। চিত্রে সুন্দর কুৎসিত, মহৎ নীচ, মনোহর ভয়ঙ্কর,—অবশ্য সবই কিছু কিছু থাকে, কিন্তু অবিমিশ্রভাবে প্রায় কিছুই থাকে না। বরং কুৎসিতের, নীচতার, ইতরতার খুব রং ফলান চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুন্দর মধুর মহত্বের আপেক্ষিক পূর্ণচিত্র বা অবিমিশ্র বর্ণনা প্রায়ই প্রকৃতি-সঙ্গত প্রণালীর নবেলে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থের বর্ণনায়,—কতকটা এইরূপ বুঝায়,—"হাঁ সুন্দর, সুন্দর বটে কিন্তু সুন্দরের মধ্যেও কুৎসিত আছে, থাকিবেই থাকিবে, থাকেই থাকে, যেহেতু তাহাই প্রকৃত।" ফলত এ প্রকৃতির গ্রন্থে সুন্দর কুৎসিতের সহিত মিশ্রিত, মহত্ব নীচতার সহিত মিশ্রিত, সভ্যতায় ইতরতায় ভয়ানক জড়াজড়ি। ভাল মন্দের সহিত মিশ্রিত; হয়ত ভাল মন্দের সহিত যুদ্ধও করিতেছে, মন্দকে পরাভব করিতে কোন ক্রমেই পারিতেছে না, পরিশেষে মন্দ কর্ত্তৃকই পরাভূত হইতেছে। কচিৎ মন্দের উপর ভাল জয় লাভ করিলেও, সে জয় অনিশ্চিত, তখনি 'কু'এর গ্রাসে 'সু'কে পড়িতে হইতেছে।

প্রকৃতি-সঙ্গত উপন্যাস গ্রন্থে, চিত্র ও চরিত্র সংসারের 'সত্যিকার' তরাজুতে তৌল করিয়া প্রদর্শিত করিবার চেষ্টা করা হয়, ঘটনা বৈচিত্র্য দেখাইবার বড় একটা প্রয়াস না পাইয়া, সংসারে যেরূপ প্রত্যহ ঘটিয়া থাকে, একই ঘটনার পৌনঃপুনিক সংঘটন এবং ঘটনা বিশেষের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ বিকাশ দেখান হয় মাত্র। নায়ক নায়িকার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার যাবতীয় ব্যাপারে, প্রত্যেক সামান্য ও সাধারণ কার্য্য ও ঘটনা লিপীবদ্ধ করা হয়। নায়ক নায়িকার বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতিরও আত্যন্তিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, সাফ্ উলঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়। সে দৃশ্য বীভৎস বলা যাইতে পারে। নায়ক নায়িকা প্রকাশ্যে বা অন্তরালে যাহা করেন, বলেন, ভাবেন,—কেবল তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া ছাড়ান নাই। নায়ক নায়িকার নেহাত গোপনীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া তথায় তাহারা যাহা নির্জ্জনে গোপনে হয়ত নিজের নিজেরই অজ্ঞাতসারে যাহা করে, বলে, ভাবে, তাহাও নিক্তির তৌলে ওজন করা হইয়া থাকে। তাহাতেও নিস্তার নাই। কাব্য বর্ণিত মানুষ মানুষীর মনের গুহ্য হইতে গুহ্যতর স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কল্পনা ক্ষণিক খেয়ালটুকু পর্য্যন্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায়, স্তরে স্তরে শিরায় শিরায় ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা করাতে বিষম

বক্তাবক্তি হউক, আর যাহাই হউক, করা চাইই। সে দৃশ্য ভয়ানক লজ্জাকরই হউক, আর ঘোর বিরক্তি-কর বীভৎসই হউক, মর্ম্মান্তিক যাতনাদায়কই হউক, তাহা দেখাইতেই হইবে। দেখানই প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে উপন্যাসের মানুষ মানুষীর সর্ব্বাঙ্গ শরীর চিত্ত মন অন্তঃকরণ—প্রথমত পর্দ্দায় পর্দ্দায় উলঙ্গ অনাবৃত করিয়া ক্রমে তাহাদের সর্ব্বত্র ছুরি চালান হইতে থাকে, জীব ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মান, যাতনায় অস্থির, ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে, কিন্তু নবেলকার স্থির গম্ভীর, উদ্বেগমাত্র বিরহিত, প্রশান্তভাবে জবায়ের ছুরি চালাইতেছেন; একের পর আর একটি কাটিতেছেন, যাহা কাটিলেন, পুনবায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থবার তাহা কাটিতেছেন, ছেদের পর ছেদ, তাহারও পুনরপি ব্যবচ্ছেদ। কাটিয়া টুকরা করিয়া, এক টুকরাকে ফের সাত টুকরা করিতেছেন। এইরূপ পৌনঃপুনিক বিশ্লেষণে তুলা-ধূনা করিয়া নবপ্রণালীর নবেলকার চরিত্র ও চিত্র অঙ্কিত করেন। আর সেই চিত্র সাধারণের সমক্ষে ধরিয়া, তাহা হইতে অবশ্য সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন।

জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি কামনায় ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার্থ জীবিত পশুপক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একে একে কাটিয়া, যেরূপে সজীব জীবচ্ছেদ (vivisection) প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন, নির্ব্বাক নিরীহ প্রাণীদিগকে দুরন্ত অস্বাভাবিক যাতনা প্রদানে কাতর হয়েন না, সেইরূপ এই শ্রেণীর নবেল লেখকগণ সাহিত্যের বা সমাজের উন্নতি কল্পনায় ঔপন্যাসিক জীবিত নরনারীর চরিত্রে জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন। ইহাঁরা নিজেই আপনাদের কৃত চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রণালীকে সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদ বলিয়া থাকেন।

প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলের এই লক্ষণকে বৈশ্লেষিক বা ব্যবচ্ছেদিক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। পরন্তু পূর্ব্বেই উহার পারিমাণিক লক্ষণের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। প্রকৃতির বা দৃশ্যের বা ঘটনার মাপ জোঁখ ওজন করিয়া, তাহার বর্ণনাকেই পারিমাণিক লক্ষণ বলিতেছি। যেমন রোগের যাতনা বর্ণনা করিতে, রোগী ঠিক কতবার জল খাইল, কতবার হাঁচিল বা হাই তুলিল, কিরূপ কষ্টে কেমন করিয়া "ঢোক গিলিল" কতবার কি প্রকারে পাশ ফিরিল, পাখানি হাতে ধরিয়া কিরূপভাবে নড়াইল, তাহাতে অঙ্গুলিগুলি কেমন করিয়া উঠিল। গা দিয়া কত ছটাক,

কত কাঁচ্চা,—ঘর্ম্ম নির্গত হইল, জ্বরের প্রবল অবস্থায় কত ডিগ্রি ও মান্দ অবস্থায় কত ডিগ্রি উত্তাপ উঠিল পড়িল ইত্যাদি। তারপর মোটের উপর কিরূপ এবং কতটা যাতনা, কোন উপসর্গের কিরূপ যাতনা; একটা যাতনা আর একটা হইতে কিরূপ এবং কতটা স্বতন্ত্র, একটার পর আর একটা আক্রমণের আগমন কিরূপ, উভয় আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুও বা কিরূপ ইত্যাদি। জীব-যাতনা বর্ণনে রিয়ালিষ্টিক লেখকগণ যেমন তৎপর, তেমনি পটু। আস্তে আস্তে গুমে গুমে এমন ভাবে তুলি চালাইতে থাকেন, যে যাতনা যথার্থই যেন জীবন্ত মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দেয়।

প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলের ভাষা অলঙ্কার শূন্য, শাদামাটা খবরের কাগজের সম্বাদ স্তম্ভের ন্যায় বলিলেও চলে। রূপক নাই, রস নাই, রসিকতার চেষ্টাও নাই, নৈতিক উপদেশ বা সিদ্ধান্তের ইঙ্গিতও নাই। এক ভাবে এক তালে আফিসের রিপোর্টের ন্যায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ চলিয়াছে।

তুমি সাবেক নিয়মানুবর্ত্তী লেখক, নিজের সৃষ্ট নায়িকার মুখের বর্ণনায় হয় ত লিখিলে,—

> পদ্মমুখীর মুখখানি পদ্মফুলের মত। যখন হাসেন ফুলটি যেন মলয় সমীরণে মৃদুমন্দ ক্রীড়া করে। মুখটি যেমন সুন্দর, ওষ্ঠদুখানির হাসি টুকুও তেমনি জ্যোৎস্নাময়। ইত্যাদি।

এরূপ স্থলে প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলকার লিখিবেন,—

> পদ্মমুখীর মুখখানিতে স্বাস্থ্য লক্ষিত হয়, অতএব সৌন্দর্য্যও বটে। পদ্মমুখী যখন হাসেন, তখন ওষ্ঠদ্বয়ের আকুঞ্চন,সম্প্রাসরণ প্রতি সেকেণ্ডে আড়াই বারের অধিক হয় না। অতএব সে হাসি খরও নয় মাটোও নয়।

সংসার যাত্রার যথাযথ বিবরণ বিবৃত করা ও প্রকৃতির অবিকল নকল লওয়া অভিপ্রায় বলিয়াই অবশ্য প্রাগুক্ত নবপ্রণালীর নবেলের নাম দেওয়া হয় 'প্রকৃতি সঙ্গত'। এ প্রণালীর পরিচালক পাণ্ডারা বলেন যে বিজ্ঞানে রাসয়নিকগণ যাহা করেন, তাঁহারা সাহিত্যেও তাই করেন, তাই করিতে চাহেন। সংসারেও মানব প্রকৃতির সাধারণ ও বিশেষ বিশেষভাব যথাযথ বর্ণনা করিয়া বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইয়া তাঁহারা সাহিত্য ও ইয়ুরোপীয় সমাজের উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবেন—এই

শ্রেণীর লেখকেরা একপ বিশ্বাস করেন। এ জাতীয় নবেল নিরীশ্বরবাদ ও জড়বাদের পোষক।

প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলে আখ্যানিক আধার আধেয়ের আকুঞ্চন প্রসারণ, বিকাশ পরিণতি,—অবশ্য থাকে, না থাকে এমন নয়। তবে শেষ সমাহার সম্বন্ধে বড় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখা যায় না। উপান্যাস মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত হইতেই হইবে, এমন কোন বাঁধাবাঁধি নাই। হয় ত মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত উভয়ের কিছুই না হইতে পারে। সংসারে ও সমাজে নিত্য যাহা ঘটে, ঘটিতেছে, তাহাই লিখিবার চেষ্টা করিয়া নবেলকার নিশ্চিন্ত হয়েন।

ইয়ুরোপে দারিদ্র্য দুঃখ ও দরিদ্রের দুষ্কর্ম্ম অতি ভয়ানক। সে এমনতর যে তাহার ধারণা আমরা এ দেশীয় লোক, যথার্থই করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের নিজের অশেষ অভাব, অন্ন বস্ত্রের নেহাত টানাটানি আছে, বিশেষত আমাদের মধ্যে সাধারণ জনগণের ক্লেশের ইয়ত্তা নাই, তাহা আমরা অষ্ট প্রহর স্বচক্ষে দেখিতেছি, নিদারুণ অনুভব করিতেছি। কিন্তু তথাচ বলিতে কি, ইয়ুরোপের সে লোমহর্ষণ কাণ্ডের কথা শুনিয়া, তাহার এক আধটা চিত্র দেখিয়া, আতঙ্কে আমাদের শরীর শিহরে, প্রাণ কাঁপে। ইয়ুরোপের ইতর সমাজে দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্গন্ধ দুরভিসন্ধি, পাপ পীড়া, অনাচার ব্যভিচার, আলস্য অনাহার, নিরতিশয় নিষ্ঠুরতা নির্লজ্জভাব ও নীচাশয়তা—সব একত্রে মাখামাখি থাকে। সে পৈশাচিক দৃশ্য আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। কিন্তু সভ্য সমৃদ্ধিশালী ইয়ুরোপে,—ইংলণ্ডে, ফরাসী রাজ্যে—তাহা রক্তে মাংসে বিদ্যমান, নিত্য প্রত্যক্ষ কাণ্ড। সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের, সেই ব্যভিচার-বিষাক্ত, মূত্র-বিষ্ঠা-ক্লেদাক্ত, বস্ত্রমাত্র বিবর্জ্জিত, আশ্রয় মাত্র বিরহিত, তীক্ষ্ণ-ক্ষুধা-হিম-শীত পীড়িত পৈশাচিক ইয়ুরোপীয় ইতর সমাজের যথাযথ বর্ণনা করা—প্রকৃতি-সঙ্গত নবেলকারদিগের একটা প্রধান ব্রত বলিলেও হয়। ইতর সমাজের প্রতি শাসক-সমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণার্থ তাঁহাদের এ ব্রত। পরন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহারা ভদ্র সমাজস্থ নরনারীদিগকে বুঝাইতে চান, যে পাপের আত্যন্তিক পুষ্টি ও প্রকাণ্ডতা দেখিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না; দারিদ্র্য দুঃখের, আলস্য অনাচারের চরমসীমা দেখিয়া ভয় করিলেও চলিবে না। সাহস সহকারে বীভৎসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যদ্দ্বারা পতিতদিগের উদ্ধার হয়, অন্তত কথঞ্চিৎ কষ্ট নিবারণ হয়, তাহা করিতে হইবে।

ইহাঁরা প্রথমত ইতর সমাজের প্রকৃতি সম্যকরূপে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রস্তুত হওয়ার পর, তবে নাকি প্রকৃতি-সঙ্গত নবেল প্রকটনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এ সম্প্রদায়ের জনৈক প্রধান পুরোহিত, বলেন 'যে ইতর সমাজের যতটা বর্ণনা করিয়া দেখান আবশ্যক, সাহিত্যাংশে তাহা হইয়া উঠিল না। এখন এ প্রকৃতির গ্রন্থ প্রবাহ ভবিষ্যতে জীবিত রাখিতে হইলে, উচ্চ উন্নত ভদ্র সমাজ ও সভ্য সম্প্রদায় সকল সম্যকরূপে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা চাই।'

স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বা সংসার সম্বন্ধীয়, এই দুই সাহিত্য প্রণালীর কতক কতক কথা বলা হইল। এই দুই মতের সমালোচনা পরে আলোচ্য।

বসন্তোৎসব।

আর্য্য ঋষিগণ যেমন চিন্তাশীল, তেমনি ভাবুক ছিলেন। তাহারা পণ্ডিতের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে চিন্তা করিতেন, আবার কবির কল্পনায় সেই সকল চিন্তা প্রকৃত বস্তুকে সজ্জিত করিতেন। তাহারা যাহা দেখিতেন, কবির রসে তাহা আপ্লুত করিতেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য পূর্ণ আর্য্য ধামে যাঁহারা বাস করিতেন, তাহারা যে স্বাভাবিক কবি হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেই আর্য্যধামে আমরাও বাস করিয়া, আমাদের রসহীন হৃদয়ে তাঁহাদের কাব্য ভাব গ্রহণে অনেক সময়েই অসমর্থ হই। কাব্যকে আমরা রসহীন করিয়া নীরস ঘটনা রূপে অবলোকন করি। যাহা হউক, যে ঋষিগণ এই রূপ স্বাভাবিক কবি ছিলেন, মধুময় বসন্ত কালে তাঁহাদের হৃদয় উৎস যে সহস্র ধারায় উৎসাহিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। দার্শনিক চক্ষে তাঁহারা প্রকৃতির বসন্ত সজ্জা অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং কবির হৃদয়ে তাহার প্রকৃত অনুভাব সকল আঁকিয়া গিয়াছেন। বসন্তকালে প্রকৃতি যখন মহোৎসবে সজ্জিত, আর্য্য ঋষি তখন সেই মহোৎসবে মিশিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। উন্মত্ত প্রায় হইয়া সেই বসন্তোৎসবের যে সকল ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক উৎসব ছবি বসন্ত পঞ্চমী, আর এক ছবি শিব চতুর্দ্দশী, তৃতীয় চিত্র মদনোৎসব, চতুর্থ ছবি দেব-দোল, এবং সর্ব্বশেষ

সাধারণ মহোৎসব—বাসন্তীপূজা। এখন দেখা যাউক, এই সকল চিত্রাবলীতে কত নিগূঢ় ভাব সমূহ সঞ্চিত আছে।

বসন্ত সজ্জিত শোভাময় প্রকৃতি-মন্দিরের দ্বার দেশে প্রথমেই জ্ঞানদেবী। সেই মন্দির সমক্ষে উপস্থিত হইলেই তুমি বিদ্যা দেবীকে দেখিতে পাইবে। তিনি অতি মোহন বেশে সেই বসন্ত সজ্জার মধ্যদেশে হৃদয় আকর্ষণী মূর্ত্তিতে দর্শককে আহ্বান করিতেছেন। সেই বসন্ত সজ্জা মাঝে বিদ্যা-দেবীর মূর্ত্তি যত মোহন ভাবে গড়িতে হয়, আর্য্য কল্পনা তাহা গড়িয়া গিয়াছে। সেই মূর্ত্তি সরস্বতী—ব্রহ্মাণ্ডের শত দল তাঁহার পদতলে, জ্ঞানা-কর্ষণী মধুময় বীণা তাঁহার করতলে, মোহকরী শ্রী ও লাবণ্য তাঁহার মুখ মণ্ডলে, ঐশ্চর্য্যের উজ্জল কিরীট তাঁহার কুণ্ডলে, সাত্বিক জ্ঞান রূপ পবিত্র বিশদ বরণের বিমলতা তাঁহার বক্ষঃ স্থলে।

বসন্তকালের শোভাময় বিশ্বদৃশ্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া আর্য্য ঋষি ভাবি-লেন, বিশ্বের এ কি কাণ্ড। কিছু দিন পূর্ব্বে দেখিলাম জগৎ অতি বিশীর্ণ অবস্থায় আছে, তাহা শুষ্ক প্রায় ও নীরস হইয়া আসিতেছে। আজি অচিরাৎ তাহা কিরূপে সরস ও শোভাময় হইল। জগতের এই যে পরি-বর্ত্তন, এই যে হ্রাস বৃদ্ধি, ইহা কিরূপে সম্পাদিত হয়? দিন দিন বৃক্ষ লতা কেমন গজাইয়া উঠিতেছে, কুসুম সকল বিকশিত হইতেছে, মুকুল উদ্গত হইতেছে, কোকিলের কণ্ঠ ধ্বনি কেমন শনৈ শনৈ উত্থিত হইতেছে! এ রহস্য কে আমায় বুঝাইয়া দিবে? কালি যাহা মৃত প্রায় শুষ্ক ছিল, আজি তাহা পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল কিরূপে? মৃত্যু ও জন্মের প্রহেলিকা কে বুঝা-ইবে? শুদ্ধ মৃত্যু ও জন্ম কেন? ঐ যে পল্লব দিন দিন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, উহার বৃদ্ধির রহস্যই বা কি?

সন্দেহের আন্দোলনে জ্ঞানের জন্ম, আমাদের আর্য্য ঋষির মনে এই রূপে জ্ঞানালোক প্রভাসিত হইল। তাঁহার অন্তরে যেন ঈষৎ জ্যোৎস্নালোক আসিল। অমনই তিনি সেই জ্ঞানের অধিকতর প্রস্ফুরণের জন্য বিদ্যাদেবীর আরাধনা করিবেন স্থির করিলেন। বিদ্যাদেবীর আরাধনা না করিলে, কে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যাইবে? কে তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দিবে? তিনি দিব্য চক্ষুলাভ করিবার জন্য বিদ্যাদেবীর ধ্যান ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হৃদয়ে বাসন্তী পঞ্চমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সেই শ্রীপঞ্চমীতে সাত্বিক জ্ঞানের আরাধনায়, বিদ্যাদেবীর পূজায় জগতের বাসন্তী শোভা পরিণত করিলেন।

তত্ত্বজ্ঞান রূপিণী সরস্বতী হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। আর্য্য ঋষি তখন বিশ্বের বাসন্তীয় সৌন্দর্য্যধামে সেই সরস্বতী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেখিলেন, সেই দেবীই এ শোভার লাবণ্য ও শ্রী, সমুদায় বসন্ত দেশকে দেবী আলোকিত করিয়াছেন। কি যেন দিব্যালোক আসিয়া বসন্ত ধামের শ্রী সম্পাদন করিল। সেই বসন্ত সৌন্দর্য্য আরও সুন্দরতর হইল, জগৎ দিব্য শোভায় শোভিত হইল। তাহার স্থূল শোভার অন্তর হইতে সূক্ষ্ম শোভার আর এক জ্যোতিঃ ফুটিল। সেই জ্ঞানজ্যোতিতে বসন্ত শোভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল।

আর্য্য ঋষি দেবীর আরাধনা করিলেন। ধ্যানে তিনি তাঁহার যেরূপ দেখিলেন, সেই রূপে তাঁহাকে হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করিলেন। সেই সরস্বতীর রূপে আজিও জগজ্জনের মনোহরণ করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্য ঋষির জ্ঞানালোক বৃদ্ধি করিবার জন্য দেবী তাঁহাকে সেই বাসন্তীয় জগতের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ লাভের অধিকার দিয়া, প্রকৃতি দেবীর মন্দির দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দেবীর দিব্য জ্যোতিঃ ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল! ঋষি সেই জ্ঞানদ্বার দিয়া প্রকৃতি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। স্থূল প্রকৃতি ভেদ করিয়া বিজ্ঞান ধামে আসিলেন, পুরোভাগে দিব্য জ্যোতিঃ পথ প্রদর্শক।

দেখিলেন, প্রকৃতির সমুদায় ক্রিয়াই অভ্যন্তরে। বাহিরে যাহা দেখা যায়, তাহা অনবরতই পরিবর্ত্ত হইতেছে, প্রকৃতির রূপ কোন সময়েই স্থির নহে। সৃষ্টি, লয়, ও স্থিতি নিয়তই ঘটিতেছে। এমন ক্ষণ নাই, যখন সৃষ্টি ও লয় হইতেছে না। একাধারে জন্ম, পরিপুষ্টি, বর্দ্ধন ও লয়। সকলই এক বীজ-মূলক, এই একই বীজ হইতে পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে, পরিপুষ্টি হইতেছে এবং প্রলয় হইতেছে। যাহা মূলতত্ত্ব তাহা অনন্ত, নিত্য ও অব্যয়, কিন্তু পরিবর্ত্তন তাহার নৈমিত্তিক ভাব। সকলই এই অনন্ত সত্ত্বে বিলীন ও পঞ্চত্ব পাইতেছে, আবার সেই লীন সত্ত্ব নবীভূত হইয়া নব নবরূপে উদয় হইতেছে। যাহাতে লীন হইতেছে, তাহাতেই জন্মগ্রহণ করিতেছে।

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

বাস্তবিক সমগ্র প্রকৃতি রাজ্য অনন্ত মূলসত্ত্বেরই তরঙ্গলীলা মাত্র।

আর্য্যঋষি ক্রমে প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রলয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলেন। প্রলয়ই সৃষ্টির মূল, প্রলয়ই পরিপুষ্টির মূল। লীন অবস্থা নবীভূত হইয়া সৃষ্টি হইতেছে। অসংখ্য পদার্থের লীন অবস্থাতেই পদার্থ বিশেষের পরিপুষ্টি। এই প্রলয় স্রোত অনবরত চলিতেছে, আর প্রকৃতির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। সমীরণের পরিমল-বহনে কুসুমের ধ্বংস! কুসুমের পরিমল হরণে মনুষ্যের নাসারন্ধ্রের উল্লাস ও বর্দ্ধন! জগৎ, তুমি শুদ্ধ বিলয়ে পরিপূর্ণ! সকলই লয় হইতেছে, অথচ কিছুরই একেবারে বিনাশ নাই! পঞ্চত্ব, লয়;—আবার সৃষ্টি! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় কেবল লয় ও সৃষ্টি চলিতেছে। দ্যুলোক, ভূলোক, নক্ষত্র লোক, ব্রহ্ম-লোক, অসংখ্য ও অনন্তলোকে এই প্রলয়ের আবর্ত্তন! ঋষি এই মহাকালকে নমস্কার করিলেন। যাহাতে সকল ভূত লয় প্রাপ্ত হইতেছে অথচ সকল ভূত যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, সেই ভূতনাথকে প্রণাম করিলেন। একবার তাঁহার ধ্যান করিলেন।

আর্য্যঋষির মনে এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রলয়ের ভয়ঙ্কর তিমির আসিতে লাগিল। জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণ জ্যোতি যেন মলিন হইতে লাগিল। পূর্ণিমা গেল, হৃদয়ে কেবলই তমোরাশি। ক্রমে এই তমোরাশি ঘনীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইল। তখন আর্য্য ঋষি একদা সেই চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকারে মহাকালের অনুভাব ও ধ্যান করিতে বসিলেন। কোথা দিয়া দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। হৃদয়ে মহাকালের প্রতিরূপ জাজ্বল্যমান হইল। মহাকাল মহারুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। তখন আর্য্যঋষি শিবরাত্রে সেই ধ্বংসকারী ত্রিশূলধারী শঙ্করের পূজা করিলেন। তাই আজিও এই মধুময় বসন্তকালে ভয়ঙ্কর মহাকালের পূজা প্রচলিত আছে।

আর্য্যঋষি সেই আশুতোষের পূজায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। পূজায় বুঝিতে পারিলেন, লয়ই সৃষ্টির মূল। জগৎ নিয়তই নূতন হইয়া সমুদ্ভূত হইতেছে। পুরাতনে যখন কাজ চলে না, তখন সেই পুরাতন দ্রব্য নবীভূত হইয়া উঠিতেছে। যাহা অমঙ্গলের আধার, তাহা বিনষ্ট হইয়া মঙ্গলাধার হইতেছে। অতএব মহাকাল,——শিবময় মহেশ্বর। এই শিবময় শঙ্করের পূজায় জগৎ রহস্য কিছু বুঝিতে পারিয়া আর্য্যঋষি প্রকৃতির আরও গভীরতর দেশে প্রবেশ করিলেন, বিজ্ঞান জ্যোতিঃ তাঁহাকে

এক নূতন দেশ দেখাইল। আর্য্যঋষি মহামায়া প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ যে সৎপদার্থের আভাস পাইয়াছেন, বিজ্ঞান জ্যোতি এখন তাঁহাকে সেই দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহামায়া প্রকৃতি যাঁহার আশ্রয়, সেই পরম পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন কিরূপ, আর্য্যঋষি তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বুঝিলেন, প্রকৃতি সংসারী, মহাকাল উদাসীন। উদাসীন মহাকাল সংসারী হইলেই প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হন। লয় সৃষ্টিতে পরিণত, সৃষ্টি লয়ে পরিণত। এই ব্যাপার চিরকালই চলিতেছে। চিরকালই মহাকাল উদাসীন, চিরকালই সংসারী। যখন এইরূপ চলিয়াছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। তখন আর্য্যঋষি গাইয়া উঠিলেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

(ভগবদ্গীতা ১৩ অ, ১৯ শ্লোক)

অনাদি কাল হইতে তবে পুরুষ সংসারী এবং প্রকৃতিতে আসক্ত। কি গভীর ও স্থায়ী প্রণয়! অনাদি কাল হইতে এই প্রেম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে এরূপ আসক্তি ও প্রেম ত আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিই যথার্থ সতী নামের পাত্রী। পুরুষ—প্রকৃতির প্রেমই প্রেম, এ প্রেম অতুল্য, নিত্য, অপ্রমেয়। এই প্রেম—দেবতা, এই প্রেমকে পার্থিব প্রেম হইতে পৃথক করিয়া আর্য্য ঋষি তাহার স্বতন্ত্র নামকরণ করিলেন। সেই প্রেম দেবতার নাম দিলেন—মদন, আর সেই চির আসক্তির নাম দিলেন—রতি। তখন আর্য্য ঋষির ধ্যানে সেই নিত্য প্রেম ও আসক্তির প্রকৃত অনুভাব উদয় হইল। তিনি তাঁহাদের ধ্যানে মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। সেই প্রেম উৎসবে ঘোষিত হইল। জগতে উহা আদর্শ প্রেম বলিয়া প্রথিত হইল। তাহারই উৎসব মদনোৎসব। এই মদনোৎসব প্রাচীন কালে আর্য্য ধামে এক মহাবাসন্তী উৎসব রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজি কাল-মাহাত্ম্যে তাহার ছায়া আছে মাত্র। এই মদনোৎসবই ফল্গূৎসব।

মদনোৎসবে ঋষির হৃদয় সাত্ত্বিক প্রেমে ঢল ঢল হইল। হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইল। সেই প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে পরম পুরুষ উদয় হইলেন। কি মোহন বেশ! কি সুধার বংশীধ্বনি! মুরলীমোহন বংশী বাজাইতে বাজাইতে বঙ্কিমভাবে ঈষৎ দুলিতে দুলিতে হৃদয়ে দেখা দিলেন। দেখা

দিবা মাত্র প্রেম গিয়া সেই পরম পুরুষে মিশিল। প্রেমের সাধনারূপিণী অষ্টসহচরী অনুরাগরূপ রাগরঞ্জনে সেই হৃদয়ধাম সুরঞ্জিত করিল। হৃদয়ে শুধু প্রেমের মাখামাখি ও ছড়াছড়ি। বংশীর সুধারবে হৃদয়ের প্রতিতন্ত্র বাজিয়া উঠিল, কেবল হরি হরি ধ্বনিতে হৃদয় পরিপূর্ণ। হৃদয়ের পাপ তাপ তখন সকল তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর্যামী হরি তখন নিজ সিংহাসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই সিংহাসনে তিনি প্রেমে নৃত্য করিতেছেন। হৃদয়-সিংহাসন দোদুল্যমান। হ্লাদিনী রাধা অনুরাগ কুঙ্কুমে সাধনার অষ্ট সহচরী সঙ্গে পুরুষোত্তমের দোলে মাতিয়া গিয়াছেন। কি সুন্দর ব্যাপার। কি মধুময় চিত্র। যে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বসন্তকালের দেবদোল আর্য্যসন্তানগণের হৃদয় মাতাইয়া তুলিত। আর্য্য ঋষিগণ যেরূপে এই দেবদোলে মাতিয়াছিলেন, আমাদের হৃদয়ে কি তাহার কিছু উন্মত্ততা হয়? যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই যথার্থ সার্থক। যাঁহারা সেই দেবদোল দেখিতে চান, তাঁহারা বসন্তকালে একদা রতি ও মদনোৎসবে মাতিয়া নিত্য প্রেমের ভাবে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করুন। হৃদয়ে সেই সাত্ত্বিক প্রেমের সঞ্চার হইলে ক্রমে সাধনা বলে হৃদয়ের হ্লাদিনী শক্তি রাধা রূপে প্রকটিত হইবে; রাধা রূপে প্রকটিত হইলেই বংশীধর দেখা দিবেন। চাই কেবল সাধনা, চাই, কেবল ভক্তি ও প্রেম। তাহা হইলেই হৃদয়ে ব্রজপুরী হইবে।

আর্য্য ঋষি তখন দেখিলেন, তাঁহার নিজ হৃদয়েই পরম পুরুষ বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার মনেরমন, আত্মার আত্মা, পরমসত্ত্ব,পরমাত্মা। আর্য্য ঋষি তাঁহার নাম দিলেন আত্মা বা পরমাত্মা। আর্য্য ঋষির দ্বৈত ভাব ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই দ্বৈতভাব যেমন তাঁহার তিরোহিত হইতে লাগিল, অমনি তাঁহার হৃদয়ে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। হৃদয়ে তন্ময়তা জন্মিল। আজি আর্য্য ধামে যে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত আছে, তাহার সম্যক্ ভাব উপলব্ধি করিতে হইলে, তাঁহাদের মত তন্ময়তায় উঠা চাই। সেই তন্ময়তায় উঠিতে না পারিলে, অদ্বৈত ভাবের প্রকৃত অনুভব হওয়া অসম্ভব। এই ভাব, সাধন প্রণালীর চরম সীমা। ইহা তর্ক নয়, যুক্তি নয়, সাধনার ফল মাত্র।

আর্য্য ঋষি এখন বাহিরের বিশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, নিজ আত্ম ধামের বিশ্বে আসিয়াছেন। তথায় দেবদোল করিলেন। পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার

পাইলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণ রূপে হৃদয়ে আঁকিলেন। সেই পরম পুরুষের ভাবে এখন ঢল ঢল হইয়া তাঁহাকেই ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ঐশ্চর্য্য সাধারণ হৃদয়ে প্রকটিত করিতে বাসনা হইল।

সাধারণ মানব হৃদয়ে সেই পরমাত্মা কেবল শক্তি রূপে প্রকটিত হন। শক্তিই সেই পরমাত্মার রূপ; এই রূপে তিনি জড় জগতে ব্যক্ত। সাধারণ মানব হৃদয় আর কোন রূপে পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারে না। আর্য্য ঋষি তাঁহাকে মহাশক্তি রূপে প্রদর্শন করিলেন। সমুদায় ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহাকে দেখিলেন ও দেখাইলেন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা শক্তি রূপে প্রকটিত। এই শক্তি রূপী পরমাত্মা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লীলায় লিপ্ত রহিয়াছেন। জগতের মহামায়ার অভ্যন্তরে তিনি আপনার লীলা সম্পাদন করিতেছেন। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বল, বীর্য্য প্রভৃতি তাঁহার বিভূতি। এই মহাশক্তির ধ্যানে ব্যাপৃত হইয়া আর্য্যঋষি সকলকে নিজ নিজ হৃদয়ে তাঁহাকে বিভূতির সহিত দেখিতে পরামর্শ দিলেন। দশ দিকেই যে শক্তি বিস্তৃত, সেই শক্তি দশভুজায় দেখা দিলেন। সেই দশ ভুজার পার্শ্বে, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান, বল ও বীর্য্য; লক্ষ্মী সরস্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়। এই মহাশক্তিকে আর্য্য ঋষি ধ্যানে দেখাইয়া তাঁহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন ও সর্ব্ব সাধারণকে করাইলেন। তাহাই বাসন্তী পূজা বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আর্য্যঋষি শুদ্ধ বসন্তকালে কেন, সমস্ত বৎসর ধরিয়া তিনি ধর্ম্মোৎসবে মত্ত থাকিতেন। এই শান্তিরসে তিনি প্রতি বৎসর নিমজ্জিত হইয়া ইহ জীবন ধর্ম্মময় করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যঋষির ধর্ম্মজীবনের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। জীবনকে ধর্ম্মময় করিয়া প্রাচীন আর্য্য সন্তানগণ পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিয়াছিলেন। সুখ ও শান্তি প্রাচীন আর্য্যধামে নিয়ত বিচরণ করিত। স্বাধীন ধর্ম্মজীবনের শান্তি সুখ কেহ হরণ করিতে পারে না। এক্ষণে আমরা পরাধীন বটে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবন স্বাধীন। মনে করিলে, আমরা পূর্ব্বকালের শান্তিসুখ আবার আর্য্যধামে আনিতে পারি। আসুন, আমরা সকলে এই বঙ্গধামকে সেই শান্তিসুধায় পরিপূর্ণ করি।

বসন্তে।

পূর্ব্বস্মৃতি।

বনে বনে বনে ফিরিত রমণী,
একাকী বাজায়ে বাঁশরী।
তরঙ্গে আকুল বিজনে নলিনী,
কিশোর বয়সে দুঃখিনী রমণী!
মুকুলিত আঁখি সতত কাতর,
প্রভাত গগনে ভাঙ্গা শশধর—
একাকী কাননে খুলিত সে প্রাণ,
ফুটিত বদনে বিষাদের গান,—
অতীত স্বপনে আধ ভোলা স্মৃতি
গাহিত—"শৈশবে বাসিত যে ভাল,
কেন রে গেল সে পাশরি।"
বসন্তের বনে গাহিত রমণী
বিষাদে বাজায়ে বাঁশরী।

তটিনীর কুলে প্রসারিয়া তনু
চাহিয়া রহিত গগনে।
যত পাখী যেত উড়িয়া উড়িয়া,
যতই পবন যাইত বহিয়া,
যতই নীরদ, যত তারা কুল,
চাহিয়া রহিত,— পরাণে আকুল,
কহিত কতই বিষাদের ভরে
—"দেখে যাও কিবা আমার অন্তরে,
বলিও তাহারে কি করে হৃদয়,—
বলিও তাহারে কত সে প্রণয়
দিয়াছি ঢালিয়া জীবনে।"
উঠিয়া আবার ছুটিত—কাননে
বাঁশরী ধরিয়া বদনে।

অই সে কানন,—অই সে তটিনী—
আজো কুলুকুলু চলেছে—অই,—
সে রমণী আর নাহিক হোথায়,
সে বাঁশরী কেহ নাহিক বাজায় ;
আজি ও কানন বিজন—নীরব,
বিজন তটিনী হারায়ে বিভব !
বনে বনে বনে ভ্রমিয়ে ভ্রমিযে
সে দিন বাঁশরী বাজায়ে বাজায়ে,
তটিনীর কূলে ভাঙ্গিল বাঁশরী ,
ডুবিল সলিলে,—নিবিল মাধুরি—
——ত্যজিল জীবন প্রণয়-ময়ী !
—অই সে কানন, অই সে তটিনী,
কই সে রমণী—বাঁশরী কই ?

বসন্ত ভুবনে মলয় মতন,
ভ্রমিত বে'সেই রমণী-রতন,—
ভ্রমিত ছড়ায়ে মাধুরি।
অস্ফুট নয়ন— অকূল পরাণ—
বাজাইত বীণা, গাহিত সে গান,—
আজি সে নীরব বাঁশরী।
এইত বসন্ত, মলয় পবন,
কোথায়, লুকাল মাধুরি।

(সতীশ।)

—•—

আশা।

কোকিল কুহরে ওই——
দেখ আঁখি মেলি গেছে যার চলি
আসিছে ফিরিয়ে ওই——
শৈশবের সেই নিরমল হাসি
আসিছে ভাসিয়ে ফুলে,

যৌবনের সেই সুখের তরঙ্গ
আসিছে সলিলে ছুলে,
নয়নের নেশা, জাগ্রতের সুখ,
সেইরূপ ওই—আসে,
হিয়ার মাঝারে দেবতার স্বর,
কোকিলের রবে ভাষে।
বিদ্যুতের মত যেই স্পর্শ, হায়!
শিরায় বহিত ছুটি,
মলয়েতে ভাসি ধীরে ধীরে, আসি
চারি ধারে পড়ে লুটি;
জীবনের ক্ষুধা সেই ভালবাসা
ফিরিয়া আসিছে ওই——
কোকিল কুহরে, দেখ আঁখি তুলি
ধরণী সে সুখময়ী।

আবেগ।

কই—সে আমার কই!
কোথা সেই আশা কই সেই ভাষা
হিয়ায় বসন্ত কই?
শাহারার মত ভীষণ অন্তরে
স্মৃতি প'ড়ে চারিধার,
নিরাশার বায়ু হু—হু রবে কাঁদি,
বহিতেছে অনিবার,
বুকের ভিতরে হেরিলে আমার
হৃদয় ফাটিয়া যায়,
সুখের কথায় শিরায় শিরায়
শোণিতে বিজলী ধায়,
বহুদিন আজ দেখি নাই ফিরি
আমার হৃদয় পানে,
সুখের সংবাদ বহুদিন, আজ
শুনি নাই আমি কাণে;

কঠোর সংসারে কঠিন হইয়ে
ছিলাম আপনা ভুলি,
কুহুরবে পিক হায়। কেন মনে
সেই সুখ দেয় তুলি।

সান্ত্বনা।

কোকিল কুহরে ওই——
হিয়ার বসন্ত হিয়ায় খুঁজিছ,
প্রাণে সে পীরিতি কই?
করেছিলে আশা? সে আশা কি আশা,
যে আশা ফুরায়ে যায়।
দেখেছিলে যদি, সে দেখা কি দেখা,
আঁখি না ভরিলে তায়!
শুনিলে কি তবে? যদি না রহিল
শ্রবণ ভরিয়ে ভাষা!
কি ভাল বাসিলে না মিটিল যদি
সাধের প্রণয় আশা।
আপনা ভুলিলে ভুলিলে তাহারে,
হায় রে মানব ভোলা!
ওই—দেখ চেয়ে সাধের সে সুখ
সম্মুখে রয়েছে খোলা।
হের এ জগত, হের ও আকাশ,
ধরণী সে সুখময়ী!
ভুলে যাও দুখ খুলে দেও বুক
বসন্ত আসিছে ওই——

(ঈশান।)

সান্ধ্য তোটক সঙ্গীত।

অবশেষ দিবা নববেশ ধরা,
সুখ শান্তির কান্তি দিগন্ত ভরা!
ভব দাহ পরে অবগাহ ছলে
নত ভাস্কর পশ্চিম সিন্ধুজলে।

নলিনী মলিনী প্রণয়ী বিহনে,
হসিতা কুমুদা পতি সংমিলনে!
উড়িতে উড়িতে নিজ নীড় মুখে
বিভুনাম বিহঙ্গম গায় সুখে।
পশু ধাইল আলয় পস্থপরে,
পথ ছাইল গোধূলি শূন্যভরে।
অতি ধীর সুশীত সমীরসনে
দুলিছে ফুল-পাদপ ফুল্ল বনে।
রহ এ সময়ে ক্ষণ কাল তরে
ভুলি পার্থিব সম্পদ মানব রে।
স্মর বিশ্বপিতা ভবপালন, হে!
ভয় ভঞ্জন, মানস-রঞ্জন—হে!
কি দরিদ্র ধনী কর সর্ব্বজনে
নিজ দৈনিক কার্য্য বিচার মনে;
গত এক দিনে কত সঞ্চিত রে
পথ সম্বল শেষ দিনের তরে।
যত দুষ্কৃত দূষিত চিত্ত ভরে,
'হর তাপ পিতঃ' বলি ডাক সবে।
ধর শঙ্খ করে রমণী নিকরে,
কর মঙ্গল আরতি শঙ্খ রবে।
ত্যজি এ সময়ে হরিনাম রসে
বিষয়ে রত যে, নর-পামর সে।
সুখ সত্যযুগে হ'ত মর্ত্ত্যপুরে
শুভ সান্ধ্য উপাসন সামস্বরে।
কলি কাল মুখাগত ভারত রে!
মদ মত্ত সদা উদরান্ন তরে!
ক্রম বিস্তৃত দুস্তর পাপভরা,
ভুলিয়া ভবতারণ নাম করা!
অতএব বৃথা কলহ ত্যজিয়া,
হরিনাম কর, স্মরণে মজিয়া॥

প্রাচীন ভারত

অর্থাৎ

বিদেশীয় প্রাচীন পরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক ভারত যদ্রূপ বর্ণিত।

প্রস্তাবনা।

আমাদের দেশে এক্ষণে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে সাধারণত দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক শ্রেণীর বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতে সভ্যতাসূচক, ভব্যতা-সূচক, কিছুই ছিল না, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, এ সকলই কুয়াসাবৃত ছিল, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র সকল কেবল খেয়াল ও অযৌক্তিক বাক্যে পরিপূর্ণ এবং শিখিবার বিষয় তাহার মধ্যে অতি অল্পই আছে। এমন কি বসন, ভূষণ, আহারীয় প্রভৃতিও অসভ্যতাব্যঞ্জক ছিল। পূর্ব্বাপর বহুকালই এইরূপ ছিল; কেবল আজি কালি মাত্র— ইংরাজ জাতির প্রসাদাৎ হ্যাট, কোট, বুট, পাইয়া আমরা সভ্য পদবীতে উন্নীত হইতে আরম্ভ করিয়াছি! আর এক শ্রেণীর বিশ্বাস ঠিক উহার বিপরীত সীমান্ত প্রাপ্ত। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, প্রাচীন ভারতের তাবৎ সমস্ত বিষয়েরই অত্যুন্নতি সাধিত হইয়াছিল, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতা সমস্তই অতুলনীয় ছিল এবং আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন কিছুই নাই, যাহা ভারতে প্রাচীন কালে ছিল না, বা যাহার উল্লেখ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে না পাওয়া যায়, অথবা এক কথায় প্রাচীন ভারতে তাবৎ বিষয়েরই এমন চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, তাহার অতি-রিক্তে কেহ কখনও যাইতে পারে না ও পারিবে না।

কিন্তু এ উভয় শ্রেণীরই, প্রকৃত সভ্যতা-বিষয়িণী ধারণা কি, তাহার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাভাসে ধর্ম্ম; আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যাহাতে ছায়াপাত হয়, সেইরূপ সাহিত্য ও বিজ্ঞান, এবং রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলের জাহাজ ও

অন্যান্য অধুনাতন ভোগবিধায়ক শিল্প, এই সকলের যথায় বিদ্যমানতা ও সমাবেশ, তাহাই সভ্যতা। তাই প্রথম শ্রেণীস্থেরা সহজ চক্ষে সে সকল প্রাচীন ভারতে দেখিতে না পাইয়া বলিয়া থাকে, প্রাচীন ভারতে কিছুই ছিল না। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থের দ্বারা, সে সমস্তই যে প্রাচীনকালে ছিল, তাহা দেখাইতে যাওয়ায়, অভিনব বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা বাহির হইতেছে; শতঘ্নিতে কামান, পুষ্পক রথে বেলুন, ইচ্ছামাত্র দূরপথ অতিক্রমণে রেলওয়ে, মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল দৃষ্টে তাড়িত তত্ত্ব, ইত্যাদি কল্পিত হইতেছে। বলিতে কি, ঠিক করা দুষ্কর, এ দুই শ্রেণীর মধ্যে কাহাকে বিশেষ প্রশংসার পাত্র বলিয়া ধরা যাইবে! একপক্ষে বাঞ্ছারাম সাহেব এবং বাবু, আর পক্ষে বাঞ্ছারাম সৌখিন হিন্দু এবং পণ্ডিত। বলা বাহুল্য যে, যে পক্ষই হউক, দেশহিতৈষীটা উভয় পক্ষেই পূর্ণমাত্রায় পুরা চারিপোয়া!

বস্তুত, এখন জিজ্ঞাস্য, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভা হইতে সভ্য; এবং সভ্যের যে ভাব তাহার নাম সভ্যতা। ইহাই যদি সভ্যতার প্রকৃত অর্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের ভারতীয়, আরও সংক্ষেপে ভারতীয়ের সারভূত বাঙ্গালি, জাতির অপেক্ষা সভ্য জাতি আর জগতে নাই। কারণ এত সভা সমিতির ঘটা ছটা আর কোথায় কোন জাতির মধ্যে আছে? ফলত, আমাদের মধ্যে কতকগুলির অন্তত এ জ্ঞান প্রায় একরূপ সাব্যস্ত, যে আমরা বড়ই সভ্য; আমাদের সভ্যতা, নীতি ও ধর্ম্মের তুলনায় আর কোন জাতিই আসিবার যোগ্য নহে। কিন্তু এ জ্ঞান থাকিলে কি হয়, সমাজস্থদের শ্রেণীভেদে আপনা আপনির মধ্যেই আবার ইহার বড় ইতর বিশেষ ও বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক মনশারাম মুচি সকল রকমেরই জুতা তৈয়ার করিতেছে, কিন্তু উহারই মধ্যে যেগুলি বিলাতি ঢং, তাহারা ভাবে, দেশীঢঙের বুট বড় অসভ্য; দেশী ঢঙের বুট ভাবে, নাগরা জুতা অসভ্য, নাগরা ভাবে চটি বড় অসভ্য। কিন্তু আবার পর পর ছিদ্রান্বেষী মনশামুচির তাবৎ কারিকুরীই, ফিরিঙ্গি জুতার কাঁটার ঘায়ে কোণ-ঠাসা হইয়া থাকে। হ্যাট, কোট, দাড়ি, চসমা; মাকুন্দে মুখে তিলক টিকী; লাঙ্গল কাঁদে; ইহাদের কাহাকে তবে সভ্য বলিয়া ধরিব? আবার যাহাদের অনুকরণে আমাদের মধ্যে এখন উচ্চ সভ্যতার গৌরব, সেই ফিরিঙ্গি জাতির সভ্যতা চীনের কাছে শয়তানী। অন্যদিকে চীনের আপাদ বিলম্বিত টিকি অন্যজাতির নিকট দারুণ উপহাসের পদার্থরূপে

গণিত হয়। এইরূপে, ব্যক্তি এবং জাতি সকলেই আপনাকে আপনি বড় সভ্য ভাবে, কাজেই সকলে সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া উপহাসের তুফান তুলিতে ক্ষান্ত হয় না। ব্যাপার ত এই, এখন এ সঙ্কটে সভ্য বলিয়া লইবা কাকে; আর অসভ্য বলিয়াই বা ছাড়ি কাকে? সভ্যতাই বা কোনটা, অসভ্যতাই বা কোনটা? এ সঙ্কটে, এ অস্থিরতার মধ্যে কাযেই বলিতে হয়, আপনাকে আপনি সভ্য ভাবিবার অতিরিক্তে আর কোন প্রকারে সভ্যতার পরিমাণ বা অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন স্থলে, ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যে বস্তু স্ব স্ব মনের খেয়াল ও ধারণা হেতুক উদিত ও সাব্যস্ত হয়, তাহার আবার প্রকৃত মূল্য কি হইতে পারে এবং তাহার সাধন জন্য যত্নেরই বা প্রয়োজন কি, আর কষ্ট স্বীকারেরই বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু সভ্যতা বস্তুতই কি এমনি অলীক, অসার, মূল্যের অনপেক্ষ পদার্থ?

যদি সভ্যতার স্বভাব কি এবং তাহার নিত্য পরিমাণ কি, তাহা দেখাইবার জন্য বলা যায় যে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলের জাহাজ, কল-কারখানা, ভোগবিধায়ক নানারূপ শিল্প, অথবা এক কথায় যাহা কিছু এখনকার দিনে উচ্চ সভ্যতার পরিচায়করূপে সাধারণ লোকে গণিয়া থাকে, সেই সকলই সভ্যতার স্বভাব পরিচায়ক এবং উহার নিত্য পরিমাপক হয়, তাহা হইলে স্বতই প্রশ্ন হইতে পারে, যে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ আদি, তত্তৎ যাবতীয় বিষয়, শতাব্দীর অধিক হয় নাই, এই পৃথিবীতে আবিষ্কৃত ও আবির্ভূত হইয়াছে; অতএব শতাব্দীর পূর্ব্বে কি তবে জগত অসভ্যতায় পরিপূর্ণ ছিল? বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার ও বিলাসিতার বিস্তারে সভ্যতা হইলে, তাহার প্রথম আপত্তি এই যে, যদি দ্রব্যের ব্যবহার ও বিলাসিতার ভোগ ভিন্ন অন্য পরিণাম না থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যের মত নির্ব্বোধ জন্তু আর নাই; যে হেতু সাধে সাধে অভাব বাড়াইয়া তজ্জনিত শ্রম ও দুঃখ, এক নির্ব্বোধ ভিন্ন, আর কে আকুলিত ও মোহপ্রাপ্ত হয়? অভাবের সঙ্কীর্ণতা বা বিস্তৃতি অনুসারে, ভোগ্য বস্তু অল্প এবং অধিক, উভয়েই সমান তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। তোমার মূল্যবান কাপড় না হইলে যেমন মন উঠে না; একজন কুকি তাহা দেখিলে, তেমনি অনাবশ্যক বোধে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু তোমার সেই মূল্যবান কাপড় খানি সংগ্রহ করিতে কত শ্রম, কত ক্লেশ, আরও কত

কি হইয়াছে বল দেখি? তাই বলি, কেবল ভোগ পরিণামে যে অভাববৃদ্ধি, তাহা নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বোধের কাজ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয় স্থানেও, যদি কেবল মাত্র দ্রব্যের ব্যবহার ও বিলাসিতাই সভ্যতা এবং সভ্যতা হেতুক গুরুত্বের চিহ্ন হইত, তবে বিলাসী চূড়ামণি যে, সে নগ্নবেশী পরমহংসের পদে বিনত হয় কেন। রাজেন্দ্রগণ অরণ্যবাসী ঋষির পদে শিরোলুণ্ঠন করিত কেন? ভিখারী সক্রেটিসের নিকট ঐশ্বর্য্যেশ্বর আলকিবিয়াডিস প্রমুখ গ্রীক ধনীবর্গ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল কেন? অতএব এ গুলিকেও সভ্যতার স্থায়ী পরিমাপক বলা যায় না। তোমার ধর্ম্মধারণা, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি?—তাহারাও ক্রমোত্তর গামী, যাহাদের অবলম্বনে আজি প্রাচীনকে হীন ভাবিতেছ, তাহারাও একদিন অনুরূপ কারণে অনুরূপ হীনতায় আসিয়া পড়িবে। এ হিসাবে, আমরাও উত্তর পুরুষের নিকট একদিন হীনসভ্য বলিয়া গণিত হইব।

লোকে সাধারণত যে গুলিকে সভ্যতার পরিমাপক বলিয়া গণ্য করে, তাহারই আলোচনা উপরে করা গেল, এবং ইহাও দেখা গেল যে, সে আলোচনার ফল বড়ই নিরাশকর। এ বিশ্বে যে যে পদার্থ প্রকৃত, তাহার ভাব অস্থিরও নহে, আপেক্ষিকও নহে, তাহা স্থির, নিত্য, সর্ব্বদৈশিক ও সর্ব্বকালিক, সর্ব্বদা স্বীয় অবিনশ্বর পরিমাণে পরিমিত। কিন্তু উপরে যে গুলি আলোচনা করা গেল, তাহারা ঠিক তাহার বিপরীত; সুতরাং সে গুলিকে প্রকৃত সভ্যতা ব্যঞ্জক (যদি সভ্যতা একটা প্রকৃত থাকে) বলা যাইতে পারে না; ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আপেক্ষিক সভ্যতা মাত্র বলা যাইতে পারে; এবং কিয়দংশ প্রকৃত সভ্যতার বাহ্যলক্ষণ স্বরূপও গণা যাইতে পারে। যাহা প্রকৃত সভ্যতার কিয়দংশে বাহ্যলক্ষণ স্বরূপ, তাহা স্বয়ং কখনও প্রকৃত সভ্যতা রূপে গণিত হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যে প্রকৃত সভ্যতা তবে কাহাকে বলে? যে তত্ত্ব প্রভাবে আমাদের ইহলোকে আগতি, প্রকৃত সভ্যতাও সেই তত্ত্বমূল হইতে উদ্ভূত। এই বিশ্ব ঈশ্বরের কর্ম্ম লীলা এবং আমাদের কর্ম্ম ভূমি। সেই কর্ম্মভূমিতে আমরা কর্ম্ম সম্পাদনার্থ প্রেরিত এবং সেই নিমিত্তই আমাদিগের এরূপ কর্ম্মশক্তি আছে ও আমাদের চতুঃপার্শ্বে কেবল মাত্র কর্ম্মায়োজন দেখিতে পাই। করিতেছিও আমরা কর্ম্ম, তবে কর্ম্মশক্তির পূর্ণ সার্থকতা কে কতদূর করিতেছে, না করিতেছে, সে স্বতন্ত্র কথা। বলা বাহুল্য যে,

সেই সার্থকতার তারতম্য অনুসারেই মানবে সভ্যতা অসভ্যতা হয় বা পাপ পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে।

আমরা যদিও মহাপ্রকৃতির অংশ কলা স্বরূপ, তথাপি আত্মবান্ হওয়ায়, মহাপ্রকৃতি হইতে আমাদের পৃথকত্বও পরিপুষ্ট হয়। আমাদের এই দ্বিবিধ অবস্থাহেতুক এ সংসারে আমাদের সম্পাদ্য কর্ম্মও দ্বিবিধ। যেমন একটি যন্ত্রকে সংরক্ষণ ও তাহার শক্তি বৃদ্ধিকরণ একরূপ কর্ম্ম, তাহার পর সেই যন্ত্র যোগে সম্পাদ্য কার্য্য আর একরূপ, আমাদেরও তদ্রূপ দ্বিবিধ কার্য্য। একটি আত্ম বা সংসারপক্ষে, অপরটি মহাপ্রকৃতি বা ঐশ্বরিক পক্ষে। প্রথমটি যন্ত্রপক্ষে, দ্বিতীয়টি যন্ত্রীপক্ষে। প্রথমটিতে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনার মূল আত্ম স্বার্থ; দ্বিতীয়টিতে জাগতিক স্বার্থ। এই আত্ম স্বার্থ যখন জাগতিক স্বার্থে উন্নীত হয়, তখন তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে, এবং সেই নিষ্কাম ধর্ম্মহেতুক নিষ্কাম কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। মানবের তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং কর্ম্মশীলতার নামই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বপূর্ণ মানব কখনও আত্মসর্ব্বস্ব হইতে পারে না। যদিও সর্ব্বত্র এ দুই বিভাগ পৃথক করিয়া লওয়া কঠিন, তথাপি মনুষ্য মণ্ডলীতে সর্ব্বদা এইরূপ দ্বিবিধ বিভাগে কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। আত্ম বা সংসারপক্ষে যে কার্য্য, তাহা আধিভৌতিক গুণপ্রধান, মহাপ্রকৃতি বা ঐশ্বরিক পক্ষে যাহা তাহা আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান। এ জড় সংসার আধিভৌতিকতাময়, কাজেই আধিভৌতিকের প্রাধান্য বেশী; এ জন্য আধিভৌতিকের ভিতর হইয়াই আধ্যাত্মিকের উদয় এবং আধিভৌতিকের আকাঙ্ক্ষাপূরণকে সবল করিতে পারিলেই, নানা সুযোগ হেতু, আধ্যাত্মিকের বিকাশ হইয়া থাকে। আধিভৌতিকের প্রক্রিয়া যত সহজ করিতে পারা যায় ও আধিভৌতিক আকাঙ্ক্ষাকে যত সহজে পূরণ করিতে পারা যায়, ততই আধ্যাত্মিকের প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়াতেই মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হয়। লোকে স্পষ্টত বুঝিতে পারুক বা না পারুক, প্রকৃত উন্নতি অর্থে—উহাই বুঝাইয়া থাকে।

যাহারা সর্ব্বদা আধিভৌতিক বা আত্মপক্ষীয় চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ অতি নগণ্যরূপেই হয়, বা একেবারে হয়ই না। এ কথা কি ব্যক্তি কি জাতি, উভয় সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। ইতিহাসে, বোধ হয়, অনেকেই পড়িয়াছেন এবং সভ্যতা বিষয়ক ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এইরূপ

উক্ত হইয়াছে যে, আদিতে যে সকল জাতি আহারীয় আদি সাংসারিক প্রয়োজনীতায় অগ্রে সচ্ছলতা লাভ করিয়াছিল, তাহারাই জগতে প্রথমে অভ্যুদয় লাভ করে এবং এই কথার দৃষ্টান্তস্থলে ভারত, মিসর আদি দেশ দর্শিত হইয়া থাকে। যাহাদের ভাগ্যে সেরূপ সচ্ছলতা ঘটে নাই, তাহারা তেমন শীঘ্র অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে নাই, যেমন রোমক, গ্রীক, ইত্যাদি জাতি। ইহার সহজ অর্থ এই যে, যাহার যে গুলি অভাব, সে গুলি যদি সহজে পূরণ হয়, তাহা হইলেই সে নির্ব্বিবাদে অবসরপ্রাপ্তে, কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে এবং সে কর্ম্মান্তর সাধন করিলে, উন্নতিলাভেও সমর্থ হয়। এ কর্ম্মান্তর চিন্তা প্রায়ই লোকাতীত চিন্তা এবং তজ্জনিত নীতি ও মনুষ্যত্ব লাভ। অপর, যাহার তদ্রূপ অভাব পূরণ না হওয়ায় অন্ন চিন্তা বা তথাবিধ চিন্তায় দিন যায়, তাহার উন্নতিলাভ হইবে কি প্রকারে? এখনকার দিনেও দেখ। এখনকার যেরূপ অভাব, সেইমত তৎপূরক দ্রব্যাদি পরাধীনতার বন্ধনে বা বাণিজ্য বা কল কারখানার অসুবিধা হেতু যদি না পাই, তবে চিত্ত কখনই সচ্ছন্দ ও সুস্থিরতা যুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্মান্তরে নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশ, আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্যের মধ্যে হইয়া উঠে। যতই অভিনব কার্য্যে প্রবৃত্তি ও তাহার সুসম্পাদন সাধিত হয়, ততই মানবীয় জীবনস্রোত অগ্রসর হইতে থাকে। যে মানব বা জাতিতে তাহা হয় না, তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া নানারূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে থাকে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের অবস্থা এই শেষোক্তরূপ।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে সংসাসারিক অভাবও সঙ্গে সঙ্গে বা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় কেন? যে সামান্য কয়টি অভাবের পূরণে আদিতে অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, অভাবকে সেই সীমানায় এপর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া চলিতে পারিলে ত, আমরা অপরিমিত আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম। কথা সত্য, কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটিয়া উঠে না। অভাবকে সীমা-নিবদ্ধ রাখা মহত্ত্বের কর্ম্ম। তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি পায়। এই নিমিত্তই অভাব সঙ্কোচকারী প্রাচীন ঋষিরা এতাদৃক পূজনীয় হইয়াছিলেন; এই কারণেই সক্রেটিসের পায়ে জুতা ও গায়ে শীতবস্ত্র না থাকিলেও, তিনি জগদ্গুরু। এবং এই মহত্ত্বের স্মৃতিস্বরূপ আজি পর্য্যন্ত, ধনবান বা উচ্চপদবীয় লোককে সাধারণ চাল চলনে চলিতে

দেখিলে, লোকে তাঁহাকে বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকে। অভাবের যে সীমা করে, বা অভাবের বৃদ্ধি বোধ হইলেও যে সে বোধকে নষ্ট করিতে পারে, তাহারা প্রকৃতই মহৎ। কিন্তু এ পৃথিবীতে মহতের ভাগ অতি সামান্য।

অভাবের বৃদ্ধি অনিবার্য্য, কিন্তু তাহার সমীকরণ মানুষের সাধ্য। অভাবের বৃদ্ধি অনিবার্য্য, এই জন্য যে, মানবের উন্নতি সহকারে তাহার চিত্তে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি পায়। ধারণাশক্তির যে বিকাশ, তাহা যে কেবল আধ্যাত্মিক বা সৎবিষয়েই আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে; তাহা হইলে উহার সর্ব্বজনীনতা নষ্ট হয়। অতএব আধিভৌতিক ও অসৎ বিষয়েতেও সমান বিকাশ পায়, এবং এই জন্যই আদিম অবস্থা অপেক্ষা ক্রমোত্তর উন্নত অবস্থায় অভাবের ভাগ অত্যন্ত অধিক, তদ্রূপ আদিম অবস্থা অপেক্ষা সভ্যাবস্থায় তরবতর কুকর্ম্মের ভাগও অত্যন্ত অধিক ও তাহারা নানা কৌশলময়। ফলত চিত্তের ধারণাশক্তির বৃদ্ধি সহকারে নানারূপ অভাবের যে বৃদ্ধি, তাহা অনিবার্য্য।

কিন্তু অভাবের যে সমীকরণ তাহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। সে সাধ্য দুই প্রকার, এক জ্ঞানের দ্বারা আপন প্রয়োজনকে কমান, অপর প্রয়োজন পূরণের সহজ উপায় উদ্ভাবন। প্রথমোক্তটি সম্বন্ধে, অভাবের বৃদ্ধি হওয়া বা না হওয়া উভয়েই সমান ফলে দাঁড়ায়, সুতরাং চিত্ত কর্ম্মপথে প্রধাবিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে সে কথা খাটে না; তথায় যতক্ষণে অভাবগুলি বা তাহাদের সম্ভবমত কিয়দংশ পূরণ না হয়, ততক্ষণ চিত্ত শান্তিলাভ করে না, সুতরাং অপূর্ণ অভাব হেতু চিত্ত আকুলিত থাকায়, মূল কর্ম্মপথে অবিমুক্ত ভাব অবলম্বন করে। কিন্তু সেরূপ অবিমুক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে, মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য যাহা তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। একারণে, যাহাতে মানব চিত্ত পুনর্ব্বার অভাব হইতে অবসর প্রাপ্তে কর্ম্মপথে ধাবিত হইতে পারে, তাহার অভাব রাশি যাহাতে সহজে সদুপায়ে পূরণ হইতে পারে, তজ্জন্য মানবকে আত্ম বা সাংসারিক পক্ষে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ প্রকরণ, দ্রব্য ভোগ্য ইত্যাদির উৎপাদন বা সংগ্রহ সাধন করিতে হয়। যাহারা তাহাতে সফলতা লাভ করে, বলা বাহুল্য যে, তাহারাই উন্নতির সঙ্গে সমান পদ রাখিতে সক্ষম হয়; আর যাহারা তাহা পারে না, তাহারা পিছাইয়া পড়ে, যেমন আমরা।

আমরা যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে আমাদের অভাব বোধ নাই, অভাব আছে; উপায় বোধ নাই, আকাঙ্ক্ষা আছে। অভাব পূরক পদার্থ সমুদায় যে কেবল মাত্র আমাদের সাংসারিক প্রয়োজন মাত্র পূরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে, তজ্জনিত ভাবরাশিও তথাবিধ বিষয় সকল প্রদানে মহাপ্রকৃতি বা ঐশ্বরিক পক্ষীয় কর্ম্ম সমুদয়েরও সহায়তা করে। এইরূপেই সংসার, সমাজ, আদি তাবতপক্ষীয় কার্য্য আসিয়া একত্র সুসংমিলিত হয়।

অতঃপর, উপরোক্ত বিষয়ের আমূলত পর্য্যালোচনে সঙ্ক্ষেপে এই কয়টি বিষয় দেখা যাইতেছে। মানব পৃথিবীতে কর্ম্মহেতু প্রেরিত। কর্ম্ম দ্বিবিধ, এক আত্মপক্ষে, অপর মহাপ্রকৃতি পক্ষে। আত্মপক্ষের বিষয়ীভূত নিজে স্বয়ং ও সংসার; মহা প্রকৃতি পক্ষের বিষয়ীভূত, সমাজ ও ধর্ম্ম। আত্মপক্ষীয় কর্ম্মের কর্ম্মমূল স্বার্থ বা আত্ম অভাব বোধ; মহাপ্রকৃতি পক্ষীয় কর্ম্মের কর্ম্মমূল, পরমার্থবোধ বা ঈশ্বর সকাশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি। আত্মপক্ষীয় কর্ম্মের ফল ইহলৌকিক সৌভাগ্য, মহাপ্রকৃতি পক্ষীয় কর্ম্মের ফল মনুষ্যত্ব এবং পারলৌকিক বিষয়ে শ্রেয়লাভ। এই সৌভাগ্য এবং মনুষ্যত্ব, এতদুভয়ের যুগপৎ একত্র সমাবেশ যাহা, তাহারই নাম সভ্যতা। বাল্য, যৌবন, জরা ও মৃত্যু যেমন মানবের হয় না, কেবল মানবীয় আকার বিশেষেরই হইয়া থাকে, সভ্যতারও তদ্রূপ; সভ্যতারও জাতিবিশেষের আকার বিশেষের মাত্র বাল্য যৌবন জরা মৃত্যু আদি সংঘটিত হয়। সভ্যতা-সংসারেও নব্য প্রাচীন ভেদাভেদ আছে এবং ইহাও দেখা যায় যে, নব্য যে, তাহার বয়োধর্ম্মের চটুলতা ও হাবভাব, সর্ব্বাংশেই যেন প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে হাবভাব, সে চটুলতায় ভুলিও না। আধুনিক একজন বালকের ইউক্লিডের সমস্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব কণ্ঠস্থ থাকিলেও, ক্ষেত্রতত্ত্বস্থ প্রথমাধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞা লইয়া জীবনাতিবাহক পীথাগোরাসের সঙ্গে সে কখনও সমান হইতে পারে না। এখানেও সেই সম্বন্ধ। সামান্য পুঁজিতেও যে স্বীয় সময়ের সহ সমান পদে যাইতে সক্ষম হইয়াছে, সে শ্রেষ্ঠ; বহুপুঁজি ও বহু আয়োজনেও যে সম্যক্ পারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সে অশ্রেষ্ঠ; আর যে জন পুঁজি, আয়োজন ও গতি সকলেতেই হীন, তাহারত কথাই নাই।

উপরে যেরূপ আলোচনা করিয়া আসা গেল, সভ্যতা যদি প্রকৃত তাহাই হয়, তাহা হইলে আর বলিবার আবশ্যক রাখে না যে, আমাদের

পূর্ব্ব কথিত শিক্ষিত দুই শ্রেণীস্থেরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহারা বলিয়া থাকেন, কিছুই ছিল না, তাঁহাদেরও যেমন ভুল, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, সব ছিল, তাঁহাদেরও তেমনি ভুল। এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার লাভের অঙ্ক কিছুই নাই, বরং ক্ষতির অঙ্ক অনেক, ক্ষতি পূর্ব্ব সভ্যতার অপলাপ এবং ভাবি উন্নতি পথে উদ্যম ভঙ্গ। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যেও আবার ভাল মন্দ বিচার করিতে হইলে, আমি বলি, যে যাহারা কিছু ছিল না বলে, তাহারা বরং ভাল, যে হেতু তাহাদের পক্ষে এখনও আশা, উদ্যম, অধ্যবসায়, এ সকলেরই পথ পূর্ণ ভাবে খোলা আছে, কিন্তু যাহারা বলে সব ছিল, তাহারা অধমাধম, যেহেতু তাহারা আশার পথে ও ভারত ভবিষ্যতের পথে, কাঁটা দিয়া থাকে। এ শেষোক্ত দল ভ্রান্ত এবং গোঁড়া, ভ্রান্ত এবং গোঁড়ার দ্বারা কাজের ভাগ এ জগতে অতি অল্পই হইয়া থাকে, বরং অনিষ্টের ভাগ যথেষ্ট হয়।

কিছু ছিল না বলা যদিও আপেক্ষিক ভাবে ভাল বটে, কিন্তু অনন্বিত-ভাবে দেখিতে গেলে, উহাও অত্যন্ত অনিষ্টকর। অবলম্বন ব্যতীত মানবের উদ্যম ও অধ্যবসায় অতি অল্পই হইয়া থাকে, ফলত সাধারণ মানবীয় জীবনস্রোতের অভ্যুদয় পথে অবলম্বন একটা অপরিহার্য্যরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনে সেই অবলম্বন পূর্ব্বস্মৃতি। আদিমকালে যখন মানবের পূর্ব্বস্মৃতির সত্য উপকরণের অভাব ছিল, তখনও মানব নানাবিধ ঔপন্যাসিক ইতিহাস কল্পনা করিয়া তাহার স্থান পূরণ করিয়া লইয়াছিল। উহাই আদর্শ এবং উত্তেজক—এ উভয়ের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন উহার অন্যান্য কার্য্যকারিতাও যে কত, তাহা কে গণিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীনেরা কি কি কর্ম্মফল প্রসব করিয়াছিল, ঠিক তাহাই প্রকৃত আদর্শস্থানীয় হয় না, কিন্তু তাহারা কর্ম্মপথ কিরূপ সাত্ত্বিকপ্রাণে অনুসরণ করিয়া তৎকালোচিত সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাই আদর্শস্থানীয় হয়। অষ্টরলিট্‌জ, ওয়াটরলু, ফ্রান্স জর্ম্মাণ বীরত্ব, এ সকলের সহ মারাথন বা থর্ম্মপলির ক্রিয়াকর্ম্ম কোনমতেই তুলনায় আসিতে পারে না, কিন্তু তথাপি সেই মারাথন, সেই থর্ম্মপলি, তত্তৎ বিষয়ের পূর্ণ আদর্শ ও উত্তেজকরূপে গণিত ও সম্মানিত।

যদি জাতীয় অভ্যুদয় আমাদিগের হৃদয়ের একান্ত বাসনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কিছু ছিল না, বলিলেও চলিবে না, সকল ছিল, বলিলেও চলিবে

না। প্রকৃত কি ছিল, তাহারই অবধারণে, পূর্ব্ব স্মৃতিকে কার্য্যকরভাবে সংস্থাপনা করা চাই। সেই পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হইবার এক প্রধান উপায় ইতিহাস, কিন্তু কি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বলিতে পারি না, আমাদের জাতির প্রাচীন ইতিহাস এখনও লুপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং সে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। কথিত উদ্দেশ্য তাবৎ ছাড়িয়া দিলেও, আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা কিরূপ ছিলেন, কি করিতেন, কেমন থাকিতেন, ইত্যাদি কথা জানিতে কাহার কৌতূহল ও ইচ্ছা না হয়?

পূর্ব্বস্মৃতি যত যত উপায়ে উদ্ধার হয়, তাহার মধ্যে একটি অতীব প্রধান, উপায় এই যে, অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন ও ভ্রমণান্তে যে সকল ভারত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত হইতে ভারতের প্রকৃত অবস্থার উদ্ধার করা। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে সকল বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য এবং আদরেও কিছু বেশী। তাহার কারণ, নিজের বৃত্তান্ত নিজে লিখিতে গেলে, যে পক্ষপাতিত্ব হওয়া সম্ভব হয়, বিদেশীয়ের লিখিত বৃত্তান্তে তাহা হয় না; অথবা যে সকল বিষয় অধিক পরিচিত ও সাধারণ ভাব হেতু ন-গণিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে, বিদেশীয়ের দৃষ্টিতে তাহা অতিক্রম করিতে পারে না; এবং আমাদের যে দোষ বা গুণ আমরা নিজে দেখিতে পাই না, বিদেশীয়গণ তাহা অনায়াসে দেখিতে পায়। কিন্তু গুণ যেমন এইগুলি, সেইরূপ বিদেশীয়ের লেখায় দোষও অনেক আছে, অনেক বিষয় বিদেশীয় দৃষ্টিতে দর্শিত ও বিদেশীয় ভাবে বিতাড়িত হইয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার প্রভাবে অনেক ভাল বিষয়ও মন্দরূপে দৃষ্ট, বোধিত ও বিবৃত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সেই বিদেশীয় আবরণ ভেদ করিতে পারিলে, যে খাটি সত্যের উদ্ধার হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তেমন স্থলে সমালোচক ও পাঠক উভয়েরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দূর দৃষ্টি ও বিশেষ বিবেচনা এবং গুণপনার আবশ্যক হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, যে সকল প্রাচীন বিদেশীয় লোক ভারতে আগমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক, ভারতের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত হইতে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অবস্থা উদ্ধার করা।

বিষয় ভেদে বিদেশীয়গণের লিখিত বৃত্তান্ত একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক, মূলের অনুবাদ, তৎপরে টীকা টিপ্পনী সহ তাহার ব্যাখ্যা ও সমালোচন,—এবম্ভূত প্রণালী ক্রমে, এই প্রবন্ধ অনুসৃত হইবে। আরম্ভে অবতরণিকারূপে, যে যে বিদেশীয়গণ প্রাচীনকালে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা যতদূর অবধারণ করিতে পারা যায়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্ণনা দেওয়া যাইবে। জানি না, এ কার্য্যে আমি পারগ হইব কি না; জানি না, এ কঠিন সমালোচনা ব্রতের উপযুক্ত হইব কি না?

আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ প্রকৃতির এবং এ প্রকারের বহ্বায়তন পুস্তক লেখা একরূপ বিড়ম্বনা বিশেষ,—ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান। যেখানে পাঠকের ভাগ অতি অল্প এবং বিনাপাঠে সমালোচকের ভাগই অত্যন্ত অধিক, যেখানে প্রতি চটি চাপাটি মহাগ্রন্থ, ফষ্টিনাষ্টি লেখকেরা মহাগ্রন্থকার, সেখানে এরূপ পুস্তক লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয়ত কি? বাঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিতেছে, তবে লেখ কেন,—এ ক্ষতি এ মনোক্লেশ স্বীকারের আবশ্যক? আবশ্যক আছে। লিখিতেছি, পাঠক সমালোচকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নহে। যাঁহার কৃপায় সংসারে আগতি, যাঁহার কর্ত্তৃক এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মার্থে আমি নিয়োজিত, কর্ত্তব্য পালনে যাঁহার তুষ্টিলাভ, সেই বিশ্বকর্ম্মার বিষ্ণুপ্রীতি কামার্থ লিখিতেছি। তাঁহারই অনুজ্ঞা পালনার্থে এ অনন্ত ক্ষেত্রে যথাসাধ্য বীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিণাম যাহা, তাহা কালের হস্তে অর্পণ করিলাম। অতঃপর ইহাতে অকৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা আমার; কৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া, অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক। জয় জগদীশ হরে।

জয়দেব।

জয়দেব গোস্বামী কৃত গীতগোবিন্দে বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের রাগ মার্গের কাব্যময় পরম ও চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তিমার্গের পূর্ণাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া বঙ্গে পূর্ণভক্তির অবতারণা করেন।

"জয়দেব, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,"

মহাপ্রভুর কৈশোর সাধনার প্রধান অবলম্বন ছিল। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম গূঢ়ভাবে বুঝিতে হইলে গোস্বামীকৃত গীতগোবিন্দ বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কথিত হইয়াছে, বাঙ্গালি বড় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীব, কাজেই বাঙ্গালি আপনার আরাধ্য দেবতায় সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আরোপ করিয়াছে। জয়দেবের গীতিকাব্য সেই ইন্দ্রিয়-বিলাস-লালসার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সম সাময়িক কতকগুলি গোস্বামীর চরিত্র-দোষে, ঐ সম্পূর্ণ অসার সমালোচনাও হঠাৎ সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই অধঃপতিত সমাজে অনেক স্থলেই সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভিতরের ভাব কিছুই বুঝা যায় না। এখনকার সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাস বুঝা যায় না—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ্য বা পাণ্ডিত্য কিছুই বুঝা যায় না, আর ঐ তুলসী-ত্রিকণ্ঠ তিলক-ধারী, তুরী-ভেরি খুন্তী-তন্নী-সমভিব্যাহারী, গুরু-প্রসাদী প্রসাদ-প্রার্থী গোস্বামী ঠাকুরকে দেখিয়া বাঙ্গালির বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝা যায় না। তাই বলিয়া যে, প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী, অধ্যাপক বা পণ্ডিত, বৈষ্ণব গুরু বা গোস্বামী—এক জনও নাই এমন নহে। প্রকৃত যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত নিতান্ত বিরল হইলেও এখনও পাওয়া যায়—পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা আমাদের এই পতিত জীবনেও আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ পুণ্যবান্ বলিয়া আশ্বস্ত হই।

যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সে যে আপনার আরাধ্য দেবতাকে 'মূত্রাগ', 'অতএব', 'কাজে কাজেই' ইন্দ্রিয়-পরায়ণ করিবে,—ন্যায়শাস্ত্রে এমন কথা

বলে না, ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। যে ভীরু স্বভাব, সে আপনার দেবতাকে ভীরু বলিয়া মনে করিবে? না, ভয়ানক বলিয়া মনে করিবে? যে কুকর্ম্মশীল সে আপনার ঈশ্বরকে কুকর্ম্মরত বলিয়া মনে করে, না দণ্ডপ্রণেতা বলিয়া জানে? বালক কালে পঠদ্দশায় শিক্ষাগুরুকে ভয়ে ভক্তিতে আমরা দেবস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলাম—ভাবিতাম কি, তিনি গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুড়েন, সকালে বিকালে কেবল মার্ব্বেল বটিকা লইয়া "থটিগেন্" করেন, আর অবসর পাইলেই, ঘোটকের পুচ্ছলোম লইয়া ঘুন্সী বুনেন? কৈ তাঁহাকেত আমাদের মত ভাবিতাম না।

ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ে জাতীয় বৈশেষিকত্বের কোন ছায়াই পড়ে না, এমন কথা বলি না--তবে একথা বলি বটে, যে কোন একটি জাতি চোর ধর্ম্মী হইলেই তাহাদের দেবতা চোর, তস্কর-ভাবাপন্ন হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাহারা চোর, তাহারা আপনাদের দেবতাকে মহার্ঘ স্পৃহনীয় মহাবস্তু মনে করিতে পারে,—অনপহরণীয় সামগ্রী মনে করিতে পারে,—তিনি স্বয়ং নির্লোভ হইয়া চোর বিদ্যার প্রধান ওস্তাদ, এরূপ মনে করিতে পারে,--আবার কঠোর দণ্ডনেতাও মনে করিতে পারে। ফল কথা, চোরের ঈশ্বরে বৈশিবিকত্ব থাকিলেও, সেই ঈশ্বর যে চোরধর্ম্মী হইবেই, এমন কোন কথা নাই।

আর এক কথা আছে,—এমন কথা যদি ঠিক হয়, যে, যাহাদের ঈশ্বর গোবিন্দ, তাহারা অবশ্যই গোপালন ব্যবসায়ী হইবে,—যে জাতির ঈশ্বর ননী চুরি, বস্ত্র চুরি করে, সেই জাতি অবশ্য তস্কর হইবে,—যাহাদের ঈশ্বর পূতনা-কংস-ঘাতী, তাহারা অবশ্যই নিতান্ত আত্মীয় আত্মীয়ার প্রাণ হন্তারক হইবে,—যে জাতির ঈশ্বর রাসবিহারী, তাহারা অবশ্যই নিয়ত ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইবে,--যাঁহাদের ঈশ্বর রাধা-বল্লভ, তাহারা অবশ্য কুটুম্বিনী-গামী হইবে,—যাহাদের ঈশ্বর রথের সারথ্য করে, তাহারা সকলেই সহিস্-কোচম্যানের জাতি। এইরূপ যুক্তিতে যদি সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসী, বিশেষ বাঙ্গালি, যে এক অত্যদ্ভুত পাপিষ্ঠ, কিশোরে গোপালক, এবং যৌবনে কোচম্যানের জাতি, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। আমরা যে ঐরূপ অদ্ভুত পাপিষ্ঠ জাতি, তাহা, বোধ হয়, আমাদের বৈদেশিক রাজার স্বীয় কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠার কল্যাণে, মহামতি বীম্‌স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য বাক্যে প্রমাণীকৃত হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব

ধর্ম্মাবলম্বীর অধিকাংশ কোন কালে যে আধা বয়স রাখালি, আর আধা বয়স কোচ্মানিতে কাটাইয়াছে, তাহা বোধ করি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মহাপাণ্ডিত্য বলেও প্রমাণীকৃত হইবে না।

উপাসকের অনুরূপে উপাস্য দেবতা 'গঠিত' হয়,—একথাটা নিতান্ত অসার। খ্রীষ্টান মণ্ডলী মধ্যে, কালে কালে কত নৃশংস, দুর্ব্বৃত্ত জাতি, আবার, কত নিস্বার্থ ব্রতজীবন সম্প্রদায় হইয়াছে, এখনও রহিয়াছে—কিন্তু সকলেরই উপাস্য দেবতা ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট জীবন, যুদীয় নবদেবতা—যীশু খ্রীষ্ট। কৈ বণিগ্‌বৃত্তি য়ুরোপীয়গণ তাঁহাকে কি পণ্যজীবী করিয়াছে? ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বী কসাকেরা কি তাঁহাকে সমর-ব্যবসায়ী করিয়াছে? উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ও ভাবে থাকে না।

উপাসকের চরিত্র-দোষের অনুকৃতিতে উপাস্য দেবতার প্রকৃতি গঠিত হয়;—এই মূল কথা যেমন অসার,—বাঙ্গালি চিরদিনই বড় ইন্দ্রিয় পরায়ণ জাতি,—এই বিশেষ কথাও তেমনই অসত্য। মধ্যে মধ্যে ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোন একটি জাতি বহুকাল পরাধীন থাকিলে, সাধারণত তাহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সম্যক্‌স্ফূর্ত্তি হয় না, ধর্ম্মের পরিপোষণ না হইলেই, অধর্ম্মের প্রশ্রয় হয়। দুই একটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায়, প্রাচীন জাতির বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র বা অসঙ্গত নহে। সুতরাং এখন, ভারতবাসী বহুকাল দাসত্বের পর, বড় ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়াছে, বলিলে, কথাটা সত্য হউক অসত্য হউক, এখানকার সেখানকার ইতিহাসের দোহাই দিয়া, কথাটা সম্ভবপর বলিয়া খাড়া করা যাইতে পারিত। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাঙ্গালির রাস-বিলাস-লালসার চরমস্ফূর্ত্তি বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন. কেবল এখনকার বাঙ্গালিদের উপর ঘোরতর ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আরোপ করিলে তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থল হয় না। তাঁহারা কাজে কাজেই বলেন, বাঙ্গালি জয়দেবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, বিষম বিলাসী। একথা নিতান্ত অপ্রামাণিক এবং অশ্রদ্ধেয়। জয়দেব গোস্বামী সেন রাজগণের সমসাময়িক। সেন রাজগণের সময়ে বঙ্গে হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধগণ বিদূরিত হন। শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান শ্রেষ্ঠজাতি সকল বঙ্গে পুনঃ স্থাপিত করা হয়। ব্যবসায় সংকরতা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত করিয়া জাতিব্যবসায়

প্রথা পুনঃ প্রচলিত করা হয়। ক্রমে বঙ্গের আদিমবাসী ও নবাগত শ্রেষ্ঠজাতি সকল মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, আভিজাতিক শৃঙ্খলা, ও কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয়। হলায়ুধ, পশুপতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদির আচার পদ্ধতি সুব্যবস্থিত করেন। এই সকল সুমহদ্ব্যাপারে কীর্ত্তি অকীর্ত্তি যতই কিছু থাকুক, একটি প্রদেশ ব্যাপিয়া এইরূপ ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা এবং অনুষ্ঠান যখন চলিতেছিল, তখন সেই প্রদেশ যে বিলাসিতার রঙ্গক্ষেত্র ছিল, ব্যভিচারের অধিকার ভূমি ছিল, এমন কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বল, বীর্য্য—ধনৈশ্বর্য্য—সমস্ত নগণ্য করিয়া যে জাতি, যে সময়ে, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সাত্ত্বিক সদ্গুণের অভূত-পূর্ব্ব আভিজাতিক সম্মাননা করিয়াছে, সেই জাতি সেই সময়েই বিলাসিতার পল্বলে, ব্যভিচারের পঙ্কে, নিমজ্জিত ছিল, প্রতীচীন পাণ্ডিত্য বলে, একথা প্রচারিত হয় হউক, আমরা আমাদের প্রাচীন মূর্খতায় কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইংরাজি অক্ষরে ছাপা কথা দেখিয়া আমরা অনেক বিশ্বাস করিয়াছি, এখন একটু ইতস্তত করিতেছি, তোমরা কেহ রাগ করিও না।

বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় মাধুর্য্য রসই,—সাধকের চিত্ত বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমভক্তি,—তাঁহার সহজ সাধনা; বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকাই,—প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ, এবং অনন্ত-সুন্দর-রস-শেখর শ্রীকৃষ্ণই,—অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ কেন্দ্র। এই সকল কথার এস্থলে পুনরালোচনা করিব না। এ সকলই রাগ মার্গের কথা।

আর এক দিক দিয়া, কথিত হইয়াছে যে, যে রূপেই এই রাগ মার্গের উৎপত্তি হইয়া থাকুক, জয়দেবাদি কর্ত্তৃক, এই পন্থার প্রচারে ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব গোস্বামিগণ সাধকভাবে যতই কৃতী হউন না কেন, প্রচারক-ভাবে মহা অকীর্ত্তি করিয়াছেন।

এই স্থলে ঈশ্বরের সগুণ প্রকৃতির পৌরাণিকী ব্যাখ্যার একটি মূল কথার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন। এডুকেশন গেজেটের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় লেখক বলেন, * মহাভারতকার "শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী-শক্তি মূর্ত্তিমতী

---

* ১২৯৩ সালের ১৮ই বৈশাখের এডুকেশন গেজেট দেখ।

করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী-শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশীশক্তির নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-রূপী নির্লেপ।"

নির্লেপ অর্থে নিষ্কাম বা নিরাসঙ্গ নহে। ঈশ্বর নিষ্কাম বলিলে বিশ্বের আবির্ভাব বা ঈশ্বরের অবতারণা কিছুই বুঝিতে পারি না, বরং তিনি সর্ব্ব-কাম এবং সিদ্ধকাম বলিলে, যেন একটু আধটু বুঝি বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর নিরাসঙ্গ বলিলে, সেইরূপ কিছুই বুঝি না, বরং তিনি সর্ব্বসঙ্গ এবং পূর্ণসঙ্গ বলিলে যেন কিছু আভাস পাওয়া যায়। নির্লেপ অর্থে—অপাপ-পুণ্য-বিদ্ধ, পাপ পুণ্যের সংস্পর্শাতীত।

নির্গুণ পরব্রহ্ম নির্লেপ—এ কথা অনায়াসে বুঝা যায়। কিন্তু সগুণ ঈশ্বর নির্লেপ, এ কথা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞান বলে, সাধনার শক্তিতে, হৃদয়ের ভক্তিতে, ধীরে ধীরে ধারণা করিতে হয়। য়ুদীয় পুরাণের মতে সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই নরদেব যীশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মর্ত্ত্যজীবন উৎসর্গ করেন। সুতরাং তাঁহাকে অপাপবিদ্ধ বলিলে তাঁহার অবতার নিরর্থক হয়।

হিন্দুদিগের ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রূপের। আমরা বুঝি যিনি পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা, তিনি অবশ্যই পাপ পুণ্যের অতীত। যে যুক্তি বলে ইংলণ্ডের অধি-পতিকে চিরদিনই নিরপরাধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, সেই যুক্তিবলেই আমরা জগদীশ্বরকে কেবল নিষ্পাপ বলিয়া ধরিয়া লই না—সম্পূর্ণ নির্লেপ বলিয়া বিশ্বাস করি।

কি কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু ঈশ্বরের নির্লেপবাদে বিশ্বাসবান হইয়াছে, ইতিহাস কি ভাবে সেই সকল যুক্তি হিন্দুর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে,—এ স্থলে সেই সকল আলোচনা সম্ভবে না, একটি মাত্র কথা আমরা এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

জীবাত্মার কর্ম্মফল বাদ বা অদৃষ্ট বাদের সহিত ঈশ্বরের নির্লেপ বাদ বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত। আমরা কর্ম্মফল ভোগ করি, তিনি আমা-দিগকে সেই কর্ম্মফল ভোগ করান। তিনি নির্লেপ। কিন্তু আমরা নিষ্কাম

হইলে, আমাদের কর্ম্ম-জনিত সংস্কার হয় না, কর্ম্ম-ফল থাকে না, কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। আমরা যখন কর্ম্মফল ভোগ করি, তখনও তিনি যেরূপ নির্লেপ, আমরা যখন সাধনা বলে, কর্ম্ম-ফল হইতে মুক্তিলাভ করি, তখনও তিনি সেই রূপ নির্লেপ।

জীবের এই অদৃষ্টবাদ এবং ঈশ্বরের নির্লেপ বাদ আমাদের শাস্ত্রের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত ভাবে আছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

একজন ফলভোজন করেন, অন্য জন কোন ভোগ না করিয়া, কেবল বিরাজ করেন।—এইরূপ শ্লোক অনেক স্থলেই আছে। আর,

'শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং'

এই রূপ বিশেষণ শাস্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনের সহিত অদৃষ্ট বাদ ও নির্লেপ বাদ রাসায়নিক মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া আছে।

অদৃষ্টবাদ আহ্লাদে স্থৈর্য্য, বিষাদে গাম্ভীর্য্য। অদৃষ্টবাদ আমাদের সুখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা। অদৃষ্টবাদ—কর্ম্মক্ষেত্রে নিরাশার আশ্রয় স্থল; নির্লেপবাদ—ধর্ম্মজীবনে বিশ্বাসের দাঁড়াইবার স্থল।

ঐ যে ব্রাহ্মণ-কন্যা একটি শীর্ণদেহ ক্ষীণপ্রাণ শিশু লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এবং এতদিন পরের বাড়ী পাচিকাবৃত্তি করিয়া, আশায়, আশঙ্কায়, সাবধানে, সন্তর্পণে সেই সন্তান পালন করিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে তাহাকে বি এ পাশ করাইয়াছিল,—আজি তাহার আশা আশঙ্কা সকলই নির্ম্মূল হইয়াছে। ঐ দেখ, আজি, বিসূচিকা রোগে সদ্যমৃত, সেই সন্তানের পার্শ্বে অভাগিনী কাঙ্গালিনী, শ্মশানে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছে,—

'বাছা কুড়ি বছর হলো, এমনি করে এই ঘাটে বসেছিলাম রে। বাবা—
সেবার, তোর মুখ দেখে, ঘরে ফিরে, গিয়াছিলাম রে বাপ!
আজি, কার মুখ দেখে, ঘরে যাব রে, বাবা।
অদৃষ্টে যে, এমন ছিল, তাত জানিনে রে বাপ।
বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল, তাত জানিতাম না গো।'

যে অদৃষ্টবলে আজি এই কাঙ্গালিনীর এই ঘোর নির্য্যাতন, সেই অদৃষ্টই

তাহার আজি একমাত্র অবলম্বন। দুঃখিনী বয়োভারাবনতা বিধবা আজি শোক বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ হইয়াছে, কঠোর বিধাতাকে শত বার ডাকিতেছে, কিন্তু তাঁহাতে যে পাপ স্পর্শ করিয়াছে, এমন কথা এমন দিনেও সে মনে করিতে পারে না।

সগুণ ঈশ্বরের নির্লেপবাদ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, দর্শনেও সেইরূপ অনুমিত হইয়াছে। উহা মহাভারতাদির উপাখ্যানে যেরূপ উজ্জ্বলীকৃত, অজ্ঞ, মূর্খ, নিকৃষ্ট বিশ্বাসী, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই রূপ প্রচারিত ও বিশ্বাসিত। সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করে, যে, এই বিচিত্র বিশ্বসংসার,—ইহার চন্দ্রার্ক-তারক-খচিত, সাগর-নাগ-নগর-বনভাগ-রচিত, ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই বল,—আর, সহস্র-দীপজ্বালা-প্রতিফালিত মরকতময় ময়ূর সিংহাসনস্থ পাতশাহের সহিত তাঁহার প্রতিবেশী, ঐ অন্ধকারের মহাঘোরে, জীর্ণ-বাস, শীর্ণবপু বন্দীর তুলনা করিয়া, ইহার বৈষম্য দেখিয়াই বল,—মলজীবীর সম্মার্জনী প্রতাড়িত ঐ পথের ধূলিকণা, আর সৌর আকর্ষণী আকৃষ্ট এই বিশাল অনন্ত—জড় জগতের সর্ব্বত্র, গতিক্রিয়ায় একই নিয়ম দেখিয়া, বিজ্ঞানের বিস্ময়েই চিন্তা কর,—আর মহা বিপদে পতিত হইয়া, একাগ্রচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে, অননুভবনীয় কারণে উদ্ধার লাভ করিয়া, ভক্তিভরেই আপ্লুত হও,—যে ভাবেই যখন পর্য্যবেক্ষণ কর,—এই বিচিত্র বিশ্বসংসার জগদীশ্বরের লীলাভূমি। তিনি লীলাময়, অর্থাৎ সগুণ ও সকাম হইয়াও নির্লিপ্ত ও সংস্পর্শাতীত। নির্লেপশক্তির কার্য্যে অভিব্যক্তির নামই লীলা। শাস্ত্র তাঁহার রহস্যলীলা উদ্ভেদ করে, দর্শন তাঁহার লীলা বৈচিত্র মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে, বিজ্ঞান তাঁহার নিয়ম-লীলা বিবৃত করে, পুরাণ তাঁহার অবতার লীলা উপন্যস্ত করে, ইতিহাস তাঁহার নিত্য লীলা ঘোষণা করে, বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী সংসারাতীত বৈকুণ্ঠ ধামে চিন্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিত্যলীলা, এবং বিশ্বসংসারে রসেশ্বর মূর্ত্তিতে পরাপ্রকৃতির সহিত তাঁহার ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া, আপনাদের অস্তিত্ব সার্থক করে।

সগুণ ঈশ্বরের এই নির্লেপশক্তি বা লীলাময় কার্য্যে বিশ্বাসই, হিন্দুধর্ম্মের জীবন। কিছু দিনের জন্য বৌদ্ধ সংশয়-বাদে এই বিশ্বাস হীন-প্রভ হইয়াছিল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে এই বিশ্বাস আবার উজ্জ্বলীকৃত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত করেন। বঙ্গে সেন রাজগণের সময়ে, যেমন এক দিকে বৌদ্ধ আধিপত্য বিদূরিত হইল, সেই রূপ গোস্বামী প্রভুরা লীলাগ্রন্থ সকল প্রচার করিয়া হীন-প্রভ বিশ্বাস আবার প্রভাময় করিলেন। জয়দেব

ঠাকুরের গ্রন্থ সেই উজ্জ্বল লীলারসে রসময়। পরাপ্রকৃতিতে নির্লিপ্ত সগুণ পরম পুরুষের ব্রজ-বিলাস তাই চোখে-দেখা ভাবে, কাণে-শোনা ভাষায়, সামান্য স্বভাব সঙ্গত প্রকরণে বর্ণিত।

জয়দেব বিদ্যাপতি প্রভৃতি গোস্বামীগণ কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের রাগ মার্গের গীতাবলি প্রকাশে, বাঙ্গালি বা মৈথিলি চরিত্রের কতদূর উন্নতি বা অধোগতি হইয়াছে, এক্ষণে তাহা গণনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত নহি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে এই সকল গ্রন্থ যে সাধারণের জন্য প্রচারিত হয় নাই, তাহা গোস্বামীগণ নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

ভক্তির মূলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বে বিশ্বাস একান্ত চাই। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণাতে (বৈষ্ণবী) ভক্তি চরিতার্থ হয় না। ভক্তিমান্ লোকে সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ভক্তির যেরূপ প্রধান অবলম্বন, ঈশ্বরের নির্লিপ্তিবাদ ভক্তিমানের সেইরূপ প্রথম ধারণা।

পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া বলা গিয়াছে, ঈশ্বরের এই নির্লেপশক্তি মহাভারতকার, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। পুরাণকারগণও তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছে—পুতনা, কংসাদি আত্মীয় ঘাতন, অসংখ্য গোপাঙ্গনা সনে অদ্ভুত রাসলীলা, জরাসন্ধ শিশুপালাদি নরপতিকে ছলে বলে হত্যা, সুভদ্রা দ্রৌপদীর ছলে বলে হরণ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারাবতীতে অভিনব রাজ্য সংস্থাপন, স্বদেশীয় বিদেশীয় রাজন্য শোভিত মহা-রাজসূয়-যজ্ঞ, অভিমন্যুর মহা-শোক-কর অকাল মৃত্যু, দুঃশাসনের বীভৎস মরণ, কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রিয়-ক্ষয়-কর ভীষণ সমর, প্রভাসোপকূলে সুরা-সেবনে যদুবংশ ধ্বংশ প্রভৃতি একটি যুগ মহাযুগের কাণ্ড অকাণ্ড মধ্যে, মহাভারতের, ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক মহাবিপ্লব আলোড়নের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব ঘটে মহা-ঘটকরূপে, অথচ নির্লিপ্তভাবে, ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মেরুদণ্ড সুমেরু পর্ব্বতের মত, মহা-মূর্ত্তিতে মুর্ত্তিমান। পুরাণ সকল তাঁহার লীলাবর্ণন করিয়া আপনাদিগকে চারিতার্থ করে, ইতিহাস তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য লালায়িত, ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারে না, গীতোপনিষৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র তাঁহার দোহাই দিয়া ধন্য মনে করে, কাব্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নানারসে উচ্ছ্বসিত হয়, সগুণবাদ উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া সাকারবাদে পরিণত হয়; আর, ভক্তি তাঁহার রাস-বিলাস-বিকাশ কল্পনা ও ধারণা করত, আপনাকে মহা-প্রকৃতির হ্লাদিনীশক্তির সহচরী ও সেবিকা করিয়া, কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করে।

এই জীবন্ত ভক্তিবাদের জ্বলন্ত প্রতিভায় নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদের যুক্তি-তামস ছিন্ন, ভিন্ন, বিদীর্ণ, বিদূরিত হইল। আর্য্য-ঋষিগণের উজ্জ্বলীকৃত ভারতবর্ষ, ভক্তিপ্রচারে সাধারণের পুণ্যক্ষেত্র হওয়াতে, জগতের ধন্য ধাম রূপে পরিণত হইল। সেই অনন্ত-চরণোপান্ত-চারিণী অনন্ত স্রোতস্বতী ভক্তি বাহিনী মধ্যে, একটি বা দুইটি রাজনৈতিক শুষ্ক বালুদ্বীপ দেখিয়া, এখানে, সেখানে, ওখানে, সামাজিক কালীয় হ্রদ দেখিয়া, যাঁহারা কালে শুষ্ক মরুর আশঙ্কা করিয়া নিরাশ হন, তাঁহারা ভক্তির নির্ম্মল ধারার গৌরব বুঝেন না। একবার ভগবদ্ভক্তির পূত-সলিলে ধীর মন্দ অথচ এক টানার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেখ, তুমি অনন্তের আভাস পাইবে, তুচ্ছ বালুস্তূপ উপেক্ষা করিতে দুই দিনেই, তোমার অভ্যাস হইবে।

বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য, রামানুজস্বামী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পন্থপ্রদর্শকগণ ভারতের নানা প্রদেশে ভগবানের লীলা-কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি সাধনার নানা প্রস্থান সংস্থাপন করেন, জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি বঙ্গে ভক্তি ক্ষেত্র স্থাপনা করেন। সেই ভক্তিক্ষেত্রে মহাপ্রভু মহাবীজ রোপণ করেন।

বৈষ্ণব তত্ত্বের পরিণাম-শৃঙ্খলায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাশৃঙ্খল। তবে শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তির সাকার অবতারণ, ভক্তির মহাবীজ সর্ব্বসাধারণ মধ্যে অকাতরে বিতরিত হওয়াতে, ধর্ম্মের যে লোক-ব্যাপিনী স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, জয়দেব প্রভৃতি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী গোস্বামীগণের, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কৃতিত্ব নাই। আর এখনকার গোস্বামীগণের চরিত্রগুণে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ মধ্যে, যে ব্যভিচারাদির প্রাবল্য হইয়াছে, সেই মহা-অপকীর্ত্তির ভাগীও জয়দেবাদি নহেন। মহাপ্রভুর মহীয়সী কীর্ত্তি, এখনকার 'মহাপ্রভু'দের দ্বারা যে বিড়ম্বিত হইতেছে, বিকৃত বামাচার পন্থাই তাহার মূল। বৈষ্ণবী সাত্ত্বিকী ভক্তি বঙ্গের সেই বিকৃত বামাচার ও বীরাচার, যে অনেকাংশে উপশমিত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বক্ষে বহন করিতেছে। বামাচার ব্যভিচার ক্রমশ দমনই বৈষ্ণবী ভক্তির অপূর্ব্বকীর্ত্তি। এই কীর্ত্তি যেমন মহতী, উহার সাধনাও তেমনই অনন্ত-স্থায়িনী। এই বৈষ্ণবী ভক্তিই আবার এখন, পাশ্চাত্য পিশাচাচারের দমন করিতে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গে উন্মুখিনী হইয়াছে, আইস, সকলে মিলিয়া এই পুণ্যভূমির, ধন্যধামের, সার্থকতা সম্পাদন করি।

ভক্তির লোক-ব্যাপিনী স্ফূর্ত্তি জয়দেব আদির যে লক্ষ্য ছিল না, পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, তাহা গোস্বামী গ্রন্থকারগণ পরিষ্কাররূপে বলিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বঙ্গব্যাখ্যা যদি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়, এই আশঙ্কা নিবারকরণের উদ্দেশে ব্যাখ্যাকারক গোস্বামীপাদ গ্রন্থারম্ভে অধিকারীর বিশেষ করিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, বটতলার গ্রন্থ হইতে আমরা ভাষা পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিয়া, গীত-গোবিন্দের গ্রন্থাভাস এবং অধিকারী নির্দ্দেশ দেখাইতেছি।

জয়দেব পাদপদ্মে করি যে ভকতি।
তাঁর অভিপ্রায় বুঝে কাহার শকতি?
বৃন্দাবনে সদা নিত্য লীলার স্মরণ,
শ্রীজয়দেব তাহা করিল বর্ণন।
রাগমার্গ পথিক হইবে যেই জন,
নিত্য লীলা স্মরণের সেই সে ভাজন। (পক্ষ কারণ?)
শ্রী গীত গোবিন্দ নাম, গ্রন্থ মহাসার,
সকলের শ্রবণে নাহিক অধিকার।
কেবল রসিক ভক্ত ইথে অধিকারী,
অতিগূঢ় কুঞ্জলীলা জানিবে বিচারি।

তাহার পর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায়, অধিকারী নির্দ্দেশ বিশেষরূপে আছে,—

প্রথম শ্লোকের শেষ চরণ, —

রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ কেলয়ঃ।

দ্বিতীয় শ্লোকের শেষার্দ্ধ,—

শ্রীবাসুদেব রতি কেলি কথা সমেত
মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধং।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা,—

বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্যলীলা,
জয়দেব গোস্বামী নিজ গ্রন্থে প্রকাশিলা।
রাধিকা মাধব কেলি যমুনার কূলে,
জয় যুক্ত বর্ত্তমান কাল শাস্ত্রে বলে।
রহঃ কেলি জয় যুক্ত বর্ত্তমান কাল,
ভূত ভবিষ্যত ইথে জানিবে মিশাল।

রাধা কৃষ্ণ রহঃ কেলি বস্তুর নির্দ্দেশ,
ইহার আস্বাদ নিত্য বৃন্দাবন দেশ।
এই পদ্য অর্থে সব গ্রন্থ তত্ত্ব জানি,
ইহার বিচারে উঠে অমৃতের বাণী।
যেই নিত্যলীলা কৃষ্ণ করেন বৃন্দাবনে,
পরম আনন্দ হয় যাহার বর্ণনে,—

* * * *

* * * *

আপনার উপাসনা সাধ্য জানাইল,
রাধাকৃষ্ণ বিলাস বর্ণন গ্রন্থ কৈল।
এইরূপে জয়দেব আত্মার যোগ্যতা,
রাধাকৃষ্ণ লীলাগত করিল সর্ব্বথা।
মন্দ জন গ্রন্থে না হইবে অধিকারী,
শ্রবণ অধিকারী ইথে, লিখিব বিচারি।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে একান্ত শরণ,
অন্য অভিলাস,— জ্ঞান কর্ম্ম,—বিবর্জ্জন,
ব্রজলীলা উপাসনা অনুরাগধারী,
সেই জন গ্রন্থের হইবে অধিকারী॥

অন্যত্র,—

শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য লীলা মাধুর্য্য সহিতে,
শ্রীজয়দেব কবি লাগিলা বর্ণিতে।
শ্রীগোবিন্দ ক্রীড়া সব করিছে বর্ণন,
বিঘ্ননাশ হয়, ভক্তি লাভের কারণ।
ভক্তি প্রতি, শুদ্ধ চিত্ত না আছে যাহার, (প্রতি? না প্রীতি?)
তার কভু না হইবে, ইথে অধিকার।
অসুর যতেক ছিল, ভক্তি প্রতি হেলা,
কৃষ্ণভক্তি নিন্দা, করি, মূল সহ গেলা,
অসুরের নাশ লাগি কৃষ্ণের বর্ণন,
করিলেন, জয়দেব কবি মহাজন।

উপসংহারে ,—

পরম সুধীর সব শুন ভক্তগণ!
কৃষ্ণ ভক্তি বাসিত তোমার বাক্য মন।
সদ সদ্বাক্যের কর্ত্তা সেই পরম পণ্ডিত,
শ্রীগীত গোবিন্দ গ্রন্থ যাঁহার রচিত,
তাঁর সৎবাক্য শ্লোকে দুর্ল্লভ বর্ণন,
আনন্দ সহিত তাহা করহ শোধন;
আশঙ্কা পঙ্কজ সব সুখে ধৌত করি,
নিশ্চয় করিয়া ইথে সাধন আচরি;
গন্ধর্ব্ব কলাতে কৌশল অতিশয়,
সঙ্গীত শাস্ত্রের উক্তি তাহাতেই কয়;
রস রাগ তাল গীত আদি যত করি,
তাহাতে নৈপুণ্য সব জানিবে বিচারি;
সেই নির্ব্বন্ধানুসারে করিলা বর্ণন,
আর যত আছে সব তাহার লক্ষণ;
শ্রীকৃষ্ণ ভজনতত্ত্ব সকলি লিখিলা;
বৈষ্ণবের ধ্যান বস্তুতত্ত্ব বিচারিলা,
অবতার অবতারী লিখিলা তাহাতে,
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ করিলা নিশ্চিতে।
মহাপ্রেম রসের বিচার ইথে জানি,
ব্রজলীলা পরিপূর্ণ ইহাতে বাখানি।
স্বাভীষ্ট লীলার কথা করিয়া লিখন,
উপাসনা উপদেশ করিলা বর্ণন।
নিত্যলীলা সহ গ্রন্থ বিচারি কহিলা,
সব সার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ণলীলা।
ইহাতে একান্ত ভক্ত করিবা চিন্তন,
মাধুর্য্য ভজনে লুব্ধ হয় যার মন।
কাব্যের মধ্যেতে গীত কৃষ্ণলীলা কথা,
রসলীলা কুঞ্জলীলা বিষয় এই গাঁথা।

বৈষ্ণবগণের এই সকল ব্যাখ্যায় আমরা গীতগোবিন্দ গ্রন্থের উদ্দেশ, নির্দ্দেশ কি, এবং অধিকরণ ও অধিকারীই বা কে,—তাহার অনেকটা আভাস পাই। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের রহস্য-কেলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু, তাহাতে হ্লাদিনীময়ী মহাপ্রকৃতিতে 'রসো বৈ সঃ' মহাপুরুষের নিত্য অনন্ত অবিরাম লীলা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যমুনা যম-ভগিনী; কালসহচরী। এই বিশ্ব ব্রজভূমির পাদস্পর্শ করিয়া করাল স্রোত লইয়া কাল-সহচরী নিত্য প্রবাহিতা। তাহাতে পুরুষ প্রকৃতির লীলা রহস্যময় বৃন্দাবনের মাধুর্য্যই উদ্ভাসিত হইতেছে। ভগবানের মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্য-লীলা বর্ণনই গীতগোবিন্দ। মঙ্গলাচরণ দশাবতারের জয়কীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব সূচিত এবং 'দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ' এই নমস্কার সূত্রে, তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রেমরসের বিচারে গীত-গোবিন্দ পূর্ণ। জ্ঞান. কর্ম্ম, ভক্তি—ধর্ম্মের এই তিন প্রসিদ্ধ পন্থা। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের পন্থা মুখ্যরূপে অনুসরণ না করিয়া, কেবল ভক্তি পন্থারই অনুসরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে একান্ত শরণ প্রার্থী, এবং রহস্যময় এই বিশ্ব ব্রজলীলার অনুধ্যানরূপ উপাসনা করিতে অনুরাগী, তিনিই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থের অধিকারী। জয়দেব গোস্বামী আত্মার যোগ্যতা রাধাকৃষ্ণের লীলাগত করিয়াছেন, ভক্ত যতই নিরাশঙ্কচিত্তে লীলারহস্যে প্রবেশ লাভ করিবেন, ততই, তিনি বৈষ্ণবানন্দে পরিশোধিত চিত্ত হইবেন।

সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয় শ্রীগীত গোবিন্দঃ।

একান্তমনে সাত্ত্বিকভাবে ভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলার চিন্তা করাই, অনুরাগ-পন্থ-চারী ভক্তের উপযুক্ত উপাসনা, জয়দেব গোস্বামীর গীত-গোবিন্দের এই উপদেশ।

অতএব, -জয়দেব ভণিত শ্রীব্রজলীলা গীত,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন পদ সর্ব্বজন হিত।
শ্রীচরণে সমর্পিত হয় মন যার,
সেই শ্রোতাগণে সুখ বাড়ুক অপার।

* * * *

জয়দেব ভণিত হরি চরিত সকল,
কলুষ করিয়া নাশ করুক মঙ্গল।

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } চৈত্র ১২৯৩। { ৯ম সংখ্যা।

সে কালের দারোগার কাহিনী।

৮ম ভাগ—আমরা মার খাই।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি, যে নাকাশী পাড়ার কেশবচন্দ্র রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধের দিবসে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উভয়পক্ষে বন্দুকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া কাটোয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে সেই বিষয়ের তদন্তের জন্য ঘটনা ক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, কিন্তু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রায় ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া কোনও কথা আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হওয়াতে, বিশেষ মহকুমা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল তিনি স্থানান্তর থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কাটোয়ায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

এই স্থানে আমার বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দারোগাদিগের ন্যায় আমি কোনও মোকদ্দমার তদন্তের জন্য প্রেরিত হইলে, ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইয়া অধিবাসীদিগের উপরে 'ধর মার পাকড়' করিতাম না। পূর্ব্ব দারোগারা অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিতেন, এমন নহে। অধিক সময়ে তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুমের ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কোনও পুলিস আমলার উপরে কোনও কার্য্যভার অর্পণ করিয়া

তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আদেশ করিতেন যে "দারোগা তিন (কিম্বা মোকদ্দমার গুরুত্ব বুঝিয়া সাত) দিবসের মধ্যে আসামি হাজির কিম্বা মোকদ্দমার কেনারা করে, যদি সে এই সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে সস্পেণ্ড ("কিম্বা কোনও স্থলে পদচ্যুত) বিবেচনা করিয়া, নায়েব দারোগার হস্তে শীল মোহর অর্পণ করিয়া, জবাবদিহীর নিমিত্ত হুজুরে হাজির হয়।" সুতরাং কর্তৃপক্ষের এইরূপ কড়া হুকুম দেখিয়া পুলিস আমলারা আপনাদের চাকরি রক্ষার জন্য গ্রামে পৌঁছিয়া চৌকিদার, মণ্ডল মাতব্বর এবং জমিদার প্রভৃতির উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিত। মুসলমান দারোগা হিন্দুর গ্রামে যাইয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুর অখাদ্য জীব সকল জবাই এবং হিন্দুর অস্পর্শীয় দ্রব্য সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিত, যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইত, তাহাকে ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দিত এবং চৌকিদার ও মণ্ডলকে মনের সাধ মিটাইয়া প্রহার করিত। এদেশে এমনও সময় ছিল, যখন পুলিসের আগমনে গ্রাম জন শূন্য হইয়া পড়িত। গ্রামবাসীরা পুলিসের অত্যাচারের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত এবং কখনও কখনও হাট বাজার বন্ধ হইয়া যাইত। পুলিসের এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিদার কিম্বা অধিবাসীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিবাদ করিলে তিনি তাহাতে প্রায়ই কর্ণপাত করিতেন না, অধিক হইলে দারোগার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং দারোগা সাহেবকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত, যে এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে, মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হওয়া, তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পুলিস আমলার অত্যাচারে প্রায়ই তাহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল উৎপত্তি হইত, কারণ ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে, যে গ্রামস্থ লোকের আন্তরিক সাহায্য ভিন্ন পুলিস আমলা কোন কথাই জানিতে পারে নাই সে স্থলে তাহাদিগকে যতদূর মিত্রভাবে রাখা যাইতে পারে, ততই পুলিস আমলার মঙ্গলকর কার্য্য হইত, কিন্তু দারোগারা তাহার বিরুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক সময় বিঘ্ন উপস্থিত করিত। আমিও দারোগা হইয়া অনভিজ্ঞতা বশত, প্রথমাবস্থায় অধীন কর্ম্মচারিদিগের কুপরামর্শে উপরি-উক্তরূপে কার্য্য করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল না দেখিয়া, আমার চক্ষু ফুটিল এবং উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে আরম্ভ

করিলাম। যত অল্প সংখ্যায় অধীন কর্ম্মচারীগণকে সঙ্গে লইয়া গেলে কার্য্য চলিতে পারে, তাহাই লইয়া নিস্তব্ধে গ্রামে উপস্থিত হইতাম এবং একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাসা করিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইতাম। প্রথম কয়েক দিবস কোনও ব্যক্তির নিকট মোকদ্দমার কিছুমাত্র উল্লেখ করিতাম না। যে দুই একজন বরকন্দাজ সঙ্গে থাকিত তাহাদিগকে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে পুলিসের চাপরাস এবং উষ্ণীষ পরিধান করিতে এবং অধিবাসীদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিতাম। ফলে, গ্রামে যাইয়া পুলিস আমলার ন্যায় কিছুমাত্র ব্যবহার করিতাম না। গ্রামের কোনও অধিবাসীর একজন আগত কুটুম্বের ভাবে কার্য্য করিতাম। এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার উদ্দেশ্য সাধনের কোনও ব্যাঘাত হইত না। ফলে আমার মনে পড়ে না যে কেবল একটি মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে, আমায় কখনও অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার এই মোকদ্দমা তদন্ত করার নিমিত্ত কাটোয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিয়া, নাকাশীপাড়াতে জমিদারেরা উপস্থিত থাকিলে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার আশঙ্কায়, তাঁহাদিগের সকলকে নাকাশীপাড়া হইতে স্থানান্তর করার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে নিজের কাছারীতে হাজির রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে নাকাশীপাড়ায় পাঠাইবার সময়ও, সেই হুকুম বলবৎ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ জমিদার বাবুদিগের সহিত আমার উত্তম আলাপ পরিচয় ছিল, বিশেষত তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রদিগের সহিত আমার বন্ধুত্বই ছিল। এইরূপ সম্প্রীতি হওয়ার কারণ এই যে, কোতয়ালী থানার দক্ষিণ অতি নিকটে কৃষ্ণনগর সহরে নাকাশীপাড়ার জমিদার বাবুদিগের বাসাবাড়ী ছিল, সুতরাং সর্ব্বদা বাবুদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার গতিকে, আমার সহিত তাঁহাদের অনেকের সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আমার উপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার মোকদ্দমার তদন্তের ভার অর্পণ করিয়াছেন শুনিয়া, বাবুদিগের মধ্যে আমার বন্ধুরা অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন এবং আমি নাকাশীপাড়ায় যাইয়া তথায় যতদিন অবস্থিতি করিব, আমার আহারাদির কোন ক্লেশ

না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের নাকাশীপাড়ার কর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রদের এইরূপ অনুগ্রহ পূর্ণ ব্যবহারের ফলে, আমার বিস্তর উপকার হইয়াছিল, নচেৎ কাটোয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইত।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি দুই এক দিবসের মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে মধ্যাহ্নের পর যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮। ৯ ঘণ্টার সময় নাকাশীপাড়ায় পৌছিলাম। দেখিলাম, যে এক মাঠের মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের তাম্বু স্থাপিত রহিয়াছে। অন্ধকার, লোক জনের কোন শব্দ নাই, কেবল একটি ভাঙ্গা দেশী লাণ্ঠানের মধ্যে একটি মাটির প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার সম্মুখে এক খানা কেদারা চৌকীর উপরে, একজন আধ-বুড়া সাহেব উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার পরিচয় দিয়া তাঁহার হস্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র দিলাম। বহু কষ্টে সেই প্রদীপের আলোকে তিনি পত্রখানা পাঠ করিয়া চৌকী হইতে উঠিয়া, আমার মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন যে "বাবু পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, তাহা তোমাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। দেখ আমার অবস্থা কি শোচনীয়, এই স্থানের জমিদার বাঙ্গেলেরা এক যোট হইয়া আমাকে প্রাণে মারিবার রকম করিয়া তুলিয়াছে। অদ্য ৮ দিবস ধরিয়া আমার আহারের যথোচিত দ্রব্যাদি যুটাইতে পারি না। মুর্গী কিম্বা অন্য প্রকার মাংস পাওয়া কথা দূরে থাকুক, চা খাইবার জন্য এক ছটাক দুগ্ধ কিম্বা প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটু তৈল পাইবার উপায় নাই। দোকানদারেরা আমার লোক জনকে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না। বিক্রয় করিতে অস্বীকার, করিতে সাহস করে না, কারণ তাহা হইলে তাহারা জানে যে আমি তাহাদিগকে দণ্ড করিব কিন্তু দ্রব্য চাহিলে, তাহা তাহাদের দোকানে নাই বলিয়া, আমার লোককে প্রতারণা করে। কল্য সন্ধ্যার পরে তৈল অভাবে বাতী জ্বালাইতে না পারিয়া, সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে কাটাইয়া ছিলাম, অদ্য আমার চাপরাসী এক জনের নিকট ভিক্ষা করিয়া একটু তৈল আনিয়াছে, তাহাতেই এই প্রদীপটি এতক্ষণ জ্বলিতেছে। যে মোকদ্দমা তদন্ত করিতে আসিয়া-

ছিলাম, তাহা গোপন করার জন্য জমিদারদিগের দুই পক্ষেরই সমান চেষ্টা এবং এখানকার লোকে কেহ তাহাদের ভয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। একে ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদিও দুই এক জন ইতর লোকের সহিত দেখা হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে যে, তাহারা কিছুই অবগত নহে। এক্ষণে এগিযেট সাহেব তোমাকে পাঠাইয়া দিযাছেন, তুমি যাহা জান তাহা কর, আমি চলিলাম; আমি আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এখানে বিলম্ব করিব না।” বলিয়া তিনি বহু কষ্টে কাহার সংগ্রহ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হিউএট সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। ভাবিলাম যেস্থলে, একজন সাহেব ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেটকে এইরূপ পরাস্ত হইতে হইল, তখন আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী দারোগা আর অধিক, কি করিতে পারিব? যাহা হউক, সেই রাত্রে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে অবস্থিত করিলাম এবং চিন্তা করিয়া দেখিলাম, যে নিজ নাকাশীপাড়া গ্রামে থাকিয়া তদন্তের সুবিধা করিতে পারিব না। হিউএট সাহেবের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিতে হইবে। নিকটে যে গ্রামে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকার নাই, এমন স্থানে থাকিতে পারিলে সুবিধা হওয়া সম্ভাবনা, কিন্তু তেমন স্থান কোথায়? অনুসন্ধানে জানিলাম, যে নাকাশীপাড়ার অনতিদূরে বিল্লগ্রাম নামক একটি গ্রাম আছে, তাহাতে বাবুদিগের অধিকার নাই কিন্তু অধিবাসীদিগের উপরে কিছু প্রভুত্ব না আছে, এমন নয়। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়ী এবং ইহাতে অনেক ভদ্র ব্রাহ্মণের বাস। অতএব এই স্থানটি মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া, তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে স্থির করিলাম এবং পরদিবস প্রাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির বহির্বাড়ীতে যাইয়া বাসা সংস্থাপন করিলাম। চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রদিগের কল্যাণে হিউএট সাহেবের ন্যায় আহারাদি সম্বন্ধে আমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইল না, আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই আমারা ইচ্ছামতে পাইতাম।

এইরূপে বিল্লগ্রামে থাকিয়া আহারের সময় আহার করি এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাই এবং দুই বেলা নাকাশীপাড়া যাইয়া বাবুদিগের কর্ম্মচারী-

না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের নাকাশীপাড়ার কর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রদের এইরূপ অনুগ্রহ পূর্ণ ব্যবহারের ফলে, আমার বিস্তর উপকার হইয়াছিল, নচেৎ কাটোয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইত।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি দুই এক দিবসের মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে মধ্যাহ্নের পরে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮। ৯ ঘণ্টার সময় নাকাশীপাড়ায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, যে এক মাঠের মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের তাম্বু স্থাপিত রহিয়াছে। অন্ধকার, লোক জনের কোন শব্দ নাই, কেবল একটি ভাঙ্গা দেশী লাণ্ঠানের মধ্যে একটি মাটির প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার সম্মুখে এক খানা কেদারা চৌকীর উপরে, একজন আধ-বুড়া সাহেব উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার পরিচয় দিয়া তাঁহার হস্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র দিলাম। বহু কষ্টে সেই প্রদীপের আলোকে তিনি পত্রখানা পাঠ করিয়া চৌকী হইতে উঠিয়া, আমার মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন যে "বাবু পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, তাহা তোমাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। দেখ আমার অবস্থা কি শোচনীয়, এই স্থানের জমিদার বাঙ্কেলেরা এক যোট হইয়া আমাকে প্রাণে মারিবার রকম করিয়া তুলিয়াছে। অদ্য ৮ দিবস ধরিয়া আমার আহারের যথোচিত দ্রব্যাদি যুটাইতে পারি না। মুর্গী কিম্বা অন্য প্রকার মাংস পাওয়া কথা দূরে থাকুক, চা খাইবার জন্য এক ছটাক দুগ্ধ কিম্বা প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটু তৈল পাইবার উপায় নাই। দোকানদারেরা আমার লোক জনকে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না। বিক্রয় করিতে অস্বীকার, করিতে সাহস করে না, কারণ তাহা হইলে তাহারা জানে যে আমি তাহাদিগকে দণ্ড করিব কিন্তু দ্রব্য চাহিলে, তাহা তাহাদের দোকানে নাই বলিয়া, আমার লোককে প্রতারণা করে। কল্য সন্ধ্যার পরে তৈল অভাবে বাতী জ্বালাইতে না পারিয়া, সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে কাটাইয়া ছিলাম, অদ্য আমার চাপরাসী এক জনের নিকট ভিক্ষা করিয়া একটু তৈল আনিয়াছে, তাহাতেই এই প্রদীপটি এতক্ষণ জ্বলিতেছে। যে মোকদ্দমা তদন্ত করিতে আসিয়া-

ছিলাম, তাহা গোপন করার জন্য জমিদারদিগের দুই পক্ষেরই সমান চেষ্টা এবং এখানকার লোকে কেহ তাহাদের ভয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। একে ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদিও দুই এক জন ইতর লোকের সহিত দেখা হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে যে, তাহারা কিছুই অবগত নহে। এক্ষণে এলিয়েট সাহেব তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি যাহা জান তাহা কর, আমি চলিলাম; আমি আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এখানে বিলম্ব করিব না।” বলিয়া তিনি বহু কষ্টে আহার সংগ্রহ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হিউএট সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। ভাবিলাম যেস্থলে, একজন সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এইরূপ পরাস্ত হইতে হইল, তখন আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী দারোগা আর অধিক, কি করিতে পারিব? যাহা হউক, সেই রাত্রে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিলাম এবং চিন্তা করিয়া দেখিলাম, যে নিজ নাকাশীপাড়া গ্রামে থাকিয়া তদন্তের সুবিধা করিতে পারিব না। হিউএট সাহেবের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিতে হইবে। নিকটে যে গ্রামে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকার নাই, এমন স্থানে থাকিতে পারিলে সুবিধা হওয়া সম্ভাবনা, কিন্তু তেমন স্থান কোথায়? অনুসন্ধানে জানিলাম, যে নাকাশীপাড়ার অনতিদূরে বিল্লগ্রাম নামক একটি গ্রাম আছে, তাহাতে বাবুদিগের অধিকার নাই কিন্তু অধিবাসীদিগের উপরে কিছু প্রভুত্ব না আছে, এমন নয়। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়ী এবং ইহাতে অনেক ভদ্র ব্রাহ্মণের বাস। অতএব এই স্থানটি মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া, তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে স্থির করিলাম এবং পরদিবস প্রাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির বহির্বাড়ীতে যাইয়া বাসা সংস্থাপন করিলাম। চন্দ্রমোহন বাবুর পুত্রদিগের কল্যাণে হিউএট সাহেবের ন্যায় আহারাদি সম্বন্ধে আমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইল না; আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই আমারা ইচ্ছামতে পাইতাম।

এইরূপে বিল্লগ্রামে থাকিয়া আহারের সময় আহার করি এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাই এবং দুই বেলা নাকাশীপাড়া যাইয়া বাবুদিগের কর্ম্মচারী-

দিগের সহিত আলাপ করি এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুক হস্তে করিয়া এগ্রামে ওগ্রামে ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষী মারিয়া বেড়াই। পক্ষী শীকার করা কেবল উপলক্ষ মাত্র, নির্জ্জনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মুখে মোকদ্দমার কোন কথা আবিষ্কার করিতে পারি কি না, তাহারই চেষ্টা করি। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। দেখিলাম যে আমরা কে কি করি, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাবুদিগের গুপ্তচর নিয়ত আমাদের অদৃশ্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। আমি বিল্বগ্রাম হইতে বাহির হইলেই একজন লোক ছদ্মবেশে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইত। কোন কর্ম্মই আমি ঐ সকল চরকে গোপন করিয়া করিতে পারিতাম না এবং যদি ও অকস্মাৎ দুই এক ব্যক্তির সহিত নির্জ্জনে দেখা হইত, তথাপি তাহাতেও কিছু ফল হইত না, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলে একভাবে উত্তর করিত যে তাহারা কিছু দেখে নাই, শুনে নাই এবং জানে না। অধিক ব্যস্ত করিলেও, তাহারা এইমাত্র বলিত, "যে আমাকে মাপ করুন, ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ কোন কথা বলিতে কোন কথা বলিয়া অবশেষে বাবুদিগের কোপে পড়িব, সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমার এদেশে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিবে।" আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বেহারারা ছিল কিন্তু কখনও আবশ্যক হইলে, সেই স্থানের কাহার আনিয়াও কর্ম্ম চালাইতাম। এক দিবস একস্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একজন বেহারাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে "আপনি যদি আমাদি-গকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমরা আর আপনার ডাকে আসিব না এবং আপনার পাল্কীও স্কন্ধে করিব না।" নাকাশী-পাড়ার জমিদারদিগের একদলের দর্পে রক্ষা নাই, তাহাতে তাহারা দুইদল একত্র হইয়া যোট বদ্ধ হইলে যে কি প্রমাদ এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা যে পুলিসের পক্ষে কত দুরূহ কার্য্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। আমি এই সকল বিষয় এলিয়ট সাহেবকে লিখিয়া অবগত করাতে তাঁহার আরও জেদ বাড়িল। আমাকে নিরুৎসাহী হইতে নিষেধ করিয়া যতকালে এবং যে প্রকারে হয় এই ঘটনার যথার্থ আবিষ্কার করিতে লিখিলেন এবং সেই সময় অগ্রদ্বীপ থানার দারোগা-পদ খালী হওয়াতে, তিনি আমার অনুরোধ মতে কোতওয়ালী থানার নায়েব দারোগা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমার

নিকট থাকিয়া তাঁহার নিজ থানার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে এবং তদতিরিক্ত আমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই স্থানে বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আমার আবশ্যক, কারণ ইনিই এই মোকদ্দমার চরম অবস্থা পর্য্যন্ত আমার সহিত ব্রতী ছিলেন, এবং তাহাতে আমাদের যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহার অধিক ভাগ বৈদ্যনাথেরই ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ উলা গ্রামের দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের বংশোদ্ভব, কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু ইঁহার পুলিস আমলার উপযুক্ত প্রখর বুদ্ধি ছিল। বৈদ্যনাথ গৌরবর্ণ, দেখিতে সুন্দর এবং তাঁহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় বলবান পুরুষ ছিলেন। বয়সে আমার অপেক্ষা বৈদ্যনাথ অল্প বয়স্ক ছিল এবং সেই জন্য আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। বৈদ্যনাথ চরমে নূতন পুলিসের ডিটেকটিব বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ আর এইক্ষণে নাই, পরলোক গমন করিয়াছে।

বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার সহিত যোগ দেওয়াতে আমার উৎসাহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল কিন্তু আমরা দুই জন প্রায় দুই মাস নাড়াচাড়া করিয়া ধরিয়া কিছুমাত্র করিতে পারিলাম না। তথাপি এলিয়ট সাহেবের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি প্রত্যেক পত্রে আমাকে সাহস্ফূর্ত্তার সহিত কার্য্য করিতে আদেশ করিতেন এবং এক পত্রে লিখিলেন যে "আমি তোমাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ায় রাখিয়া দেখিব, তথাপি কি তুমি কিছু করিতে পারিবে না?" লোকে বলিয়া থাকে যে "লেগে থাকিলে মেগে খায় না"। এই কথা নিতান্ত সত্য, কারণ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে গোটপাড়ার নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পাটুলী নামক একখানি গ্রাম আছে এবং তাহাতে কয়েক ঘর কীর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা ধনাঢ্য লোকের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তাহাদের কয়েক জন কীর্ত্তনীয়া কেশব বাবুর শ্রাদ্ধে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল এবং আদ্যোপান্ত সকল অবস্থা অবগত আছে। আমরা এমনও শুনিলাম যে ঐ সকল কীর্ত্তনীয়াদের দুই এক জনের শরীরে বন্দুকের গুলি লাগিয়া আঘাতিত হইয়াছিল! পাটুলী গ্রাম নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত নহে এবং পাটুলীর এক জন

স্বতন্ত্র ধনাঢ্য জমিদার আছে, কিন্তু ঐ গ্রাম আমাদের কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত নহে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। অতএব ভিন্ন জেলার পুলীসের সহায়তা না লইয়া তাহাতে কার্য্য করিতে গেলে, নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ কীর্ত্তনীয়ারা যদি একবার জানিতে পারে, যে আমরা তাহাদিগকে ধরিবার উদ্যোগে আছি, তাহা হইলে তাহাদিগের দেখা পাওয়া কঠিন হইবে, এবং নাকাশীপাড়ার বাবুরাও তাহাদিগকে বশীভূত এবং স্থানান্তর করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় আমরা পাটুলী যাইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই সংবাদ জানাইলাম। কয়েক দিবস পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, যে তিনি আমার পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লেখাতে তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব এলিয়ট সাহেব একটি দিন অবধারণ করিয়া আমাকে লিখিলেন যে সেই দিবস তিনিও বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট পাটুলীর অনতিদূর দক্ষিণে সাবী সাহেবের এক নীলকুঠীতে উপস্থিত থাকিবেন এবং আমাদিগকে সেই তারিখে পাটুলী যাইয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে সংগ্রহ করিতে এবং তাঁহাদিগকে সেই কুঠীতে সংবাদ দিতে আদেশ করিলেন।

অবধারিত দিবসের রাত্রি থাকিতে গোটপাড়ায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার উপলক্ষে সঙ্গে চারি জন বরকন্দাজ লইয়া আমি এবং বৈদ্যনাথ বিল্লগ্রাম হইতে নিস্তব্ধে বাহির হইয়া বেলা ৮। ৯ ঘণ্টার সময় পাটুলী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাটুলীর বাজার খোলায় পাল্কী বেহারা ও বরকন্দাজদিগকে রাখিয়া আমরা দুই জন দারোগা কীর্ত্তনীয়ারা যেস্থানে বাস করে সেইস্থানে ছদ্মবেশে গমন করিলাম। ভাগীরথী নদী পার হওয়ার পরেই আমরা বরকন্দাজদিগের চাপরাস ও উষ্ণীশ গোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলাম যে পাটুলীর বাজারে উপস্থিত হইলে কেহ আমাদিগকে পুলীশ আমলা বলিয়া বুঝিতে না পারে। কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদের আলয়ে যাইয়া বলিলাম, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ী হইতে আসিতেছি, সেখানে এবার অতি সমারোহ পূর্ব্বক দোল-যাত্রা হইবে অতএব পাটুলীর কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদিগের প্রশংসা শুনিয়া আমরা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে ও বায়না দিতে আসিয়াছি।" দোলের বায়নার কথা শুনিয়া সকল কীর্ত্তনীয়ারাই স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যৎপরোনাস্তি

আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের দুইজনকে তাহাদের বাহির বাড়ীতে বসাইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, যে কেশব বাবুর শ্রাদ্ধে অনেক গরদের ধুতি বিতরিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে একজনের পরিধানে এক খানা গরদের ধুতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এত দেখি কেশব বাবুর শ্রাদ্ধের গরদের ধুতি, আপনারা সেই কাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন না কি?" কীর্ত্তনীয়ারা সকলে একত্র উত্তর করিল যে, "হাঁ সরকার মহাশয় গরদ পাইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাণ লইয়া আমরা যে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম, সে কেবল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবল ও কৃষ্ণের ইচ্ছা।" তাহার পর, তাহাদের মধ্যে একজনের বুকের নামাবলি খুলিয়া একটা চিহ্ন দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন সে দিনের দুর্গতি।" আমি যেন কিছুই জানি না,—এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে শ্রাদ্ধে আবার দুর্গতি কি?" উত্তর "দুর্গতির কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে আছে, সরকার মহাশয় তুমি কি কিছুই শুন নাই যে, সেই শ্রাদ্ধে বন্দুক দিয়া গুলি মারামারি হইয়াছিল।" প্রশ্ন "সত্য নাকি, যথার্থই কি এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আপনারা কি তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন?" উত্তর "হাঁ আমরা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং গুলি মারামারি চক্ষে দেখিয়াছি।" প্রশ্ন "আপনারা সেই কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া কি করিলেন?" উত্তর "কি আর করিব? ইহাঁর গায়ে গুলি লাগিবা মাত্র, আমরা যে যেমতে পারিলাম পলাইয়া বাড়ী আসিলাম এবং তাহার দুই তিন দিবস পরে, নাকাশীপাড়ায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।" প্রশ্ন "এত দেখি অতি আশ্চর্য্য কারখানা! আর কখনও এমন শুনি নাই, আপনাদের যে সকলের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল তাহাই যথেষ্ট ভাগ্য বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, রজপুতের কাণ্ড লইয়া আমাদের মাথা ব্যথা করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে আমাদের সঙ্গে চলুন, বাজার খোলায় আমাদের বাসাতে আর একজন কর্ত্তা আছেন, তাঁহার সহিত আপনাদের কথা বার্ত্তা হইলে আপনারা বায়না পাইতে পারিবেন।" এইরূপ কৌশল করিয়া আমরা তাহাদের ৮।১০ জনকে কথা কহিতে কহিতে, বাজার-খোলায় আনিয়া আমাদের বাসা ঘরের মধ্যে বসাইয়া ব্যক্ত করিলাম যে "দোলের বায়না দেওয়ার কথা মিথ্যা, আমরা কৃষ্ণনগর জেলার পুলিশ-দারোগা, আপনাদের [illegible]নবন্দী লওয়ার জন্য আপনা-

দিগকে এখানে আনিয়াছি; অতএব যে পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আগমন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে।” আমার এই কথা শুনিয়া কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদের প্লীহা চম্‌কিয়া গেল, সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম যে, “আপনাদের কিছু চিন্তা নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি নিকটেই আছেন তিনি আসিয়া আপনাদের জবানবন্দী লিখিয়া লইলেই, আপনারা স্ব স্ব গৃহে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। উত্তর “আর মশাই পরমানন্দ, আপনি যে পরমানন্দ দেখাইলেন, তাহা আর মরিলেও ভুলিব না; আমাদের কোনও পুরুষে যাহা কখনও না হইয়াছিল, তাহা আজ আপনাকে দিয়া হইল।” অর্থাৎ সাক্ষী দেওয়া!! এ দিকে আমি কীর্ত্তনীয়াদিগকে লইয়া বাজার-খোলায় পৌছিবার পূর্ব্বেই পথ হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত গোপনে একজন বরকন্দাজকে সেই নিলকুঠিতে পাঠাইয়াছিলাম। সাক্ষীরা বাজারে আসিবার প্রায় ৪ ঘণ্টার পরে অর্থাৎ বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময় ঝড় ও শিলা-বৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই শিল ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া এলিয়ট সাহেব এক অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের একখানা পাল্কীর ছাদে মেজ করিয়া তাহার উপরে কাগজ রাখিয়া উপস্থিত কীর্ত্তনীয়াদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিলেন। পরে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণনগরে তলব মতে হাজীর হওয়ার নিমিত্ত, পাঁচ পাঁচ শত টাকার মুচলেকা লইয়া বিদায় হইলেন। আমরাও মহা আনন্দে বিল্লগ্রাম প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যদি এই স্থানে মোকদ্দমায় তদন্ত সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে সকল কুল রক্ষা হইত। অভাবনীয় প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবও সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদেরও কোন বিঘ্ন হইত না। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া ভর করিলেন। আমরা এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নাচিয়া উঠিলাম, মনে করিলাম যে আমাদের অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব এবং বাবুদের পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। সত্য কথা বলিতে কি, পরিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৈদ্যনাথেরই বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। সে নূতন দারোগা হইয়া এই মোকদ্দমার

তদন্ত ভালরূপে সমাপ্ত করিতে পারিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যদিও আমার মনে মনে শীঘ্র কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিবার সম্পূর্ণ বাসনা হইয়াছিল, তথাপি বৈদ্যনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমি লজ্জায় আর তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৈদ্যনাথ এক দিবস কোথা হইতে সংবাদ আনিল, যে নাকাশীপাড়ার নিকট পলাসডাঙ্গা নামক গ্রামে বাবুদিগের সংসারের দুইজন পুরাতন কায়স্থ কর্ম্মচারী আছে, যাহারা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং প্রাণান্তে মিথ্যা কথা কহে না। তাহাদের নাম আমি এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছি, বোধ হয় তাহাদিগের "সরকার" পদবী ছিল; সে যাহা হউক এই প্রবন্ধে আমি তাহাদিগকে সরকার বলিয়াই উল্লেখ করিব। বৈদ্যনাথের বিশ্বাস যে এই সরকার দুইজনকে কোনও প্রকারে উপস্থিত করিতে পারিলে, মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত যথার্থ বিবরণ আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু আমাদিগের নাকাশী পাড়ায় আগমনের পর পর্য্যন্ত এই দুই ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় গৃহ মধ্যে গোপনভাবে রহিয়াছিল। পূর্ব্বকার ন্যায় তাহারা এক্ষণ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যায় না এবং বহির্বাড়ীতেও কচিৎ আসে। এমন অবস্থায় থানাতল্লাসী ভিন্ন তাহাদিগকে ধরিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া বৈদ্যনাথ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমি একত্র হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলাম। দেখিলাম, যে এলিয়ট সাহেবও বৈদ্যনাথ হইতে বড় কম উদ্যমশীল নহেন। কীর্ত্তনীয়াদিগের প্রদত্ত প্রমাণে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, আরও প্রমাণ পাওয়ার অভিলাষী ছিলেন। আমাদের উপরি উক্ত রিপোর্টের উত্তরে তিনি তল্লিখিত মর্ম্ম অনুকরণ করিয়া, থানাতল্লাসীর দ্বারা সরকারদিগকে হাজির করার হুকুম-যুক্ত এক পরওয়ানা আমাদিগের প্রতি জারি করিলেন। এই হুকুমটি অতি অন্যায় হুকুম এবং আইন বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা বোধ হয় এলিয়ট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে কখনই ঐরূপ হুকুম দিতেন না। আমরা পুলিস আমলা, আপন নিষ্কৃতি এবং অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত থানাতল্লাসীর দ্বারা সাক্ষী ধরিবার প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাহাতে কেহ আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষে তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু সে কালে আইনে অধিকার

প্রায় সকলেরই সমান ছিল এবং মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের এই হুকুমটি অন্যায় বলিয়া কাহারও অনুধাবন হয় নাই। সে যাহা হউক, এতদিন আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বসিয়াছিলাম দেখিয়া নাকাশী-পাড়ার বাবুরা হর্ষযুক্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু যে দিবস আমরা পাটুলীর কীর্ত্তনীয়াদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলাম সেই দিবস হইতে তাঁহাদের মনে আশঙ্কার উদয় হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে ইহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে দূরীকৃত করিতে না পারিলে, আরও না জানি, কোন্ সর্ব্বনাশ এবং কোন স্থান হইতে আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিবে। এইজন্য তাঁহারা, বিশেষত সর্ব্ব ও ঈশান বাবু দ্বয় আমাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া যাহাতে আমরা নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে কর্ম্মচারিদিগের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কর্ম্মচারী দিগের চেষ্টা বৃথা হওয়াতে, সর্ব্ব বাবু নাকি তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "যদি অন্য রূপে ফল না হয়, তাহা হইলে দারোগা-দিগকে উত্তম মধ্যম ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিবে।" এই হুকুম পাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত বাবুদিগের কর্ম্মচারীরা অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা পাইয়া উঠে নাই। খানাতল্লাসীর পরওয়ানা পাওয়ার পরে আমরাই আমাদের কার্য্য দ্বারা সেই সুযোগ ঘটাইয়া দিলাম। ঐ পরওয়ানা লইয়া এক দিবস অনেক রাত্রি থাকিতে আমি এবং বৈদ্যনাথ পাল্কী করিয়া আমাদের সকল বরকন্দাজগুলিকে সঙ্গে লইয়া পলাসডাঙ্গায় যাইয়া সরকারদিগের বাড়ী ঘের দিলাম। সূর্য্যোদয় পরে যথারীতি মতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সাক্ষী-দিগের দেখা পাইলাম না। এই কার্য্যে আমাদিগের প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। খানাতল্লাসীর পরে আমরা অন্দর-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, বাহির বাড়ীর দুর্গামণ্ডপের সম্মুখস্থিত দাঁড়ঘরাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম এবং নাকাশীপাড়া হইতে বাবুদিগের এক জন কর্ম্মচারী আনাইয়া, তাহার সম্মুখে, আমরা খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্থিত কোন দ্রব্য অপচয় কিম্বা অপহরণ করি নাই, তদ্বিষয়ে একখানা রসিদ সে গৃহের একটি লোকের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া, বিল্বগ্রাম প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। আমাদের দুই জনের দুই খানা পাল্কী পাশাপাশি

এবং তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে বরকন্দাজেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিল। আমার একটি দু-নলী বন্দুক তুলসীসিংহ নামক একজন বৃদ্ধ বরকন্দাজের হস্তে এবং পাল্কীমধ্যে একটা এক-নলী পিস্তল ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময় রিবল্বর পিস্তল আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন আমার হস্তে একটা রিবল্বর থাকিলে বোধ হয় ঘটনার মূর্ত্তি অন্য রূপ হইত। পাল্কীতে বিছানা ও একটা রূপা বাঁধান হুকা ও একটা পিতলের নদিয়ার গাড়ু ও একটা বাক্সে থানার কাগজপত্র ও শীল-মোহর এবং নগদ অল্প কয়েক টাকা ছিল। আমার পরিধানে একখানা অর্দ্ধ মলিন সামান্য মোটা আটপ্রহরী ধুতি এবং গাত্রে একখানা পুরাতন ভাগলপুরী খেস ছিল, মের্জাই কিম্বা অন্য প্রকার পোযাক ছিল না। বৈদ্যনাথের পাল্কীতেও একটা বাক্সে তাহার কাগজপত্র ও শীল-মোহর ছিল, অন্য কি কি দ্রব্য ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। কেবল ইহা খুব মনে আছে যে তাহার পরিধানে রজক-গৃহ হইতে নবাগত ধপ্ ধপে শান্তিপুরের মিহি ধুতি ও অঙ্গে মের্জাই এবং চিকণ চাদর দ্বারা মাথায় উষ্ণীষ বান্ধা ছিল। দাঁড়ঘরা হইতে আমাদের পাল্কী ৫০ হাতের অধিক দূর যাইতে, না যাইতে যে বরন্দাজের হস্তে আমার বন্দুকটা ছিল, সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কহিল যে, "বাবুদের লোক আসিতেছে পাল্কী হইতে নামুন।" "লোক আসিতেছে" বাক্য শুনিয়া আমার প্রথমে বোধ হইল যে বুঝি বাবুদের কোন কর্ম্মচারী কোনও কথার নিমিত্ত আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। তাই ভাবিয়া আমি আমার পাল্কীর বাম দ্বার দিয়া এবং বৈদ্যনাথ তাহার পাল্কীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইলাম। বাহির হইয়া দেখি যে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী অনুমান ৬০। ৭০ হাত অন্তরে একদল ৩০। ৪০ জন পশ্চিমদেশীয় পালোঁয়ান মল্লবেশে কেহ ঢাল তরবার, কেহ বর্শা এবং কেহ লোহাঙ্গী হস্তে করিয়া মহা আস্ফালন করিতে করিতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া, পাল্কীর মধ্য হইতে পিস্তলটা উঠাইয়া, হস্তে লইয়া বৈদ্যনাথের সহিত একত্র পাল্কীর দণ্ডের নিকট অগ্রসর হইলাম এবং আমাদের বরকন্দাজ গুলিও সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ এবং আমাদের সঙ্গে যে তিনজন পশ্চিমা বরকন্দাজ ছিল, তাহারা হস্ত প্রসারণ করিয়া দস্যুদিগকে বলিতে লাগিল যে "ভাগো

ভাগো এয়্সা কাম মত্ করো, নেহি ত ফাঁসী যাওগে।” কিন্তু চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, তাহারা উত্তর করিল যে “তোম্ লোক হট্ যাও, তোম লোককো কুছ্ নেহি বোলেঙ্গে, সেরেফ ঐ কালা দারোগা শারোয়াকা শীর লেঙ্গে, ওস্‌কো ছোড়েঙ্গে নেহি।” বরকন্দাজেরা তদুত্তরে বলিল যে “আগে হাম লোক মরেঙ্গে, পিছে যো জানো সো করিও।” এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আমাদের পশ্চাদ্ভাগে পাল্কীর ছাদের উপরে ধুপ্ ধাপ্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, যে সেই দাঁড়ঘরা দেশী শড়কীওয়ালায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোঁচড়ে ঢেলা এবং হস্তে একখানা করিয়া ফরিদ ঢাল ও তাহারা কয়েক গাছা বাঁশের শড়কী লইয়া ঢেলা নিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। তাহাদেরই কয়েকটা ঢেলা পাল্কীর ছাদের উপরে পতিত হইয়া শব্দ হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল যে আমরা কোনও দিক দিয়া পলায়ন করিতে না পারি সেই জন্য দুই পথ বন্ধ করিয়া সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দিয়া দুই দল অস্ত্রধারী লোক আগমন করিতেছিল। প্রথমে সম্মুখের লোক দেখিয়া আমার যথার্থই অধিক আশঙ্কা হয় নাই কিন্তু শেষে পশ্চাদ্ভাগে শড়কীওয়ালা দেখিয়া ঘোর বিপদ বিবেচনা করিলাম। শড়কীওয়ালারা আসিবামাত্র দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথ যে আমার দক্ষিণ পাল্কীর দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে, বাবুদের সেই কর্ম্মচারী, যে আমাদিগকে রসিদ লিখিয়া দিয়াছিল সে, রক্ষা করার অভিপ্রায়ে হস্তে ধরিয়া টানিয়া দাঁড়ঘরের নিকট এক ঘরের দিকে লইয়া গেল। সেই কর্ম্মচারী আমাকে কিছু না বলিয়া বৈদ্যনাথের প্রতি ঐরূপ কৃপাবান হওয়াতে, আমার বিবেচনায় তাহার অভিপ্রায় এইরূপ বোধ হইল যে দারোগাদ্বয়ের মধ্যে কেবল আমাকেই লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হয় নাই। কারণ বৈদ্যনাথ নূতন দারোগা এবং বাবুদিগের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অতএব তাঁহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু কর্ম্মচারীটির বুদ্ধির গতিকে শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পশ্চাদ্ভাগে শড়কীওয়ালাদিগের আগমন দেখিয়া আমার পার্শ্বস্থ বুদ্ধু বরকন্দাজ ও আমার কৃষ্ণনগরের বেহারারা আমাকে তাহাদের মধ্যখানে করিয়া ঠেলিয়া বাম দিকে স্থিত এক গোহাল ঘরের পিছানে লইয়া গমন করিল। তখন

পশ্চিমা ব্যাটারা আমার পাল্কীর নিকট আসিয়া "দারোগা শ্বশুর কাঁহা" বলিয়া আমাকে তল্লাস করিতেছে, আমরা তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিলাম, তথাপি তাহারা আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে, একেত আমি কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিতে কদাকার, তাহাতে আমার পরিধানে অতি সামান্য পরিচ্ছদ ছিল, শরীরে মের্জ্জাই কিম্বা অন্য কোন আচ্ছাদন ছিল না, সুতরাং তাহারা আমাকে সেই পলায়ন উদ্যত বেহারাদিগের মধ্যে একজন বেহারা বিবেচনা করিয়া লক্ষ্য করিল না এবং আমিও বেহারাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। শৈশবকালে আমার জনক-জননী আমায় শ্রীহীন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিতেন কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে দেখিলাম," যে আমার শ্রীহীনতাই এক সময়ে আমার জীবন রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। বেহারারা আমাকে লইয়া সেই গোহাল ঘরের পিছাড়া দিয়া সরকারদিগের বাড়ীর খিড়কী খণ্ডে উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে সে স্থানে জন-মনুষ্য নাই, কারণ সকলেই আমাদিগকে আক্রমণ করার তামাসা দেখিতে বাহির বাড়ীর-দিকে গিয়াছে সুতরাং আমরা কোন দিক দিয়া কোন দিকে পলাইলাম, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। তৎপর আমরা কয়েকটা গড়, খন্দ ও আম্রবাগিচা অতিক্রম করিয়া, একটা মাঠের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম। পথে দেখিলাম দুই ধারে গ্রাম্য লোকেরা দলে দলে তামাসা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে এক দলের একজন লোক আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল যে "ওগো তোমরা পলাও কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই, বাবুদের লাঠিয়াল দারোগা ঠেঙ্গাইতে গিয়াছে।" বাবুদের গৌরবেই তাহাদের গৌরব এবং বাবুদের সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না এই বিশ্বাসে তাহাদের মনে যৎপরোনাস্তি অহঙ্কার ছিল। গ্রামবাসী লোকেরা কেহ আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই, চিনিতে পারিলে বোধ হয় আমাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। যাহা হউক, এইরূপে আমরা নাকাশীপাড়া ও পলাশডাঙ্গার মধ্যস্থিত মাঠের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাহার পরে কোন্ স্থানে গমন করিলে আমরা নিরাপদে থাকিতে পাইব, তাহাই চিন্তা এবং পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে সেই অঞ্চলে বাবুরা ভিন্ন কেহই আমাদের পরিচিত ব্যক্তি নাই। বিশেষ গ্রাম্য লোকেদের মুখে

যেরূপ কথা শুনিতে পাইলাম, তাহাতে কোনও ব্যক্তির গৃহে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রবেশ করিলে, আমরা যে তাহার নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বরং বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। বিল্বগ্রামে আমাদের বাসায় যাইবার পথও আমরা ভালরূপে জানিতাম না। একে আশঙ্কায় এবং দুশ্চিন্তায় বক্ষ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে চৈত্র মাসের রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ, তৃষ্ণায় মুখের মধ্যে ছাতু উড়িতেছে, এমত অবস্থায় 'কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ং' ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া, নাকাশীপাড়ার সেই আক্রমণকারী বাবু-দিগের শরণ লওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় মনে উদয় হইল না। ভাবিলাম যে "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব," অতএব চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর শরণাগত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। তিনি ভদ্র হিন্দুপরিবার, অবশ্যই আমার প্রতি কিছু না কিছু দয়া করিবেন। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নাকাশীপাড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে এই গ্রামও জনশূন্য, কারণ সকল লোক লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে সঙ্গে পলাসডাঙ্গার দিকে গিয়াছে। চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দেহুড়িতে কেবল মাত্র তাঁহার একটি বৃদ্ধ জমাদারকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ তটস্থ হইল। বোধ হয়, আমাকে জীবিত দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে বলিলাম যে "জমাদার, তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া বল, যে আমি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম। তাঁহার পুত্র যদু ও হিরু বাবুরা আমার পরম বন্ধু, অতএব তাঁহাদের মাতা, আমারও মাতা, তিনি এক্ষণে মাতার ন্যায় কার্য্য করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" জমাদার সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বসিবার আসন দিয়া বলিল, যে "আপনি এই খানে বসুন, মাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যে আপনার কোনও চিন্তা নাই, তাঁহার এই বাড়ীতে আপনার প্রতি কেহ কোন রকম বর্দ্দিযত করিতে পারিবে না।" ইত্যাকার বাক্যে আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া, অন্দর হইতে জলও কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য আনিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিল।

আমি ত একরূপে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয়ের স্থান পাইলাম কিন্তু বৈদ্যনাথের কি অবস্থা হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। চন্দ্রমোহন বাবুর জমাদারকে বৈদ্যনাথের অনুসন্ধান করিতে বলিলাম কিন্তু সে বলিল যে এমন সময় আমাকে একাকী এই শূন্য বাড়ীতে রাখিয়া সে

স্থানান্তর গমন করিলে, আমার পক্ষে বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ তাহার কর্ত্রী তাহাকে দেহড়ী ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার বুদ্ধু বরকন্দাজও বলিল যে সে আমাকে একলা ফেলিয়া এক পাও নড়িবে না। অন্তে অনেক বলিয়া কহিয়া আমার একজন কৃষ্ণনগরের বেহারাকে বৈদ্যনাথের অন্বেষণে পাঠাইলাম। চন্দ্রমোহন বাবুর দেহড়িতে বসিয়া শুনিতে পাইলাম যে পলাশডাঙ্গার দিক হইতে হৈ হৈ রৈ রৈকার শব্দে লাঠিয়ালদিগের হাঁকার উঠিতেছে, কিন্তু সে স্থানে কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা হাঁকার উঠে, আর শুনিয়া আমার বুকের এক পোয়া রক্ত শুখায়, ভাবি, যে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে আছি শুনিয়া ব্যাটারা বুঝি উল্লাস-ধ্বনি করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; কিন্তু জমাদার আমার মনের ভাব বুঝিয়া বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমার কোন চিন্তা নাই, সেখানে কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই এবং কেহ আসিবেও না। এই রূপে প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতীত হওয়ার পরে দেখিলাম, যে দুইটি লোকের স্কন্ধে ভর দিয়া বহু কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বৈদ্যনাথ আমাদের দেহড়ী অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার সমস্ত শরীর জলে ও রক্তে আর্দ্র। মাথা, হস্তের বাহু, এবং জানু দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে এবং লাঠির আঘাতে শরীরের অনেক স্থান নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং আমরা উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। বৈদনাথ বলিল যে "দাদা আমার যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার ভাবনা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি মনে করিয়াছিলাম, যে এতক্ষণ তোমাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া ছিলাম, যে এক স্থানে তোমার ধড় ও আর এক স্থানে তোমার মাথা দেখিতে পাইব। ব্যাটারা তোমাকে ধরিবার জন্য পলাসডাঙ্গার প্রত্যেক বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছে, তোমাকে একবার হাতে পাইলেই, আমি শুনিয়াছি যে, তোমাকে বলি দিয়া ফেলিবে। এইক্ষণ তোমার প্রাণ-রক্ষা কিসে হয় তাহার উপায় কর। তোমার উপরেই তাহারা জাতক্রোধ, তোমাকে মারিবার জন্যই ব্যাটারা এই সাজ-সজ্জা করিয়া গিয়াছে, তোমাকে নিশ্চয় তাহারা বধ করিবে, আমি কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী বলিয়া মার খাইয়াছি।" বৈদ্যনাথের মুখে এই

সকল কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম যে "আমার আর কোন ভয় নাই, চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রী আমাকে অভয় দান করিয়াছেন, নচেৎ এতক্ষণে লাঠিয়ালেরা এইখানে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।" বৈদ্যনাথের মুখে শুনিলাম যে, যখন সেই কর্ম্মচারী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ছিল, তখন দাঁড়ঘরার শড়কীওয়ালারা বৈদ্যনাথকে দেখিয়া "আ রে এও এক শালা দারোগা" বলিয়া তাহাকে শড়কীর খোঁচা মারিতে আরম্ভ করিল এবং তাহা দেখিয়া একজন পশ্চিমা আসিয়া একটা লাঠির দ্বারা বৈদ্যনাথকে আঘাত করিল। কর্ম্মচারীরা বারম্বার নিষেধ করাতেও তাহারা শুনিল না দেখিয়া সে নিজে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার আপন শরীর দ্বারা বৈদ্যনাথকে আচ্ছাদন করিল এবং লাঠিয়ালদিগকে বলিল যে "আহাম্মকেরা তোরা একি কার্য্য করিতেছিস? তোরা যাহাকে মারিতে আসিয়াছিস্ সে কোথা গেল তাহার খোঁজ কর; ইহাঁকে অনর্থক মারিয়া কি হইবে? ইনি আমাদের লোক।" কর্ম্মচারীর এই সকল কথা শুনিয়া দস্যুরা বৈদ্যনাথকে মারিতে ক্ষান্ত হইয়া আমার অন্বেষণে গমন করিল। পরে বৈদ্যনাথকে কয়েকজন ভদ্রলোকে ধরিয়া একটা পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া নাকাশীপাড়ায় আনিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিল। তদনন্তর তদন্ত করিয়া দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথের দুই বাহুতে চারিটা ও দক্ষিণ পদের ডিমের মধ্যে একটা শড়কীর গভীর আঘাত, মাথায় লাঠির আঘাতে একস্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং পৃষ্ঠে ও পঞ্জরে লাঠির আঘাতে অনেক স্থান বিবর্ণ এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই সকল আঘাত দিয়া এত রক্তস্রাব হইয়াছিল, যে বৈদ্যনাথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং এমন গ্রীষ্মের সময়ও শীতে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রী কিছু টার্পিন ও একখানা পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়া দেওয়াতে তদ্দ্বারা আমরা বৈদ্যনাথের আঘাত সকল বেষ্টন করিয়া রক্ত পড়া বন্ধ করিলাম এবং স্ফীত স্থান সমস্তে টার্পিন ও অগ্নির সেক দিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় বাড়ীর মধ্যে একটা শোরগোল শুনিতে পাইয়া আমাদের অত্যন্ত ভয় হইল। শুনিলাম, যে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর দেহড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি শুনিয়া সর্ব্ববাবুর যে একজন কুটুম্ব লাঠিয়ালদিগের নেতা হইয়া পলাশডাঙ্গায় আমাদের আক্রমণ করিতে গিয়াছিল,

সে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লইয়া অন্দর মহলের মধ্য দিয়া পুনবায় আমাকে মারিবার জন্য আসিতেছিল কিন্তু চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রী তাহাদিগকে তাঁহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে "তোরা যে কর্ম্ম করিয়াছিস্ তাহাই আগে সামলা, পরে আবার মারিতে যাইস্।"

চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রী এই দুরাত্মাদিগকে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন বটে কিন্তু বোধ হয় তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল না, কারণ দেখিলাম যে তিনি ক্ষণেক পরেই আমাদিগকে আমাদের বিল্লগ্রামের বাসায় পৌছিয়া দিতে উদ্যোগ পাইলেন এবং তাঁহার জমাদার এবং আর কয়েকজন লোক আমাদের সমভিব্যাহারে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ইহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে আমাদের কোনও আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। আমরাও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিল্লগ্রাম যাত্রা করিলাম। পাল্কী অভাবে বৃদ্ধ বরকন্দাজ বৈদ্যনাথকে স্কন্ধে করিয়া লইল, এবং আমি পরিধানে কেবল একখানা ধুতি ও হস্তে সেই পিস্তলটা লইয়া নত মস্তকে নাকাশীপাড়া হইতে প্রস্থান করিলাম। নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বেই একটা জনরব শুনিয়াছিলাম যে বিল্লগ্রাম হইতে আমরা বাহির হইলে, দুরাত্মারা পুনবায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাতিত বৈদ্যনাথকে হস্তগত করিবে। আমি ইহা শুনিয়া একজন দ্রুতগামী বরকন্দাজকে মুড়াগাছার দেবিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক চাহিয়া পাঠাইলাম, যে তাহারা আসিয়া অদ্য রাত্রিতেই আমাদিগকে মুড়াগাছা লইয়া যায়। এই বন্দোবস্ত করিয়া আমরা নাকাশীপাড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখি, যে পথ মধ্যে আমাদের বেহারারা আমদের পাল্কী দুইখানা পলাশডাঙ্গা হইতে লইয়া আসিতেছে। দেখিলাম যে লাঠিয়ালেরা লাঠি মারিয়া দুইখানা পাল্কীরই ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থিত তৃণটি পর্য্যন্ত দ্রব্য সকল লুটিয়া লইয়াছে। বন্দুকটি প্রথমেই একজন দস্যু সেই বৃদ্ধ বরকন্দাজের গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। বৈদ্যনাথকে পাল্কীতে বসাইয়া বিল্লগ্রাম পৌছিলাম এবং কিছুকাল পরে মুড়াগাছার বাবুদিগের প্রেরিত প্রায় ৪০ জন অস্ত্রধারী লোক আসিয়া পৌছিলে, আমরা তাহাদের সঙ্গে মুড়াগাছায় গমন করিলাম এবং সেইস্থানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাহার পর দিবস প্রাতে আসিয়া কৃষ্ণনগর পৌছিলাম।

গোযাড়ির খেয়াঘাটের নিকটে বৈদ্যনাথের পিতার বাসা বাড়ী ছিল। সেইখানে আসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং আমাদের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বৈদ্যনাথের আঘাতের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিলে পর, এলিয়ট সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কুঠিতে লইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া বিদায় দিলেন। বৈদ্যনাথ সুন্দররূপে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় এক মাস কালের অধিক লাগিল। নাকাশীপাড়া হইতে আমাদের কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করার পরে, সাধারণের, বিশেষ বাবুদের, মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব না জানি তাঁহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিবেন, কিন্তু ঘটনার পরে এক মাসের অধিক কাল অতিবাহিত হওয়াতে বাবুদের সেই আশঙ্কা দূর হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যে মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ে কিছুই করিবেন না, অধিক হইলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। বাবুদিগের সহিত কথোপকথন হইলে আমিও এলিয়ট সাহেবের ইঙ্গিতে সেই ভাবের আভাস প্রকাশ করিতাম সুতরাং বাবুরা অনেকেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ দিকে এলিয়ট সাহেব গোপনে কমিশনর ও গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। বৈদ্যনাথ ভালরূপে আরাম হইলে পর, একদিন রাত্রি অনুমান ১১ ঘণ্টার সময় আমার থানাতে ৮টা হস্তী ও দুইশত বরকন্দাজ এবং আর দুইজন আমার অপরিচিত সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র আমার থানার সকল বরকন্দাজ ও দুইজন জমাদার ও কৃষ্ণনগর সহরের সমুদয় চৌকিদার সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। আমি পূর্ব্বেই ইহা অবগত থাকিয়া উদ্যোগ করিয়া রাখিযাছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে সাহেবদের আদেশ পালন করিয়া আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাবুরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাইয়া, বাবুরা তখন যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় দুই দুইজনকে এক এক হস্তীর উপরে বসাইয়া প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠের আলানের দুইধারে অর্থাৎ দুইজন বাবুকে মধ্যে করিয়া, দুই জন সাহেব উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেক সাহেবের হস্তে এক একটা দোনালা পিস্তল বাহির করিয়া বাবুদিগকে দেখাইয়া তাহার মধ্যে গুলী ও

বারুদ ভরিয়া লইলেন এবং বাবুদের বলিলেন যে তাঁহারা কেহ কোন উচ্চবাচ্য কিম্বা কোনও রূপ অবাধ্যতা দেখাইলে, তৎক্ষণাৎ পিস্তলের দ্বারা তাঁহার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। গোযাড়ীর ঘাটে আসিয়া দেখিলাম যে সেইখানে বৈদ্যনাথ একশত জন লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। আমিও বৈদ্যনাথ চন্দ্রমোহন বাবুর দুই পুত্রকে লইয়া এক হস্তীতে উপবেশন করিলাম এবং তাঁহাদের দুইজনের কোন চিন্তা নাই বলিয়া আশ্বাস দিলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার সম্মুখে পৌঁছিয়া দুইদলে বিভক্ত হইলাম, এক দল পলাশডাঙ্গার দিকে গমন করিল এবং দ্বিতীয় দল নাকাশীপাড়া প্রবেশ করিল। নাকাশীপাড়ায় আসিয়া এলিয়ট সাহেব ব্যক্ত করিলেন, যে তাঁহার দারোগাদিগকে যে সকল লোকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আসিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, আসামি ধৃত করা কেবল উপলক্ষ মাত্র, বাবুদের অপমান করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার ও বৈদ্যনাথের অনুরোধে কেবল চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে সকলকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া, নাকাশীপাড়ার ও পলাশডাঙ্গার অন্য সকলের বাড়ীতে যাইয়া আসামীদের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং আমাদের কার্য্য সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত বাবুদের সকলকে এক প্রকাশ্য স্থানে বসাইয়া, তাঁহাদের উপরে বরকন্দাজ ও জমাদার প্রহরী সংস্থাপিত হইল। চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ী ভিন্ন অন্যান্য বাবুদের বাড়ী ও নাকাশীপাড়া ও পলাসডাঙ্গা গ্রামের সেইদিন আমাদের সঙ্গের লোকের হস্তে, যে কি দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা এস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যক রাখে না। পাঠক অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারেন। এই থানাতল্লাসীতে আমাদের আক্রমণকারী লোকের মধ্যে কেবল ১০ জন লোক ধৃত হইয়াছিল। থানাতল্লাসী সমাপ্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের হুকুম মতে সেই তারিখে নাকাশীপাড়াতে নাকাশীপাড়ার থানা নামক থানা সংস্থাপন এবং তাহার আবশ্যকীয় দারোগা প্রভৃতি পুলিস আমলা নিযুক্ত করিয়া, কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিলেন। সেই পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার বাবুরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের কি অবস্থা তাহা আমি জানি না।

আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার নাম আমার চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে এবং নাকাশীপাড়ার লোকেরাও আমার নাম শীঘ্র ভুলিবে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিয়া আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কয়েক বৎসর পরে এফ, আর, কক্‌রেল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট এক খুনি মোকদ্দমার তদন্তের জন্য আমাকে নিযুক্ত করাতে, পুনর্ব্বার আমার নাকাশীপাড়ায় যাইতে হইয়াছিল। নাকাশীপাড়ার লোকেরা আমাকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "ভাই সাবধান! আবার সেই মুষল নাকাশীপাড়ায় আসিয়াছে।"

সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি।

৩।—উভয় কথার সমালোচনা।

এখন জিজ্ঞাস্য "স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত" এবং সম্পূর্ণরূপে "স্বাভাবিক অথচ সাংসারিক"—এই দুই পথের কোন পথে সাহিত্য চলিবে, কোন নিয়ম অবলম্বন করিবে? সকল দিক বিবেচনা করিয়া কথাটার একটা নির্দ্দিষ্ট স্পষ্ট উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী, সাহিত্য-প্রিয় লোক, উপরি উক্ত প্রশ্নের এক উত্তর মোটের উপর অবশ্য এই দিতে পারেন, যে "যে দিক দিয়া হউক, যত দিক দিয়া হউক, সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া সুখের বিষয়। আমাদের পুরাতন পরমাত্মীয় স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, পরিচিত সরল সোজাপথ ত আছেই আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি "সাংসারিক" বলিয়া আর একটা নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়, আর সে পথে আমরা একই অভীষ্টস্থলে যাইতে পারি, তাহাতে হানি কি? হইতে পারে, নূতন পথটা বড় ভয়াবহ, বড় অসমান টেরা বাঁকা শর্ক্র-শঙ্কুল; তা হইলই বা, সে সকলের মধ্যেও বেশ একরূপ সৌন্দর্য্য অনুভূত হইবে,—একটা অভূত-পূর্ব্ব উৎসাহ, বা আমোদ বা উত্তেজনা, একটা অনভ্যস্ত কিছু-না-কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব সাহিত্য দুই পথে চলে চলুক না, তাহাতে আমাদের লাভ ভিন্ন লোকসান কি? কিন্তু আমাদের পুরাতন প্রিয় পথ থাকা চাই। পুরাণ পথ বন্ধ করিয়া নূতন পথ চালাইতে আমরা

আদৌ অসম্মত। তবে যদি নূতনটা পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চায় ও যাইতে পাবে, আমবা তাতে রাজি আছি।”

ইহা সাহিত্যে আদবানুরক্তিব কথা। সম্যক্রূপে সদুত্তর না হইলেও একটা সুন্দব উত্তব বটে। কিন্তু বিচারের নিকট আদব অনাদর প্রিয় অপ্রিয় নাই। কোন প্রকার ওজোব আপত্তিই তথায় খাটে না; বক্ষ্যমান প্রশ্নকে বারেক বিচারের কষ্টিতে কষিয়া কি উত্তর বাহিব হয় দেখা উচিত। প্রথমত সাহিত্যাংশে কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক; পবে সাহিত্যের যাহা সাবসত্বা’ চবম উদ্দেশ্য ও পরিণতি, যার একনাম ধর্ম্ম অপর নাম শান্তি, সে অংশেও বিবেচনা করা যাইবে।

“স্বাভাবিক অথচ স্বাভাবাতিবিক্ত”—এই পূর্ব্বাপব প্রচলিত নিবম সম্বন্ধে আমাদেব যাহা বক্তব্য, তাহা প্রথম প্রস্তাবে এক প্রকার বলিয়াছি। তাহা লইয়া আর বেশি কথার প্রয়োজন হইতেছে না। আধুনিক অভিনব প্রণালীর সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে আবশ্যক মতে, আনুসঙ্গিক এক আধ কথা বলিলেই চলিবে। বহুকাল ধরিয়া বহু বিচার তাহা লইয়া হইয়া গিয়াছে। বহু ব্যবহাবে সে পুবাতন প্রণালী পরীক্ষিত। নিজের বলে বদ্ধমূল,—সাহিত্য-শাস্ত্রে তাহা বুনিয়াদ স্বরূপ। বুনিয়াদের বুনিয়াদ সম্বন্ধে এই চতুর্থ প্রহরে কিছু বলা অনাবশ্যক। খালি অন্যাবশ্যক নয়, কিছু ধৃষ্টতাসূচক ও বটে।

আধুনিক অভিনব প্রণালী যে সাহিত্যাংশে একেবারেই অবহেলার যোগ্য,—তা নয়। যথাযথ সংসার ও স্বভাব-সঙ্গত চিত্রপূর্ণ উপন্যাস বা কাব্য সাহিত্যাংশে পাঠেব অযোগ্য, চিত্তাকষণে অসমর্থ, গুণমাত্র বর্জ্জিত, কেবল দোষেরই আকর,—ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এ প্রবৃত্তির অনেক উপন্যাসে গুণপনা ও মুন্সিআনা বেশ থাকে। তাহারা তাহাদের স্বথোদিত স্বভাবে চিত্তাকর্ষণে এবং আমোদ প্রদানে সমর্থ। নবপ্রণালী কল্পনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, জবরদস্তি তাড়াইতে চাহিলেও নব-প্রণালীর প্রধান নবেলগুলি একেবারে কল্পনা বিবর্জ্জিত নহে,—তাহা হইতেই পাবে না, হওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপে সংসার; যাহা সংসারের পূর্ণ প্রতিলেখ্য লইতে উদ্যত, তাহা কল্পনা বিরহিত হইবে, ইহা অযৌক্তিক যুক্তি। নব-প্রণালীব ভাল ভাল নবেলগুলিতে মোটের উপর কল্পনা আছে, স্থানে স্থানে লক্ষিত ও অলক্ষিত ভাবে একশ্রেণীব কবিত্বও আছে।

বর্ণনা সবল সহজ ও সতেজ। বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। চিত্র ও চরিত্র আঁকিবাব কৌশলও আছে। সব জড়াইয়া এক প্রক প্রকার সৌন্দর্য্যও সৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রন্থের এসব গুণ গ্রন্থকারদিগের নিজের ক্ষমতারই পরিচায়ক, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রণালীতে গুণ নাই বলিলেও চলে। অবশ্য তাঁহাদের ক্ষমতা বা প্রতিভা দ্বাবা তাঁহাদের প্রণালী পরিপুষ্ট হইবারই কথা বটে, তথাচ তাঁহাদের নিজেব শক্তি ও তাঁহাদের প্রণালীর যোগ্যাযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে এক পদার্থ নহে। পরন্তু তাঁহাবা যে যুক্তি ও মতের উপর তাঁহাদেব প্রণালীটা খাড়া করিতেছেন, তাহা সাহিত্যাংশে আদৌ অসঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হয়। তাঁহারা যুক্তিতে যাহা যাহা করিব বলিতেছেন, কার্য্যে তাহা সম্যকরূপে করিতে পারিতেছেন না; তাহার কারণ তাঁদের যুক্তিই অযৌক্তিক। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সংসার বা স্বভাব অনুকরণে ব্রতী, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রণালীব নাম দিয়াছেন,—সংসার-সঙ্গত; কিন্তু সত্য-সত্যই কি তাঁহাদের সে সংকল্প কার্য্যে প্রতিফলিত কবিতে পারিতেছেন? অদ্যাপি পারেন নাই, ভবিষ্যতে পাবিবেন তাহাও বলিতে পারেন না। সম্পূর্ণরূপে স্বভাব (স্বভাব অর্থে জড় প্রকৃতিই হউক, আর যাহাই হউক) অনুকরণ করা সম্ভাবিত নহে এবং তাহা কবা সাহিত্যের উপযোগীও নহে, তাহা আমবা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতি বাদীরা পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রণালীব বিশেষ বিশেষ নিয়ম রীতি পদ্ধতি যতই কেন উলঙ্ঘন করুন না, মূলত তাঁহাদের সেই প্রণালীর দ্বারা আপনাদের অভিনব প্রণালীকে নিয়মিত ও চালিত করিতে হইতেছে।

এমিলি জোলা এখনকার সংসার-সঙ্গত নবেলকারদিগের মধ্যে একজন খুব নামজাদা ব্যক্তি। ইনি ক্ষমতাশালী লেখক সমালোচক ও অভিনব প্রণালীর জনৈক দক্ষ পরিচালক ও পরিপোষক। ইঁহার দ্বারা উক্ত প্রকৃতির সাহিত্য বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ইনি কবিতা ও কল্পনাকে সাহিত্য হইতে একেবারেই নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন না এবং এক সময়ে নাকি তাহা খুব ভালও বাসিতেন,—কিন্তু এখন বলেন যে উক্ত দুই বস্তুর দ্বাবা (Romanticism) ফ্রেঞ্চসাহিত্যের নাকি গুরুতব অনিষ্ট হইয়াছে। বিজাতীয় বিদেশীয় সাহিত্যের বিচার করিতে অবশ্য আমরা অসমর্থ। কিন্তু সমষ্টি দৃষ্টিতে দেখিলে সংকবিতা ও সুকল্পনা দ্বাবা সাহিত্যের কনিষ্ট কি প্রকারে হইতে পারে, আমবা তাহা অনুমানই

করিয়া উঠিতে পারি না। পরন্তু এমিলিজোলা বলেন যে ডিকেন্সের নায়ক নায়িকারা পরস্পরে কথা কহিবার সময় নাকি বাঁধি বক্তৃতা দেয়। ডিকেন্সের নায়ক-নায়িকারা কি করে, তাহার অনুসন্ধান করিতে চাহি না এবং বাঁধি বক্তৃতা করা নায়ক-নায়িকাদের নেহাত বেজায় আর তাহা কাব্য নাটকে অত্যন্ত অনুপযোগী তাহাও বিলক্ষণ স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া "নায়ক-নায়িকারা" কথা কহিবার সময় ক্রমাগত 'আবল-তাবল' বকিবে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষা ব্যবহার করিবে, তাহাও ত সম্ভবে না। এমিলিজোলার নিজের অনেক নায়ক-নায়িকাই অবশ্য তাহা করে না, ভাষার ভাষাত্ব ও সংক্ষেপত্ব রাখিয়া চলে। আবশ্যক মতে দুই চারি কথা বেশি বলিতে হইলে, সে কথা গুলা কিয়ৎ পরিমাণে বক্তৃতার আকারও ধারণ করে। তাহা না হইলে চলেই না, ভাষার অনুশাসন, ব্যাকরণের বিধি রক্ষা হয় না। তজ্জন্য মসুঁবজোলা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নহেন। সংসার-সঙ্গত নবেলের অনেক নায়ক-নায়িকা অনেক স্থলে বড়ই প্রলাপ বকে বটে কিন্তু তথাচ (There is method in their madness) সে সকল পাগলামিতে একরূপ পর্য্যায় আছে। ফলত পূর্ব্ব প্রণালীর সহায়তা ব্যতীত অভিনব প্রণালী মোটের উপর এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, তা ভাষায় হউক, ভাবে হউক, আর কায়দা কৌশলেই হউক। নব-প্রণালীর নবেলকার আদর্শ ঔপন্যাসিক চিত্র বা চরিত্র উঠাইবার অশেষ চেষ্টা করিয়াও অবশেষে সংসারাতিরিক্ত আদর্শ ঔপন্যাসিক চিত্র চরিত্রই অজ্ঞাতে আঁকিয়া বসেন। আদর্শ হয়ত সদাদর্শ হয় না, কিন্তু যাহা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে সংসারাতিরিক্ত ও ঔপন্যাসিক। অতএব সাহিত্যাংশে নব-প্রণালীর যুক্তি থিওরি মত ও সঙ্কল্প সমস্তই উলটিয়া যাইতেছে। ফলিতার্থে সাহিত্যের এই অভিনব স্রোতকে একটা নূতন প্রণালী বলা যাইতে পারে না। উহা পুরাতন প্রণালীর একটা নূতন ফেশিয়ান বলিলে হয়। উহা পুরাতন প্রণালীর অনুমোদিত বন্দোবস্ত রীতি প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া কতকটা স্বাধীনতা দেখায় মাত্র এবং তাহাতেই হঠাৎ চোখে চমক লাগে, যেন কতকটা বেশী বেশী সজীব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সজীবতা কেবল চাকচিক্য মাত্র। নব-প্রণালীর লেখকগণের স্বভাবে ভক্তি, স্বভাবাতিরিক্তে বিরক্তি, আছে বটে, কিন্তু স্ব স্ব গ্রন্থ জাঁক-জমক-ময় করিবার সময় স্বভাবকে স্মরণে রাখেন না কেন, তাহা বলা যায় না।

তার পর 'সংসার-সঙ্গত' চিত্র ও চরিত্রের অনাবৃত উলঙ্গ ভাব। এমিলি জোলা বলেন "ঔপন্যাসিক"গণ তাঁহাদের চিত্র চরিত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অনাবৃত ও উদ্ঘাটিত করেন মাত্র, তদতিরিক্ত এক চুলও অগ্রসর হন না। কাজেই চিত্র বা চরিত্রের সমস্তটা দেখা যায় না। এক অংশের কতকটা দেখা যায় মাত্র। আর সমস্তই ঘোর অন্ধকারে ঢাকা থাকে। কিন্তু তাঁহাদের কাছে তাহা হইবার যো নাই। তাঁহারা চিত্রের "আট পিঠ" দেখান, চরিত্রের 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত করেন। এ কথাটা কিন্তু ষোল আনা ঠিক নয়। ইহাঁরা মুখে যতটাই বলুন, সৌভাগ্যক্রমে কাজে ততটা করিয়া উঠিতে পারেন না। ততটা করিতে গেলে কেবল সমাজচ্যুত হইয়া নিষ্কৃতি হইত না, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে দেশ ছাড়া হইতে হইত; আর তাঁহাদের গ্রন্থ ভদ্র সমাজে কেবল অনাদৃত মাত্র হইয়া থাকিত এমন নহে, 'চাঁড়ালের হাতে দগ্ধ হইয়া কর্ম্মনাশা জলে নিক্ষিপ্ত হইত।' কিন্তু নব লেখকগণ উপরোক্ত বিষয়ের যতটা করেন, তাহাই ভয়ানক প্রচুর। তদ্দ্বারা সুরুচি সভ্যতা সমাজ ধর্ম্ম ও মানুষের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা মর্ম্মান্তিক আঘাত পায়। এ সম্বন্ধে সাংসারিক মহাশয়েরা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ অবশ্য অনেক কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন। এমিলিজোলা বলেন, 'যথাযথ স্বভাব বর্ণনা করার দরুণ তাঁহাদের বা তাঁহার গ্রন্থ চুল পরিমাণেও অনৈতিক বা কুনীতির পরিপোষক নহে। তাঁহার গ্রন্থে নীতি উপদেশ না থাকিতে পারে,—ছন্দেবন্দে নীতি উপদেশ দেওয়াও তাঁহার ব্যবসা নয়,—যথাযথ ঘটনা বিবৃত করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিয়া নীতি নিষ্কাশনের ভার তাঁহাদের উপরেই রাখিয়া দেন। যেরূপ বিষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখানতে রসায়নবিদের উপর দুর্নীতি দোষারোপ করা অন্যায়, তাঁহাদের সম্বন্ধেও তাই।" অন্য একজন লেখক আরও অনেক যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম সংস্থাপন ও মনুষ্য সমাজের দুঃখ নিবারণই তাঁহাদের এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা একেবারেই যে অগ্রাহ্য করিবার যোগ্য, তাহা নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের নিজের না হউক, তাঁহাদের গ্রন্থ গুলার অপরাধ এতটা গুরুতর, যে কোন কৈফিয়তেই কুলাইয়া উঠে না।

নব সম্প্রদায় স্বভাব ও স্বাভাবিকের একান্ত পক্ষপাতী। বেশ কথা। কিন্তু স্বাভাবিকতা কি পূর্ব্বতন প্রণালীতে নাই? স্বাভাবিকতাই ত

সে প্রণালীর প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। "স্বাভাবিক এবং স্বভাবাতিরিক্ত" বিষয়টা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, ষোল আনা স্বাভাবিকতা ব্যতিরেকে, কাব্যে স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টিই হইতে পারে না। স্বাভাবিক সৃষ্টির জন্যই অনেক সময়ে দেবতাকেও খাট করিয়া মনুষ্য করা হয়, আবার আবশ্যক মতে সদাদর্শের অনুরোধে মনুষ্যকেও একটু উচ্চে আরোহণ করান হয়। ফল কথা স্বাভাবিকতা ভিন্ন স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টিই সম্ভবে না। স্বাভাবিক নহিলে মনুষ্য স্বভাবে খাপেই না। যাহা স্বাভাবিক নয় অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, নিত্য প্রত্যক্ষ সংসারের অসম্ভাবিত, তাহা অসার "আষাঢ়ে গল্প"। 'আরব্য উপন্যাস'' ও তদনুরূপ অনেক গ্রন্থ সাহিত্যে আছে বটে,—এবং লোকে তাহা আদর করিয়া পাঠও করে,—কিন্তু তাহা 'কাব্য' নহে, তাহা 'কেচ্ছা।''

ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যপরায়ণ শৌর্য্য বীর্য্যবান শান্ত সুশীল সত্যপ্রিয় উদার-চেতা দয়ালু প্রেমিক ইন্দ্রিয়-জয়-ক্ষম, এরূপ নর নারী তখনকার নিয়মে কাব্যের নায়ক নায়িকা স্বরূপ গৃহীত হইত। কিন্তু এখন তাহার বিপরীত প্রায়ই দেখা যায়। অভিনব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হওয়া অবধি নায়ক নায়িকা ইনডেণ্ট করা হইতেছে সচরাচর এমন সব স্থান হইতে যে সে সব স্থানে, ভদ্রলোকে বড় একটা গতিবিধি করেন না। পুলিসের গ্রেপ্তারী, ফৌজদারির ফেরারী, হরিণবাড়ীর ফেরত, খামখেয়ালী, বদ্-মেজাজী, বাতিকগ্রস্ত—ইহারাই প্রায় এখন নব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের নায়ক। এরূপ নায়ক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক অবশ্য আছে। কিন্তু যুক্তি তর্কে কুদৃষ্টান্তের অনিষ্টকারিতা ধোয়া যায় না। তখনকার কাব্য সাহিত্য, নাটক, নবেল ছিল—বিশিষ্টরূপে বিশ্রামের স্থল। লোকে সংসা-রের কোলাহল দুঃখ যাতনায় হৈ-চৈ হয়রান হইরা দু'দণ্ড সাহিত্যের ছায়ায় বসিয়া একটু শীতল হইত। কিন্তু এখনকার নূতন ধরণের সাহিত্যে (এখনকার পুরাণ ধরণেও নূতন ধরণের আবর্জ্জনা মিশিয়াছে) আর তাহা হইবার যো নাই। এখন সাহিত্য আর জুড়াইবার জায়গা নয়। এখন তথায় নরকাগ্নি যেন সশরীরে বিদ্যমান।. সংসারে যত না গণ্ডগোল ধুন্ধুমার্ চীৎকার হাহাকার, এখনকার সাহিত্যে তাহা অপেক্ষা সপ্তগুণ বেশী। অবস্থা শোচনীয় বই কি ?

অভিনব অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান দোষ ‘জড়বাদ’; নির্জ্জলা জড়বাদ লইয়া এ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব। অঙ্গে পৃষ্ঠে ললাটে জড়ত্ব ধারণ করিয়াও ইউরোপ সন্তুষ্ট নহেন। কাব্য উপন্যাসেও জড়বাদের সুদীর্ঘ ধ্বজা তুলিতেছেন। জড়বাদমাত্র প্রাণ, জড়ত্বমাত্র অবলম্বন, এই সংসার-সর্ব্বস্ব সম্প্রদায়, মনুষ্য জীবনের অতি অপব্যাখ্যা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলত তাহারা অতি মন্দব্যাখ্যাই করিতেছে। অবশ্য দেখিতে জানিলে ইহাদের এই “মন্দের” ভিতর দিয়া “সৎ” সুস্পষ্ট দেখা যায়। “সৎ” ঢাকিয়া রাখে সাধ্য কার? ‘সৎ’ই সকল সংসার সম্প্রকাশ করেন। যাহা হউক ইহাদের জীবন ব্যাখ্যা অতি ‘মন্দ’। সে ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদীর বড় অনিষ্ট করিতে পারে না বরং ক্ষেত্র বিশেষে ইষ্ট করিলেও করিতে পারে। কারণ অদ্বৈতবাদী সে ব্যাখ্যায় ও সে ব্যাখ্যার বিবৃতি ও বিস্তারে অতি সহজে অনাত্ম পদার্থের নশ্বরত্ব ও যাতনাময়ত্ব অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু দ্বৈতবাদী ইয়ুরোপের পক্ষে উক্ত ব্যাখ্যা বিষবৎ অনিষ্টকর। উক্ত প্রকৃতির সাহিত্য সাধারণ্যে বিলক্ষণ অস্বাস্থ্যকর।

এই সংসার-সর্ব্বস্ব রীতির আঁচ বঙ্গীয় সাহিত্যের গায় যে না লাগিয়াছে, বা না লাগিতেছে—এমত নয়; তবে জোলার জোনাকি-অবতার আমাদের মধ্যে আজিও দেখা দেন নাই। বঙ্গ লেখকগণ এ সম্বন্ধে দিন থাকিতে সাবধান হইবেন, এই অভিপ্রায়ে আমরা এই বৈদেশিক মাথামুণ্ডের বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম।

প্রাচীন ভারত।

বা

প্রাচীন বিদেশীয় পরিব্রাজকগণকর্তৃক ভারত যদ্রূপ বর্ণিত।

অবতরণিকা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে, পাশ্চাত্য ভূভাগের যে সকল লোক ভারতাভিমুখে বা ভারতে যাতায়াত করিত, যে বাণিজ্য স্রোত তদুভয়ের মধ্যে প্রায়ই একরূপ অবিচ্ছেদ ভাবে চলিত, যে সকল পাশ্চাত্য বীরেরা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, জয়োদ্দেশে ভারতভূমে আগত হইত, ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ এবং পুরাণাদি বিলোড়ন করিলে, তাহার কোনই স্পষ্ট উল্লেখ বা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঘটনা বিশেষ, লোক বিশেষ, —এ সকলের নাম পাওয়া ত দূরের কথা; কোন দেশ বিশেষের নাম পাওয়াও দুর্ঘট। দুয়ারের নিকট প্রতিবেশী যে পহ্লবী বা পারসীক জাতি তাহাদের নামও রামায়ণের পূর্ব্বোদ্ভূত কোন সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। রামায়ণে বাহ্লিক অর্থাৎ আধুনিক বল্‌খদেশবাসী, পহ্লব অর্থাৎ পারস্যবাসী, পরদ অর্থাৎ পার্থিয়াবাসী,—ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহা হউক, মোটের উপর ধরিতে গেলে, ভারতবর্হির্ভূত দেশ, দ্রব্য, লোক, তাবৎ বিষয়েই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ক্ষেত্র নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; একে একে, অপরিজ্ঞাত ভাবে উপন্যাসক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অসুরবংশ, বর্ব্বরবংশ, কল্পিত দেশ, কল্পিত জাতি, ইত্যাদির মধ্যে সন্নিবেশিত হইত, সত্য-অস্তিত্ব লোপে তাহারা বিস্মৃতির সাগর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; উদ্ধারের আশা চিরকালের তরে বিগত।

এইরূপ পাশ্চাত্য ভূভাগ ভারতের নিকট যেরূপ একেবারে অস্তিত্ব শূন্য, পাশ্চাত্য ভূভাগের নিকট ভারত কিন্তু সেরূপ নহে। অতি পুরাকাল হইতেই নানাসূত্রে ভারত পাশ্চাত্য ভূভাগের নিকট পরিচিত এবং সে পরিচয়, অল্প বিস্তর যেমন হউক, এ দূরতমকাল পর্য্যন্তও অবিনাশে আগত হইয়া আমাদের হস্তগত হইতেছে। কি দিগ্বিজয়, কি লোক যাতায়াত

কি বাণিজ্যসূত্র ও বাণিজ্য দ্রব্য, সে সমস্তেরই যথা কথঞ্চিৎ পরিচয়, পাশ্চাত্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রমাণে অভ্রান্তরূপে পাওয়া যায়। উল্লেখ সকল যদিও বহুপরিমাণে অস্ফুষ্টভাবে আছে, তথাপি সে সকলকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে, সেগুলি যে ভারত বিষয়ক উল্লেখ, তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র থাকে না। পরবর্ত্তী উল্লেখ সকল পরিস্ফুট এবং অনেক স্থলে বিস্তৃত। পাশ্চাত্য ভূভাগ সম্বন্ধে এখন উল্লেখাদি পাওয়া যায় না, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু কখনই যে পাওয়া যাইতে পারিত না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এখন পাওয়া যাইতে না পারে, কিন্তু এক সময়ে হয় ত পাওয়া যাইতে পারিত। কারণ, দেখা যায় যে এক সময়ে ভারতে যথার্থ ইতিহাস রক্ষিত হইত এবং যাহা রক্ষিত হইত, তাহা এখন সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; নানা বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাতে তাহারা কালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। অনেকের, অথবা অনেকের কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়স্থ প্রায় সকলেরই একরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, যে প্রাচীন ভারতে প্রকৃত ইতিহাস যাহা, তাহা রক্ষিত হইত না, একমাত্র পুরাণই ইতিহাস রূপে গণ্য হইত এবং ইহা সর্ব্ব-জন-পরিজ্ঞাত যে পুরাণ সকল কেবল কল্পিত ও অলৌকিক ঘটনাবলিতে পূর্ণ। তাঁহাদিগের এ বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ। প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয়েরা পুরাণকে সর্ব্বদাই ইতিহাস হইতে পৃথক বলিয়া জানিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পুরাণ হইতে ইতি-হাসকে পৃথক করিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, হিয়াস্থসাঙের প্রদত্ত ভারতীয় বিবরণের মধ্যে নানাস্থানে ইতিহাস রক্ষা হইত, এমন উল্লেখ সকল পাওয়া যায় এবং উক্ত পরিব্রাজক কর্ত্তৃক এমনও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, প্রতিরাজ্যে ঘটনাবলি ও ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ ইতি-হাসবিদ্ নিযুক্ত থাকিত। (১) হিয়াস্থসাঙ যে কিরূপ বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষী ও তাঁহার সাক্ষ্য যে কতদূর আদর পূর্ব্বক গ্রহণের যোগ্য, তাহা ক্রমেই গ্রন্থোত্তর ভাগে প্রকাশ পাইবে।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে কাম্বোজ, শক, পরদ, পহ্লব, ও যবনজাতির ভূয়ো উল্লেখ আছে এবং মুদ্রারাক্ষস, যাহা সম্ভবত, খৃষ্টের পর সপ্তম শতা-ব্দীতে লিখিত হয়, তাহাতে একস্থানে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী কুসুমপুর অর্থাৎ পাটনা, কিরাত, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিকা ও

১। হিঃ সাঃ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ২ অধ্যায়। সি-উ-কি।

পারস্য জাতির দ্বারা আক্রমিত হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষস অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ; কিন্তু অতি প্রাচীনতম গ্রন্থেও যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এ পর্য্যন্ত অনেকেই অনুমান করিত যে, এই যবন শব্দ দ্বারা গ্রীকদিগকে বুঝাইত। কিন্তু প্রত্নবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যবন অর্থে কেবল গ্রীক নহে; ভারত বর্হিভূত পাশ্চাত্য বর্ব্বর-জাতি বিশেষ বা তাবৎ জাতিকেই যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইত। সে যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষসের উল্লেখে যে ভারতে গ্রীক আক্রমণের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা ব্যতীত আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীকদিগের উল্লেখ, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, উভয়বিধ ভাবে, অল্প বিস্তর পাওয়া যায়। যেমন অশোক রাজের শাসন লিপিতে অন্তিয়কের নাম; রাজাবলির মধ্যে দ্যুমিত্রিয়সের নাম; ইত্যাদি। কিন্তু এস্থানে সে সকলের পৃথক উল্লেখে কোন ফল নাই। কারণ এক নাম ভিন্ন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আর কিছুই পাইবার উপায় নাই। যাহাই হউক, আলেকজাণ্ডারের আগমনটা ভারতে একেবারে স্মৃতি-বর্হিভূত হইয়া যায় নাই, কিন্তু বড়ই বিষম গোল, তাহার পূর্ব্বগত বিষয় সম্বন্ধে। মুদ্রারাক্ষসকার অবশ্যই তৎকালে প্রচলিত পুরাতন কথায় নির্ভর করিয়া ও রূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও যাহা প্রচলিত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণার্গত চণ্ডীর একস্থানে (২) লিখিত আছে যে, চক্রবর্ত্তী রাজা, সুরথ, কোলাবিধ্বংসিন্ অর্থাৎ শূকরভোজী ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ছিলেন। ইহাকে যদি কোন অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়ী বীরবিশেষের ভারতাক্রমণের অস্পষ্ট উল্লেখ স্বরূপ ধরা যায়, তবে তেমন উল্লেখ পুরাণের মধ্যে অনেকই আছে। কিন্তু সেরূপ অস্পষ্ট উল্লেখে ফলই বা কি, অথবা তাহার সমালোচনার লাভই বা কি হইতে পারে? প্রায় সকল পুরাণেই রাজবংশ চরিতে উক্ত হইয়া থাকে যে, শিশুনাগ অগ্নিকুল দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতে রাজ্যস্থাপন করেন। এ শিশুনাগ কি মিসরদেশীয় দিগ্বিজয়ী বীর সিসস্ত্রিশ, বা শিশুত্রশ? এ সকল অতি দুঃসাহসিক অনুমান। এরূপ অনুমানের উপর নির্ভর

২। চণ্ডী ১ অধ্যায়।

করিতে পারিলে, ঐতিহাসিক অনেক অভাবই দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহা কি সঙ্গত? স্বদেশের গৌরব-স্পর্দ্ধী অনেকেই সেরূপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেটা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অযৌক্তিকতার একটি দৃষ্টান্ত দেখ। লঘু ভারত-কার কৃত মাগধপর্ব্বের (৩) পুরাণানুযায়ী লিখনানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনার অতি অল্পকাল পূর্ব্বে, শিশুনাগাধিকার নিরূপিত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য কাল তালিকা অনুসারে সিসস্ত্রিশ খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

আসিরীয় বা আসুর দেশীয় রাণী সেমিরেমিস বা সমিরমা সম্বন্ধে আমায় একজন পরিচিত লোক বলিয়াছিলেন, যে পুরাণ বিশেষে সমির-মার নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন পুরাণে, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই; অতএব আমারও সে কথায় বিশেষ ফল হইতেছে না। প্রবাদ আছে, প্রাচীন শকজাতি সমিরমাকে দেবীরূপে উপাসনা করিত এবং তাহারা যখন ভারতে আগমন করিয়া রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে রাজ্যস্থাপন করে, সেই সময় সমিরমার নাম ও উপাসনাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। (৪)

৩। লঘুভারত রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার পণ্ডিত মৃত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণের প্রণীত। গ্রন্থখানি বৃহৎ, ১৬০০০ শ্লোকে পরিপূর্ণ। উহার উদ্দেশ্য মহাভারতের পর হইতে ভারতেতিহাস বর্ণন করা। পুরাণ আদি বিলোড়ন করিয়া রাজবংশাবলি যতদূর সম্ভব দেওয়া হইয়াছে; অবশিষ্ট—অনুমান, অতি অবিশ্বাস্য প্রমাণ, এবং বিচারবিহীন সাধারণ ঐতিহাসিক কথা ও প্রবাদাদির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। পৌরাণিক অংশে কিছুমাত্র প্রমাণ প্রয়োগ নাই। অতএব ঐতিহাসিক ব্যবহারে এ গ্রন্থ অতি অল্পই উপকারে আসিবার কথা।

৪। স্বদেশে অর্থাৎ আসিরিয়ার সমিরমা পক্ষিমূর্ত্তীতে উপাসিত হইতেন। শকজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রেই সমিরমার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে ঐ উপাসনা ভারতে নীত হইবারই কথা। বিন্‌সেণ্টের উক্তিতে জানা যায় যে পারস্য উপসাগরের প্রবেশ পথে সমিরমার পাহাড়েও লোকে পূজা প্রদান করিত। আরবীয় নাবিকগণ, তাহাদের সমুদ্রযাত্রার কল্যাণের নিমিত্ত, এখানে কৃপাযাচ্ঞা করিত এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি সুসজ্জিত খেলেনা জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ভাসাইয়া দিত। যদি ঐ খেলেনা জাহাজ পাহাড়ের পাথরে লাগিয়া চূর্ণিত ও জলমগ্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলেই তাহাদের বলি গৃহীত হইয়াছে ভাবিয়া আপনাদের যাত্রাকে সুযাত্রা বলিয়া মানিত।

সমিরমার নামে ইহারা সমি-নগর স্থাপন করে। সিন্ধুনদের সাগর সহ সঙ্গমস্থলে এই নগরের অবস্থিতি ছিল। পেরিপ্লুসে উহা মিন্নগর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, জাড়েজা রাজপুতগণ উহাকে সমি-নগর বলিত। পেরিপ্লুসের লেখক যে সময়ে ভারতে আসেন, তখন পার্থিয় (প্রাচীন সংস্কৃত নাম, পরদ) জাতি শকজাতিকে বিদূরিত করিয়া রাজত্ব করিতেছিল। (৬) সমিনগর হইতে অতি অল্প দূরে, পারস্য-উপসাগরের প্রবেশ পথে, একটি পাহাড় ছিল, তাহাও সমিরমার পাহাড় বলিয়া খ্যাত ছিল; ইহা পেরিপ্লুসে বর্ণিত।(৭) ইহা ছাড়া সমিরমা সম্বন্ধে আর কোনই খবর এ দেশে মিলে না।

ভারতে পাশ্চাত্য ভূভাগ সম্বন্ধে উল্লেখ যাহা কিছু পাওয়া যাইতে পারে, তাহা উপরে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য ভূভাগে ভারত সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখের বিষয় দেখা যাউক। আসীরিয় ইতিহাসে সমিরমা, মিসরীয় ইতিহাসে সিসস্ত্রিশ, পারস্য ইতিহাসে খস্রু সাহার তাবর্ত আক্রমণ প্রভৃতি ছাড়া, বাইবেল আদিগ্রন্থে হন্দু, অফির, (৮) ইত্যাদি নামে ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল উল্লেখ খৃষ্ট জন্মিবার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের। বাইবেলের এজিকিয়েল অধ্যায় (৯) ও অন্যান্য স্থানে যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যের নাম আছে, সে সকল দ্রব্যের উৎপত্তিস্থান একমাত্র ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যে হেতু তৎকালে আর কোন দেশে সে সকল শিল্পের অস্তিত্ব ও প্রকরণ পরিজ্ঞাত ছিল না।

ঐতিহাসিক প্রবাদে যদিও সমিরমা, শিশুস্ত্রস্ ও খস্রু সাহার ভারত আক্রমণের কথা অত্যন্তই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু তথাপি ঐ সকল আক্রমণের কথা সত্য ঘটনা মূলক কিনা, তৎপক্ষে অনেক মতভেদ আছে। কতকগুলি ঐতিহাসিক উহা একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া

৬। পেরিপ্লুস ৩৮। পার্থিয় জাতির রাজত্বের চিহ্ন স্বরূপ, এখনও ঐ প্রদেশের নানাস্থানে পার্থিব রাজগণের চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রা সকল পাওয়া গিয়া থাকে।

৭। পেরিপ্লুস ৩৫।

৮। হন্দু, অনুমান সিন্ধু নামের অপভ্রংশ। অফির অর্থে সৌবীর। এতদর্থে মক্ষমূলর কৃত ভাষাবিজ্ঞান পুস্তকের ১ খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯। এজিকিয়েল ২৭।

থাকেন, কতকগুলি আবার ঐ সকল একেবারে উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেন। গ্রীক ইতিহাস-বিদ্ স্ত্রাবো এবং সুবিখ্যাত মিগাস্থিনিস্, উভয়েই এই শেষোক্ত মতস্থ। স্ত্রাবো লিখিতেছেন— (১০)

"কৈরোস্ এবং সেমিরেমিসের আক্রমণ সম্বন্ধে ভারতীয় বৃত্তান্তের উপর কেমন করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে? মিগাস্থিনিসও এই কথা সমর্থন করিয়া থাকেন এবং তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে প্রচলিত ভারতীয় প্রাচীন বিবরণ সকল একেবারেই অবিশ্বাস করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয়গণ আপনারা কখনও বিদেশ আক্রমণ করিতে সেনাবল পাঠায় নাই এবং বিদেশীয়ের দ্বারাও তাহারা কখনও আক্রমিত হয় নাই। কেবলমাত্র অতি প্রাচীনকালে হিরাক্লিস্ ও দিওনিসিয়া (১১) এবং অধুনাতন কালে, আমাদের সময়ে, মাকিডুনিয়গণের দ্বারা আক্রমিত হইয়াছিল। মিসরীয় সিসস্ত্রিস্ এবং ইথিওপিয়ার তিয়ার্কস, ইহারা কেবল ইউরোপ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। * * * * কিন্তু এ সকল দিগ্বিজয়ী বীরেদের কেহই ভারত পর্য্যন্ত আসে নাই। এবং সেমিরেমিস্, যদিও ভারত আক্রমণের কল্পনা করিয়াছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত সরঞ্জাম না হওয়ায় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। পারসাবাসীরা যদিও ভারতীয় হিদ্রাকৈ (১২) জাতিকে তাহাদের সৈন্যভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের

১০। স্ত্রাবো ১৫।১।৬-৮

১১। হিরাক্লিস্ ও দিওনিসিও, এ দুই দেব-বীরের কথা গ্রীকেরা যখন হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহারা হরি ও শিব এই অর্থেই যে বুঝিয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। সুতরাং তাহাদের কর্তৃক ভারতাধিকার বা যে কোন কথা গ্রীকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভারতীয়েরা তাহাতেই সায় দেয়; যেহেতু দেবতাই যখন সব, তখন আর সায় দিতে বাধা কি? কিন্তু গ্রীকেরা তাহাতে যে অন্যরূপ বুঝিয়া লইয়াছিল, তাহা উপরেই প্রকাশ পাইতেছে এবং পরেও প্রকাশ পাইবে। মিগাস্থিনিস আরও বলিয়াছেন যে, (৪৪ সংখ্যক টুকুরা) হিরাক্লিস্ যে ভারত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নস্বরূপ এখনও গবাদি পশুর গাত্রে তাঁহার দণ্ড অঙ্কিত হইয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে তখনও এ দেশে গবাদি পশুর গাত্রে শিবশূল আদি অঙ্কিত হইবার প্রথা ছিল এবং তাহা দৃষ্টেই মিগাস্থিনিসের এরূপ ধারণা হইয়াছিল।

১২ লাসেনের নির্দেশ অনুসারে ক্ষুদ্রক বলিয়া জাতিবিশেষ।

অভ্যন্তরে তাহারা কখনই সেনাবল আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিয়াই, কৈরোস্ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মাসাগিটী নামক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।"

কিন্তু প্রাচীন পুরাবৃত্তবিদ্ ডিওডোরুস্ সিকিউলস ও ক্লিসিয়াস্ এবং আধুনিক সেণ্টমার্টিন (১৩) ইহাঁরা উক্ত ভারত আক্রমণ সমস্তই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেমিরেমিসের ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে যদিও এ পর্য্যন্ত আসীরিয় শিল্পলিপিতে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সেণ্ট মার্টিন বিশ্বাস করেন, যে কালে তাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে। সেণ্ট মার্টিন কৈরোস্ সম্বন্ধে আরও বলেন যে, কৈরোস্ যে ভারত-আক্রমণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক বিশ্বাস-যোগ্য প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাঁহার মতে সেমিরেমিস এবং কৈরোস্—উভয়েরই আক্রমণ ও অধিকার, কেবল সিন্ধুনদের পশ্চিম তট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং তাহাও অতি অল্পদিন হইয়াছিল বলিয়া, বিশেষ কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। প্রাচীন লেখক জষ্টিন্ আপিয়ানের বিশ্বাস যে, দিগ্বিজয়ীদিগের মধ্যে কেবল সমিরমা ও আলেকজণ্ডার, এই দুইজন মাত্র ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে গ্রীকভূমে ভারত কতকাল হইতে পরিচিত ও কি ভাবে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা দেখা যাউক। এতৎসম্বন্ধে মিগাস্থিনিসের ইংরেজী অনুবাদক ম্যাক্রিণ্ডেল কর্ত্তৃক, অনুবাদের অবতরণিকায়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"গ্রীকেরা তাহাদের ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, ভারত বিষয়ে যথার্থ খবর অতি অল্পই রাখিত। এমন কি, তাহাদের বড় বড় কবিকৃত কি মহাকাব্য, কি গীতিকাব্য, কি নাটক, কোথাও, এমন কি, ভারতের নামটা ধরিবারও, উল্লেখ নাই। যাহা হউক, তথাপি তাহারা তাহাদের অতি মানুষিক কাল হইতেই ভারতের অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল; কারণ হোমার দৃষ্টে দেখা যায় যে, গ্রীকেরা তখনও ভারতীয় বাণিজ্য লব্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত, এবং সে সকল দ্রব্যের অনেকের নাম, ভারতীয় নামের অপভ্রংশে উৎপন্ন, যথা কসিতেরাস্ অর্থাৎ টীন (সংস্কৃত নাম

১৩। সেণ্টমার্টিন কৃত গ্রীস, লাটিন ও ভারতীয় ভূগোল, ১৪ পৃঃ; ম্যাক্রিণ্ডেল ধৃত।

কস্তীব), এলিফাস্ অর্থাৎ হস্তিদন্ত (সংস্কৃত পিলু হইতে অপভ্রংশ)। কিন্তু তাহা হইলেও ভারত বিষয়ে তাহাদের ধারণা অস্পষ্ট ও কুজ্ঝটিকাময়ী। তাহারা বিবেচনা করিত যে এই সকল দ্রব্য, পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব্ব ইথিওপিয়া হইতে আসিয়া থাকে; এবং পশ্চিম ইথিওপিয়ার ন্যায়, পূর্ব্ব ইথিওপিয়ার লোক সকলও কাল, যেহেতু তথায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সূর্য্যতাপ পড়িয়া থাকে।"

তাহারা ভারত এবং ইথিওপিয়াকে স্পষ্টরূপে পৃথক্ করিতে না পারায়, ভারত হইতে যে সকল উপন্যাস,উপাখ্যান এবং একপদী,এককর্ণী, ইত্যাদি অদ্ভুত মানব ও জাতির খবর পাইয়াছিল, তাহাদের উৎপত্তি ও অবস্থান গোলেমালে ভারত ও ইথিওপিয়া উভয়েতেই সমানরূপে নির্দ্দেশ করিত (১৪)। ভারতকে, অথবা ভারতজ্ঞান স্পষ্ট না থাকায়, ভারতস্থলীয় পূর্ব্বদিকস্থিত সমগ্র দেশকে, পূর্ব্ব ইথিওপিয়া নামে জানিত। এমনকি বহুপর-বর্ত্তী ঐতিহাসিক হিরোদোতস্ ও ক্তিসিয়াস,—ইহাঁরাও ভারতীয়দিগকে, কখন ভারতীয় কখন ইথিওপিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে, ম্যাক্রিণ্ডেল কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ভারত যেরূপ দূরে ও সম্বন্ধবিহীনবৎ অবস্থিত ছিল, তাহাতে যে তৎ-সম্বন্ধে গ্রীকদের আদিম ধারণা অন্ধকারময়ী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয় যে, মিসরীয় সিসস্ত্রিস্, আসিরীয় সেমিরেমিস, পারসীক কৈরোস এবং তৎ-পরে হিস্তাস্পিসের পুত্র দারাওস্, ইহারা ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করি-য়াছে, অথচ ইহাদের সেই সকল আক্রমণ সূত্রে গ্রীকেরা ভারত সম্বন্ধে কিছুই গণনীয় রূপে জানিতে পারে নাই। যেরূপ ডাক্তার রবার্টসন বলেন, বোধ হয়, তাহারা আপনাপন সভ্যতা গৌরবে, যাহাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া কহিত ও যাহাদের দেশ অতি দূরান্তরে স্থাপিত, সে সকল দেশের লোকযাত্রার প্রতি মনোযোগ প্রদানে তত আবশ্যকতা বিবেচনা করে নাই। কিন্তু যেরূপেই দেখা যাউক না কেন, পারসিক যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষ গ্রীকদিগের নিকট নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল, তাহাতে

১৪। এতদ্বিষয়ের মীমাংসা এবং বিচার, মিগাস্থিনিসের সংগ্রাহক সোযানবাকের লিখিত অবতরণিকায় দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ নাই। ঐ সময়ের পর হইতেই, গ্রীকেরা ভারতের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। মিলেতোস্-বাসী হিকাটেয়স্ই সর্ব্বাপেক্ষা আদি ইতিহাসবিৎ (খৃঃ পূর্ব্ব ৫৪৯-৪৮৬), এবং তাঁহারই গ্রন্থে ভারতের প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।(১৫)

জর্ম্মাণ লেখক সোয়ানবক লিখিয়াছেন যে ভারতীয় যক্ষ, রক্ষ, আদি নানাবিধ ঔপন্যাসিক জাতি ও তাহাদের সম্বন্ধীয় অদ্ভুত উপাখ্যান সকল অতি প্রাচীনকালেই, গ্রীকভূমে নানাসূত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের নাম অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, ভারতীয় দ্রব্যজাত ও উক্ত উপাখ্যান সকল অপরিজ্ঞাত ভাবে গ্রীকভূমে প্রবেশ করে এবং হোমর ও হেসিওদ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সোয়ানবকের মতে স্কাইলাক্সই সর্ব্ব প্রথমে স্পষ্টত ভারতের নাম ও তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। তৎপরে ক্তিসিয়াস ও অন্যান্য লেখকগণ ক্রমান্বয়ে ভারতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কাইলাক্স হইতে ক্তিসিয়াস্ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র অদ্ভুত বৃত্তান্ত ও ঔপন্যাসিক জাতি ও জীব জন্তু বর্ণনাতেই ভারত-বিবরণ পর্য্যবসিত।

ইহার পর উত্তরোত্তর, হিরোদোতস, ক্তিসিয়াস, বৈত, দিওগিনেতোস, নিয়ারখস, ও নেসিক্রিতোস, আরিস্তোবুলস, কালিস্থিনস, দৈখাখোস, এবং মিগাস্থিনিস; ইহাঁদের গ্রন্থে ক্রমেই ভারতবৃত্তান্ত বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহাঁদের অনেকেরই গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে কেবল জনশ্রুতি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। মিগাস্থিনিসের পরেও ইরাতস্থিনিস, হিপার্কস, প্রভৃতি ভারত-সম্বন্ধে অনেক লেখক জন্মিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও প্রায় সকলেই উক্তদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৫। ভারত সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত নামগুলি হিকাটেয়সে পাওয়া যায়, ইন্দস অর্থাৎ সিন্ধুনদ, ওপৈ্য, সিন্ধুনদের ধারস্থ এক জাতি বিশেষ; কালটৈ্য আর এক জাতি, কাস্পাপিরোস্, গান্ধার দেশীয় একটি নগর, সম্ভবত পুষ্করাবতী। কিন্তু অন্যমতে পিউকেলাওটিস্ ও পুষ্করাবতী এক; আরগান্তে—ভারতীয় একটি নগর, স্কিয়াপোদস্, সম্ভবত একপদা নামক একটি ঔপন্যাসিক জাতি।

ফলত উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, অতি পুরাকালে ভারতের নাম গ্রীকভূমে অপরিচিত থাকিলেও, ভারত ও গ্রীস নিতান্ত সম্বন্ধশূন্য ছিল না; যে হেতু দেখা যাইতেছে যে, শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও উপাখ্যান উপন্যাস এবং হয় ত লৌকিক অপর নানাবিধ বিষয়েও, তৎকালে স্পষ্টত বিনিময় চলিতেছিল। নিঃসন্দেহ, এ বিনিময় কার্য্য মধ্যস্থিত জাতি সকলের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্পাদিত হইত। তাহার পর খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ভারতের নাম, গ্রীকভূমে স্পষ্টত পরিজ্ঞাত হয়। তথাপি তখনও উহাকে অনেকে পূর্ব্ব ইথিওপিয়া বলিয়া ভ্রমে পড়িত। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আলেকজাণ্ডারের সময় পর্য্যন্ত, গ্রীসে যে কিছু ভারত বৃত্তান্ত প্রচলিত ছিল, তাহা সমস্তই ঔপন্যাসিক। আলেকজাণ্ডারের পর হইতে ভারত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ও তৎসম্বন্ধে বহুল সত্য বিবরণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। ভারতের নাম যখন গ্রীসে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তখন এটা নিশ্চয় যে মধ্যবর্ত্তী আসিরিয়া, ব্যাবিলন দেশেও ভারতের নাম বহু পুরাতনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বিশেষত ইহা নিরূপিত হয় যে, পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় দ্রব্যের যে বাণিজ্য, তাহা এই সকল দেশের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইত। (১৬) পারস্যভূমে ভারত অতি প্রাচীনতম কাল হইতে পরিজ্ঞাত ছিল, এমন কি অবস্তা গ্রন্থেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। (১৭)

মিসর সম্বন্ধে কোন কথা না ভারতীয় গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায়, (১৮) ন

১৬। গ্রীক এবং হিন্দু, ৫ম অধ্যায়, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য।

১৭। "আমি, অহুরমজদ, পঞ্চদশ সংখ্যক যে উত্তম দেশ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা হপ্তহিন্দু (অর্থাৎ সপ্তনদ প্রদেশ)"—বেন্দিদাদ ১। ১৯।

১৮। আসিয়াটিক রিসর্চের আদি খণ্ডে অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত লিখিত আছে যে, 'মিসর হইতে পুরাকালে অনেক লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, মিথিলা দেশে একজাতি মিসরীয় লোক বাস করে এবং তাহাদের আদিম দেশের নামে এখনও তাহাদিগকে মিছর বলিয়া থাকে।' বলা বাহুল্য যে মিশ্র উপাধিধারী মৈথিলি ব্রাহ্মণ দৃষ্টে এরূপ ভ্রান্ত অনুমান সিদ্ধ হইয়াছে! অথচ তৎকালে উহা অনেকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। সেকালে হউক আর এ কালেই হউক, ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত প্রায়ই উক্তরূপ, অন্তত ভারত সম্বন্ধে। সেকালের প্রমাণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত, আর একালের প্রমাণ, আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল লইয়া ছেলে-খেলা।

ভারত সম্বন্ধে কোন কথা মিসরীয় লিপিতে পাওয়া যায়। মিসরে কেবল একমাত্র প্রবাদ চলিত এই যে, মিসর রাজ শিশুয়েস ভারত জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রবাদ সূত্রে ভারতের নাম মিসরে কত পূর্ব্বে ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। যাহা হউক, ভারত ও মিসরের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আপাতত কিছু দৃষ্ট না হইলেও, এ উভয়ের ধর্ম্মতত্ত্ব ও আচার ব্যবহারের মধ্যে এতই সৌসাদৃশ্য ও ঘনিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সহসাই যেন মনে উদয় হয়, কোন এক সময়ে এ দুই জাতির মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত ছিল। কি উপনিষদের উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব, (১৯) কি সাধারণ দেবতত্ত্ব, কি লৌকিক আচার ব্যবহার,—সকল

১৯। ফরাসী লেখক রেণফ বলিতেছেন, "মিসরীয় কোন বিষয়ই বোধ হয় এত সাব্যস্তরূপে নিরূপিত হয় না, যেমন একই শিক্ষকগণ একাধারে এক দিকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদ, অন্যদিকে বহুদেব বাদ শিক্ষা দিত।" রেণফ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদ ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি ইন্দ্র, যম মাতরিশ্বানমাহু।"—১।১৬৪। যেমন ভারতে, মিসরেও তদ্রূপ, বহুদেবতত্ত্ব সাধারণ গ্রাহ্যের নিমিত্ত বহুতর ব্রহ্মবিভূতির বহুতর রূপকল্পনা মাত্র অথবা অতিবাহিক রূপস্বরূপ। (সেণ্টজাইল লেকচার, দ্বিতীয় স্তবক, পঞ্চম লেকচার।)

জাম্বিকসের উক্তি,—'মিসরের দেবতাগণ ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতিরূপ অথবা প্রকৃতির এক একটি শক্তির রূপ-কল্পনা স্বরূপ। যথা, যিনি আলোক আনয়ন করেন তিনি আমন নামে খ্যাত; প্রজ্ঞার অধিপতি যিনি, তিনি এমেথ নামে খ্যাত, সত্য এবং মেধার অধিপতি ফ্তা; সর্ব্বমঙ্গলকর যিনি, তিনি অসিরিস; ইত্যাদি'। অধ্যাপক রলিন্সনের উক্তি— 'কোন মিসরীয় পুরোহিতই, অথবা পুরোহিত কেন, অপরাপর শিক্ষিত লোকেরাও, লৌকিক দেবতাদিগকে প্রকৃতই এক একটি পৃথক দেবতারূপে ভাবিত না। খেম, ক্লেফ, ফ্তা, মৌত, খোত বা আমন, যাহাকেই উপাসনা করা হউক না কেন, সে সমস্তই এক ঈশ্বরেই অর্পিত হইত। ঈশ্বরেরই বিশেষ বিশেষ বিভূতি অনুসারে ঐ সকল পৃথক দেব কল্পিত হইয়াছে মাত্র।, ইহার সহিত ঋগ্বেদস্থ মন্ত্র মিলাইয়া দেখ,—"সুপর্ণম্ বিপ্রা কবয়ো বচভিরেকম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" সাধারণ লোকে দেবতত্ত্ব লইয়া থাকিত, কিন্তু শিক্ষিত যাহারা তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মধ্যানে রত হইত। জেমস ডডধৃত রুজ কর্ত্তৃক উক্ত কতকগুলি মিসরীয় তত্ত্ববাক্য সহ হিন্দুশাস্ত্রীয় বাক্যের সাদৃশ্য দৃষ্ট কর,—

বিষয়েতেই অতি সুন্দর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এমন কি নামের পৃথকত্ব ও দুই চারিটি আচার ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য পরিত্যাগ করিলে, মিসরীয় ও ভারতীয় মধ্যে কিছুই পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

মিসরীয়।	ভারতীয়।
"ব্রহ্ম একমাত্র, তাঁহার দ্বিতীয় নাই।"	"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব।" উপনিষদ।
বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত প্যাপিরসের লিপিতে,— "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, শাশ্বত, যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও তাঁহাতেই লয় হইবে।"	"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি।" অথবা, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রত্যভি সংবিশন্তি।"
টুরীণে রক্ষিত প্যাপিরসের লিপিতে,— "যে কিছু পদার্থ তুমি নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহারা তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমি স্বীয় প্রভাবেই সঞ্চরণ করিয়া থাক।"	"তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।" "স্বেন রূপেণাভি নিষ্পদ্যতে।"
"হে ঈশ্বর, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার পিতা নাই, মাতা নাই, তুমি জন্ম রহিত, পুরাতন, তুমি স্বীয় প্রতি প্রভাবে প্রকাশমান।"	"না জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণঃ।"
"স্বর্গ পৃথিবী তারতে তোমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকে, যে পথ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ, তাহারা সেই পথেই ভ্রমণ করে, কদাচ তাহা হইতে স্খলিত হয় না," ইত্যাদি।	"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতিপঞ্চম।" অথবা "যদিদং কিঞ্চজগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যতং।"
"তিনি বাক্য মনের অতীত।"	"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

পাশ্চাত্য ভূভাগ সম্বন্ধে ঐ পর্য্যন্ত। এক্ষণে পূর্ব্ব ভূভাগের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্ব ভূভাগে -গণনীয় এক চীন রাজ্য।(২০) কিন্তু হিন্দু-গ্রন্থে এখানেও সেই অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব। বৈদিক সময়ে ঐরূপ, তবে রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে দেখা যায় যে চীন ভারতে অপরিচিত ছিল না, কারণ চীনের উল্লেখ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সময়ে চীনরাজ্যের সহ ভারতের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল, এবং ভারতীয়গণ প্রায় চীনরাজ্যে যাতায়াত করিতেন। ভারতীয়দিগের নিকটেই চীনবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব উপদ্বীপ ভারতীয় জ্যোতিষিক গ্রন্থে ভদ্রাশ্ববর্ষ নামে খ্যাত; কিন্তু কেবল ঐ নাম মাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীন ও পাশ্চাত্য দেশে ভারত কতদূর পরিজ্ঞাত ছিল, তাহারই আলোচনা যখন মূল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তখন আর সে বিষয় লইয়া এ অবতরণিকায় অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ভারতে প্রাচীনকালে যত যত দিগ্বিজয়ী বীর ও পরিব্রাজকগণ আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহা দেওয়া যাইতেছে।

"আমি স্বর্গের নির্ম্মাতা,
অতি গূঢ় গুহ্য দ্বিবিধ দৃশ্য
তুমি আমা হইতেই উদ্ভূত।"

এ দ্বিবিধ গূঢ় গুহ্য দৃশ্য তুমি কি? শক্তি বা মায়াতত্ত্বরূপ তন্ত্র মিসরে পরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া কি এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় না?

এক্ষণে দৃষ্ট হইবে যে ভারতের ন্যায় মিসরেও অতি উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব সকল পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, এবং তথায়ও ধর্ম্মবিদ্‌গণ ভারতীয় ঋষিদিগের ন্যায় সম্মানিত ও সর্ব্বকার্য্য পরিচালক স্বরূপ ছিলেন।

যেরূপ উপরোক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অপরাপর বিষয়ে এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়েও ভারতের সহ মিসরের অতি সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

২০। চীন অতিশয় প্রাচীন রাজ্য। খৃঃ পূঃ ২৭ শতাব্দী হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এক মিসর ও ভারত ভিন্ন, অন্য কোন রাজ্য যে এত পুরাতন ছিল, এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে ২৬৯৭ খৃঃ পূঃ সম্রাট হোয়াংতে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন এবং তিনিই চীনদেশে লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন এবং আকাশ পর্য্যবেক্ষণের জন্য লিংতৈ অর্থাৎ একটি মাণমন্দিরও স্থাপিত করিয়াছিলেন।

য়ুরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার।

২।
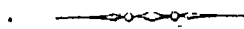
খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্ব নিরূপণ করাই আমার অভিপ্রেত; বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের মধ্যে উক্ত ধর্ম্মই প্রধান ও তন্মতাবলম্বী লোকেরা পদার্থজ্ঞান এবং সভ্যতা বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু কোন্ প্রাচীন জাতির নিকট হইতে ইউরোপ ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন, ইতিহাস লেখকেরা তাহা বলিতে অক্ষম।

পূর্ব্ব পরম্পরা শ্রুত আছে, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মুষিহকে ধর্ম্ম কথা সকল লিখিয়া পাঠাইলেন, সে লিপি হিব্রু অক্ষরে ছিল, হিব্রু স্বর্গীয় দেবভাষা!। পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে অনেক ভিন্নতা আছে; এটি পৌরাণিক বিবরণ, এ প্রকার বর্ণনা পূর্ব্বতম লোকে বিশ্বাস করিতেন; বর্ত্তমান সময়ে "আপ্তবাক্যে" (Revelation) সকলে বিশ্বাস করেন না, বিশেষত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের লক্ষণ দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ইহার বিলক্ষণ সন্নিকৃষ্টভাব রহিয়াছে, আমরা উভয় ধর্ম্মকে সহসা স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কোন্ মূল হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, পুরাতত্ত্ব আলোচনা ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না, সেই হেতু এতদ্বিষয়ের ক্রমশ আলোচনা করা যাইবে। সত্য যেখানে থাকুক প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি প্লেতোতত্ত্বে হিন্দুদর্শনের বহুতর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, আর্য্যঋষিগণ জ্ঞান দ্বারা অন্তর ও বহির্জগৎ কল্পনা করিয়াছিলেন, এই হিন্দুভাবটি প্লেতোতে বিদ্যমান আছে।(১) ইহা বড় বিস্ময়ের কথা যে, হিন্দুদিগের অধিকাংশ তত্ত্বকথা প্লেতোর ফিলেবস্, ফেদ্রস, পিমিয়স্, ও রিপব্লিকাতে আছে। কোথাকার দর্শন কোথায় নীত ও কাহার খ্যাতির হার কে ধারণ করিয়াছে? প্লেতোতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্বতই ইহা মনে উদিত হয়। আত্মা এক দেহ হইতে ভিন্ন দেহ আশ্রয় করে, ইহাতে হিন্দু-

১। "Plato supposed two worlds, the world of matter and the world of mind, the visible and the ideal world.

যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তিপ্রকরণ ৫। ৬ শ্লোক।

দর্শনের বিলক্ষণ গন্ধ রহিয়াছে, সেই গন্ধ আমরা প্লেতোতেও বিলক্ষণ অনুভব করি।(২)

গ্রীক্ দার্শনিকেরা মনকে (Nous) ঈশ্বর বলিতেন ; এটি গ্রীক্জাতির কল্পনা নহে।(৩)* জীবাত্মা, পরমাত্মা, অন্তর্জগত, বহির্জগৎ, সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রয়ত্ব, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সকলই তাঁহারা ইতালীয় তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।(৪)

এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যেরূপ স্থান প্রাপ্ত হন নাই, ইতালীয় সমাজও বহুকাল ইতালীতে অবস্থিতি করিতে পারেন নাই ; এতদ্দেশীয় বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইতালীয় সমাজও উৎপীড়িত ও যাতনাগ্রস্ত হইয়া গ্রীসদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তথায় প্লেতো প্রভৃতি ছাত্রগণকে স্বধর্ম্মে (ইতালীয় মতে) দীক্ষিত করেন। ইতালীয় ছাত্রগণ কর্তৃক গ্রীসে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।(৫)

২। "The migration of souls from one body to another also formed, as is well known, a leading feature of the Pythagorean doctrine and seems also to have been maintained by Plato"

৩। "মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্বিদঃ।"

"লৌকিক তত্ত্ববাদীরা মনকে আত্মা বলিয়া জানেন, বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন।"

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ বৈতথ্যাখ্য দ্বিতীয় প্রকরণ ২৫ শ্লোক।

৪। "Cicero, in the passage of his treatise 'De Republica' (I C 10) referred to above, seems to consider that the philosophy of Pythagoras (Italian School) formed the main groundwork of Plato's philosophy"

৫। Persecution of the Pythagoreans was followed by a great political movement throughout all the Italian states. Everywhere the Pythagorean houses of assembly were burnt to the ground and the leading citizens banished This persecution of the Pythagoreans and their political principles was the cause and occasion of the appearance of so many philosophers of this sect in Greece proper H. Ritter. P 348

Some Pythagoreans such as Philolaus fled to Greece where they taught their doctrines and had considerable influence on the philosophy of Plato

অনেকে তর্ক করিবেন, আদি খ্রীষ্টীয়-সমাজ নিওপ্লেতনিষ্টগণ, এই নিওপ্লেতনিষ্টগণের মধ্যে ইতালীয় মতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইহা মীমাংসা কথা নহে। বস্তুত যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পূর্ব্বতন অংশই আলোচনা করিয়া থাকিবেন।(৬) আমরা অনর্থক তর্ক করিতে চাই না। কেবল এই কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্টের শিষ্যগণ খ্রীষ্টীয় নামে অভিহিত না হইয়া প্লেতোশিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন কেন? নিওপ্লেত-নিষ্টরাই ত আদি খ্রীষ্ট শিষ্য ছিলেন।

নিওপ্লেতনিষ্ট সম্প্রদায়ের গুরু এবং মহাগুরুগণ বৌদ্ধ স্থবিরগণের উপদেশ হইতে আত্মাকে উন্নত করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বা-বৃত্তেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।(৭)

গ্রীকদিগের দর্শনশাস্ত্র ছিল না, তাহারা বৌদ্ধ স্থবিরগণের নিকট হইতে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়াছিল।(৮)

৬। "The Pythagorean system was revived at a later period and in the second century of our era it appeared mixed up with the doctrines of the Neo-platonists"

Krische, De Societates a Pythagorean Gottinger

৭। "The expedition which the Emperor Gordian undertook against the Parthians in A. D. 243 furnished an opportunity, which Plotinus had long coveted of forming acquaintance with the sages of the East, whose doctrines were so much commended by the philosophers of the Alexandrian School and were supposed by them to have formed the basis of many of the speculations of their great master Plato."

৮। "Philosophy flourished among the Barbarians (গ্রীক-ভাষায় হিন্দু বুঝাইত) shining from nation to nation, till at last it came to the Grecians"

1 Tatianus
2 Clemens
3 Theophilus
4 Eusebius and others.

Court of the Gentiles P 65 Part I

খ্রীষ্ট মতাবলম্বীগণ যে ইহুদিজাতিকে ধর্ম্মের মূল বিবেচনা করেন, সে ইহুদিজাতির দর্শনশাস্ত্র ছিল না।(৯)

নব্য লেখকেরা কালদির, ফিনিক্ ও মিশরীয় দর্শনের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য ম্যানেথো, বেরোসস, সাঙ্কোনিএথো প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের অসম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন; তাহা প্রকৃত নহে, ঐ সকল লেখক তত প্রাচীন নহেন।(১০)

আদি খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী নিওপ্লেতনিষ্টদল যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তৎকালে প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যার কিরূপ হীনভাব ঘটিয়াছিল, পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই।(১১) অধিকাংশ লোকই অনক্ষর ও অসভ্য ছিল, নানাপ্রকার অসৎ সংস্কারে পরিপূর্ণ, সেই ঘোর অন্ধতম লোকদিগের হীন মস্তিষ্কে নানাবিধ মিথ্যা বোধের ও ভ্রমের উদ্ভব হওয়া আশ্চর্য্য নহে (১২)।

৯। "Of some Asiatic nations, with whose literature we are acquainted, we shall without apprehending considerable opposition, venture to assert that they did not in ancient times possess any species of philosophy Among these we place the Hebrews No one who is fully embued with the spirit of the old Testament writings will scruple to assent to the truth of our assertion."

His. Phil. Ritter 150

১০। "We shall pass over without notice the conjectures formed on the subject of the philosophy of the Egyptians, Phoenicians, Chaldeans because the works and fragments of Manetho, Berosus, Sanchoniatho are in part not free from suspicions as to their genuineness and in part belong to periods when the nationality of these people became extinct and because the ideas and conceptions prevailing in them are of little value philosophically." P. 150

১১। "Philosophy passed its meridian in Plato and Aristotle declined in the Aristotelian systems and set in the darkness of Platoism

১২। But the masses were trained to a superstition with which the Christian Church as the executor of Neoplatonism had to reckon and contend."

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি আমরা দ্বেষ করিতেছি না; সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, যে খ্রীষ্টের উদয় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঘটিয়াছে। অতএব পুরাতত্ত্ব গাঢ় অনুসন্ধান দ্বারা বিষয়টি উত্তমরূপ আলোচনা না করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার কথাই বলিতে পারি না। প্রাচীন দর্শন আলোচনা দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বৌদ্ধধর্ম্ম পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইয়াছিল। যদিও এক্ষণে তাহা লোকে উত্তমরূপ বুঝিতে পারে না, কিন্তু গ্রীকদিগের ও পাশ্চাত্য অন্যান্য জাতির পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে, জানিতে পারা যায় যে, হিন্দু ব্যতীত কোন জাতির দর্শনশাস্ত্র ছিল না। এমন কি মিশর ও পারশ্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে গ্রীকেরা কোন দর্শনশাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই।(১১) পারস্যের ম্যানীচীয় মত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

"By a fortunate coincidence at the very moment when this bankruptcy of the old culture, its reversion to barbarism must have become apparent, the stage of history was occupied by barbaric peoples with whom the work of the passed thousand years passed for nothing '

This has obscured the fact which is nevertheless obvious enough to a keener scrutiny, that the inner history, antiquity ending as it did in despair of this world, must in any event have seen a recurrence of barbarism.

১১। There is no trace, in the oldest times of philosophy, of any Greek having made or procured the translation of a Persian or Egyptian work. Ritter. P. 151.

Thales, it is said, received his doctrines from Egyptian priests. The authorities for this assertion are modern. Plutarch (De Plac, Philos I 3) and Jamblicus (De V Pythag 12)

Ritter, P 154

শ্রীকৃষ্ণচরিত।

(দার্শনিক মত।)

২।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমার এক বলবতী আশা আছে।—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত কল্পতরু। এই কল্পতরুর নিকট যাহার যেরূপ প্রার্থনা, সে সেই-রূপ প্রার্থিত ফল লাভ করিতে পারে। তুমি কৃষ্ণকে ভগবান ভাব, ভগবানের অভাবনীয় ভাব পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইবে—তুমি তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য ভাব, মনুষ্যোচিত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ, কর্ত্তব্যকর্ম্মের দৃঢ়তা অনাসক্ততা ও অধ্যবসায়িতা দেখিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।—তুমি তাঁহাকে অবতার ভাব, অবতার সুলভ প্রমাণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তি উপহার প্রদান করিবে। তুমি তাঁহাকে যে ভাবে দেখিবে—আয়নার মুখ, সেইরূপ প্রকৃত, অনুকৃত, অপ্রাকৃত—তদবস্থই দেখিবে। পক্ষান্তরে তুমি তাঁহাকে গোপীগণ পরিবেষ্টিত রসিকরাজ ভাব, তাহারও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। ফল কথা, সমস্তভাব আদর্শরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে পূর্ণমাত্রায় প্রতিভাত রহিয়াছে। তাই তাঁহাকে কল্পতরু বলিলাম।

দার্শনিক হইলেই যে বেদ মানিতে নাই, এরূপ শুষ্ক যুক্তি হিন্দু দার্শ-নিকগণের হৃদয়ে উত্থিত হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান-যেরূপ যুক্তিযুক্ত প্রমাণ, শব্দও সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ। বিষভোজন করিলে মনুষ্য বাঁচে না, ইহা কয়জন প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কিন্তু আবালবৃদ্ধ বনিতা—সকলেরই বিশ্বাস—বিষ প্রাণ-নাশক। এই বিশ্বাসের মূল শব্দ বা আপ্ত-বাক্য। কেহ পুস্তক পড়িয়া, কেহ বা বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ এই, বিষের প্রানাশক শক্তির প্রত্যক্ষতা অনায়াস সাধ্য, সুতরাং সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তাই লোকে সহজেই বিশ্বাস করে। বেদ প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রত্যক্ষতা বহ্বায়াস সাধ্য, কাজেই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না—লোকের যেমন দর্শন, তেমনি জ্ঞান; কাজেই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না।

কৃষ্ণচরিত বুঝিতে হইলে, বেদ-বোধিত তাদৃশ চরিতবানের চরিত আলো-চনা করা উচিত। কৈবল্যোপনিষদে আছে—

"ধ্যাত্বা মুনি গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষং তমসঃ পরস্তাৎ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনং।

মননশীল উপাসক মহাভূত আকাশাদির কারণ, সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সাক্ষীস্বরূপ বিক্ষেপাদি শক্তিময় অজ্ঞানের অতীত পরব্রহ্ম ধ্যানে প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে সেই উপাসকই কার্য্যকারণ-ভূত ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভবানী দেবীর সহিত শিব, সেই ইন্দ্র, সেই অবিনাশী পরমবস্তু স্বরাট, সেই বিষ্ণু, সেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, সেই কালাগ্নি, সেই চন্দ্র—এক কথায় এই সকল যা' হইয়াছে, যা হইবে, বর্ত্তমানের তো কথাই নাই।

ইহাতে প্রতিপাদিত হইল, সাধনায় সিদ্ধ হইলে স্বয়ং ইন্দ্রাদি হইতে কীট পর্য্যন্ত প্রাণিবৃন্দ হওয়া যায় এবং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ধূলিকণা এবং মহৎ হইতে মহত্তর পর্ব্বত পর্য্যন্ত হওয়া যায়। পাঠক, চমকিত হন, পূর্ব্ব প্রস্তাব পুনর্ব্বার পাঠ করুন।

কৈবল্যোপনিষদের বক্তা পরমেষ্ঠী, শ্রোতা আশ্বলায়ন। পরমেষ্ঠী উপদেশ্য আশ্বলায়নকে প্রবোধ দিতেছেন।

"যৎপরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥"

বিশ্বের আধার স্বরূপ সকল বস্তুর আত্মা যে পরম ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও নিত্যবস্তু, হে আশ্বলায়ন, তাহা তুমি, তুমিই তাহা।

কৃষ্ণ যেমন ভগবদ্গীতায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন,

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"

আমা হইতে জগৎ সৃষ্ট। আমা হইতে জগৎ প্রবর্ত্তিত।

পরমেষ্ঠীও সেই ভাবে গদ গদ হইয়া ব্রহ্মাত্ম দৃষ্টিতে বলিয়াছেন,

"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।"
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহং।"

আমা হইতে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি জগতের উপাদান, অতএব আমাতেই সমস্ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে—আবার আমাতেই ঐ সকল লীন হয়, সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই আমি।

ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, আত্মদর্শিমাত্রই এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এখন দেখিতে হইবে, কৃষ্ণের সাধনার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আছে কিনা। ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণের ব্রহ্মোপাসনার গুরুর পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রা

য়োক্ত্বা উবাচা পিপাস এব সবভূব"।

আঙ্গিরস গোত্রের ঘোর নামক জনৈক ঋষি দেবকীসুত কৃষ্ণকে সেই সমস্ততত্ত্ব বলিলেন, তিনি সেই সকল শুনিয়া সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক, সাধনায় সিদ্ধ কৃষ্ণ মনুষ্য হইয়া কিরূপে অবতার হইলেন।

দৃষ্টান্তের দ্বারা কৃষ্ণের অবতার-বাদ সঙ্গত করি। মৃৎ-পিণ্ডকে মৃৎ-পিণ্ড বলিয়া থাকি। বিবেচনা করিলে তাহাকে কেবল মৃৎপিণ্ড বলা উচিত হয় না; কেননা, তাহাতে যেরূপ মৃত্তিকার অংশ আছে, সেইরূপ জলীয়, তৈজসিক—প্রভৃতি পদার্থ নিচয়ের অংশ আছে। তথাপি মৃদ্‌ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হওয়ায়, তন্নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "ভূয়স্না ব্যপদিশ্যতে" ভূয় অংশের দ্বারাই বস্তুর নামকরণ হয়। কৃষ্ণে ঈশ্বরের ভূয় অংশ আছে, ঈশ্বরগত সমস্তভাব কৃষ্ণে যথাযথ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাই কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণ ঈশ্বর রাজ্যের লোক। আমরা প্রকৃতির অধিকারে বাস করি এবং প্রকৃতির ভাবেই বিভোর থাকি, তাই আমরা প্রকৃতির অবতার বা প্রকৃতির অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম ও আমরা। স্ফুলিঙ্গ যদি অগ্নি হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথক্ হয়, তাহা হইলেই স্ফুলিঙ্গ পদ বাচ্য হয়। সেই স্ফুলিঙ্গ অগ্নির সহিত অভিন্নাবস্থায় থাকিলে অগ্নি নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। উপাধি ভেদেই পদার্থ নিচয় পৃথক্ হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বাষ্পযোগে উৎপন্ন নদী পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া প্রবাহিত হয়। যখন চরমে পরম্পরায় আবার সমুদ্রে পরিণত হয়, তখন যে সমুদ্র, সেই সমুদ্র। এই উপাধির হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইলে ব্রহ্মরূপে পরিণত হওয়া যায়। কৃষ্ণ উপাধিভেদ করিতে পারিয়াছিলেন, বলিয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। কৃষ্ণ পৃথক্ উপাধিতে অবস্থিত,—অথচ উপাধি বিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর হইতে অপৃথক্ হইলেও তাঁহার পৃথক্ নাম হওয়া

উচিত। তাই ঈশ্বর ও ঈশ্বর অবতার—এই ভেদবুদ্ধিজনক নামদ্বয় যুক্ত হইয়াছে।

অবতারবাদ প্রকারান্তরে সমর্থন করিবার চেষ্টা করি। ঈশ্বরের অবিদ্যাদি দোষরহিতত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি যে সকল অসাধারণ গুণ আছে, ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সমস্ত গুণে সমলঙ্কৃত—অথচ ঈশ্বরের অংশ; সুতরাং ঈশ্বর সশরীরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সাধারণের বোধ হওয়ায়, কৃষ্ণ অবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন। অবতার শব্দ প্রকৃতি ও বিকৃতির পরস্পরের অভেদ বোধক শব্দ।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেবচ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং।" ইত্যাদি

গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য—যাহা ভাল জিনিষ, তাহাই ঈশ্বর। অতএব যাহাতে পূর্ণমাত্রায় ঈশ্বরের ভালত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার—ইহার অন্যতর শব্দবাচ্য হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

জয়দেব।

২।

সেন রাজগণের সময় হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশ। তাহার পূর্ব্বের বৌদ্ধবঙ্গকে মধ্য যুগের, এবং আরও পূর্ব্বের বঙ্গকে প্রাচীন কালের বঙ্গ বলা যাইতে পারে; আধুনিক বঙ্গ আট শত বৎসরের। আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতিকাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার কাব্য সঙ্গীতময়; ইহার আমোদ আহ্লাদ, বিলাস কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান ধারণা কীর্ত্তন ভজন,—সঙ্গীতে; ক্রন্দন কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি কবিতাকে আপনার সর্ব্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে, গীতি কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালির গীতিকাব্য বাঙ্গালি বিচিত্র বিমানে অঙ্কিত করিয়া 'এই দেখ' বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলী, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালীকীর্ত্তন, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবিগান, নিধু বাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী, পরিচয়ের স্থল। ইংরাজি সাহিত্যের আগমে বঙ্গ সাহিত্য

নূতন পরিচ্ছদে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতি কবিতা তেমনই উজ্জ্বলা, তেমনই মধুরা। রাজা রামমোহন রায়ের বিবেক সঙ্গীত, সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীত, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত, বেহারীলালের সারদা-মঙ্গল, গোবিন্দ বাবুর যমুনালহরী প্রভৃতি শত সহস্র গান, গীতি ও উচ্ছ্বাস—এখনও জগতে প্রদর্শনের সামগ্রী।

সেই জয় 'জগদীশ হরে!' হইতে, এই 'বন্দে মাতরং', পর্য্যন্ত, সেই—ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে,

মধুকর নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে,—হইতে,

এই—শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী°

ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং,—পর্য্যন্ত,

এক অনন্ত স্রোত, অনন্ত প্রবাহ, অবিরাম গতিতে, অবিচ্ছিন্ন অবয়বে, দু কূল ভাসাইয়া, কুলু কুলু রব করিয়া, বাঙ্গালীর প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির অনুরক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম্ম,—এই আট শত বৎসর সমানে বহিয়া আনিয়া অনন্তের চরণপ্রান্তে নীত করিতেছে। ইহাই বাঙ্গালির জীবন; ইহাই বাঙ্গালির ইতিহাস। আমরা ভাল বা মন্দ, আর পাঁচ জনে বিচার করুন; আমরা যে কি, তাহা অগ্রে আমাদের বুঝা চাই। আমরা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের গোলাম; গোলাম বটে, কিন্তু পিয়ারের গোলাম; মনিবের হাব, ভাব, লীলা, লাবণ্য, রসবস্তু,—সকলই বুঝি; তিনি তাঁহার লীলা খেলা আমাদের দেখাইতে ভাল বাসেন, আমরা দেখিতে ভালবাসি। তিনি হেলিয়ে দুলিয়ে, দুবাহু পসারি, রূপরাশি ছড়ায়ে যান, আর আমরা সেই সৌন্দর্য্যরাশি ভিজায়ে ভিজায়ে, মজায়ে মজায়ে ভোগ করিয়া থাকি।

দুঃখও মজায়ে মজায়ে ভোগ করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের মজা ক্রন্দনে; আমরা দুঃখে মজিতে জানি, কাঁদিতে জানি। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে জানি। গাহিতে গাহিতে সুখ দুঃখের সমাধিদাতাকে ডাকিতে জানি। স্বভাবের সৌন্দর্য্য-বোধের এই উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ দুঃখ সকল সময়েতেই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালির গীতিকাব্য। আর সেই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নিত্যজীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস।

এই অনন্তচারিণী, সুখ-দুঃখ-ভক্তি-বাহিনী সুরধুনী গীতিকবিতার অমৃত-ধারার হরিদ্বার ক্ষেত্র,—জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্ব্বত্রই পূতসলিলা; তথাপি হরিদ্বার সেই পুতবারির পূততম, পুণ্যতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙ্গালির গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে প্রবর শাখা সম্প্রদায় থাকুক, সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙ্গালার গীতিকাব্য একমাত্র জয়দেব গোত্রজ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, যে জয়দেব গোস্বামী হইতে বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্মের রাগমার্গের পরম ও চরম স্ফূর্ত্তি হয়, এবং সেই রাগমার্গ হইতেই মহাপ্রভুর প্রণোদিত ভক্তিমার্গের উৎপত্তি।

জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তিক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য এবং সঙ্গীত-ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাস পদ্ধতি, এবং সঙ্গীত রীতি, আর পাঁচটা জিনিশের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দবন্ধময়ী পদ-লালিত্য সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বঙ্গভাষা সৃষ্টি করিয়াছে।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। * একটু অনুধাবন করিলেই গীতগোবিন্দের শ্রোতারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন যদু-কুল-নলিন-দিনেশ॥
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুর-কুল-কেলি-নিদান।
অমল কমল-দল-লোচন ভব-মোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।

বাঙ্গালির মুখে এরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তন বাঙ্গালা বলিব না ত, কি বলিব?

"চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী"

আর—

"ধীরসমীরে, যমুনাতীরে, বসতি বনে বনমালী"

এইরূপ পদ সকল চিরদিনই আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত হইবে।

---

* ১২৭৯ সালের অর্থাৎ প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনে আমরা এই মত প্রথমে প্রকাশ করি। জয়দেব চরিতে রজনীকান্ত, সেই মতর সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ এবং জয়দেবের জীবনী ও সমালোচনা সমেত যে একখানি উৎকৃষ্ট গীতগোবিন্দ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও বলা হইয়াছে, "জয়দেব বাঙ্গালি কবিগণের আদিগুরু, তাঁহার ভাষা প্রায় বাঙ্গালী।"

'চল সখি কুঞ্জং সমিতির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং'
দূতীর মুখে এইরূপ ভারতী শুনিলে, একটু হাসি পায়; মনে হয়, দূতী বুঝি আপনার উপদেশের গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন জন্যই অনর্থক অনুস্বর দিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত করিতেছে। বাস্তবিক জয়দেবের গানগুলির ভাষা এমনই সহজ, এমনই সরল, এখনই বাঙ্গালার মতনই বটে।

বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানত দুইটি। পয়ার ও ত্রিপদী। ঐ দুইটির লঘু গুরু, ভঙ্গ অভঙ্গ, কুঞ্চিত বিস্তৃত, মিত্র অমিত্র করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন একাবলী আদি যে সকল ছন্দ আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই বাঙ্গালা ছন্দের পরিবার মধ্যে পরকীয়া পরিচারিকা। বাঙ্গালার আসরে, না নাচিতে পারে, না গাহিতে পারে; পাঁচটার মিশালে একটু আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে মাত্র। আসরের যুড়ী—পয়ার ও ত্রিপদী।

জয়দেবের গীত গোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার কোন ছন্দই প্রথমে অক্ষরবৃত্তি ছিল না, সকল ছন্দই মাত্রাবৃত্তি ছিল। দশ হইতে বিশ পর্য্যন্ত এক এক চরণে অক্ষর সংখ্যা থাকিলেও, ছন্দ সাধারণত পয়ার নামে অভিহিত হইত।/ একাবলী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দের পৃথক্ নাম ছিল না। পদ্য মাত্রকেই পয়ার বলা হইত। দুই চরণে এক পয়ার, দুই চরণের শেষের দুই অক্ষরে মিল থাকিবে, আর প্রতি চরণে পাঁচ হইতে দশ যে কোন অক্ষরের পর যতি থাকিলেই চলিবে। যখন চৌদ্দ অক্ষরের চরণ লইয়া পয়ার হইয়াছে, তখনও ছয়, সাত, আট ইহার মধ্যে যে কোন অক্ষরের পর যতি থাকিত। এমন কি ভারতচন্দ্রেও ঐরূপ আছে। জয়দেবের অনেকগুলি গান এইরূপ পয়ার বলিলেই চলে;—

সরস মসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥
দিশিদিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ননলিনমিব বিদলিত নালং॥
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পং॥

ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং।
বালশশিমিব সায়মলোলং॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিত মরণেব নিকামং॥

এইটি চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের, চৌদ্দ বা পনের অক্ষর মাত্র আছে।

ত্রিপদীতে দুই চরণ এবং চরণের শেষে পরস্পর মিল থাকে। প্রতি চরণে দুইটি করিয়া মধ্য যতি থাকে। তাহাতেই প্রতি চরণ ত্রিপদী হয়। দুইটি যতি স্থলে আবার মিল থাকে। জয়দেবে তিনটি ত্রিপদীর গান আছে;— একটির কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, "দিণমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন" ইত্যাদি। এখনকার দিনে ঐটিকে ভঙ্গ ত্রিপদী বলিতে হয়। আর একটিরও দুই চরণ (ধীর সমীরে ইত্যাদি এবং চল সখি কুঞ্জং ইত্যাদি) উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি ত্রিপদী, তবে কোথাও পাঁচের পর, কোথাও ছয়ের পর, মধ্য যতি আছে। তৃতীয়টির ভণিতা এইরূপ,—

ইহ রসভণনে কৃত হরিগুণনে মধু রিপু পদ সেবকে।
কলিযুগ চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ জয়দেবকে।।

ঐ তিনটি সম্পূর্ণ গান, ত্রিপদী। এক আধ চরণ ত্রিপদী অন্য গানের মধ্যেও আছে,—জয়দেবের প্রসিদ্ধ—

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লবমুদারং।

এইরূপ।

জয়দেবের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষণে তাঁহার গান সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীত-নায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিস, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়-দ্রাবিনী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কিনা জানি না। কীর্ত্তনে সমজদার অসমজদার নাই। যে কোন ভাবের মানুষ হও না, ভদ্র অভদ্র, পাষণ্ড ভণ্ড, মূর্খ জ্ঞানী, দুঃখী ধনী, কীর্ত্তন সকলকে সমতলে বসাইবে, হৃদয় গলাইবে; দুই গণ্ড দিয়া দর-বিগলিত ধারা বহাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুঃখের মজা ক্রন্দনে। এখন বলি, ক্রন্দনের মজা কীর্ত্তনে। বাঙ্গালি কাঁদার মজা জানে বলিয়াই কীর্ত্তন পাইয়াছে। আর কীর্ত্তন পাইয়াছে

বলিয়াই, কান্নার মজা বুঝিয়াছে। যে কাঁদে নাই, সে মানুষ নহে, আর যে কীর্ত্তনে কাঁদে নাই, সে বাঙ্গালি নহে। এই কীর্ত্তনের পরিচিত আদি গুরু—জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেবের পদাবলী আজি আটশত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি না, জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ূদের সামগীতি (psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানব জীবনের অত্যদ্ভুত স্ফুর্ত্তি-ব্যঞ্জক বিকাশ, এবং মানব হৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও, সঙ্গীত নহে; তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, দ্রুত বিলম্বিত গতি, এ সকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কিন্তু রাগে তালে, সুরে, লয়ে, ভোরপুর। এই বিগত আটশত বৎসর বাঙ্গালি সঙ্গীত চর্চ্চায় শিথিল প্রযত্ন হয় নাই; বনের মধ্যে বন বিষ্ণুপুর, দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা নানা রাগের ধ্রুবপদ সৃজন করিয়াছে; আর বঙ্গ কেন্দ্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে, সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বত্র গোস্বামী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনের ঐকান্তিকী সাধনা করিয়াছেন। এত সাধনাতেও, আধুনিক কীর্ত্তন কিন্তু জয়দেবকে এক বিন্দু অতিক্রম করিতে পারে নাই। কোরাণের ভাষার মত, জয়দেবের কীর্ত্তন চিরদিনই অনুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে। অথচ একই ভাবে সমানে গীত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি না। জয়দেব আমাদের আদি অথচ চিরকালই জীবন্ত গুরু।

জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে, পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয়।

গান সময়ে গায়কের স্থিতি ও গতির বিভেদ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় গান-পদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে, পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে, নাচাড়ি; বসিয়া গান করিলে বৈঠকী; ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়া গান। যে কোন প্রকারের গান, গায়ক যে কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন এমন নহে; এক একরূপ কেতার গান এক একরূপ ধরণে গীত

হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানত পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি দুই আছে। নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মের গানে, নাচাড়ি খুব বেশী ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা—এই সকল প্রধানত বৈঠকী গান। কীর্ত্তন পত্তনে প্রধানত বৈঠকী। প্রাচীন সখীসম্বাদাদি দাঁড়াকবি বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন পাঁচালি পদ্ধতির বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচালিতে গান থাকে, ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, খানিক তার রাগ-রাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী। পাঁচালিতে যে গান বা 'পদ' থাকিত, তাহার মুখ টুকু ধ্রুব বা স্থির পদ; ইহাকেই ধূয়া বলিত; আর বাকি টুকু অন্তরা। অন্তরায় দুই চারি বা অনেক কলি থাকিত, প্রত্যেক কলির পর ধূয়াটি গায়িতে হইত। ছড়ার পর গান; আবার ছড়া আবার গান, এইরূপ ক্রমাগত থাকে। প্রতি ছড়া ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী গান প্রায় একই ভাবের হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের গান সেই বিষয়েরই ছড়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঁচালি প্রায় ঐরূপই আছে; তবে গানের মুখভাগ এখন আর প্রায়ই ধূয়ার মত করিয়া গীত হয় না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গালার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া, গান, ধূয়া, অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে। তবে বাঙ্গালায় যাহাকে ছড়া বলে, সংস্কৃতে তাহাকে শ্লোক বলিতে হয় এই মাত্র প্রভেদ।* জয়দেব কৃত প্রসিদ্ধ দশাবতার বর্ণনে, "জয় জগদীশ হরে।" এই টুকু ধ্রুবপদ বা ধূয়া। আর;—

---

* বালক কালের মামুলি বিদ্রূপ এই যে, যদি কেহ শ্লোক বলিতে বলিল, অমনই বলিতে হইবে;—

শোলোক মোলোক বাঁশের গোজা।
ভাতটি খেলেই পেটটি সোজা॥

প্রাচীনদের একটি শ্লোক ছিল;—

শোলোক শিখিনু বালক কালে।
শোলোক ভুলিনু ঘর কুটিলে॥

এই সকল স্থলেই শ্লোক অর্থে—ছড়া।

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর,—

ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। প্রতি কলির শেষে ধুয়া ধরিতে হয়— "জয় জগদীশ হরে।" আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া;—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্র-ক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য মাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, তাহার পর সেই বিষয়ের শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে। জয়দেবের দশাবতার বর্ণনের গানটি ছাড়া আর সকল গানেই আটটি করিয়া কলি এবং এক একটি ধুয়া আছে, শেষের কলিটিতে ভণিতা থাকে, তাহাতে ধুয়া লাগে না।

জয়দেবের গান এবং শ্লোকে বিভেদ না বুঝিয়া কচিৎ কোন কোন গায়কে দুই একটি শ্লোকও গান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল ভাল গায়কে * প্রায়ই সেরূপ ভুল করিতেন না।

গীতগোবিন্দ হইতেই যে ধুয়া লাগান গান এবং সেই গান ও ছড়ার মিশালে পাঁচালি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। অন্তত, একথা বলিতে পারা যায়, যে ঐরূপ ছড়া, গান ও ধুয়া মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের সহিত যে গীত-গোবিন্দের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাচাড়ি গান পাঁচালির অঙ্গজ; কিন্তু কখন স্বতন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ। তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ; রামায়ণ, চণ্ডীর গান প্রভৃতির অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

উত্তর পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে "রাম যাত্রা"ই আদি যাত্রা। রামায়ণ, ও রামযাত্রা—একই কথা। অয়ন এবং যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রামযাত্রা নামের অনুকরণে, "কৃষ্ণযাত্রা" কথার সৃষ্টি হয়; ক্রমে অভিনয় মাত্রেই যাত্রা হইয়াছে। রামায়ণের আদি গায়ক

---

* শ্রীযুক্ত গোপাল দাস, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস প্রভৃতি।

কুশ ও লবের নামে অভিনেতা মাত্রের নাম কুশীলব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের (রাম)যাত্রায় এখনও দুই জন বালক কুশীলব, প্রধান গায়ক। এই দুই বালক অভিনেতার অর্থাৎ কুশীলবের অনুকরণে বাঙ্গালায় যাত্রার যুড়ী হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আদিযাত্রা রামযাত্রা হইলেও, ইদানীন্তন বঙ্গে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কুশীলবের পরিবর্ত্তে শ্রীদাম সুবলের যুড়ী * করিয়া কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়। বোধ হয় প্রথম যাত্রায় কালীয়-দমনের পালা গীত হইয়া থাকিবে, নহিলে পূর্ব্বে কৃষ্ণযাত্রা মাত্রকেই কালীয়দমন বলিবে কেন? যদিও জয়দেবের বহুকাল পরে, বঙ্গে কালীয়-দমনের সৃষ্টি হয়, তথাপি জয়দেবের পদাবলী কালীয়দমন যাত্রার জান ছিল। প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী তাঁহার পর বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন, মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাজন পদাবলীও আবৃত্ত, গীত ও ব্যাখ্যাত হইত। এখনও নীলকণ্ঠ গীতরত্ন সেই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালার কবিগান প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত, ঠাকুরণ বিষয়, সখী-সম্বাদ, বিরহ ও খেঁউড়। তাহার মধ্যে ঠাকুরণ বিষয় কেবল বন্দনা বলিলেই হয়, আর দুর্গোৎসব সময়ে বিশিষ্ট লোকের ভবনে কবিগান হইত বলিয়া ঠাকুরণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী, অষ্টমী, বিজয়া প্রভৃতি গীত হইত। খেঁউড়, কবির পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, বাঙ্গালার রুচির গুণে, কবিগান যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া বসিতেছিল, তখন ইহার পুচ্ছধারী হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং কবির প্রধান অঙ্গ সখীসম্বাদ ও বিরহ।

দেখিতে গেলে গীত-গোবিন্দের বার আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূলগ্রন্থারম্ভ সখীসম্বাদে; "রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী।" ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস বসন্ত-সময়-বন বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পও সখ্যুক্তি; "সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং"। ইহাতে শ্রীহরির রাস বিলাস বর্ণন।

* অনেকে অনুমান করেন, শ্রীদাম সুবল এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির নাম। কিন্তু শ্রীদাম সুবলের পুরাতন গান, যেন শ্রীদাম সুবলের উক্তিতেই শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহার একটি সুবৃহৎ গান শ্রীদাম সুবলের উক্তিতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় একবার শুনিয়াছিলাম—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই মনে নাই; আর কাহারও নাই কি?

দ্বিতীয় সর্গ, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গ, শ্রীহরির স্বগত বিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে, শ্রীহরি সমীপে সখী সম্বাদ। পঞ্চমে, রাধিকার নিকট সখীসম্বাদ। ষষ্ঠে, আবার শ্রীহরি নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণনা। সপ্তমে, রাধিকা স্বগত। সপ্তমের দ্বিতীয় কল্প, সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি, আবার স্বগত। অষ্টম, রাধাকৃষ্ণ সংবাদ। নবমে, সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধ দান। দশম, শ্রীহরি কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্প, সখীসম্বাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্য্যন্ত, মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম জয়দেবের বার আনা ভাগ সখী-সম্বাদ, তবে মাথুর সখীসম্বাদ জয়দেবে নাই। জয়দেবের সখীসম্বাদের প্রায় অর্দ্ধেক বসন্ত ও বিরহ বর্ণন। সুতরাং এ দিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখী সম্বাদের ভাবভঙ্গি এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সঙ্গৃহীত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ সমালোচনায় আমরা একরূপ বুঝিতে পারিতেছি, যে, বাঙ্গালার কি কীর্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি, অল্প বিস্তরে, কোন না কোন বিষয়ে, জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট নদানত।

জয়দেব, এক দিক দিয়া দেখিলে, যেমন বঙ্গের গীতি-গঙ্গা স্রোতের হারদ্বার স্বরূপ,—আমাদের মূল প্রস্রবণ, চির মহাজন, মহাগুরু এবং আদি কবি। সেইরূপ অন্য দিক দিয়া দেখিলে, সংস্কৃতরূপ বিশাল ভারত সাগরে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ আমাদের গঙ্গা-সাগর। হরিদ্বারই বল, আর গঙ্গা-সাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্য তীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারতসাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও, আমাদের নিজস্ব সাগর; আমাদের কুল-প্লাবন, কুল-পাবন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের সহজ-লভ্য নমুনা। সেই ঘন নীল-জলদোপম সতত চঞ্চল জল রাশির উপরি সহস্র খণ্ডে খণ্ডীকৃত শুভ্র স্ফটিক রাশি নিয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—সেই সহস্র-রশ্মির সহস্র কিরণ লক্ষ লক্ষ জল কণার অবয়বে নিয়ত প্রতি-ফলিত হইয়া মধুরে উজ্জ্বলে, নানা বর্ণ বিকীরণ করিতেছে,—সেই নীল সলিল পৃষ্ঠে সমীরণের অপরূপ লীলা খেলা,—আর সেই অবিরাম গতি সমীরণের অঙ্কে সলিলের আনন্দ কুন্দন,—সেই অবয়ব আসঙ্গনে মাদো-

গণের জলকেলি,—আর সেই সাগরচর বকপাঁতির বক্ররেখায় বিচরণ—সকলই গঙ্গাসাগর হইতে দেখিতে পাই। সেই অনন্ত কুল-কুল-স্বরে প্রাণ ভরিয়া উঠে, সেই অনন্তদৃশ্যে নয়ন ভরিয়া যায়, আর সেই অনন্তের অনন্তদেবের আমেজ পাইয়া প্রাণ আকুল হয়। জয়দেব আমাদের এই গঙ্গাসাগর, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত সাগরের সুন্দর নমুনাও বটে, সহজলভ্য নিকটস্থ পন্থাও বটে। গীতগোবিন্দ হইতে সংস্কৃত কোমল কাব্য সাগরের সেই বিশাল, নীল, উজ্জ্বল, তরল, রসাল ছটা আমরা কিছু কিছু উপলব্ধিকরিতে পারি, এবং ক্রমে সেই পন্থা দিয়া মহাসাগরে নীত হইতে পারি।

মধুর কোমল কান্ত রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে কঠোর বা উৎকট রসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সমগ্র গীত-গোবিন্দ মধ্যে, দুই চারিটি মাত্র স্থলে উৎকটের একটু আধটু আভাস আছে, একটি স্থলের উপমা অতুল্য, অমূল্য।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং॥

একটি উপমায় যেন জগৎ জাগিয়া উঠে, সেই উজ্জ্বল, বিশাল, ঘোরাল, করাল কেতু-করবাল দেখিয়াছি বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনকারী কল্কিমূর্ত্তিও চোখের উপর ভাসিতে থাকে। বারটি অক্ষরের ভাবে যেন আকাশ যুড়িয়া আছে; স্বর্গ মর্ত্তে যেন সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, হিন্দুর আশা যেন ফুটাইয়া দিতেছে। বলিহারি উপমা, আর বলিহারি কবিত্ব!

জয়দেবের ললিত কোমল কান্ত পদ বিন্যাসের গুণে চির প্রসিদ্ধ উপমা সকলও নব কলেবর ও নব রস ধারণ করে; তাঁহার 'অনিল-তরল কুবলয় নয়ন', 'বিকসিত-সরসিজ-ললিত মুখ', 'স্থল জলরুহ রুচি কর চরণ', 'নিকষ-কনক-রুচি শুচি বসন',

'প্রচুর পুরন্দর ধনু রনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশং',
'শশিকিরণচ্ছুরিতোদর জলধর সুন্দর সকুসুম কেশং'
"রাধা বদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গং
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গং।"

এ সকলই সুন্দর ও মনোহর।

তাঁহার—করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত শিঞ্জিত-কামিনী নৃত্যপরা গোপিনীর বিলাস বর্ণন,—আর, পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে,—পাখীটি

নড়িলে, পাতাটি পড়িলে, নায়িকার আগমন আশঙ্কা করিয়া, যে নায়ক চকিত নয়নে ক্ষণে ক্ষণে পথপানে চাহিতেছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা প্রকৃতি শত-বিধ চিত্র—সকলই বিচিত্র। বনস্থলীর বসন্ত প্রভাতের মত সেই সকল চিত্র নিয়তই আপন আপন ভাবে ভোর হইয়া হাসিতে থাকে, আর ভাবুকের মনে ধীর মলয় সমীরে মৃদু মন্দ ভাসিতে থাকে।

জয়দেবের বসন্ত বড় জীবন্ত, বড় রসবন্ত। প্রকৃতির বসন্তে যেমন পুরাতন প্রায় শীত-শুষ্ক জগৎ আবার জীবন্ত রসবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, জয়দেবের কবিত্বগুণে, কাব্যের চির প্রসিদ্ধ চির পরিচিত, চির ব্যবহৃত পুরাতন সাধন সকল আবার তেমনি নবজীবন্ত হইয়া উঠে। মলয় সমীর কবি গুরু বাল্মীকি হইতেও পুরাতন, তবু যখন সেই মলয় সমীর কুসুমিতা ললিতা লবঙ্গ লতাকে ধীরে ধীরে দুলাইয়া, ভ্রমর ভ্রমরীর গুঞ্জনের সহিত আপনার প্রাণ মিশাইয়া বনস্থলীর কুঞ্জ কুটীরে সমাগত হয়, কে বল এমন আছে, যে একবার আহা বলিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ না করিবে! বকুল-তলায় বকুল ফুল চিরদিনই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু তবু বকুলের থোলো থোলো ফুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর পড়িয়া, অমন জটাধারী যোগীর মত বকুলকেও আকুল করিতেছে,—শুনিলেই পুরাতন বকুল যেন নব-কলেবর ধারণ করে। বসন্তে সকলই বিকশিত, প্রফুল্লিত, চালিত, কুজনিত; এ সকল কথাই পুরাতন, সকল কথাই জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি শুনিতে পাই, যে জগতের আজি লজ্জা গলিয়া গিয়াছে, তাই ছোট চারাটি, ক্ষুদে লতাটি, বৃহৎ বটবাজি, গম্ভীর বন, অনন্ত আকাশ, সকলেই হাসিতেছে, সকলেই নাচিতেছে, সকলেই গাহিতেছে, সকলেই মাতিয়াছে, তাহা হইলে বসন্তের বসন্ত বুঝিতে পারি, জয়দেবের কবিত্ব চিনিতে পারি: বুঝি যে,—

> শ্রীজয়দেব ভণিত মিদ মুদয়তি হরিচরণ স্মৃতি সারং
>
> সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন মনুগত মদন বিকারং।

জয়দেবের সম্যক্ পরিচয় প্রদান আমাদের অসাধ্য। আমরা পূর্ব্ব মাসের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে জয়দেবের রাগ মার্গ অবলম্বনে বঙ্গে ভক্তিমার্গের অবতারণা হয়। বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদি গুরু জয়দেব গোস্বামী। এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বঙ্গের কবিত্ব সাহিত্যের পরিবার সকলই জয়দেব গোত্র-সম্ভূত; আমরা জয়দেবের নিকট চিরঋণ-

গ্রন্থ, তিনি আমাদের মহাজন, তাঁহা হইতে গীতি কাব্যের উৎপত্তি—তিনি আমাদের হরিদ্বার, তিনিই আমাদের মহাসাগরের মহাপন্থা, আমাদের মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর। বঙ্গের সাহিত্য জগতে জয়দেব আদি গুরু; তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্ম্ম জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা; চৈতন্য দেব প্রদীপ্ত সূর্য্য। এই চন্দ্র সূর্য্যের আলোক উত্তাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের দিবা বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।

সিংহের উপাধি বিতরণ।

কস্মিংশ্চিদ্বনে ভাসুরকো নাম সিংহ প্রতিবসতি স্ম। কদাচিৎ তাঁহার প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, "হে পশুপতি! মনুষ্যলোকে রাজবর্গ আপন আপন প্রজাবর্গকে এক্ষণে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিতেছে। অতএব পশুলোকে কেন তাহা হইবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব হে শ্বেত-পুরুষ সাম্রাজ্য-ধ্বজ-বিহারিন্ মহাকেশরিন্! শশ-মূষিক-চর্ব্বণকারিন্! প্রসীদ! প্রসীদ! প্রসন্ন হও! আমাদের উপাধি প্রদান কর। তোমার মসৃণ কেশর-দাম চিরকুঞ্চিত হউক! তোমার শিলা-স্ফালন-কর্কশ মহালাঙ্গুলের চিরন্তন পরিপুষ্টি হইতে থাকুক।"

তখন পশুরাজাধিরাজ শ্রীমান্ ভাসুরক দংষ্ট্র-ময়ূখ জালে গিরি গহ্বর কানন কুঞ্জ কান্তার প্রভৃতি প্রভা-ভাসিত করিয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না উপাধি ব্যতীত তোমাদিগের এই সকল দীর্ঘায়ত, শ্রীমান্, কোমল, বিচিত্র, এবং লোমশ লাঙ্গুল সকল, ফলশূন্য লতার ন্যায়, এবং পতাকাশূন্য বাঁশের ন্যায়, জনসমাজে সম্যক সম্মানিত হয় না। অতএব হে বনচারি-বৃন্দ! তোমরা উপাধি গ্রহণ কর।"

তখন সেই কাননারণ্য-প্রমথন-কারী বনচারী-বৃন্দ সহস্র সহস্র জিহ্বা নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক তুমুল গর্জ্জনের সহিত রাজাজ্ঞার অনুমোদন করিল। তখন কাননেশ্বর শ্রীমান্ ভাসুরক, যথাবিধি উপাধিশাস্ত্র অবগত হইয়া প্রজাবৃন্দকে উপাধি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

পশুশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রকে অগ্রে সম্বোধন করিয়া, মৃগেন্দ্রবর আজ্ঞা করিলেন, "হে শার্দ্দূল! বলে, ছলে, কৌশলে, তুমি সর্ব্বপ্রধান। আহারে, প্রহারে, সংহারে, এবং অপহারে তোমার তুল্য কেহই নাই। তুমি দংষ্ট্রী, তুমি নখী, তুমি চোর, এবং তুমি গর্জ্জনকারী,—এজন্য অগ্রে তোমাকেই উপাধি প্রদান করিব। এই ভারতভূমে প্রায় সর্ব্বপ্রদেশই রাত্রিকালে তোমার ভয়ে ভীত—স্বল্প পরিমিত নাগরিক প্রদেশ ভিন্ন, ভারতের সর্ব্বত্রই রাত্রিকালে তোমারই আযত্ত। এজন্য আমি তোমাকে উপাধি দিলাম—"Night Commander of the Indian Empire"

ব্যাঘ্র মহাশয় সন্তুষ্ট চিত্তে, রাজপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দে লাঙ্গুলাস্ফালন করিলেন। তখন, রাজা সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বিষধর! তুমি মহাবীর। তোমার তুল্য বীর আর দেখি না। বরং ব্যাঘ্রের নখদংষ্ট্রা হইতে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু তোমার বিষ-দন্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। শক্রবস্তু তুমি এই মহা-বল-বিক্রমশালী শার্দ্দূল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে জানা যায়। শার্দ্দূল কেবল বনে বনে শক্র নিপাত করেন—কিন্তু তুমি গৃহে গৃহে। এই ভারতভূমে রাত্রিকালে কে তোমার সঙ্গ ছাড়া? অতএব হে নিঃশব্দ-সঞ্চারী রাত্রিচর তোমাকে "Night Companion of the Indian Empire" উপাধি দেওয়া গেল।

ক্ষুদ্রজীবী ভুজঙ্গমের এরূপ সম্মানে প্রধান প্রধান পশুগণ অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন মহাকায় ভল্লুক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি উপাধি পাই না?"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ভল্লুক বলিল, "আজ্ঞে, আমি The Great Bear"

তখন পশুরাজ বলিলেন, "আর পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি হইলে "Grand Commander of the Star of India"

ভল্লুক একটি মার্জ্জারকে দেখাইয়া বলিল, "এই কাবুলি বেরালটির কি হইবে? এটি আপনারই আশ্রিত।"

পশুরাজ বলিলেন, "Companion to the Star of India."

কুকুর বলিল, "তবে আমি কি?" পশুরাজ বলিলেন "Companion to the Comets of India"

এইরূপে অন্যান্য পশুগণ নানাবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইলে পর, সভায় গর্দ্দভ-মণ্ডলী সহসা ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বিকট শব্দ, দীর্ঘকর্ণ, আরূঢ় কেশর, এবং স্থূল উদর দর্শন করিয়া রাজা সভাপণ্ডিতের নিকট কারণ-জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন রাজ-সভা-পণ্ডিত নিবেদন করিলেন যে উহারা উপাধি প্রার্থনা করে। পশুরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? এই মূঢেরা কি উপাধি পাইবার যোগ্য?"

সভাপণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহারা

মূঢ় বটে। মূঢ়ের গুণ বিচার করিয়া উপাধি প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক।”

পশুরাজ। সে কি প্রকার?

সভাপণ্ডিত। মুহ ধাতু হইতে মূঢ় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূঢ়ের গুণ মোহ।

শুনিয়া মৃগেন্দ্রবর আজ্ঞা করিলেন, “ইহাঁরা মহামোহোপাধ্যায় হউন।”

শুনিয়া গর্দ্দভ-মণ্ডলী আহ্লাদে তুমুল ঘ্যাঁকঃ ঘ্যাঁকঃ শব্দ করিল। মহারাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন আর কতকগুলি সভ্যতা-ব্রত-নিষ্ঠ উচ্চাসনস্থিত সভাসদ্—বৃক্ষশাখা সকল হইতে কোমল-বল্লী-সন্নিভ দীর্ঘ-সংসর্পিত লাঙ্গুলশ্রেণী বিমুক্ত করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীমণ্ডল পবিত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগের হেম-কলধৌত-সন্নিভ মসৃণ লোমাবলী, অগ্র-পাকে নিয়ত-গভীর-কৃষ্ণ হাণ্ডিকা, তত্তুল্য সদৃশ বদন মণ্ডল এবং করচরণ, এবং সর্ব্বোপরি আনন্দোৎসব-দিবস-রস-বিকাশকারী পতাকা শ্রেণীতুল্য উর্দ্ধোত্থিত লাঙ্গূলমালা সন্দর্শন করিয়া কেশরীরাজ প্রীত হইলেন, এবং প্রীতিব্যঞ্জক হাস্য-হুঙ্কারে কানন-বিটপী সকল কম্পিত করিয়া কহিলেন, “ভো ভো বানরাঃ! অহং প্রীতোস্মি। তোমরাই আমার রাজ্যের গৌরব। তোমরা প্রভুভক্ত, রামচন্দ্রাদি প্রাচীন রাজগণ তাহার সাক্ষী; তোমরাই ধনবান্, কেননা তোমরা গাছেরও পাড, তলারও কুড়োও; এবং তোমরাই আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ, কেননা ডালে ডালে বেড়াও। আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে উপাধি-বিশিষ্ট করিতেছি—তোমরা “মহারাজা” এবং “রাজা বাহাদুর” বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিখ্যাত হইবে। তোমাদের জয় হউক, তোমরা সচ্ছন্দে কিচির মিচির কর, এবং পুরুষানুক্রমে লাঙ্গুল বিক্ষেপ-বিসর্পাদির দ্বারা বনবাসীবৃন্দের মনোহরণ করিতে থাক।” তখন কিচির মিচির হুপ্ হাপ্ ইত্যাদি কৈষ্কিন্ধ্য জয়ধ্বনিতে রাজাবণ্য পরিপূর্ণ হইল।

উচ্চস্থ মহাশয়দিগের অভিনন্দন-নিনাদ কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে রাজা প্রতিহার-ভূমে কিঞ্চিৎ অস্ফুট এবং দীন-ভাবাপন্ন কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন। প্রতিহারীবর্গ ছুঁচাকে সেই মহাসভাতলে সমাগত দেখিয়া রুষ্টভাবে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু সর্ব্বসমদর্শী সেই পশুনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, এবং আজ্ঞা করিলেন, যে “এই পশুকে তোমরা গুণহীন বা উপাধির অযোগ্য বিবেচনা করিও না। ইনি বিনীত, লজ্জাশীল, এবং সৌরভ * পরিপূর্ণ। বিশেষ ইনি ধনবান্। অনেক গোলা লুট করিয়া ইনি ধন ধান্যে আপনার বিবর পরিপূর্ণ করিয়াছেন। অতএব মনুষ্য লোকের প্রথানুসারে ইহাঁকে “রাজা” উপাধি প্রদান করা গেল।”

তার পর, মহাকোলাহলের সহিত সেই মহতী রাজসভা ভঙ্গ হইলে, সভ্যগণ উর্দ্ধ লাঙ্গুল হইয়া স্ব স্ব বিবরাভিমুখে গমন করিলেন।

---

* Lingua Vulgaris—সৌরভ।

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } বৈশাখ ১২৯৪। { ১০ম সংখ্যা।

বাঙ্গালার শেঠবংশ।*

শেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত—প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা,
লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ। জাহ্নবীর মত—
শত মুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদ রাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন ছার!)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।

নবীন চন্দ্র।

ভারতে যত দিন ইংরাজদিগের অধিকার থাকিবে, ততদিন ভারত ইতিহাস হইতে, শেঠদিগের নাম বিযুক্ত হইবে না। বাদশাহী আমলের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে শেঠেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা আজ কাল বিলাতী রথস্‌চাইল্ডের নাম স্থির কর্ণে শুনিয়া থাকি—কিন্তু, শেঠেরাই আমাদিগের দেশের বাদশাহী আমলের রথস্‌চাইল্ড ছিলেন। ভারতের—বিশে-

* ঐতিহাসিক মূলভিত্তির উপর প্রাচীন রেকর্ড প্রভৃতি ও জনশ্রুতির সাহায্যে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

যত আর্য্যাবর্ত্তের, সকল প্রদেশেই তাঁহাদের বহুদূর বিস্তৃত কারবার ছিল। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের, প্রধান প্রধান নগরীতে বাঙ্গালার শেঠদিগের গদী ছিল। সে সময়ে আজ কালকার ন্যায় এত ব্যাঙ্কের প্রাদুর্ভাব ছিল না, একমাত্র শেঠদিগের গদীতেই ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইত। সে কার্য্য যে অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত ও বিশ্বস্তভাবে সম্পাদিত হইত,—তাহার পরিচয় কেবল বাঙ্গালার শেঠদিগের "জগৎশেঠ" (Banker of the World) উপাধি হইতেই, বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে স্থাপিত,—বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবগণের সাহায্যে ও রক্ষকতায় পরিপুষ্ট,—ও অন্যান্য প্রাদেশিক জমিদারদিগের হিতেচ্ছায় সম্মানিত হইয়া, বাঙ্গালার শেঠগণ এক সময়ে, সমগ্র বাঙ্গালার,—এমন কি ভারতের রাজনৈতিক জগতে, প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে ইঁহারা যতদূর দিল্লীশ্বরদিগের প্রসাদ-ভাজন, ও বঙ্গীয় নবাবদিগের সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন, এতদূর সেই সময়ের অন্য কোন ধনী সম্প্রদায় হইতে পারেন নাই। মোগল রাজবংশের অবনতির সময়ে, বঙ্গীয় নবাবগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শেঠগণ অতিশয় প্রতাপশালী ও বিত্তবান হইয়া উঠেন।

শেঠ বংশের এই প্রকার অভ্যুদয়ের সময়ে,—তাঁহারা বাঙ্গালার নবাবদিগের কোষাধ্যক্ষতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সরকারী তহবিলের আদায়ী টাকা, বা নবাদিগের নিজস্ব ধন রত্নাদি শেঠদিগের গদীতেই থাকিত। বাদশাহগণ শেঠদিগের নিকট হইতে এই সময় হইতে নানাবিধ সাহায্য লাভ করিতেন। বাঙ্গালার জমিদারদিগের ত কথাই নাই। সুবাদারের খাজানার টাকা অকুলান হইলেই শেঠদিগের গদীতে তাঁহাদের লোক পাঠাইতে হইত। বস্তুত এই সময়ে বঙ্গদেশে—কি রাজস্ব সংগ্রহে,—কি রাজকোষ সংরক্ষণে,—কি রাজস্বের বন্দোবস্ত কার্য্যে,—কি রাজনৈতিক মন্ত্রণাদানে,—সকল কার্য্যেই শেঠগণ মধ্যে মধ্যে নবাবকে সাহায্য করিতেন। বাঙ্গালার জমীদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি, সুন্দর সংস্করণ শেঠদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। এ প্রকার শুনা গিয়াছে যে বঙ্গীয় নবাবগণ, কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া কাহারও সর্ব্বস্বাপহরণ বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলে, শেঠদিগের মধ্যস্থতায়, তাঁহারা সেই

সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেন। অথবা যখন বাঙ্গালার নবাবগণের উপর দিল্লীর বাদশাহগণ, কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন তাঁহারা শেঠদিগকে বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার ক্রোধ মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার কয়েকটি বিখ্যাত রাষ্ট্রবিপ্লবেও শেঠগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যে অনল দুর্দান্ত সেরাজের রাজত্ব সময়ে, গৃহে গৃহে ধূমায়িত হইয়া, একটি দিগন্তব্যাপিনী জলন্ত শিখার আয়োজন করিতেছিল—ও যাহা প্রদীপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে, বাঙ্গালার দিকপালগণ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন—যে বহ্নির সহস্রমুখী প্রচণ্ড শিখায় দুর্দান্ত, প্রতাপশালী বাঙ্গালার শেষ যবন ভূপতি, রাজ্যচ্যুত হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন—যে বহ্নির, সুদূরব্যাপী ধূমে, বাঙ্গালার যবনদিগের সুখ-সূর্য্য চিরকালের মত, নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, যে মহাযজ্ঞের অনল জ্বালিতে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, মন্ত্রী রায়দুর্লভ, সেনাধ্যক্ষ মীরজাফর, মহারাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন—সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে, বাঙ্গালার শেঠগণও কোনত্রুটি প্রকাশ করেন নাই। জনশ্রুতি এই,—যে সেই গুপ্তমন্ত্রণা সভায় এই স্থির হইয়াছিল—"বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হইবে, জগৎশেঠ তাহার সমস্তই যোগাইবেন। পরে সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল হইয়া আসিলে, সকলেই স্ব স্ব অংশমতে দেয় মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিবেন।" আবার কেহ কেহ বলেন—শেঠেরা ইংরাজদিগকে অর্থ সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এবং নির্দ্ধারিত সময়ে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করায়, ক্লাইব সেনা বৃদ্ধি করিয়া পলাশীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, সেরাজের অক্ষৌহিণী পরিমেয় সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হন।

শেঠেরা যে বাঙ্গালার মধ্যে তৎকালে বিশিষ্ট ধনী ছিলেন—তাহার আরও অনেকে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামার সময়, যখন বাঙ্গালার, ধনী দরিদ্র জমিদার কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল—সেই সময়ে শেঠেদের গদীর উপর মারহাট্টা বর্গীদিগের নজর পড়ে। নবাব আলিবর্দ্দী তখন নিজেই বর্গীদিগের জ্বালায় বিব্রত সুতরাং

শেঠেরা বহুযত্নে আত্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের গদী রক্ষার জন্য নবাবের যে সমস্ত সৈন্য নিয়মিত থাকিত, তাহার উপর নবাব বিশেষ সাহায্য করেন, তথাপি বর্গীরা জোর করিয়া গদী আক্রমণ করে। প্রায় দুই কোটির উপর টাকা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়। এই অসম্ভাবিত ক্ষতিতেও শেঠেরা কোন মতে ভীত, বা দুঃখিত হন নাই—বা ইহাদ্বারা তাঁহাদের কারবারের কোন অনিষ্ট হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বর্ক পার্লিয়ামেন্টের সমক্ষে একবার বলিয়াছিলেন—"Their (the Setts') transactions were as extensive as those of the Bank of England" এ কথা আজ কাল ভারতের এ ঘোর দরিদ্রতার দিনে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কথা কপোল-কল্পিত উপাখ্যান নহে—অতীতকালের সুখময় স্মৃতি ও সত্য ঘটনা মাত্র।

বাঙ্গালার শেঠবংশ বাঙ্গালী নহেন। কিন্তু অনেক দিন বাঙ্গালায় বাস করাতে বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা, যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশ হইতে বাণিজ্যার্থ আসিয়া ভারতের নানা স্থানে—বিশেষত দিল্লী ও মুরশীদাবাদে আপনাদের ব্যবসা বিস্তার করেন। যে মারওয়ারী জাতি, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আজও বিখ্যাত, বাঙ্গালার শেঠেরা সেই মারওয়ারী। ইঁহারা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ও তাঁহাদের মধ্যে "শ্বেতাম্বর" শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন; পরে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময় হইতে, দুই শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের শেঠদিগের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, হীরানন্দ শাহ নামক একজন মারওয়ারী ভাগ্য পরীক্ষার্থ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হন। পাটনার তখন সুখ-সমৃদ্ধির অবস্থা—দক্ষিণ গাঙ্গ প্রদেশের বাণিজ্যের এক প্রকার কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পর্টুগীজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইংরাজ প্রভৃতি সকল প্রকার বিদেশীয় জাতি এই সময়ে পাটনায় নানাবিধ কারবার করিত। হীরানন্দ এই স্থানে আসিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা পাঠকগণের সৌকর্য্যার্থ শেঠদিগের একটি বংশাবলী প্রদান করিলাম।

জগৎশেঠদিগের বংশাবলী।
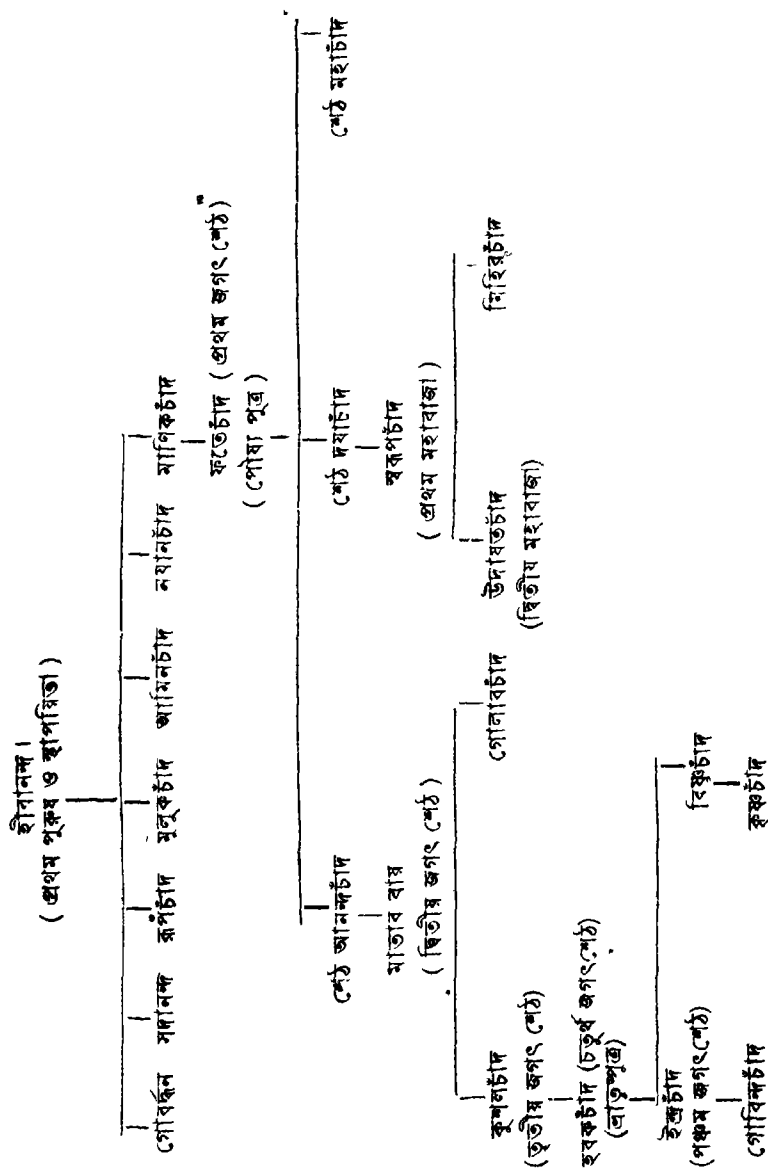
জনশ্রুতি মুখে এইরূপ শুনা যায়, যে হীরানন্দ অতি সামান্য অবস্থায়, স্বল্প সম্বল লইয়া পাটনায় আগমন করেন। তিনি কি প্রকারে স্বল্প মূলধনে বহুতর ধন সঞ্চয় করিলেন, এ বিষয়ে নানা প্রকার কাহিনীর উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে একটির উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রামাণিক হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সামান্য সম্বলে, হীরানন্দ পাটনায় আগমন করেন। প্রথম প্রথম এই দুই একজন প্রধান গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে, তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। যাহার কাছে যান, সেই অবিশ্বাস করিয়া নূতন লোক রাখিতে চায় না। এক দিন মনকষ্টে পীড়িত হইয়া তিনি নগরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে গমন করেন। অন্যমনস্ক ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে একটি ক্ষুদ্র নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল—গগনে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল—হীরানন্দ মনের সেই উত্তেজনাময় ও নিরাশ অবস্থায়, প্রকৃতির চন্দ্রালোকিত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আরও বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেই বিজন বনে গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা যাতনা-ব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল—তিনি সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া এক ভগ্নময় ক্ষুদ্র অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। সেই অট্টালিকার মধ্য-প্রকোষ্ঠে এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু অবস্থায় সেই প্রকার আর্ত্তনাদ করিতেছিল—হীরানন্দ তাহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন—কিন্তু সেই শুশ্রূষায় কোন ফল হইল না—সেই মুমূর্ষুর জীবন-দীপ ক্রমশ নির্ব্বাপিত হইল। হীরানন্দের সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ মুমূর্ষু—মরিবার প্রাক্কালে গৃহের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কি দেখাইয়া দিয়া—তাহার অব্যবহিত পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল। হীরানন্দ সেই ভগ্নপ্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ সমুদায় সঞ্চিত ধনের অধিকারী হইলেন। যদিও জনপ্রবাদ মাত্রেই আস্থা প্রদান করা যায় না—তথাপি এই প্রকার গল্প হইতে এই অনুমান করা যায় যে, হীরানন্দ কোন আকস্মিক উপায়ে বা ঘটনাবশে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরে তাহা বাণিজ্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সামান্য ব্যক্তির ন্যায় তিনি পাটনায় আসিয়াছিলেন—কিন্তু মরিবার সময় তাঁহার সাত পুত্রকে প্রচুর ধনরাশি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান। তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও বাঙ্গালার নানা স্থানে গদী স্থাপন করেন।

হীরানন্দ হইতে শেঠেরা আপনাদিগের বংশস্থাপয়িতা প্রথমপুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ তাঁহার পুত্র মাণিকচাঁদ হইতেও তদ্রূপ করেন। ফলত উভয়ই এক কথা। মাণিকচাঁদ হীরানন্দের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র,—ও ইনিই স্বীয় বুদ্ধিবলে শেঠদিগের নাম আরও যশস্বী করিয়া যান। হীরানন্দের সাত পুত্রের মধ্যে মাণিকচাঁদই বাঙ্গালায় আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ঢাকায় মাণিকচাঁদের প্রথম কুঠী স্থাপিত হয়। এই জন্য মাণিকচাঁদকে অনেকে বাঙ্গলার শেঠবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মাণিকচাঁদের সময়ে ঢাকা বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল—তখন এই স্থানে সুবাদারের রাজধানী ছিল—সুতরাং মাণিকচাঁদ বাণিজ্যের এ কেন্দ্র স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। স্বল্প দিনের মধ্যেই তিনি সুবাদারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া একজন প্রধান ও গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল পরে বাণিজ্যের বাজারে ঢাকার পতন হইল—মুরশীদকুলী খাঁ বাঙ্গালা বিহারের সুবাদার হইয়া ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া মুরশীদাবাদে আনিলেন (১৭০৪ খৃঃ)। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদ শেঠও মুরশীদাবাদে উঠিয়া আসিলেন।

মাণিকচাঁদের সময় হইতেই আমরা শেঠদিগের সহিত বাঙ্গালার নবাবগণের প্রথম সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট মুরশীদকুলী খাঁ নানা কারণে ঋণী ছিলেন। এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর, বাঙ্গালায় সুবেদার নিয়োগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, মাণিকচাঁদ মুরশীদকুলী খাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া, সুবাদারির জন্য আবেদন করিতে বলেন। মাণিকচাঁদের সহায়তায় সাহসী হইয়া মুরশীদকুলী খাঁ প্রচুর অর্থ বাদশাহকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া বাঙ্গালার সুবাদারি লাভ করেন। এই কারণেই হউক, বা অন্য কারণই থাকুক, তাঁহার সহিত নবাব মুরশীদকুলী খাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মুরশীদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইল—মাণিকচাঁদ নবাবের কোষ-রক্ষক ও প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন। প্রকাশ্য রাজকার্য্য ছাড়া নবাবের গোপনীয় কার্য্য সম্বন্ধেও মাণিকচাঁদের হস্তক্ষেপ চলিত। মুরশীদাবাদে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইবার কিয়ৎকাল পরে তিনি নবাবকে সেই স্থানে একটি টাঁকশাল স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, নিয়মিত সময়ে সেই টাঁকশালে নূতন মুদ্রা

মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই সময়ে বাঙ্গালা ও বিহারের জমীদারেরা মাসে মাসে সুবাদারের নিকট খাজনার টাকা পাঠাইয়া দিতেন, সেই সমস্ত টাকা, মাণিকচাঁদের হাত দিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইত। কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন, বাঙ্গালা বিহারের সংগৃহীত সমস্ত রাজস্ব এই প্রকারে মাণিকচাঁদের হাত দিয়া (বাৎসবিক এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের উপর টাকা) মুরশীদাবাদ হইতে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। নগদ টাকা পাঠানর অনেক অসুবিধা বলিয়া দিল্লী ও আগরাতে মাণিকচাঁদের অন্যান্য ভ্রাতাদিগের যে গদী ছিল, তাহাতে হুণ্ডী পাঠান হইত, তাহাতে রাজস্ব স্বল্প সময়ে নিরাপদে গিয়া দিল্লীর রাজকোষ পূর্ণ করিত। * বাঙ্গালার রাজস্ব সম্বন্ধে মুরশীদকুলী খাঁর সময়ে যে কয়েকটি নূতন সংস্করণ হয়, তাহার অধিকাংশই মাণিকচাঁদের বুদ্ধি প্রসূত †। শেঠ মাণিকচাঁদের নিকট বাঙ্গালার রাজস্ব ছাড়া নবাবের নিজ অর্থও সঞ্চিত থাকিত। মুরশীদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময় শেঠদিগেব গদীতে, তাঁহার নিজ নামে পাঁচ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। ইহা ছাড়া বেগমদিগেব ও অন্যান্য নবাব বংশধরদিগের অর্থও—কার্য্য সৌকর্য্যার্থ এইস্থলে সঞ্চিত হইত।

---

* Stewart 's Bengal. P. 238.

† মুরশীদকুলী খাঁব সময়ে বাঙ্গালা, বিহারের জমিদারদিগের নিকট হইতে প্রতি মাসে মাসে খাজানার টাকা আদায় করা হইত। সমস্ত সংগৃহীত অর্থ, নবাবের নিযুক্ত কর্ম্মচাবীদিগের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া শেঠদিগের গদীতে আসিয়া স্তূপাকাবে জমা হইত। মাণিকচাঁদ, বহুসংখ্যক অশ্ব ও পদাতি প্রহরী বেষ্টিত কবিয়া বাজস্বগুলি, শকট দ্বাবা তাঁহাদের নিকটস্থ প্রধান গদীতে প্রেরণ করিতেন। এই প্রকারে সেই বিপুল রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে পৌছিত। আবার কখনও কখনও বা মাণিকচাঁদ একবারে দিল্লীর বা আগরাব গদীতে হুণ্ডীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইতেন ও সেই স্থান হইতে, অতি নিরাপদে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত বাঙ্গালার রাজস্ব দিল্লীর কোষাগার পূর্ণ করিত। কোন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"এই প্রকারে মাণিকচাঁদের হাত দিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা রাজস্ব স্বরূপ বাঙ্গালা হইতে প্রেবিত হইত"। মুরশীদকুলি খাঁর রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নানাবিধ নূতন সংস্করণ হইয়া ছিল। তিনি প্রাচীন জাইগীরদাবদিগকে,—বহুকাল প্রচলিত বন্দোবস্ত মতে সুবৃহৎ জাইগীব আদি হইতে বঞ্চিত কবেন। তিনি বাজস্ব সংগ্রহেব সৌকর্য্যার্থ বাঙ্গালা বিহাব ও উড়িষ্যাকে ত্রয়োদশটি "চাকলায়" বিভক্ত করেন। এই বিভাগানুসাবে, ভাগিরথীর পূর্ব্ব কূল ছয়টি, পশ্চিম কূল

মাণিক-চাঁদ অতুল বিভব ও অপরিমেয় সম্মান রাখিয়া ১৭২২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। এই অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাচন করিয়া ছিলেন—দিল্লীর গদীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতে চাঁদ অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। কার্য্যকুশল, সুপুরুষ, ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ দেখিয়া নিঃসন্তান মাণিকচাঁদ ফতেচাঁদকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর—দিল্লীর কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার গদীতে আসিয়া পিতৃ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। ইহার সময় হইতেই বাঙ্গালায় শেঠবংশের প্রভুত্ব অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মাণিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি 'জগৎ-শেঠ" উপাধিতে ভূষিত হন—এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, বাদসাহ ফেরোক্শিয়ার, মাণিকচাঁদকে "জগৎশেঠ' উপাধি প্রদান করেন। যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয়—ফতে চাঁদই বাদশাহের নিকট হইতে সর্ব্ব প্রথমে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। যে সময়ে, বাদশাহ ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করেন, সেই সময়ে তৎসঙ্গেই—একটি বহুমূল্য খেলাত—"জগৎশেঠ" শব্দাঙ্কিত, মণিময় শীল,—ও শিরোপা সম্মান চিহ্ন-স্বরূপ প্রদত্ত হয়। এই মোহর আজও জগৎ-শেঠদিগের বংশধরের অধিকারে আছে। বাঙ্গালার নবাব সরকারে ফতেচাঁদের প্রভুত্ব নানা কারণে ক্রমশঃও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিজামতের দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর-গবর্মেণ্টের জন্য শেঠ বংশের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার একস্থলে তৎকালীন শেঠবংশধরের সম্বন্ধে বলিয়া

পাঁচটি ও উড়িষ্যা দুইটি "চাকলায়" বিভক্ত হয়। এই সমস্ত চাকলার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার জমীদারদিগকে নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্য করিয়াই দিনাজপুর, রাজসাহী, নদীয়া বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থলের জমীদারেরা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে, (প্রায় ১৭২৫ খৃঃ) রাজা রামজয়ের হস্তে রাজসাহী, রায় রঘুনাথের হস্তে নদীয়া, রায় রামনাথের হস্তে দিনাজপুর বিভাগের ভার অর্পিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়—যে শেঠ মাণিকচাঁদের পরামর্শে নবাব এই প্রকার বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করেন।

Vide—Sir John Shore's Minute on the Revenues. Appx 'I and Mr. James Grant's Analysis of the Revenues of Bengal. Pt I.

ছিলেন "এই সময়ে ফতেচাঁদ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা ঘটাতে, শেঠদিগের বাদশাহের দরবারে ও নবাব সরকারে অতিশয় প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে। এক সময়ে ফতেচাঁদ বাদশাহ মহম্মদ শাহের এতদূর প্রিয় হইয়া উঠেন, যে বাঙ্গালার সুবেদার মুরশীদ্ কুলীখাঁর সেই সময়ে কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হওয়াতে—বাদশাহ—নবাবের উপর অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ফতেচাঁদকে বাঙ্গালার সুবেদারি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ফতেচাঁদ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই প্রকার অভাবনীয় সম্মানের জন্য বাদশাহকে ধন্যবাদ দিলেন বটে—কিন্তু সুবাদারি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা—আমার পিতা মাণিকচাঁদ বাঙ্গালা বিহারের সুবাদারের অনুগ্রহে এতদূর বিত্তশালী হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বাদশাহের নিযুক্ত সুবাদারের অনুগ্রহেই আজ আমি বাদশাহের সমক্ষে এই প্রকার ভাবে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে সাহসী হইয়াছি—এত দিনের পর পুরাতন সুবাদারকে বঞ্চিত করিয়া বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করিলে, আমাদের প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে, আমি আশা করি বাদশাহ এজন্য আমায় মার্জ্জনা করিবেন। পুনরায় যাহাতে বাঙ্গালার নবাব বাদশাহের প্রসাদভাজন হন, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। বাদশাহ জগৎশেঠের এই উদারতাময় উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হইলেন—ও তখনি তাঁহার আজ্ঞাক্রমে এক ফারমান লেখা হইল। এই ফারমানে, নবাবকে উপদেশ দেওয়া হইল—যে তিনি, বাঙ্গা সম্বন্ধীয় সমস্ত আবশ্যকীয় কার্য্যেই "জগৎশেঠদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন। কারণ ফতেচাঁদ অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদারপ্রকৃতি এবং তাঁহার প্রার্থনাতেই নবাবের অপরাধ মার্জ্জনা করা হইয়াছে।" এই সময় হইতেই,—বাঙ্গালার সুবেদারের সহিত "জগৎশেঠ"দিগের দিল্লীর দরবারে সমান খাতির আরম্ভ হইল—যখন বাদশাহ কোন কারণে বাঙ্গালার নাজিমকে কোন প্রকার উপহার দ্রব্য বা খেলাত পাঠাইতেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠের জন্যও একটি পাঠান হইত। এই প্রকার বাদশাহী সম্মান জগৎশেঠেরা বংশাবলী-ক্রমে কিছু দিন ভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন। মুরশীদকুলী খাঁর বংশধরদিগের প্রতি শেঠেরা চিরকালই সমান সম্মান ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার শেষ বংশধর সরফ-রাজখাঁর ঔদ্ধত্যদোষের ও অবিমৃশ্যকারিতার জন্য ফতেচাঁদ তাঁহার সহিত সমস্ত

।ম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যদি জগৎশেঠগণ এই সময় সরফরাজ খাঁর প্রতি বিমুখ না হইতেন—তাহা হইলে বোধ হয়—আলিবর্দ্দিখাঁ কখনই বাঙ্গালার মন্‌সদে বসিতে পারিতেন না। আমরা নিম্নে এই মনোমালিন্যের কারণ বিবৃত করিলাম।

১৭২৫ খৃঃঅব্দে নবাব মুরশীদ কুলীখাঁর মৃত্যু হয়। নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার মসনদে বসেন। মুরশীদকুলীখাঁ তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলে সুজাউদ্দীন (তাঁহার জামাতা ও সরফরাজের পিতা) কৌশল করিয়া দিল্লী হইতে নিজ নামে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সনন্দ আনাইলেন। সুজাউদ্দিন এই সময়ে মুরশীদাবাদ হইতে বহুদূরে উড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তিনি মুরশীদাবাদে চর রাখিয়া প্রতিদিন মুরশীদকুলী খাঁর, স্বাস্থ্য সংবাদ আনাইতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন—নবাব আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, তখন সসৈন্যে মুরশীদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুত্রও এই অবসরে গদী অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন—কিন্তু সুজাউদ্দীন সহসা মুরশীদাবাদে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। পিতাপুত্রে সেই স্থলে সাক্ষাৎ হইল—পুত্র বেগতিক দেখিয়া গদীতে আরোহণ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন ও পিতার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

সুজাউদ্দীন, অতিশয় সুচতুর লোক ছিলেন। শেঠদিগের উপর তিনি সুতরাং অধিকতর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোষরক্ষকতা ভিন্ন জগৎ শেঠ তাঁহার মন্ত্রণাসভার প্রধান সদস্যপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর কাল বাঙ্গালার মসনদে বসিয়া ছিলেন—এবং সমস্ত সাধারণ কার্য্যই জগৎশেঠের পরামর্শ লইয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এ দীর্ঘকাল মধ্যে কোন বিষয়েই তাঁহাদের মত বিভিন্নতা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁর আমলে, কোন বিপরীত ঘটনাবশে তাঁহার সহিত জগৎশেঠের বিষম মনোমালিন্য জন্মিল। এই মনোমালিন্য হইতেই সরফরাজ রাজ্য ও জীবন হারাইয়া শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইলেন, ও অন্য এক ভিন্নবংশোদ্ভব শাসনকর্ত্তা আসিয়া বাঙ্গালার মসনদ সজোরে দখল করিয়া লইলেন। নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত, জগৎ শেঠের মনোমালিন্যের কারণ দুই তিনটি শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার মধ্যে একটিরই উল্লেখ করিব।

ফতেচাঁদের পুত্রের, খুব সমারোহের সহিত বিবাহ হইল। নবাবের নিজ সমারোহ ভিন্ন মুরশীদাবাদে এতাদৃশ সমারোহ কেহ কখন দেখে নাই। ফতেচাঁদের পুত্র-বধূ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার কমনীয় রূপের কথা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এক জন গিয়া নবাবের কাণে তুলিল—"জাহাপনা জগৎশেঠের পুত্রবধূর ন্যায় রূপবতী রমণী বাঙ্গালাতে নাই, যেখানে যাই, সেই স্থানেই তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতে পাই।" নবাবের কৌতূহল ও কামপ্রবৃত্তি এই ঘটনায় একত্র জাগরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি জগৎশেঠদিগের ক্ষমতাকে মনে মনে ভয় করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, নবাব ততই সেই সুন্দরী রমণীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে এক সময়ে, অদমনীয় প্রবৃত্তি-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, জগৎশেঠের নিকট স্বীয় মনোবাসনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ও এই জন্য তাঁহাকে অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নবাব জানিতেন—যে ইহাতে শেঠবংশের মস্তক অবনত হইবে, তাঁহাদের নিষ্কলঙ্কিত বংশগৌরব কলঙ্কিত হইবে—কিন্তু তথাচ তাঁহার দুরাশা পরিতৃপ্তির জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক দিন পাল্‌কী পাঠাইয়া জগৎশেঠের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পুত্রবধূকে বেগম-মহলে আনাইলেন—সেই অনিন্দিত-রূপরাশি, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন—কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নি ভাবিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহস করিলেন না। ফতেচাঁদের পুত্রবধূও সসম্মানে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহার সতীত্ব অক্ষত রহিল বটে, কিন্তু জগৎশেঠদিগের বংশগৌরব ইহাতে অবনত হইল *। নবাবের এই দুঃসাহসিক ও অন্যায় কার্য্যে ফতেচাঁদ তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন—এ প্রকার লোক মসনদ অধিকার করিয়া থাকিলে, হিন্দুমাত্রেরই মঙ্গল

---

* Orme's History of British India Vol ii pp 29, 30, 31

ফতেচাঁদের পুত্রবধূর সহিত নবাবের সাক্ষাৎ ঘটনা শেঠদিগের বংশধরেরা একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—সরফরাজখাঁ শেঠদিগের নিকট তাঁহার পিতার ও পিতামহের গচ্ছিত সমস্ত টাকা একবারে দাবি করেন। এই প্রকার অসঙ্গত দাবিতে, শেঠেরা দুই এক দিন ইতস্তত করিতে থাকেন। এই ঘটনাসূত্রে নবাব তাঁহাদের কোন প্রকার অপমান-সূচক কথা বলাতে, তাঁহারা তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী আলিবর্দ্দিকে সহায়তা করেন।

নাই ভাবিয়া নবাবের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উপায়ান্বেষণে তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না—আলিবর্দ্দিখাঁ (মহাবৎজঙ্গ) অদূরেই সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রচুররূপে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, শেঠদিগের গোপনীয় সহায়তায় তিনি প্রকাশ্যরূপে নবাবের বিপক্ষে সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে গিয়া নবাব সরফরাজখাঁ রাজ্যের সহিত দগ্ধ হইলেন। গড়িয়াতে নবাব-সৈন্যের সহিত আলিবর্দ্দির একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে নবাব সরফরাজ হস্তীর উপরেই গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন এবং বিজয়ী মহাবৎজঙ্গ আলিবর্দ্দি উপাধি ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসেন। আমাদের প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি যে শেঠেরা বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ রাজ্যবিপ্লবে কয়েকবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ঘটনা হইতে তাহা বিশেষরূপ প্রতিপন্ন হইল। তাঁহারা এ সময়ে সহায়তা না করিলে, নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ কখনই প্রতিকূল ঘটনাস্রোত অতিক্রম করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে পারিতেন না।

নবাব আলিবর্দ্দির সিংহাসনারোহণের প্রথম বৎসর হইতেই বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। নবাব মধ্যে মধ্যে স্বয়ং দুই চারি দল সেনা লইয়া গিয়া—তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া আসিতেন—আবার তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া গাঙ্গপ্রদেশে প্রবেশ করিত। এক দিন সংবাদ আসিল, চল্লিশ সহস্রেরও উপর বর্গী আসিয়া দেশে প্রবেশ করিয়াছে। চারি দিকে সুতরাং হুলস্থূল পড়িয়া গেল—অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল—সকলেই স্ব স্ব সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার উপায় করিতে লাগিল—এমন কি স্বয়ং নবাবই তাঁহার নিজ তহবিলের অধিকাংশ ধনরত্নাদি গঙ্গার পরপারে এক নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে নবাব সসৈন্যে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। নবাব এক দিক দিয়া তাহাদের তাড়াইতে লাগিলেন—আবার অন্য দিকে তাঁহারা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বেগে দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১৭৪২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই বর্ষা আসিয়া পড়িল—বর্ষায় বর্গীরা ভাগীরথী পার হইতে সাহস করিল না। এই প্রকারে বোধ হয় কিছু দিন ইতস্তত করিয়াই তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে ফিরিতে হইত—কিন্তু মীরহবীব নামক কোন উচ্চ পদস্থ মুসলমান, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা

তাহাদিগকে, গঙ্গাপার হইবার উপায় বলিয়া দিলেন। ভাগীরথীর পর পারে আসিয়াই তাহাদের কিয়দংশ সৈন্য মীরহবীবের উপদেশ ক্রমে মুরশীদাবাদে ধাবিত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।—মুরশীদাবাদ তখন অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, নবাব কাটোয়ায় আসিয়া বর্গীদের অপেক্ষা করিতেছিলেন—সুতরাং অনায়াসেই সেই অরক্ষিত নগরী ও শেঠদিগের প্রধান গদী লুণ্ঠিত হইল। যে চৌথ প্রত্যাশায় এই বিপুল মহারাষ্ট্র সৈন্য বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছিল—শেঠেদের গদী লুণ্ঠনে তাহারা তদপেক্ষা অধিক ফললাভ করিল। জনশ্রুতি যে এই লুণ্ঠনে এক শেঠদিগের গদী হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা অপহৃত হইয়াছিল।

আলিবর্দ্দি খাঁ শেঠদিগের সহায়তায় বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের সমস্তাংশই তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবের সহিত কাটাইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি নিজে বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও অনেক বিষয়ে জগৎশেঠের নিকট পরামর্শ লইতেন। প্রতি বৎসর মতিঝিলের প্রাসাদে যে পুণ্যাহ হইত, তদুপলক্ষে বরাবরই খুব সমারোহ হইত। কৃষ্ণনগর, রাজসাহী, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থলের জমীদারেরা ও চাকলাদারেরা এই পুণ্যাহে স্বয়ং হাজির হইয়া খেলাত লইতে আসিতেন—নবাবকে নানাবিধ বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন। মুরশীদাবাদ এই সময়ে কোলাহলময় হইয়া উঠিত, এবং কয়েক দিবস ব্যাপিয়া কেবল, নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত হইত। এই মহৎ সমারোহের সময় প্রকাশ্য দরবারে, জগৎশেঠ সুবাদারের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া সময়োচিত কার্য্যাদি করিতেন। নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর—সকল কার্য্যেরই একটা বাঁধাবাঁধি ছিল—বিশৃঙ্খলা ও বিলাসিতা বলিয়া দুইটি শব্দ তাঁহার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার দৈনিক কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে কোন মুসলমান ইতিহাস লেখক যাহা লিখিয়াছেন—আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "নবাব অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নমাজপড়া শেষ করিতেন ও তৎপরে কয়েকটি নির্ব্বাচিত সভাসদ ও আত্মীয়বর্গের সহিত একত্রে কাফি পান করিতেন। দিবালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নবাব দরবারে বার দিয়া বসিতেন ও এই সময়ে রাজ্যের ছোট, বড় সকলেই, স্ব স্ব অভিযোগ ও প্রার্থনাদি তাঁহার নিকট পেশ করিত। দুই তিন ঘণ্টা রাজকার্য্যের পর পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন।

এই সময়ে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াইস্ মহম্মদ * ও দৌহিত্র (মির্জা মহম্মদ) সেরাজউদ্দৌলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এই অবকাশে মৌলবীরা ও কবিরা নানাবিধ বয়েৎ ও কবিতা রচনা করিয়া নবাবকে শুনাইতেন। কবিতা পাঠ শেষ হইলে, নবাব নিজে গিয়া খানা, তদারক করিতেন ও বাবুর্চ্চিদিগকে তাঁহার মুখরোচক খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে আহারাদি শেষ হইলে, নবাব শয়ন করিতে যাইতেন ও সেই সময়ে দুই জন লোক তাঁহার নিকট নানাবিধ আশ্চর্য্য গল্প করিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণের সহায়তা করিত। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ হইত। কোরাণ পাঠের পর উপস্থিত মৌলবীদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রালাপ ও বিচারাদি হইত—ও তাঁহারা চলিয়া গেলে জগৎশেঠ তাঁহার অধীনস্থ বিশিষ্ট কর্ম্মচারিদিগের সহিত আসিয়া তাঁহার নিকট বসিতেন। জগৎশেঠের মুখ হইতে নবাব, এই সময়ে দিল্লীর সংবাদ ও অন্যান্য স্থলের ঘটনাদি শ্রবণ করিতেন। সেই সমস্ত শুনিয়া আবশ্যক মতে হুকুমাদি প্রদান করিতেন। আবশ্যকীয় হিসাবপত্র এই সময়ে দেখা হইত—ও আবশ্যক হইলে রাজস্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার গোপনীয় কথোপকথন হইত। ইহার পর জগৎশেঠ নবাবের বাসনামত, রাজকার্য্য সম্বন্ধে আবশ্যকীয় হুকুমাদি দিতে নিজগৃহে প্রস্থান করিতেন। জগৎশেঠ প্রস্থান করিলে, বিদূষক ও নর্ত্তকীরা আসিয়া নবাবের মনোরঞ্জন করিত। এবং রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে, নবাব—কোন মহলে প্রবেশ করিতেন।”. এই বিবরণ হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হয় যে, জগৎশেঠ মুরশীদকুলী খাঁ ও আলিবর্দ্দি উভয়কেই রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন—এবং এতদ্বিনিময়ে উক্ত সুবাদারদ্বয় তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়েও যে ইংরাজদিগের সহিত জগৎশেঠের সংস্রব ছিল—নিম্নলিখিত ঘটনাটি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে কতকগুলি আর্ম্মাণি সওদাগর অকারণে ইংরাজ হস্তে অত্যাচারগ্রস্ত হয়।

---

* ইনি ঢাকার গবর্ণর ছিলেন—সেরাজ আলিবর্দ্দির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইঁহার বিধবা পত্নী ঘাসিটি বেগমের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নবাবের নিকট তাহারা অভিযোগ করিলে--নবাব প্রমাণাদি দ্বারা তাহা-দিগকে যথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। (১৭৪৯) সৈন্যগণ আসিয়া কাশীম-বাজারের কুঠী ঘেরিয়া ফেলিলে—ইংরাজেরা ভীত হইয়া নবাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শেঠদিগের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। * আরও ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে লিখিত কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত এক খানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আলিবর্দ্দির রাজত্বকালে, ইংরাজেরা কলিকাতায় একটি টাঁকশাল স্থাপনের চেষ্টা দেখিতেছিলেন— ডাইরেক্টর সভা লিখিয়া পাঠাইলেন, এই কার্য্যে যত খরচ হউক না কেন—নবাবের অনুমতি প্রার্থনার জন্য যেন বিশেষরূপে চেষ্টা করা হয়। তদুত্তরে প্রেসিডেণ্ট লিখিলেন—এই কার্য্য গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে। নবাবের নিকট এ কথা উঠিলে তিনি আগে জগৎশেঠের এ বিষয়ে সম্মতি জিজ্ঞাসা করিবেন। এরূপ স্থলে জগৎশেঠ যে সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রতিকূলতা করিবেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই—কলিকাতায় টাঁকশাল হইলে, তাঁহার লাভের ব্যত্যয় ঘটিবে—এবং যত টাকা খরচ করি না কেন—আমরা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না। তবে অতি গোপনে জগৎশেঠদিগের অজ্ঞাতসারে দিল্লী হইতে যদি বাদশাহের সম্মতি আনাইতে পারা যায়, তবে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এই কার্য্য কিন্তু অতিশয় গোপনে করিতে হইবে। দুই লক্ষের উপর টাকাও ইহাতে ব্যয় পড়িবে—কিন্তু ঘটনাক্রমে, জগৎশেঠ যদি এই সমস্ত কথা জানিতে পারেন—তাহা হইলে দিল্লীর দরবারেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের কার্য্য নিষ্ফল করিতে পারেন।" †

---

* Selections from the **Unpublished Records of Government** Vol I.

† Report of the Select Committee **Appendix—VI Part I**

মানবীয় কর্ম্ম।

১। কর্ম্ম ফলের আশা।

শুন বাঙ্গারাম, গোটা দুই কথা বলি, কথা গুলা ভাল লাগে শুনিও, না লাগে শুনিও না। তোমার ন্যায় জ্যেষ্ঠত্ব পূর্ণ ধড়িবাজের কোন কথা শুনায় আবশ্যক নাই, তা জানি, তথাপি মন বুঝে না, বিশেষ বয়োধর্ম্ম হেতু।—

'কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, ফলের আশা পরিত্যাগ কর'; —এ কথা ঠিক নহে। এ কথা ঠিক হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্তিই ঘটে না। আশা মানবীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। মহাঘোর, মহা অন্ধকার, মহা বিপদ সাগর, মানব যেখানেই পতিত হউক, আশাই কেবল তাহার একমাত্র অবলম্বন দণ্ড স্বরূপ হয়, কেবল আশাই তাহাকে বিবিধ বিপাক মধ্যে, বিবিধ মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত করিয়া জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। যে আশা এমন, যাহা অন্ধ মানবের যষ্টি অপেক্ষাও অধিকতর, মানবীয় কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে তাহাকে যদি বিতাড়িত কর, তাহা হইলে কি আর কখনও কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে? ফলত আশা মানবীয় জীবনের পরিমাণ এবং কর্ম্মের মূল, উভয়ই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ফলের আশা না থাকিলে কর্ম্ম প্রবৃত্তি, কর্ম্ম প্রণালী, ও কর্ম্ম সম্পাদন, এ তিনই অসম্ভব।

কিন্তু ফলের আশা ও পুরস্কারের কামনা এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। পুরস্কার কামনায় উন্মাদিত হওয়া অতি নীচ প্রকৃতির কার্য্য। যে সার্থক-জন্মা স্থির সৎ কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, তাহার মনে পুরস্কার কামনা স্থান পায় না। সর্ব্বদা তদ্রূপ কামনার অভিঘাত হইতে থাকিলে, কার্য্য এবং ফল, উভয়ই অনর্থ হইয়া থাকে। সৎ আশা কর্ম্মসুসম্পাদন-রূপ ফল মাত্র চাহে।

এখন বলা বাহুল্য যে কর্ম্মারম্ভ করিয়া ফলের আশা পূরা করিবে, তদ্বিষয়ে নীতিবেত্তা হউন আর যিনিই হউন, কাহারই মানা শুনিও না। কিন্তু করিবে না, ইহাতে একটি বিষয়, তাহা এই,—কর্ম্মে সফলতা হইলেও, হর্ষে উন্মাদ হইও না, বা বিফলতা হইলেও বিমর্ষে হত জ্ঞান হইও না, অথবা কিরূপ করিলে লোকে ভাল বলিবে, তাহারি দিকে তাকাইও না। অথবা এক কথায়, সফলতা বা বিফলতা, উভয়েতেই সমভাবে চিত্ত প্রসাদ

যুক্ত হইবে। পুরস্কার কামনা যাহাদের নাই বা তৎপ্রতি যাহারা অনাস্থা যুক্ত, তদ্রূপ সৌভাগ্যবানেরাই সেই রূপ হইয়া ও করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র হইতে মহত্তম, এ সংসারের যাবতীয় সৎস্বরূপ কার্য্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত, এবং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কৃত হয়, তুমি আমি কেবল উপলক্ষ ও কর্ম্মকারক মাত্র। এজন্য, যথার্থপক্ষে কর্ম্মের সফলতা বা বিফলতার পরিণাম যাহা, তাহা সেই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে; এবং তাহার ফল বা পরিণামও সুতরাং তাহাতে অর্পিত হইয়া থাকে। এমন স্থলে, তোমার সফলতায় উন্মাদিত বা বিফলতায় বিষাদিত হওয়ার আবশ্যক? বিশেষ তাহাতে প্রভূত ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য লোপ এবং কার্য্য শক্তি অবসন্ন হয়, হইলে যে কর্ম্মার্থে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে আশা, যাহা আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং যাহাতে আমাদিগের জীবনের সার্থকতা, সেই কর্ম্মার্থে আমরা বহুলাংশে অকর্ম্মণ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সুতরাং এই অল্পস্থায়ী জীবন এবং কাল, উভয়েরই কিয়দংশ মিছামিছি অপব্যয় হইয়া যায়। যে সকল লোকের জীবন সাধারণতই কেবল অপব্যয়ের সমষ্টি, তাহাদের পক্ষে এ ক্ষতি অবশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা যাহাদের নহে, তাহাদের পক্ষে এ ক্ষতি অত্যুর নীয় ও অনন্ত শোচনীয়।

কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কিরূপ কর্ম্মপরায়ণ ও কর্ম্মঠ, তাহা তাহাদের সময়ের ব্যয় অপব্যয় বিষয়ে যত্ন পরিমাণ দেখিয়া অবধারিত হয়। বঙ্গসন্তান, শত দিবা গত হইলেও তাতেন না, কিন্তু ইউরোপ ভূমের যে কোন জাতীয় লোক এক মুহূর্ত্ত মাত্র লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হয়। ফল, সেই ইউরোপীয় এক জাতি আজি আমাদের নির্দ্দয় প্রভু এবং আমরা আজি তাহাদিগের সহিষ্ণু ও রাজ ভক্ত দাস।

কেবল আপন সুখভোগে রত থাকিবে, এ বলিয়া মানবের সৃষ্টি হয় নাই। কেবল আপন সুখ ভোগ সম্ভব হইত, যদি মানবের আপনা-আপনি সৃষ্ট হইবার ক্ষমতা থাকিত। কিন্তু মানব যখন তাহা না হইয়া অন্যের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার অভিপ্রায়ও আছে, তখন সেই স্রষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধিরূপ ঋণ পরিশোধান্তে, তবে আপন সুখের চেষ্টা দেখাই বিধি; নতুবা স্রষ্টা যিনি, তিনি ছাড়িবেন কেন। মানব ভ্রান্ত! মানবের ন্যায্য আত্ম সুখ যাহা, তাহা সেই স্রষ্টার ঋণ

শোধের সঙ্গেই সংযোজিত; কিন্তু ভ্রান্ত মানব, ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, মানব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে কর্ম্ম মজুরের ন্যায় বিবেচনা করিবে। আরব্ধ কার্য্যে, কি ফলের উৎপত্তি হইল, তাহা লইয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নহে। ফল যাহাই হউক না কেন, মানব যদি যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি আপনাকে কার্য্যে নিয়োজন করে, প্রাণান্তপণে তাহাতে নিরত হয়, এবং সামর্থ্য থাকিতে কখনই তাহা হইতে বিচলিত না হয়, তাহা হইলেই, তাহার জীবন, সার্থক জীবন বলা যায়। কারণ, সার্থকতার পরিমাণ কে কত খানি কার্য্য সম্পাদন করিল, তাহা লইয়া নহে কে কত খানি তাহাতে সাত্বিক ভাবে আত্ম নিয়োজিত করিল, তাহা লইয়া। অতএব তেমন কর্ম্ম কারক, ফলের বেলায় নিষ্ফলতা হইলেও, ঈশ্বরের নিকট সে পূর্ণ প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। এখানেও কর্ত্তব্য বুদ্ধি মানবকে খাড়া রাখিবার জন্য একমাত্র সহায়।

কার্য্যারম্ভে, মানব কেবল ফল হেতুক পুরস্কার বা যশ আদির প্রার্থী হইলে, তাহাতে আত্ম স্বার্থ আসিয়া সংযোজিত হয়। যে কোন প্রকারে আত্ম স্বার্থের সংযোগ হইলে কার্য্যের করণ ও অকরণে একরূপ স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা উপস্থিত হইলে, মানবের অলস ভাব বা নীতির ব্যত্যয় হইতে কার্য্যের হানি হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তীতায় সেরূপ কখনও হয় না। অর্জ্জুন, আত্মস্বার্থ সংযোগ হেতুই স্বাধীনতা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, যে আমি যুদ্ধ করিব না। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে আত্মস্বার্থ মোহজনিত, কিন্তু জাগতিক স্বার্থ যাহা, তাহাই সত্য এবং তাহাতে যে কর্ম্মাবদ্ধ, তদ্বিষয়ে স্বাধীনতা নাই, যেহেতু তাহা কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীন। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীনে যে কর্ম্ম তাহাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম রূপে গণিত হইতে পারে। উহাই গীতা শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাই অর্জ্জুন ত্যক্ত ধনুর্ব্বাণ পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করেন নাই।

এ সংসারে সকল কার্য্যের ফল সহসা উৎপন্ন বা অনুভূত হয় না, বা তাহা হাতে হাতে একই দিনেও ফলে না। উহা সর্ব্বদাই বহুকাল বা অনন্ত কালে সম্পন্ন হয়; এদিকে কিন্তু মনুষ্য জীবন আবার তেমনিই অল্পকাল মাত্র ব্যাপক। এ কারণে কোথায় সফলতা বা কোথায় বিফলতা— অথবা আপাতত যাহা নিষ্ফলতা বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বস্তুত নিষ্ফলতা

কি ভাবী সফলতার পূর্ব্ব সূচনা—অথবা আপাততঃ যাহা সফলতা বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সফলতা কি ভাবী নিষ্ফলতার পূর্ব্ব সূচনা, তাহা অব ধারণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি, এই মাত্র। কার্য্য কারণ সম্বন্ধে পরম্পরায় ক্রমোত্তর ও ক্রম পরম্পরা কর্ম্ম সমষ্টি স্বরূপ এই সৃষ্টি এবং উহা আবার সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভেদে অনন্ত কাল লইয়া ব্যাপ্ত। সুতরাং সফলতা বা বিফলতা, পর পর কোথায় আসিয়া যে উঠিতেছে বা কোথায় আসিয়া যে যাইতেছে, তাহা যাঁহার অনন্ত চক্ষু, কেবল তিনিই এক মাত্র আমূলতঃ দেখিতে ও নিরাকরণ করিতে পারেন, তোমার আমার সে সাধ্য নাই। কার্য্য মাত্রেরই দ্বিবিধ ফল, এক নিকট অপর গৌণ। নিকট যাহা, তাহা এই মুহূর্ত্তে বা দশ দিনে বা দশ বৎসরে সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু গৌণ যাহা, তাহার ব্যাপকতা অনন্ত কালের উপরে। নিকট ফল ভাক্ত, গৌণ ফলই সত্য। আমরা স্থূলদর্শী, নিকট ফল মাত্রই দেখিতে পাই, গৌণ ফল দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। মোহভ্রান্ত মানব ভাক্তকেই সত্য জ্ঞান করিয়া, সত্যকে অবহেলা করে। গৌণ ফল রূপ সত্যকে সম্মুখে রাখিলে, আর সফলতা বিফলতারূপ দ্বন্দ্বে বিতাড়িত হইতে হয় না। তাই আবার বলি, আমাদের উন্মাদিত বা বিষাদিত হওয়ায় ফল কি? যে আদি মানব প্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়াছিল, জানিও তোমার ষ্টীম এঞ্জিন ও তদবলম্বিত রেল গাড়ী প্রভৃতি সুখের সূত্রপাত, সেই আদি মানবের অগ্নি দহনে। হরিণশীকারের যে নিষ্ফলতা ও তদানুষঙ্গিক যে কারাবরোধ প্রভৃতি, সেই সকলের দূর ফলে সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব কবিত্ব। যে ডালের উপরেতে ভর, সেই ডাল কাটিতে গিয়া কালিদাস কালিদাস হইয়াছিল। বাঞ্ছারাম, এ দুর্জ্ঞেয় গূঢ় গুহ্য রহস্য ধারণার অতীত, বোধের অতীত। তাই বলি, সোজা পথে চলাই সংপরামর্শ।

২। যথার্থ কর্ম্মশীলতা।

যে কোন সৎকার্য্যে হউক, যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি পূর্ব্বক মানবের যে সাত্ত্বিকভাবে পরিশ্রমশীলতা, তাহাকেই তাহার ঈশ্বর সকাশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা ও প্রার্থনা বলিয়া জানিও। যে উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা মানব তাহার ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা ও সেই পুরস্কার প্রাপ্তির আশা

করিতে পারে, সে উপাসনা ও প্রার্থনা উক্তবিধ। কেবল নিয়মিত যাগ-যজ্ঞ, আহ্নিকাদি জপতপ, ব্রাহ্মমন্দিরে চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাকর্ষিতবৎ অবস্থিতি, খৃষ্টানের গির্জ্জাঘরে পাখার বাতাসে সুখাসনে খোস মেজাজে পুস্তক হস্তে উপবেশন, অথবা মুসলমানের ভক্তি বিগলিত ভাবে যে সে স্থানে নেমাজে রতি, ইত্যাদি দ্বারা সেরূপ পুরস্কারের আশা করিতে পারা যায় না, আমার বোধ হয় যে আশা করে, সে বহুলাংশে ভ্রান্ত। ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ, একমাত্র তিনিই কেবল জানেন, যে কি সে কি হয়, তথাপি যে আমি উক্তবিধ বলিতেছি, সে কেবল ঈশ্বরের করুণায় আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা মাত্র। প্রকরণযুক্ত পূজা এবং উপাসনা ও বাচনিক প্রার্থনা প্রভৃতিতে যে একেবারে ফল নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে কি না লোকে যতটা ভাবিয়া থাকে ও যে অর্থে তদ্দ্বারা ফলের কামনা করিয়া থাকে, সে অর্থে ফলের ভাগ অতি অল্পই। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আংশিক শিক্ষা, ঈশ্বরকে কেবল নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। অন্যান্য ধর্ম্মে যদিও সেরূপ স্থূল শিক্ষা নাই, কিন্তু উপাসকদিগের মধ্যে কাজে দাঁড়াইয়া থাকে তাহাই। ঈশ্বর অবশ্যই সামান্য মানবের ন্যায় তোষামোদের বশ নহেন, অথবা সুখ্যাতি অখ্যাতি বা যশেরও প্রার্থীও নহেন, সুতরাং ভ্রম হইতে অনন্বিত ভাবে যে উপাসনা ও প্রার্থনা আদি, তাহাতে কি ফল ফলার সম্ভব হইতে পারে? তবে ঈশ্বর করুণার বশ বটেন, কিন্তু তাঁহার সে করুণা আকর্ষণত কেবল বচনে হয় না, সে কথা পরে বলিব। তাই আবার বলিতেছি, এরূপ অনান্বত উপাসনা আদিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আকর্ষণ পক্ষে ফল অতি অল্পই। তবে উপাসকের আত্মপক্ষে ফল ইহাতে অনেক আছে। প্রকরণযুক্ত উপাসনা ও বাচনিক প্রার্থনা আদির দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্তত এটি ঘটে, যে মনোমধ্যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের শাসন ও নীতি জাগরূক হওয়ায়, মন পবিত্র হয়, এবং শরীর ও মন উভয় পবিত্র হইলে, মানবের আত্মবোধ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরূক হইয়া উঠে। সুতরাং, তখন সে যথার্থ কর্ম্ম পথের পথিক হওয়ায়, কথিত যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি পূর্ব্বক সাত্বিক শ্রমশীলতা দ্বারা সত্য উপাসনা ও প্রার্থনায় সক্ষম হয়, এবং কর্ম্ম উৎপাদন দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন, ও নিজেও যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করিতে পারে। প্রকরণযুক্ত উপাসনা

ও বাচনিকরূপে প্রার্থনা, এ সকলের সার্থকতা কেবল এইরূপেই হইতে পারে। কিন্তু এ কথা বুঝেও বুঝিবে, অতি অল্পই লোকে!

লোকে কৃতপাপের উপর অনুতাপের একটা ফল গণনা করিয়া থাকে। গণনা কিছু মন্দ নহে। কিন্তু অনুতাপ বলিতে এমন বুঝিও না যে কতকটা বিলাপ পরিতাপ করিলেই, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন ও অমনি তাহার পূর্ব্বকৃত তাবৎ পাপ মার্জ্জনা করিয়া, তাহার জন্য স্বর্গরাজ্যে খানিকটা জায়গা আলাহিদা করিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাখিয়া দেন, সে পক্ষে তিনি কিছুই করেন না। লোককে আপনা আপনি অনুতাপ পন্থা দ্বারা শোধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বস্খলিত কর্ম্ম সকলের সাধন দ্বারা, নিজের ক্ষতি-পূরণ করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই প্রকৃত অনুতাপ বলে, নতুবা আর যে কিছু তাহা অনুতাপ নহে। মানব বচন বিন্যাসে যতই অনুতাপ, বিলাপ প্রার্থনা বা উপাসনা করুন না কেন, যতক্ষণ না সে আত্ম পবিত্রতা সাধনপূর্ব্বক, প্রকৃতভাবে স্বশক্তির পরিমাণ অনুরূপ কর্ম্মপথের পথিক হইবে, ততক্ষণ তাহাকে ঈশ্বর সকাশে শূন্যস্থলীয় বলিয়া জানিও;— অনন্ত হিসাব পুস্তকে নিশ্চয়ই সে নামশূন্য। আমি বলিয়াছি অনুতাপ করিলেই ঈশ্বর মুক্তি দেন না, লোককে আপনার মুক্তি আপনি করিয়া লইতে হয়, তাহা এইরূপে।—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানবপাপে লিপ্ত, বা অকর্ম্ম রত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার নিজ উৎপত্তি পক্ষে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবন তাহার নিষ্ফল ও পরিণাম তাহার শূন্য হয়। অনুতাপের দ্বারা মানব যখন সেই পাপ বা অকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; এবং প্রতিনিবৃত্ত হইলে যখন তাহার প্রকৃতিতে পবিত্রতা আদি উপস্থিত হওয়ায়, কর্ম্মপথে তাহার পুনর্ব্বার গতি আরম্ভ হয়, তখন তাহার মুক্তির পথও প্রশস্ত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে ও অনন্ত হিসাব পুস্তকেও তাহার নাম উঠিবার সূত্রপাত হয়। কর্ম্মপথে যে গতি, তাহা নিজের স্বেচ্ছাশক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং অনুতাপ দ্বারা সুপথে আসায় যে মুক্তির পথ পরিষ্কার হয় তাহাও তাহার নিজের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। প্রকৃত অনুতাপ তাহাকে বলে যদ্দ্বারা, যেরূপ পাপের জন্য অনুতাপ, সেই পাপে চিরবিরতি ও সেই পাপে যে কর্ম্মহানি করিতে-ছিল, সেই কর্ম্মে নিত্য রতি সাধিত হয়। নতুবা এই পাপ করিলাম, এখনই অনুতাপ উপস্থিত হইল, আবার পরক্ষণেই সেই পাপে প্রবৃত্ত হইলাম,

তাহাকে অনুতাপ বলে না। অনুতাপ কালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণে মনে অনেকটা শান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণত তাহাতে যে পাপ মার্জ্জনা হইল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ নহে, সে কেবল নামের গুণ মাত্র। সুবুদ্ধি যে, সে তত্ত্বদ্বারা চিনিয়া লয়, যে যখন এক নামের গুণে এত শান্তি এত সুখ; তখন সেই ঈশ্বরের প্রকৃত পথে বিচরণ করিলে, আরও কত অধিক সুখ ও শান্তির আশা করা যাইতে পারে।

লোকে পাপ অর্থে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ব্যাখ্যার সংখ্যা দেশভেদে কালভেদে এত, যে তাহা মানবীয় সামান্য শক্তিতে সমগ্রত আয়ত্ব পূর্ব্বক সমালোচন করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু এত ব্যাখ্যার কিছুই প্রয়োজন নাই। মানবের সুকর্ম্মপথে যে গতিব্যতিক্রম, তাহার নাম পাপ। পুণ্য যাহা তাহা সত্য ও নিত্যপদার্থ; স্বকার্য্যরূপ দ্বার দিয়া মানবীয় সৃষ্টিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পাপ ও পুণ্য, দেশ ও কালভেদে, কর্ম্মশক্তির গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে, গুরু বা লঘু আকার ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা আকারে গুরু বা লঘু হইলেও, প্রত্যেকে পূর্ণমূর্ত্তি বটে. যেমন চক্র ছোট হউক বা বড় হউক প্রত্যেকেই যে পূর্ণ অবয়বে চক্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র মিথ্যা ও অনিত্য পদার্থ যে জীবনের অবলম্বন, তাহা ক্রমে সেই মিথ্যা ও অনিত্য পরিণামেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

অনেক অজ্ঞান মানবে ঠিক পায় না যে যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি সাত্ত্বিক শ্রমশীলতা কাহাকে বলে। অনেকে আশঙ্কা করে যে, হয় ত সেই সকল তাহাদের নিত্য ও প্রাত্যহিক সাংসারিক বা যে কোন আত্মীয় কার্য্যসীমার অতীতে, অপর কোন বস্তু বিশেষ হইবে, সুতরাং সে সকলে হস্তপ্রসারণ ও তাহার আত্মীকরণ সহজে হইবার নহে, যাহারা ভাগ্যবান, কেবল তাহাদিগেরই তাহা সম্ভবে, সকলের সম্ভবে না। আমাদিগের দেশে বস্তুত সাধারণ লোক মাত্রের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যথার্থ ধর্ম্মপথ যাহা, তাহার অনুসরণ ও অনুষ্ঠান সংসার আশ্রম পরিত্যাগ ভিন্ন কোন মতে ঘটিয়া উঠা সম্ভব নহে। কি ভ্রান্ত এবং বিপরীত বিশ্বাস! বলা বাহুল্য যে এ সকল বুঝিবার ভুল, বিশেষত সংসার আশ্রম পরিত্যাগের পুণ্য যত হউক না হউক, প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আরও অধিক। বস্তুত আমি দেখিয়াছি, অধিকাংশ লোকেই ইচ্ছাবান থাকিলেও, কেবল এইরূপ ভ্রমে

পতিত হইয়া, অনাস্থাকেন্দ্রশয়নশায়ী হন ও আপনার জীবনকে মিছামিছি ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে।

বাঞ্ছারাম, তোমার অবস্থা বশে, তুমি যে সাংসারিক কর্ম্ম সীমার মধ্যে স্বাভাবিকবৎ আবদ্ধ রহিয়াছ, এবং যাহার অতিরিক্তে যাওয়া তোমার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য, তুমি ভ্রম ক্রমে বুঝিতে পারিতেছ না বটে, কিন্তু তাহাই আপাতত তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা। প্রায় ভারত সাধারণ লোকের পক্ষেই এ কথা প্রযোগ হইতে পারে। আর সেরূপ সীমা অতিক্রম করিযাও যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার সেরূপ লোক কতকাংশে দুর্লভ এবং লোকে সাধারণত সেরূপ লোককে ক্ষণ জন্মা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু কে সেরূপ ক্ষণজন্মা, কে সেরূপ ক্ষণজন্মা নহে, তাহা সহসা বুঝা যায় না এবং ক্ষণজন্মা যে, সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারে না। অতএব কে সেরূপ ক্ষণজন্মা, কে সেরূপ ক্ষণজন্মা নহে, তাহা বুঝিতে হইলে, মানবের উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাতেই যথাসাধ্য কর্ম্মরত হওয়া চাই; কারণ কেবল কর্ম্মেই কর্ম্মের বিস্তার, কর্ম্মারম্ভেই কর্ম্ম শক্তির উদ্বোধন, বিকাশ ও পরিচয়; কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ সম্ভব হয়। অতএব ক্ষণ জন্মা হউক, অক্ষণজন্মা হউক, যখন সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম্ম,—তখন প্রত্যেকেই যে অবস্থায় পতিত ও যাহার অতিক্রম আপাতত অসাধ্য, এবং যে যেরূপ কর্ম্মের আয়োজন ও উপকরণ আদির সংগ্রহে পারগ, সে সেইরূপ কর্ম্ম রত হইবে ও সেই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ও তাহাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্রস্থ উদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। সেই কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মের অবলম্বন দ্বারা সে, ক্ষণ জন্মা হইলে ক্ষণ জন্মা ভাবেও যাইতে পারে এবং যদি ক্ষণজন্মা না হয়, তবে অক্ষণজন্মা ভাবেও আপন জীবনের সফলতায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ও কর্ম্মহেতু ইহলোক পরলোক উভয়ত্র যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভেও সমর্থ হইতে পারে। মনে কর,—কোন ব্যক্তিকে সংসারস্থলীতে পড়িয়া, সময় ও অবস্থাগুণে বা যে কোন কারণে, চাষ কর্ম্ম ও হল চালনে রত হইতে হইয়াছে। এরূপ লোকের পক্ষেও, যথা বুদ্ধি ও যথাশক্তি এবং সৎভাবে ও প্রাণপণে চাষ কর্ম্ম ও হল চালন করাতেই তাহার কর্ম্মের সার্থকতা, এবং তদ্দ্বারাই সে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকে, পুরস্কারের ভাগী হইতে পারে। ফলত, দেখা যাইতেছে যে কেহবা কেবল লাঙ্গল চালাইয়াই স্বীয় জীবনের সফলতা প্রাপ্ত

হয়; আবার কেহ বা সর্ব্বশাস্ত্রে উচ্চ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াও সফলতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার কারণ আছে। একজন হয় ত, তাহার হলচালনা কার্য্য যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে; আর এক জন, হয় ত, সর্ব্বশাস্ত্রে যে উচ্চ ব্রত, তাহাতে ব্রতী হইলেও, তাহার কার্য্যে তদীয় কোন দোষে সেই সেই নিয়ম ও গুণের হয় ত কোন একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। কার্য্যমাত্রে তদ্রূপ কার্য্যসাধক গুণগুলির (অর্থাৎ যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি প্রয়োগের) পূর্ণবিকাশ ও তাহাদের চালনার জন্য, আত্মপবিত্রতা সুতরাং সদাচার প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। আত্ম-পবিত্রতা ভিন্ন, সাত্ত্বিকতার পূর্ণত্ব হয় না। আত্মপবিত্রতা সদাচার হইতে, সদাচার নীতি হইতে, হয়। ইহা ধ্রুবনিশ্চয় যে, আত্মপবিত্রতার পরিমাণ অনুসারে, কর্ম্ম-সফলতা-সাধক গুণগুলিরও বিকাশ ও কর্ম্মসফলতার পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে। একটি অপরের অনুসরণ করে, একটি আসিলে, আর সকল গুলিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিতে হয়। উক্তবিধ আত্মপবিত্রতা সহ যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি যে কর্ম্মনিয়োজন, তাহাকেই স্ব-নিহিত বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি বলা যায়। তদ্ভিন্ন বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির অপর কোন অর্থ নাই। পুনশ্চ মানবে যত প্রকার উপাধিবিশিষ্ট শক্তি আছে, সে সমস্তেরই সার্থকতা থাকা স্বতঃসিদ্ধ হেতু, তাহাদের সকলেরই সম্যক্ প্রয়োগ চাই,—একথা বলিলে এমন বুঝায় না যে উপাধি বিশিষ্ট সকল শক্তিরই যুগপৎ প্রয়োগ বা তথাবিধ কিছু করিতে হইবে। ফলত, যে কোন আরব্ধ কার্য্যবিশেষে সমধর্ম্মী ঔপাধিক শক্তিবিশেষের অবশ্যই পূর্ণ প্রয়োগ চাই; এবং তাহা হইলে অপরাপর ঔপাধিক শক্তিগুলি আপনা হইতেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাহার সহকারী হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই ঔপাধিক-শক্তিগুলির সার্থকতা সাধিত হয়। ইহাকেই নাম স্বনিহিত শক্তি সকলের সম্যক স্ফুরণ বলা যায়।

এখন দেখ, লাঙ্গল চষা পর্য্যন্তে যখন কর্ম্মের সার্থকতা আছে, তখন মানবকে কর্ম্মানুসন্ধানে অধিক ভাবিবার ত বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এক কথা, যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি কাহাকে বলে, তাহা একটু বলা উচিত। বাঞ্ছারাম, বিশ্বাস করিবে কি, এই 'যথাবুদ্ধি' ও 'যথাশক্তি' গুণ চালনা হেতুই, মানব বন্য অবস্থা হইতে এই সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; আবার তাহারই আংশিক অভাব হেতু ভারতীয়েরা এখন পূর্ব্বাবস্থা হইতে এই অধম অবস্থায় পতিত হইয়াছে। যাউক, এখন ঐ জিনিস দুটা কি, তাহা দেখা যাউক।

যে কোন কাজ করিতে হইলে, তাহার জন্য পরিশ্রম দ্বিবিধ প্রকার আছে, এক শারীরিক, অপর মানসিক। কোন কার্য্য কিরূপ করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে, কিরূপ করিলে ভাল হইবে, কিরূপ করিলে মন্দ হইবে, এবং কিরূপ করিলে কার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা তাহার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে, পুনশ্চ এতৎসূত্রে আরও অপর কোন্ কোন্ কার্য্যের পথাদি পরিস্কার বা অপরিস্কার হয়, দোষ বা অদোষ যুক্তই বা কিসে হয়, এই সকলের যে সম্যক্ অবধারণা তাহার নাম মানসিক শ্রম। এই মানসিক শ্রমের মধ্যে যে যে বিষয় মন্দ এবং অবনতি ও অপূর্ণতা বিধায়ক, তাহার যথাসাধ্য পরিহার এবং যে যে বিষয় ভাল, উন্নতি বিধায়ক ও পূর্ণতা সাধক, তাহার যথাসাধ্য অবলম্বন ও অনুসরণ, এ দুইকে 'যথাসাধ্য' গুণ কহা যায়। তাহার পর শারীরিক শ্রম। মানসিক শ্রমের কার্য্য যাহা তাহা বলিলাম, আবদ্ধ কর্ম্মসহ তাহা শরীরের দ্বারা উপকরণ যোগে কার্য্যে পরিণত করাকে শারীরিক শ্রম বলে। শারীরিক শ্রমে শরীরকে সম্যক্ নিয়োজন করার নামই 'যথাশক্তি' গুণ। সম্যক্ অর্থে সামঞ্জস্য সমুৎপন্ন সম্যক্ ভাব। যে তদ্রূপ যথাশক্তি শরীর নিয়োগে হেলা করে, তাহাকে তৎপরিমাণে অনুরূপ 'যথাশক্তি' গুণের ব্যত্যয়কারী বলিয়া প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে শারীরিক ও মানসিক, দুই প্রকারেই, ত্রুটি হেতু প্রত্যবায়ের ভাগ আছে, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটু বিশেষ আছে। শারীরিক শ্রমের হেলায়, কার্য্যের কেবল শারীরিক ভাগই ব্যতিক্রম যুক্ত হয়, কিন্তু মানসিক শ্রমের হেলায়, কার্য্যের মানসিক ও শারীরিক (যথাশক্তি শ্রম করিলেও), উভয় ভাগেরই ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে। এই হেতু, শরীর মনকেই অনুগমন করিয়া থাকে; এবং পরিদৃশ্যমান কার্য্য সকল মানসী মূর্ত্তি বিশেষ, বা কল্পনা-রূপের বাহ্যপ্রচার মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, শারীরিক শ্রমের ব্যত্যয়ে কেবল একদিক মাত্র পণ্ড, কিন্তু মানসিক শ্রমের ব্যত্যয় হইলে, সকল দিকই পণ্ড হইয়া থাকে। সুতরাং মানসিক শ্রম চালনার ন্যূনাতিরেকেই বেশী পাপ বা পুণ্যের আশঙ্কা করিতে হয়।

পুনশ্চ মনে কর, এক ব্যক্তির লাঙ্গল চষাই কার্য্য সীমা। এমন স্থলে তাহাকে প্রাণ পণে যথা যোগ্য লাঙ্গল চষিতে দেখিলে, অবশ্য সেখানে তাহার কার্য্য পক্ষে আপাতত সার্থকতা বলিয়াই, বলা যায়। কিন্তু যদি

সে মানুষের আরও খেলাইবার যোগ্য এমন বুদ্ধি থাকে যে, যথারীতি লাঙল চষার মধ্যেও সে চেষ্টা করিলে সাধারণ অপেক্ষা ভাল লাঙল চষিয়া ভাল ফলের উৎপন্ন করিতে পারে, বা নিজ লাঙলেরই কোন উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, অথচ সে তাহা না মনে, না কাজে, না উভয়ত কিছুই করিতেছে না, অলসে কেবল তাহার সে ক্ষমতার অপলোপ বা বিকৃতি সাধন করিতেছে। তখন আর সেখানে তাহার কার্য্যক্ষেত্রের কার্য্যে কখনই সম্যক্ সার্থকতা বলিব না। হইতে পারে সে যথাশক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু যথাবুদ্ধিও যে হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। যথারীতি পুরা লাঙল চষিলেও, সে আত্মশক্তির সম্যক্ চালনার ব্যতিক্রম করিতেছে বলিয়া, প্রত্যবায় বা পাপের ভাগী, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পুনশ্চ সেই ব্যক্তি যদি আবার লাঙল চষার অপেক্ষাও উন্নত কার্য্যের জন্য পারগ হয়, এবং দেশ কাল পাত্র সকলই সে পক্ষে যদি অনুকূল থাকে, বা অল্প চেষ্টাতেই অনুকূল হইতে পারে, অথচ সে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তথা পরিমাণ অনুরূপ প্রত্যবায় বা পাপের ভাগী হইয়া থাকে। সংগ্র জপ তপ উপাসনা আদিতে তাহার সে পাপের ক্ষালন হয় না। যতক্ষণ সে সেই কার্য্যে যথা সাধ্য প্রবৃত্ত না হইবে, বা যতক্ষণ অপর কোন কার্য্য বিশেষে তাহার তথা পরিমাণ শক্তি প্রযুক্ত না হইবে, ততক্ষণ তাহার পাপ হইতে কখনই নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মস্থলে যথাবুদ্ধি পরিশ্রমের প্রবর্ত্তনা নিমিত্ত, সাময়িক সুযোগানুরূপ যথোপযুক্ত শিক্ষার একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর আবার পুনরুক্তি স্বরূপ বলিতেছি, যে মনের শ্রম সাধ্য ভাব যতদূর, শরীরের শ্রম সাধ্য ভাব যত দূর, এই উভয় সাধ্য ভাব একত্র করিয়া মানব যতক্ষণ তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিবে, ততক্ষণ তাহার কর্ম্মস্থলীতে পূর্ণ সার্থকতা কখনই আসিবে না। এইরূপ করিবার জন্য ও তাহার উদ্বোধনের নিমিত্ত, মানবকে যে বিশেষ ভাবিয়া আকুল হইতে হয়, তাহাও নহে। কার্য্য বিশেষের প্রতি মনের স্বাভাবিকী যে আকাঙ্ক্ষা ও সেই কার্য অন্যের অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে যে সম্পাদন করিতে পারি এই ধারণা, এই দুইয়েতেই, কর্ম্মস্থলে শারীরিক ও মানসিক শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবান সে, যে ইহাদের দেখা প্রাপ্ত হইয়াও চিনিতে পারে না, বা তাহাদের উদ্দেশ্য ও তাড়না অবহেলা করিয়া থাকে। জানিও কথিত আকাঙ্ক্ষা ও যথোক্ত ধারণা ক্রিয়া—এই

উভয়ের ক্রীড়া হইতেই জগৎ এতদূর উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া আসিযাছে।

এ জগতে কোদালপাড়া হইতে ঋষির বেদগান বা জ্যোতির্ময় আকাশ দর্শন অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্করণ, কোন কার্য্য ও কাহারও কার্য্য, হেয় নহে। এ বিশ্বস্থলীতে এ ক্রিয়াব্রহ্মাণ্ডে সকলেই আদরের এবং সকলেরই প্রযোজনীয়তা আছে। অতি উচ্চ দরের না হইলেও, স্ব সীমান্ত মধ্যে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনার অন্তিম সীমা সৈনিক পুরুষের। জীবনান্ত যাহার কার্য্যের পরিণাম, তাহাপেক্ষা শক্তি চালনার উচ্চতম সীমা আর কি হইতে পারে? এ জগতে সৈনিক পুরুষের যে এত আদর, এত নাম, তাহার যথার্থ কারণ এই। কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে ইহাও এক শ্রেণীস্থ চূড়ান্ত কর্ম্ম, সুতরাং ইহার জ্যোতিঃ বিস্ফুরণ হেতু যশ বিস্ফুরণও এরূপ চূড়ান্ত, এবং এই জন্যই জগতে তাহা এতটা ধ্বনিত হয়; নতুবা তাহাদের কার্য্য কেবল মানুষ মারা ও ডাকাতি করা বলিয়া ধরিলে, কি কখনও এতটা মান সম্ভব হইত? এই কর্ম্ম বিশেষে মানবের স্বয়ং জীবন লইয়া খেলা; অপর দিকে আত্মরক্ষার বৈপরীত্য সমাবেশ হেতু, আরব্ধ কার্য্যে মানসিক ও শারীরিক উভয় শক্তিরই চূড়ান্ত বিকাশ হয়। এই জন্যই গূঢ়জ্ঞ হিন্দু ঋষি, সম্মুখ সমরশায়ী যোদ্ধার পক্ষে একেবারে সকল পাপের নিষ্কৃতি, ও মৃত্যু মাত্রই কর্ম্ম পুরুষ্কার স্বরূপ স্বর্গারোহণ অনুভব করিয়া, তদনুরূপ অভিপ্রায় ও ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই বটে, কেবল সম্মুখ যোদ্ধারই অক্ষয় ও অবিলম্ব স্বর্গ; যেহেতু আরব্ধ কার্য্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের ন্যূনতা ব্যতীত, কখন রণে পৃষ্ঠ দেওয়া সম্ভবে না। অথবা পূর্ণতা ব্যতীত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্তিও সম্ভবে না। উহাই পুরুষার্থ এবং সত্য, উহাই পুরুষার্থ এবং সত্য।

কীর্ত্তি কৌমুদী ও সোমেশ্বরদেব।

জৈন ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলি অনুশীলন করিলে জানা যায়, বৌদ্ধ সময় অপেক্ষা জৈন সময়ে, ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকানেক সৎকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে যে সকল লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সকল লেখকের লিপি অসার কাহিনী পূর্ণ কিন্তু জৈন সময়ে জৈনগণের মধ্যে যে সকল লেখক জন্মিয়াছিলেন, সে সকল লেখক প্রায়শই সৎকবি ও দার্শনিক। উপরের লিখিত কাব্য ও কবি তাহার অন্যতম নিদর্শন।

সৎকবি সোমেশ্বর গুর্জর রাজার পুরোহিত এবং মহামন্ত্রী বস্তুপালের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বস্তুপাল অসামান্য গুণধর ও রাজলক্ষণাক্রান্ত বীর পুরুষ ছিলেন, পুরোহিত প্রবর সোমেশ্বর তাঁহার তাদৃশ গুণগ্রামে মুগ্ধ প্রায় হইয়া কীর্ত্তিকৌমুদী নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

কীর্ত্তি-কৌমুদীর ১ম সর্গের প্রথমে কালিদাসের, মাঘ কবির, ভারবি কবির, কাদম্বরী প্রণেতা বাণ কবির, ধনপালের, বিহ্লণ কবির, জৈনাচার্য্য হেমস্থরি কবির, নীলকণ্ঠ কবির, ভোজের, মুঞ্জের ও নরচন্দ্রের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং এই সোমেশ্বর ঐ সকল মহাকবি অপেক্ষা অত্যন্ত নবীন কিন্তু ইহাঁর কবিতা ঐ সকল কবির কবিতা অপেক্ষা অধিক হীন নহে।

সোমেশ্বর অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার ভাল বাসিতেন, তাই তিনি স্বকৃত কাব্যের আদ্যোপান্ত ঐ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তি কৌমুদী কাব্যে এমন একটিও শ্লোক নাই—যাহা অনুপ্রাসালঙ্কারে সুশোভিত নহে। এই দুই অলঙ্কার তিনি এরূপ সুকৌশলে ন্যস্ত করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা কাব্যে শোভার বৃদ্ধি ভিন্ন হানি হয় নাই। অনেকের মনে সংস্কার আছে, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিলে অর্থের গৌরবের হানি হয় এবং কবিতা সকল শ্রুতকটু অর্থাৎ কর্কশ হয়। আমাদের বিশ্বাস আছে, সৎকবি সোমেশ্বরের কীর্ত্তি কৌমুদী পাঠ করিলে, তাদৃশ লোকের

---

* এই কীর্ত্তি কৌমুদী বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়া জন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

তাদৃশ সংস্কার আবর্জিত হইতে পারে। আমরা আদর সহকারে সোমেশ্বর দেবের কীর্ত্তি কৌমুদী পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে দেখিয়াছি, কীর্ত্তি কৌমুদীর প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক পদে অনুপ্রাসালঙ্কার ন্যস্ত আছে, অথচ অর্থ গৌরবের হানি ও কার্কশ্য কিছুই হয় নাই। *

কীর্ত্তি কৌমুদী কাব্য নয় সর্গে সমাপ্ত। ইহার প্রথম সর্গে নগর বর্ণনা, দ্বিতীয় সর্গে নরেন্দ্র বংশ বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে মন্ত্রি স্থাপনা, চতুর্থ সর্গে দূত সমাগম, পঞ্চম সর্গে যুদ্ধ বর্ণনা, ষষ্ঠ সর্গে পুরপ্রাসাদ, সপ্তম সর্গে চন্দ্রোদয় বর্ণনা, অষ্টমসর্গে পরমার্থ বিচার, এবং নবম সর্গে যাত্রা সমাগম বর্ণিত হইয়াছে।

"নগর বর্ণনা" কি? কোন্ নগরের বর্ণনা! তাহা বলিতেছি। প্রাচীন গুর্জ্জর রাজ্যের রাজধানী অনিহিল্লপুর—এক্ষণ যাহা "অনিহল্‌বারাপত্তন" নামে বিখ্যাত—সোমেশ্বর দেব সেই মহানগর—

"অস্তি হস্তিমদ ক্লেদ বিরাজ দেশ পুরং পুরম্।
অনহিল্লপুরং নাম ধাম শ্রেয়ঃ শ্রিয়ামিহ ॥"

এবং ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন।

নরেন্দ্র বংশ বর্ণন।

কীর্ত্তি কৌমুদীগ্রন্থে সোমেশ্বর কোন্ রাজবংশ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। যে রাজাধিরাজবংশ পৃথিবীতে চৌলুক্য বংশ বলিয়া বিখ্যাত—যে মহাবংশে মূলরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমেশ্বরদেব সেই রাজবংশের বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমে মূলরাজ, তৎপরে চামুণ্ডরাজ, পরে বল্লভরাজ, তৎপরে দুর্লভরাজ, ভীমরাজ, জয়সিংহ, তাম্রচূড, সিদ্ধরাজ, কুমারপাল, জয়পাল, দ্বিতীয় মূলরাজ, শ্রীভীম, অর্ণোরাজ, ধবলরাজ, লাবণ্যরাজ বা লাবণ্যসিংহ, শ্রীবীরধবল এবং লবণপ্রসাদ † প্রভৃতির শৌর্য্যবীর্য্য রাজ্যাধিকার ও অন্যান্য গুণগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে।

---

* নিদর্শনের জন্য এ স্থলে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।
'লঙ্কা শঙ্কাবতী চম্পা অকম্পা বিদিশা কৃশা।
কাশি র্নাশিত সম্পত্তি র্মিথিলা শিথিলাদরা ॥"
[ন... বর্ণনম্।
''আলিঙ্গিতঃ শমনেচ পৃথগ্ভূতঃ কলেরপি চ।
সদ্বৃত্তেনেচ নির্বৃত্ত স সদা শূন্যতে ভূশম্ ॥"
[পরমার্থবিচার।

† সোমেশ্বর এই লবণপ্রসাদের মন্ত্রী ও পুরোহিত ছিলেন।

মন্ত্রিস্থাপনা।

প্রাগ্বাট বংশীয় গুজরাটী ব্রাহ্মণেরা গুর্জরেশ্বরদিগের কুল-পুরোহিত। এই বংশের প্রথম পুরুষ বা প্রথম মন্ত্রী চণ্ডপ, তৎপরে চণ্ডপ্রসাদ, তৎপরে সোমদেব, তৎপরে সিদ্ধরাজ, তৎপরে অশ্বরাজ, অশ্বরাজের পুত্র মল্লদেব, বস্তুপাল এবং তেজঃপাল। সোমেশ্বরদেব এই অশ্বরাজের মধ্যমপুত্র। গুর্জরেশ্বর মহামাত্য বস্তুপালের শৌর্য্যবীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দূতসমাগম।

দক্ষিণেশ্বর ও সিন্ধুদেশের ঈশ্বর গুর্জর-রাজ লবণপ্রসাদের উন্নতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত সৎকবি সোমেশ্বর উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

যুদ্ধ বর্ণনা।

সংগ্রাম সিংহ প্রভৃতির সহিত লবণপ্রসাদের ও বস্তুপালের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের স্বরূপ বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে।

প্রমোদ।

যুদ্ধ জয় হইলে গুর্জরপুরে যেরূপ উৎসব হইয়াছিল, কীর্ত্তিকৌমুদী কাব্যে তাহা বর্ণিত আছে।

চন্দ্রোদয়।

চন্দ্রোদয় অর্থাৎ রাকা নিশার সৌন্দর্য্য বর্ণনা।

পরমার্থ বিচার।

বস্তুপালের সংচিন্তা ও বৈরাগ্য বুদ্ধি বর্ণনা।

যাত্রা সমাগম।

বস্তুপালের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত। তিনি যে যে তীর্থে যে যে সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, সে সমস্তই এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গে জৈন-তীর্থ অর্ব্বুদাচলের অর্থাৎ আবু পাহাড়ের বিশেষ বর্ণনা আছে।

আবু পাহাড় অতি সুরম্য স্থান এবং এই পাহাড়ে প্রাচীন জৈনরাজা-দিগের অনেক সুকীর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। এই কার্য্যের শেষে সোমেশ্বরদেব বলিয়াছেন,—

> "অন্বাসন বিনয়েন বিদ্যয়া
> বিক্রমেণ সুকৃতক্রমেণ চ।
> কাপি কোহপি ন পুমান্নু পৈতি মে
> বস্তুপালসদৃশো দৃশঃ পথি॥"

এই বস্তুপালের ভার্য্যার নাম ললিতাদেবী এবং ইহাঁর পুত্রের নাম জয়ন্ত সিংহ। বস্তুপাল তীর্থযাত্রাকালে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজঃপালের প্রতি সচিব্য-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন নাই। তেজঃপালও গুণে ও শৌর্য্যবীর্য্যে ভ্রাতা বস্তুপালের সদৃশ ছিলেন। সোমেশ্বরদেব তেজঃপালের গুণ বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন,—

অস্তি স্বস্তি নিকেতনং তনুভৃতাং শ্রীবস্তুপালানুজঃ
তেজঃপাল ইতি স্থিতিং বলিকৃতা মুর্ব্বী পালয়ন্।
আত্মীয়ং বহুমন্যতে ন দ্বিগুণ গ্রামঞ্চ কামন্দকি
শ্চাণক্যোঽপি চমৎকরোতি ন হৃদি প্রেমাস্পদংপ্রেক্ষ্য যম্।

মন্ত্রিপ্রবর তেজঃপালের পত্নীর নাম অনুপমা দেবী এবং পুত্রের নাম লাবণ্য সিংহ।

অর্ব্বুদাচলের অর্থাৎ আবু পাহাড়ের গাত্রে একটি সুদীর্ঘ প্রশস্তি পত্র খোদিত আছে। সেই প্রশস্তি পাঠ সোমেশ্বর দেবের রচিত এবং চণ্ডেশ্বর নামক ভাস্করের দ্বারা খোদিত। অদ্যাপি তাহা দেদীপ্যমান আছে। এই খোদিত প্রশস্তি লিপির সমাপ্তি স্থলে এই রূপ লেখা আছে।—

"সূত্রবীর কহ্লণ যুত ধান্ধল পুত্রেণ চণ্ডেশ্বরেণ
প্রশস্তিরিয় মুৎকীর্ণা শ্রীবিক্রম সংবৎ ১২৯৩ বর্ষে
শ্রীশ্রাবণ বদি ৩ রবৌ শ্রীবিজয় সেন সুবিভিঃ
প্রতিষ্ঠা কারিতা।"

এই খোদিত প্রশস্তি দৃষ্টে স্থির হয় যে, সোমেশ্বর দেব ৬০০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

আবু পাহাড়ের গাত্রে যে প্রশস্তি পাঠ উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা ৭৪টী শ্লোকে সমাপ্ত। সুতরাং উহাকে ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষ বলিলেও অসঙ্গত বলা হয় না। এই ৭৪টি শ্লোক কীর্ত্তি কৌমুদী কাব্যের সার সংগ্রহ স্বরূপ। সোমেশ্বর দেব কীর্ত্তি কৌমুদীকাব্যে যে যে রাজার ও যে যে মন্ত্রির গুণ গ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন, সে সমস্তই এই প্রশস্তি পাঠে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অণহিল পুরীর, চুলুক্য বংশের, প্রাগ্বাট বংশের, এবং সেই বংশীয় রাজগণের ও মন্ত্রিগণের কীর্ত্তি কলাপ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উৎকীর্ণ প্রশস্তির প্রারম্ভ বাক্য এই রূপ—

বন্দে সরস্বতীং দেবীং যাতি যা কবি মানসং
নার মানা নিজ বেশ্ম যান মানস বাসিনা।

সমাপ্তি শ্লোক এই রূপ ঃ—

শ্রীনেমি রশ্মি কাবাশ্চ প্রসাদাদর্ব্বুদাচলে।
বস্তুপালান্বয়-স্যাস্ত প্রশস্তিঃ স্বস্তি শালিনী ॥

অর্ব্বুদাচলোপরি যে সকল তীর্থ, ক্ষেত্রে, মন্দির উৎকীর্ণ প্রশস্তি স্তম্ভ বা চৈত্য প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই গুর্জর পতি চুলুক্য বংশীয় রাজাদিগের এবং তদ্বংশীয় অমাত্যদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। প্রত্যেক উৎকীর্ণাক্ষর পংক্তিতে হয় বস্তু পালের, না হয় তেজপালের, অথবা লবণ প্রসাদের, নাম দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন, আরও অনেক নাম আছে, সেই সকলের তালিকা এই—

মল্লদেব। সোমসিংহদেব। ভীমদেব। বালক শ্রীলবন প্রসাদ। বালক শ্রীধবল সিংহ। চণ্ডপ পুত্র। চণ্ডপ্রসাদ পুত্র। কুমার দেবী। অনুপমাদেবী। লুণসিংহ। মহেন্দ্র স্থরি। শান্তি স্থরি। অমর চন্দ্র স্থরি। হরি ভদ্র স্থরি। বিজয় সেন স্থরি চন্দ্রবতী দেবী। শ্রীপাল। এতদ্ভিন্ন গুজরাটি ভাষায় অনেক নাম ও গ্রাম খোদিত আছে।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে জৈন রাজগণ ও তাঁহাদের পুত্রামাত্যগণ এদেশে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা এদেশে অনেক সৎকীর্ত্তি বা স্মারক চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল। বহু পূর্ব্বে এক সময়ে বৌদ্ধ রাজগণ এদেশে যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কুমার প্রভৃতি জৈন রাজগণও এদেশে বিশেষ আধিপত্য করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বৌদ্ধগণ জৈনগণের নিকট বিদ্যাংশে হীন ছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা অনেক কবি ও কাব্য দেখিতে পাই কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধগণের লিখিত অনেকানেক পুস্তক আছে সত্য, কিন্তু সে সমস্তই অসার কাহিনী কল্প; সুতরাং সে সকল গ্রন্থে আমাদের বিশেষ পরিতুষ্টি হয় না। আমাদের বিবেচনায় জৈন কবিগণের কাব্য, জৈন দার্শনিকগণের দর্শন, জৈন শাব্দিকগণের শব্দ শাস্ত্র—এ সমস্তই বৌদ্ধকাব্য ও বৌদ্ধ দর্শন অপেক্ষা অনেক ভাল এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির নিদর্শন।

শ্রীরামদাস সেন।

শিশু।

আলক্ষ্য দন্ত মুকুলান-নিমিত্ত হাসৈ
রব্যক্ত বর্ণ রমণীয় বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয় প্রণয়িন স্তনযান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গবজসা পরুষীভবন্তি ॥
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

কি কারণে হাস শিশু বুঝে উঠা ভার।
অনিমিত্ত হাসি তব অতি চমৎকার ॥
দেখিলে তোমার অই সহাস্য আনন।
ভুলে যাই শোক তাপ বিপদ শাসন ॥
কচি কচি মুখখানি দুধে গন্ধ কয।
দেখিবা মাত্রই মন পুলকিত হয় ॥
কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মিস্মিসে কালো।
স্তবকে স্তবকে মাথা করিয়াছে আলো ॥
চৌরস কপাল, ভুরু কিবা টানা বাঁকা।
ঠিক যেন বোধ হয় তুলি দিয়া আঁকা ॥
জলজলে দুটি চক্ষু কিবা শোভা পায়।
চপলতা তাহে যেন বিজলী খেলায় ॥
অন্তরের ভাব যত তাহাতে চিত্রিত।
দর্পণেতে বাহ্য বস্তু যেমন অঙ্কিত ॥
মাট মাট ছোট নাক নহে অমানান।
কাণ যেন ছাঁচে ঢালা, সুন্দর সমান ॥
ফুলো ফুলো গাল দুটি যেন রসে ভরা।
ধপ্ধপে দুধে দাঁত অতি মনোহরা ॥
পাতলা পাতলা ঠোঁট বাঙ্গা টুক্টুকে।
ছোট খাট মুখখানি বড়ই চটুকে ॥

নিটোল আঙ্গুল গুলি অতি সুগঠন।
সহসা দেখিতে চাঁপা কলির মতন ॥
দুধে আলতার রঙ্গ কিন্তু ক্ষীর ক্ষীর।
চলন সুছন্দ অতি, দ্রুত কভু ধীব ॥
আধ আধ কথা কও সুমধুর বাণী।
অমৃত বর্ষণ হয হেন অনুমানি ॥
অল্পেতে হও হে তুষ্ট হাস ফিক্ ফিক্।
ঘুরে ফিরে নৃত্য কর ধিনিক ধিনিক ॥
চঞ্চল চপল অতি নানা মূর্ত্তি ধর।
যা যখন কব কিন্তু সব মনোহর ॥
যখন সোহাগে তুমি গলা ছেঁদে ধর।
মধুমাখা বাবা বলে সম্বোধন কর।
যখন মাতার ক্রোড়ে হইয়া শয়ান।
কুর্ কুর্ করে কুর সুখে স্তন পান ॥
পবিত্রতা সরলতা মুখেতে তোমাব।
স্নেহ দয়া মূর্ত্তিমতী বদনে মাতার ॥
ভূতলে সুন্দর বস্তু নহে অপ্রতুল।
কিন্তু তাবা কেহ নহে তব সমতুল ॥
সুন্দর গোলাপ ফুল নয়ন রঞ্জন।
গৌরবে সৌরভ দানে হরে লয় মন ॥
সুন্দর কমল বিস্তারিয়া শতদল।
সরোবর পরে কিবা করে ঢল ঢল ॥
সুন্দর ময়ূব ধরে ছত্রাকাব পুচ্ছ।
যার কাছে শিল্প কারু হয অতি তুচ্ছ ॥
যবে হেরে ঘন ঘটা হইয়া মোহিত।
সুখেতে করে সে নৃত্য সঙ্গিনী সহিত ॥

ইন্দ্রের শারদ ধবে দিবাকর করে।
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত চিত্ররূপ ধরে॥
ফুর ফুরে প্রজাপতি সুন্দর দুপাখা।
প্রত্যেক বিন্দুতে তার শোভা যেন মাখা॥
রামতনু রামধনু বলিহারি যাই।
রঙের বাহার দেখে নির্নিমেষে চাই॥
নভোমণ্ডলের সেই অনুপম শোভা।
প্রকৃতির মাথে যেন সিঁথি মনোলোভা॥
শরতের চন্দ্র তারা যামিনী ভূষণ।
রমণী মস্তকে যথা হীরক শোভন॥
এসব সুন্দর বটে, মানি, খুব ভাল।
কিন্তু তোমা হতে ভেদ আকাশ পাতাল॥
তোমাতে নানাত্বআছে নানা ভাব ধর।
তাই তুমি সব হতে অতি মনোহর॥
এসেছ মরতে লাঘবিতে ধরাভার।
শিখাইতে নরকুলে ধর্ম্মের কি সার॥
দেখাইতে ধর্ম্মরাজ্যে তাঁরি অধিকার।
তোমার মতন যাঁর মন পরিষ্কার॥
ধর্ম্মের নিমিত্ত লোক নানা কার্য্য করে।
নানা দেশে যায় তীর্থ পর্য্যটন তরে॥
দান ধ্যান করে কেহ নানা ক্রিয়া কাণ্ড।
যশের সৌরভে তার পুরয়ে ব্রহ্মাণ্ড॥
অনশনে থাকে কেহ হরিগুণ গায়।
দিবা রাত্রি বসি কেহ মালাই ঘুরায়॥
সংসার তেয়াগি কেহ অরণ্যেতে যায়।
ফল মূলাহার করি জীবন কাটায়॥
ভস্ম লেপে গাত্রে কেহ দিগম্বর বেশ।
হর হর শব্দ মুখে মাথে রুক্ষ কেশ॥
যোগেতে মগন কেহ মুদিত নয়ন।
স্থির ভাবে অবস্থিত স্থাণুর মতন॥
কেহ ঊর্দ্ধ বাহু কেহ থাকে ঊর্দ্ধ পদ।
নানা কৃচ্ছ্র করে লোক না গণি বিপদ॥
দুর্গন্ধে চন্দনে, কেহ করে সম জ্ঞান।
যাহা পায় তাহা খায় নাহি ঘৃণা মান॥
শীতে জলে মগ্ন, গ্রীষ্মে অগ্নিতে বেষ্টিত।
লৌহময় কণ্টকেতে সচ্ছন্দে শায়িত॥
হেট মুণ্ডে ঝুলে কেহ অগ্নির উপর।
অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য বড়ই কঠর॥
সব বৃথা, সব পণ্ড, ভস্মে ঘৃত দান।
চিত্ত যদি শুদ্ধ নহে তোমার সমান॥
ধর্ম্ম রাজ্যে যদি কেহ প্রবেশিতে চাও।
বাঁকা পথ হতে আগে মনকে ফিরাও॥
শাদা মন সমদর্শী শিশুর মতন।
না হইলে, কভু নাহি মিলে ধর্ম্ম ধন॥
যদি ওহে শিশু তব জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষীণ।
ভালবাসা মন্দবাসা চিনিতে প্রবীণ॥
আদরের ধন তুমি, সংসারের সার।
সংসার শ্মশান হয় বিহনে তোমার॥
দুঃখীর মাণিক তুমি সাত রাজার ধন।
সব দুঃখ ভুলে হেরে ও চাঁদ বদন॥
সম্পদের গৌরবেতে তোমা প্রয়োজন।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কহে সর্ব্বজন॥
স্নেহের আধার তুমি তুমি বংশধর।
পিতার মূরতি তুমি আশার আকর॥
মাতার সর্ব্বস্ব ধন অঞ্চলের নিধি।
সার্থক সৃজন তোমা করেছেন বিধি॥
তোমার জনমে হয় তিন কুল পুষ্ট।
পিতৃ পিতামহ আদি হন পরিতুষ্ট॥
পথের পথিক লোক তোমা পানে চায়।
সাদরে কোলেতে লয়ে মুখে চুম খায়॥

অঙ্গেতে লাগিলে ধূলি না হয় বিরক্ত।
তোমার প্রেমেতে লোক এত অনুরক্ত॥
তোমা ধন লভিবারে শশব্যস্ত নর।
যাগ যজ্ঞ ব্রত হোম করে নিরন্তর॥
তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি যদি নাহি হয়।
আপনার পুত্র মত পর পুত্রে লয়॥
মানব মনের এই স্বাভাবিক গতি।
বিপরীত গুণে হয় সে আকৃষ্ট অতি॥
নারীর যে কোমলতা পুরুষে আদরে।
পুরুষের পুরুষত্ব স্ত্রীতে মান্য করে॥
যে সব দোষেতে হই আমরা দূষিত।
তুমি ত নহ হে শিশু তাতে কলঙ্কিত॥
পাপেতে আশক্ত মোরা অপরল অতি।
নিষ্পাপ তোমার চিত্ত—অকপট মতি॥
আমরা চিন্তায় মগ্ন, অবিশ্বাসী বড়।
তোমার নিশ্চিন্ত ভাব, বিশ্বাসেতে দড়॥
এইরূপ বিপরীত গুণাধার বলে।
তোমায় আদর করে মনুষ্য সকলে॥
নিষ্কলঙ্ক মুখে তব সুমধুর হাসি।
কিবা মনোহর দৃশ্য বড় ভালবাসি॥
গাল ভরে হাস শিশু আনন্দে মাতিয়া।
বাহু তুলে নৃত্য কর তাথিয়া তাথিয়া॥
প্রাণ খুলে গাও গান, ধরে নানা তান।
শুনি রে সংসার জ্বালা জুড়াই পরাণ॥

সে কালের হাকিমদের ও আমলাদের কথা।

সকলেই জানেন যে ইংরাজের আমলের প্রথমাবধি দেশের শাসন, বিচার প্রভৃতি সমুদয় রাজ কার্য্যের ভার সাহেবদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দেশীয় লোকে উচ্চ পদে প্রবেশ করিতে পারিত না, তবে যে দেওয়ানী মুচ্ছুদীগিরি চাকরি করিয়া পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী সম্যক্ মর্য্যাদা এবং বহু ধন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ও কেবল অধীন আমলার কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় দীর্ঘকাল পরে সাহেবেরা আমাদের হস্তে বিচার কার্য্যের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এখন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ, সব জজ প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আমাদের যুবা বয়সেই প্রথম আরম্ভ হয়। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুলের সহিত ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পরে, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কাশিম বাজারের প্রাতঃস্মরণীয় দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী ৺কৃষ্ণনাথ কুমার যে খুনি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার তদন্তের ভার এই চন্দ্রমোহন বাবুর হস্তে অর্পিত

হয়। প্রবাদ আছে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে কুমার কৃষ্ণনাথের অনুকূলে চন্দ্র মোহন বাবুকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ লক্ষাধিক টাকার ও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু দৃঢ় চিত্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করাতে অভিযুক্ত কুমার নিস্তারের উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার জোড়াশাঁকো ভবনে বন্দুকের দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছিলেন। তখন আমরা কলেজে পড়ি। "কৃষ্ণনাথ কুমার গুলি খাইয়া মরিয়াছে" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সেই দিবস কলিকাতায় এমন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, যে তেমন আর কখনও দেখি নাই। আন্দামান উপদ্বীপে লর্ড মেয়োর বধের সংবাদ যে দিবস কলিকাতায় প্রচারিত হয়, সেই দিবসেও আমি কলিকাতায় ছিলাম, কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের চিত্ত তত আকর্ষণ করে নাই বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, কুমারজীর মৃত্যুর সময় কলিকাতায় সংবাদ পত্রের ব্যবহার ছিল না; যে দুই এক খানা ছাপা হইত, তাহাও লোকেব দ্বারা বড় গৃহীত কিম্বা পঠিত হইত না। সংবাদেব জন্য সকলেই জনরবের উপর নির্ভর করিত। হাটে বাজারে, রাস্তায় ঘাটে, ধনী লোকের বৈঠকখানায়, দরিদ্রের কুটীরে, গাঁজার আড্ডায় ও শরাবের দোকানে এবং স্কুল কলেজে—সকল স্থানেই কয়েক দিবস ধরিয়া ঐ কথার ঘোর আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিয়াছিল। স্কুল ও কলেজ সমস্তে ইহার বিশেষ উল্লেখ হওয়াব কারণ এই যে, ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালকের বন্ধু হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জন্য কোন চিরস্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের উপায়ের নিমিত্ত মেডিকাল কলেজের দরবার ঘরে এক মহতী সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে কৃষ্ণনাথ কুমার বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজে তিন হাজার টাকা দান করিয়া, আবশ্যক হইলে আরও অধিক টাকা দিবেন বলিয়া, অঙ্গীকাব করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেবের যে শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি এই ক্ষণে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় হেয়াব স্কুলেব সম্মুখে বিরাজমান, তাহা সেই টাকায় নির্ম্মিত হয় এবং সেই নিমিত্ত কুমার বাহাদুর ছাত্রবর্গেব নিকট বিলক্ষণ পবিচিত ছিলেন।

মুন্সফীপদও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের জন্য খোলা ছিল কিন্তু বেতন ছিল কেবল ২৫ টাকা মাত্র সুতরাং মুন্সেফদেব যে অতি নিকৃষ্ট অবস্থা ছিল তাহা আব বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু যদি ও সাহেবেরা দেখিতে

দেশের বিচারপতি ছিলেন তথাপি প্রকৃত পক্ষে সকল বিচারালয়ে বিচার করার কার্য্য সেই সেই আদালতের দেওয়ান ও তদধীন আমলার হস্তে অনেকটা নির্ভর করিত। আমি এমন কথা বলি না, যে সাহেবদের মধ্যে কেহই বিচার কার্য্যে পটু ছিলেন না। সিবিলিয়ান বিচারপতিগণের মধ্যে হারিংটন, ডি, সি, স্মিথ, প্রভৃতি অনেকে সুবিচারের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রশংসিত ছিলেন। সুবিচার করার নিমিত্ত অনেক সাহেবেরই মনে সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল কিন্তু শুদ্ধ বিচারকের চেষ্টায় এবং ইচ্ছায় তো বিচার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নিষ্পাদিত হয় না। একে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাতে আইন কানুনের অল্পতা ও অনিশ্চিততা, বিশেষ কোন স্থানে কোন্ আইন খাটিবে কি খাটিবে না, তাহা দেখাইবা দেওয়ার নিমিত্ত এখনকার মত তখন শিক্ষিত উকীল সম্প্রদায় ছিল না, সুতরাং হাতুড়িয়া কবিরাজের হস্তে রোগের যেরূপ চিকিৎসা হইয়া থাকে, সে কালের বিচারকদিগের হস্তেও বিচার কার্য্য সেই রূপে নিষ্পাদিত হইত। কিন্তু অনেক স্থানে এবং সময়ে সাহেব হাকিমেরা কেবল সাক্ষী গোপালের ন্যায় এজলাসে বসিয়া থাকিতেন, আসল কার্য্য দেওয়ানজীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। দেওয়ানজীরা অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন এবং ফারসী ভাষায় তাঁহাদের দক্ষতা থাকা আবশ্যক ছিল। মোকদ্দমার রায় ফয়সালা সমুদয় আবশ্যকীয় কাগজ দেওয়ানজীকেই লিখিয়া প্রস্তুত করিতে হইত। যে আদালতের সাহেব কার্য্যক্ষম হইতেন তিনি অধিক করিলে নিজে কেবল ডিক্রী কি ডিসমিশ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অবসর লইতেন। হেতুবাদ সমস্ত ব্যক্ত এবং লিপি বদ্ধ করা দেওয়ানজীর কার্য্য ছিল। অনেক আদালতে দেওয়ানের ইঙ্গিত মতে সাহেবেরা নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইতেন সুতরাং সাহেবেরা খুব ভাল লোক দেখিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন।

তবে টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পুর্ব্বে সাহেবেরা অনেকেই এই দোষে মুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ঘুস লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম্ম মনে করি তখন লোকের সে জ্ঞান ছিল না। ঘুস না দিলে কোনও কার্য্য হইত না। কিন্তু এক্ষণে সেই দোষের হ্রাস হইয়াছে বলিয়া অর্থী প্রত্যর্থীগণের বড় বিশেষ সুবিধা হয় নাই। সকল কালেই তাহাদের ভাগ্যে সমান কষ্ট, তখনও দেওয়ানজীকে কিম্বা অন্যান্য আমলাকে টাকা না দিলে মোকদ্দমার সুবিধা ছিল না এখন ও ষ্টাম্প কুসুম, আদালতের নানা

প্রকার ফীস ও উকীল কৌন্সলীর মেহেন্নতানা দিতে লোকের সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখনও দেওয়ানজীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইত, এখনও সেইরূপ উকীল বাবুদিগকে টাকা দিতে ও উপাসনা করিতে হয়। তবে তখন দেওয়ানজীকে পরিতোষ করিতে পারিলেই জয় লাভের সন্দেহ থাকিত না কিন্তু এইক্ষণে উকীল বাবুদিগকে মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে পারিলেও সেই রূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না।

কাছারীর আমলাদিগের মধ্যে উৎকোচ লওয়ার প্রথা এক্ষণে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। আমলারা ঘুস লয়েন না বলিয়া লোকের বিশেষ সুবিধা কিম্বা উপকার বর্দ্ধিত হয় নাই বরং অসুবিধা এবং অনুপকারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যখন আমলারা ঘুস লইত, তখন কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই আপনার স্বেচ্ছাধীন সময়ের মধ্যে আমলা দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লওয়া যাইত, ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। পূর্ব্বে আমলাকে যে টাকা উৎকোচ স্বরূপ দেওয়া যাইত বরং তাহার অধিক টাকা সেই কার্য্যের জন্য এখন আদালতের ফিস্ স্বরূপে দিতে হয়, কিন্তু নিয়মের অধীন হইয়া আমলাদিগের ইচ্ছা এবং সাবকাশের প্রতীক্ষা করিতে হয়। আগে চারি গণ্ডা পয়সা দিলে আমলার দ্বারা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে যে কার্য্য সম্পাদিত করিয়া লওয়া যাইত, এক্ষণে আদালতে সেই কার্য্যের জন্য এক্ টাকা ফীস্ দিয়া তিন দিবস আদালতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া প্রাণান্ত হইতে হয়। বিশেষ আর যে এক উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনেক স্থানে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে সকল আমলারা বেবাঁয়া হইয়াছেন, অহঙ্কারে তাঁহাদের মাটিতে পা পড়ে না। তাঁহারা ঘুস গ্রহণ করেন না বলিয়া প্রার্থীদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন এবং কটু কাটব্যের সহিত তাহাদিগের ব্যবহার করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই স্থানে এতৎসম্বন্ধে আমি একটা রহস্যের কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমি কিছুকাল তমলুকের নিমক মহলের হেড কেরাণী ছিলাম। তমলুকে নিমকের এজেণ্ট সাহেবই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যালয়ই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তদনুযায়ী ডাকঘরও তাঁহার অধীনে ছিল। সেই ডাকঘর আমাদের নিমক মহলের কাছারী বাড়ীর এক ঘরে স্থাপিত ছিল, এবং ডাক মুন্সি

ছিলেন,—একজন বৃদ্ধ কায়স্থ। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে পূর্ব্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃত পক্ষেও কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সে কালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে

নূনে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর্, না দেখ্ মোর্॥

নিমক মহাল ও কাপড়ের কুঠি উভয়ই সে কালে (Pagoda tree) টাকার গাছ ছিল। কিন্তু আমি যে সময়ে তমলুকে চাকরী করিতে যাই তখন "তালপুকুরের" কেবল নাম ছিল, তাল অথবা পুকুর কিছু ছিল না। তথাপি নামের মাহাত্ম্য কোথায় যায়? এমন ভগ্নাবস্থায়ও আমলারা প্রতিবৎসর দাদনের সময় মলঙ্গিদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইতেন এবং সেই বার্ষিকই তাঁহাদের নিমিত্ত প্রচুর ছিল। দাদনের সময় নিমক মহলের সকল আমলার কিছু না কিছু লাভ হইত কেবল হইত না,—আমাদের ডাক মুন্সী মহাশয়ের। কারণ ডাক মুন্সীর সঙ্গে নূনের মলঙ্গীদিগের কি সম্পর্ক যে তাহারা তাঁহাকে বার্ষিক দিবে? সেই নিমিত্ত মুন্সী মহাশয়ের মেজাজ সর্ব্বদা গরম থাকিত। দাদনের সময় সকল মলঙ্গিরা টাকা লইতে তমলুকের কাছারীতে আসিত এবং হাঁ করিয়া কাছারী বাড়ীর সকল ঘরে সাহেব আমলাদিগকে দেখিয়া বেড়াইত। স্বয়ং এজেণ্ট সাহেবের ঘরে যাইলেও সাহেব মলঙ্গিদিগকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু কেবল আমাদের ডাক মুন্সী মহাশয়ের তাহা সহ্য হইত না। কোনও মলঙ্গী তাঁহার ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি আরক্ত লোচনে এবং একটা রুল হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া মলঙ্গিদিগকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন যে "তোম লোক হিঁয়াসে নিকাল যাও, আমি তোমাদের রেস্পদ খাই না, এখানে রেস্পদের কোনও এলাকা নাই।" আদালত ফৌজদারী ও কলেক্টরির আমলারা যে কোন কারণে হউক এইক্ষণে বেরোঁয়া হইয়াছেন বলিয়া উক্ত ডাক মুন্সীর মত অর্থীপ্রত্যর্থীদিগের প্রতি কটু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে সিবিলিয়ানদিগের নিয়োগের স্বতন্ত্র প্রণালী ছিল। তাঁহারা সুপারিশে নির্ব্বাচিত হইয়া ইংলণ্ডে হেলিবারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পাঠ করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইতেন এবং কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজ নামক বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালা, পার্সী, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয়-ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন। কলিকাতায় লাল-দীঘীর উত্তর ধারে যে পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা এক বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা ছিল এবং যাহা এক্ষণে বহুব্যয়ে সংস্কার করিয়া বঙ্গদেশের সেক্রেটারিয়েট আফিসে পরিণত করা হইয়াছে, সেই গৃহেই এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত ছিল এবং তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সিবিলিয়ান যুবা পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইতেন। প্রথমে সিবিলিয়ানদিগের নাম Writer (কেরাণী) ছিল বলিয়া তাঁহাদের এই বাসের গৃহকে লোকে Writers Buildings (কোম্পানির বারিক) বলিত।

সিবিলিয়ান যুবক সাহেবদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অনেক ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতেরা নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক দিত। ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার প্রথম বয়সে এইরূপ একজন শিক্ষক ছিলেন। হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কালিপ্রসন্ন দত্তের পূর্ব্বপুরুষেরাও এই কার্য্য করিতেন, কিন্তু সকলের উপরে রাজনারায়ণ গুপ্ত নামক শ্রীখণ্ডের হরি হরি খাঁ বৈদ্য কুলীন এইরূপ শিক্ষকবৃত্তি দ্বারা অনেক ধন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাহির সিমলা বেচু চাটুর্য্যের গলির যে স্থানে এক্ষণ রাজা দুর্গাচরণ লাহার বাড়ী, সেই স্থানে উক্ত রাজনারায়ণ মুন্সীর এক বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সিবিলিয়ান যুবকদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালা এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষা সমস্তে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করা হইয়াছিল এবং বঙ্গ ভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক এই সকল সাহেবদিগের হিতার্থেই লিখিত হয়। এক্ষণে আর সেই সকল পুস্তকের চলন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের শৈশব পুস্তক বলিয়া বরাবর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় ৩ বৎসর কাল বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষান্তে সিবিলিয়ানরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আসিষ্টাণ্ট পদ পাইয়া চলিয়া যাইতেন।

বর্ত্তমান কালে যেমন যে সে ব্যক্তি ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই সিবিলিয়ান হইতে পারেন, পূর্ব্বে সেরূপ যে সে মনুষ্য সিবিলিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত

হইতে পারিতেন না। ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত বিলাতে যে কোর্ট অব ডাইরেক্টর নামক সভা ছিল, তাহার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বৎসর দুই একজন করিয়া সিবিলিয়ান নিযুক্ত করার ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইতে পারিলে, সিবিলিয়ান হওয়ার উপায় ছিল না এবং সেই কারণে পূর্ব্বে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংলণ্ডের মর্য্যাদাপন্ন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানেরা অনেক স্থলে সিবিলিয়ানিতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহাদের গুণেই এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশোদ্ভব সাহেবেরা পর্য্যায়ক্রমে সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেন। ইহাঁরা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকার সিবিলিয়ান সাহেবদিগের এ দেশের লোকের প্রতি দয়া মমতা ছিল এবং তাঁহারা নিজে যেমন ভদ্র বংশে উদ্ভূত, সেইরূপ এখানকার ভদ্রলোককেও তাঁহারা যথোচিত সম্মান করিতে ক্রটি করিতেন না। সিবিলিয়ান সাহেবেরা যতদিন ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেন, ততদিন তাঁহাদের সকলেরই এক একজন দেওয়ান মুচ্ছদী থাকিত। তাঁহারা বিলাত যাইবার সময় তাঁহাদিগকে নিদর্শন কিম্বা সুখ্যাতি পত্র দিয়া যাইতেন, যে তাঁহাদের পরে তাঁহাদের সন্তানেরা ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়া আসিলে, সেই সকল নিদর্শন পত্র দেখিলে, দেওয়ান মুচ্ছদীর সন্তানেরাও তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং অনেক যুবক সিবিলিয়ান তাঁহার পিতার ঐরূপ নিদর্শন পত্র দেখিয়া আগ্রহের সহিত সেই দেওয়ানের উত্তর পুরুষদিগকে চাকরি দিতেন কিম্বা প্রকারান্তরে উপকার করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমি এইস্থানে বিবৃত করিব। ডাম্পিয়ার সাহেব যিনি অতি অল্পদিন হইল রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়া চাকরী হইতে অবসর লইয়াছেন, তিনি যখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরি ছিলেন, তখন, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺রামকুমার বসু মহাশয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রামকুমার দাদা শুনিলেন, যে তাঁহাকে ২৪ পরগণা হইতে এক দূর জেলায় বদলি করার কথা হইতেছে। তিনি তাহা শুনিয়া ডাম্পিয়ার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঐ সাহেবের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল না। ডাম্পিয়ার সাহেব রামকুমার দাদার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এমন তাঁহার বোধ হইল না বরং তিনি সাহেবের উল্টা অভিপ্রায়ই বুঝিলেন। তাহাতে রামকুমার বাবু সাহেবকে বলি-

লেন যে "মহাশয় আপনার অনুগ্রহের উপরে আমার কিছু দাবি আছে।" সাহেব এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রামকুমার দাদার সহিত কথা কহিতে ছিলেন, কিন্তু উপরি উক্ত বাক্য শুনিয়া তিনি বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কিরূপে আমার অনুগ্রহের উপরে তোমার দাবি আছে?" রামকুমার দাদা উত্তর করিলেন যে "আপনার পিতার নিকট আমার শ্বশুর চাকরি করিতেন।" সাহেব রামকুমার দাদার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা নাম ব্যক্ত করিবা মাত্র সাহেব তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহার পরে রামকুমার দাদার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। ইহা অতি অল্প দিনের কথা, কিন্তু পূর্ব্বতন সিবিলিয়ানের দল এক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

নূতন প্রণালী মতে যাঁহারা সিবিলিযান হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাব অন্য রকমের। কয়েক খানা নির্দ্দিষ্ট কেতাব পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি উত্তম শাসনকর্ত্তা এবং বিচারক হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে, কিন্তু যাউক সে কথা। আমি কেবল পূর্ব্ব কালের হাকিমের কথা বর্ণনা করিব সুতরাং নূতন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আমার অনধিকার এবং তাহাতে আমি হস্তক্ষেপণও করিব না। সে কালের হাকিমদিগের পুঁথিগত বিদ্যা না থাকিলেও তাঁহারা যে কম বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন এমন নহে। বিশেষ তাঁহারা অহঙ্কার শূন্য ছিলেন এবং ভাল কথা শুনিলে তাহা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এখন যেমন সাহেবেরা ভারতবর্ষে দুই দিন পদ নিক্ষেপ করিয়া "হাম জান্তা" এবং "সব জান্তা" প্রভু হইয়া পড়েন, তখনকার হাকিমেরা তাহা করিতেন না। তখনও অল্প বয়সে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের উপরে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু তাঁহারা নিজে যে সকল বিষয় ভাল রূপে বুঝিতে পারিতেন না, সেই সকল বিষয়ে আমলাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান কিম্বা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। কাছারীর সকলেই এক কার্য্যের জন্য ব্রতী বলিয়া তাঁহাদিগের অনুধাবন ছিল। এমন ভাবিতেন না যে আমি উচ্চ পদস্থ অতএব আমি সকল অপেক্ষা ভাল বুঝি এবং আমার অধীন আমলারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

কলিকাতার বড় ট্রেজরিতে এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও অনেক কেরাণী ছিল কিন্তু কেরাণীরা অনেকে ইংরাজী কেবল লিখিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের কেরাণাদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। কায়কষ্টে উপরিতন সাহেবকে মনের ভাব বুঝাইতে পারিতেন। একবার একজন কেরাণী একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তা সব্‌ট্রেজরর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলে, সাহেব সেই হিসাবের কয়েক দফা খরচ অন্যায্য বিবেচনা করিয়া তাহা কর্ত্তন করার মানসে কলম তুলিয়া লইলেন। কেরাণী তাহা দেখিবা মাত্র অগ্রসর হইয়া সাহেবের হাত ধরিয়া ব্যগ্র চিত্তে বলিয়া উঠিলেন যে "নাট্ কাট্ নাট্ কাট্ স্যাব্ রীজন্ গাট্‌গ" অর্থাৎ "কাটিবেন না কাটিবেন না মহাশয় কারণ আছে।" সাহেব কেরাণীর কাণ্ড দেখিয়া হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন এবং কেরাণীর নিকট কারণ শুনিয়া সেই সকল খরচ মঞ্জুর করিলেন। বলুন দেখি এখনকার দিনে কেরাণী ওরূপ কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিফল কি হইত?

আর একবার ২৪ পরগণায় কলেক্টরীতে এক পল্টনের রসদের জন্য পল্টনের কাপ্তেন সাহেব কলেক্টর সাহেবকে পত্র লেখেন। কলেক্টর সাহেব সেই পত্রের উত্তর মুসাবিদা করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার নিমিত্ত কেরাণীখানায় পাঠাইয়া দেন। যে কেরাণীর উপর ঐ সকল চিঠি লিখিবার ভার ছিল, সে দস্তুরমত কাপ্তেন সাহেবের নামের নীচে N I. অর্থাৎ Native Infantry বলিয়া লিখিয়া দস্তখতের জন্য কলেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিল। সাহেব N I. কাটিয়া তাহার স্থলে I N করিয়া দিয়া পুনরায় চিঠিখানা সাফ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেরাণী I. N. না লিখিয়া পূর্ব্ববৎ N. I লিখিয়া চিঠি কালেক্টরের নিকট পাঠাইল। সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কেরাণীকে ডাকিয়া সে কি জন্য বারম্বার ভুল লিখিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেরাণী বলিল যে, যে "Servant not make fault. Master make fault" অর্থাৎ আমার ভুল হয় নাই, হুজুরের ভুল হইয়াছে। সাহেব বলিলেন যে "না তোমারই ভুল হইয়াছে"। তাহাতে কেরাণী আর উত্তর না করিয়া দ্রুতবেগে কেরাণীখানায় যাইয়া চিঠির নকল বহিখানা আনিয়া সাহেবকে দেখাইয়া দিল, যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত কাপ্তেন সাহেবকে ঐরূপ পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহার সকলেতেই N. I. লিখিত আছে, অতএব সে পুনরায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের সহিত বলিল যে, "See Sir

"Master make fault" অর্থাৎ দেখুন হুজুরেরই ভুল হইয়াছে। সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই কাপ্তেন Native Infantryর কাপ্তেন নহে Indian Navyর কাপ্তেন অর্থাৎ ইনি পদাতিক সৈন্যের কাপ্তেন নহেন, নৌ-সেনার কাপ্তেন অতএব ইহাঁকে I. N. লিখিতে হইবে। কেরাণী তখন দন্তে জিহ্বা কাটিয়া যোড় হাত করিয়া সাহেবকে বলিল যে "Then servant make fault Sir" অর্থাৎ তবে অধীনের দোষ হইয়াছে। এমন শীতল-প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ক্ষমা-শীল হাকিম এখন কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়?

ইহারও পূর্ব্বের হাকিমদিগের আরও ভাল প্রকৃতি ছিল। নবাব সুভার নিকট হইতে রাজ্য লইয়া সাহেবেরাও অনেক বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতেন। ঘর কন্নার বিষয়ে কেহই নিজে দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাহার ভার আমলা এবং ভৃত্যদিগের উপরে ন্যস্ত থাকিত। সাহেবেরা কেবল চাহিতেন এবং ভোগ করিতেন। অনেকে বোধ হয় হয় জানেন না যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের লক্ষ্মীশ্রীব মূল তিনটি P ছিলেন অর্থাৎ তিন জন সাহেবের নামের প্রথমাক্ষর P ছিল। Parker, Plowden, Pattle এই সাহেবত্রয়ের অনুগ্রহেতেই তিনি ভাগ্যধব হইয়াছিলেন এবং চবিত্রও তাঁহাদেব অত্যন্ত উদার ছিল। পার্কার সাহেব কেবল উচ্চ পদস্থ সিবিলিয়ান ছিলেন এমন নহে, ইংবাজি সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত ইংরাজি কবিতা অত্যন্ত মধুব এবং তাহা পাঠ কবিলে তৃপ্তি জন্মে। D. L. Richardson সাহেবের Selection বহিতে পার্কার সাহেবের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্যাটেল সাহেব কিঞ্চিৎ উগ্রভাব বিশিষ্ট ছিলেন এবং প্লাউডেন সাহেব অতি উচ্চ ঘরের লোক। তাঁহার বংশের ব্যক্তি এখনও বঙ্গদেশে সিবিলিয়ান আছেন। যখন দ্বারকানাথ বাবু নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন,তখন প্লাউডেন সাহেব ২৪ পরগণায় (Salt Agent) নিমকের এজেণ্ট ছিলেন। ২৪ পরগণার এজেন্সির অধীনে নানা স্থানে এক এক জন নিমকের দারোগা নিয়োজিত ছিল, ইহার মধ্যে আলীপুরের দারোগার উপরে এজেণ্ট সাহেবের বাড়ীর তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই যে এই সকল দারোগা এবং তাহাদের নিম্ন আমলা সমস্তই দ্বারকানাথ বাবুর নির্ব্বাচিত কিম্বা নিজের লোক ছিল। এক দিন সাহেব একটা গাভী ২০ সের দুগ্ধ দেয় শুনিয়া তিনি অনেক টাকায় ক্রয় কবেন

এবং তাহা বাড়ীতে আনিয়া তাহাকে খুব যত্নে রাখিতে দারোগাকে আদেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই গাভীটা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া ৬। ৭ সেরের অধিক দুধ দিত না। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বেও সে ঐ পরিমাণে দুগ্ধ দিত, কিন্তু বিক্রেতা সাহেবকে বঞ্চনা করিয়াছিল। সে যাহা হউক, বিক্রেতা বঞ্চনা করিলে কি হয়, সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে গোরুটা যথার্থই ২০ সের দুগ্ধ দেয়। বিক্রেতার কথা মত গাভী দুগ্ধ দেয় না দেখিয়া সাহেব মনে করিলেন যে হয় দারোগা উহাকে ভাল করিয়া সেবা করে না, নচেৎ দুগ্ধ চুরি করে। তাঁহার ধারণা ছিল যে বাঙ্গালিরা অত্যন্ত দুগ্ধ প্রিয় অতএব তাঁহার চাকরেরা তাঁহার গাভীর প্রদত্ত দুগ্ধ আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় স্বীয় উদর পোষণ করে। এই জন্য তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের উপরে শাসন করিতে এমন কি তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দারোগা, সাহেবের এই ব্যবহার দেখিয়া দ্বারকানাথ বাবুকে আসিয়া অবস্থা জ্ঞাত করিল এবং বলিল যে "আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলুন।" দ্বারকানাথ বাবু উত্তর করিলেন যে "বুঝাইলে কিছু ফল হইবে না, সাহেবকে যে প্রকারে হউক সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, তাঁহাকে ২০ সের দুগ্ধ বুঝাইয়া দিতেই হইবে।" দারোগা বলিল "গরু দুগ্ধ না দিলে তাহা কি প্রকারে হইবে।" দ্বারকানাথ উত্তর করিলেন যে "গরুর বাঁটে দুধ না হয় নিজের পয়সায় বাকী দুধ কিনিয়া সাহেবকে ২০ সের দুধ বুঝাইয়া দেও, তথাপি মনিবের আজ্ঞা পালন করা আবশ্যক।" তাহাই হইল। তাহার পর দিবস প্লাউডেন সাহেব দ্বারকানাথ বাবুকে অতি হর্ষ চিত্তে বলিলেন যে "দেখ দ্বারকানাথ লাঠির বড় গুণ, লাঠির চোটে আমার গরু পূর্ব্ববৎ ২০ সের করিয়া দুগ্ধ দিতেছে।"

দ্বারকানাথ বাবুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাঁহার যখন খুব উন্নত অবস্থা, যখন তিনি গবর্ণমেন্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া, কার ঠাকুর কোম্পানির হাউসের এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা, তখন তাঁহার সহিত সেই প্যাটেল সাহেবের বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল; এমন কি প্যাটেল সাহেব দ্বারকানাথ বাবুর অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়িতেন না, কিন্তু মৌখিক সদ্ভাব কি আলাপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই সময়ে

ঢাকা বিভাগের বরদাখাত পরগনা জমিদারীর সদর খাজানা বাকী পড়াতে সেই জমিদারী লাটে উঠিয়াছিল। প্যাটেল সাহেব তখন সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর এবং আমার সর্ব্বাচ্ছাদক পূজ্যপাদ মাতুল ৺ রামলোচন ঘোষ সেই বোর্ডের দেওয়ান অর্থাৎ সেরেস্তাদার। বরদাখাত পরগণা লাটে উঠিলে প্যাটেল সাহেব স্থির করিলেন যে, যেহেতু ইহা অতি বৃহৎ এবং বহু-মূল্যের সম্পত্তি, অতএব নিজ জেলায় ইহার নিলাম হইলে উপযুক্ত মূল্য উঠিবে না; কলিকাতার বোর্ডের কাছারীতে নিলাম হইলে অনেক ধনাঢ্য ক্রেতা উপস্থিত হইতে পারিবে সুতরাং অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব। বরদাখাতের মালিকেরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল; কারণ তাঁহাদের পুনরায় ঐ জমিদারী ক্রয় করায় অভিপ্রায় ছিল, এবং জানিতেন যে নিজ জেলায় নিলাম হইলে অপর ক্রেতাকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া নিবস্ত রাখিতে এবং আপনারা সুলভ মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন। অতএব কলিকাতায় যাহাতে নিলাম না হয়, তাহার চেষ্টার নিমিত্ত সেই জমিদারেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মাতুলের নিজের চেষ্টায় সেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না জানিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শের নিমিত্ত দ্বারকানাথ বাবুর নিকট যাইতে বলিলেন। আমার মাতুল জানিতেন যে এই কার্য্য উদ্ধার করিতে যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা দ্বারকানাথ বাবুর আছে, অন্য কাহারও নাই। কিন্তু তখন প্যাটেল সাহেবের সহিত দ্বারকানাথ বাবুর অত্যন্ত বৈরজভাব, পাছে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠে, তাহাও মাতুলের মনে সন্দেহ হইল, কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বুদ্ধির কৌশলের উপরে তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে প্যাটেল সাহেবের সহিত উক্ত বাবুর শত্রুতাভাব জানিয়াও তিনি প্রার্থীদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। দ্বারকানাথ বাবু যত টাকা চাহিলেন, তাহা জমিদারেরা দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাহাদিগকে সেই টাকা তাঁহার নায়েব রুক্মিণীকান্ত বাবুর নিকট আমানত করিতে বলিয়া দিয়া, পর দিবস প্যাটেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথার পরে দ্বারকানাথ বাবু বরদাখাত পরগনার নিলামের কথা উত্থাপন করিয়া প্যাটেল সাহেবকে অবগত করিলেন যে "আপনি এই জমিদারীর নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য যে হুকুম দিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই

সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিজের উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, জেলায়, নিলাম হইলে আমার সুবিধা হইত না, এখানে নিলাম হইলে আমি স্বয়ং আসিয়া ডাকিব, এবং আমি ডাকিলে, বোধ হয় অন্যান্য ক্রেতা আমার প্রতিবন্ধকতা করিবে না।" এই কথাতে চারে মৎস্য লাগিল। একেই দ্বারকানাথ প্যাটেলের চক্ষুশূল, তাহাতে সাহেব উপরন্তু দেখিলেন যে তিনি যে সদভিপ্রায়ে নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শত্রু দ্বারকানাথ ঠাকুর নষ্ট করিতে উদ্যত। কারণ প্যাটেল সাহেব জানিতেন যে দ্বারকানাথ মনে করিলে যথার্থই অন্যান্য ক্রেতাকে অনুরোধ করিয়া থামাইয়া রাখিতে পারিবে। অতএব যে কার্য্যে দ্বারকানাথের মঙ্গল হইবে তাহা প্যাটেলের কখনও করিতে দেওয়া হইবে না। তিনি দ্বারকানাথ বাবুকে বলিলেন যে "হাঁ আমি এইরূপ হুকুম দিয়াছিলাম বটে কিন্তু বাকীদায় মালিকেরা আমার নিকট দরখাস্ত করাতে, আমার এক্ষণে অন্যমত হইযাছে।" উপসংহারে তিনি হাস্য বদনে তাঁহাকে বলিলেন, যে "না দ্বারকানাথ আমি তোমাকে বরদাখাত জমিদারী কিনিতে দিব না, ইহার নিলাম জেলাতেই হইবে।" এইস্থানে বিবৃত করা আবশ্যক, যে সেই দিবস দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে জমিদারেরা যথার্থই প্যাটেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সাহেব তখন তাহা না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ প্যাটেলের নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই তিনি আমার মাতুলকে ডাকিয়া পুনরায় সেই দরখাস্ত পেষ করিয়া জেলাতে নিলাম হওয়ার আদেশ প্রচার করিলেন। প্যাটেল সাহেব মনে মনে খুসি হইলেন, যে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এমন গুরুতর বিষয়ে নৈরাশ করিলেন, দ্বারকানাথ বাবু আহ্লাদিত হইলেন যে তিনি তাঁহার বৈরঙ্গকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হইলেন এবং জমিদারেরা তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইল, দেখিয়া হর্ষচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহাত গেল পূর্ব্বকালের, এখন আমাদের সময়ের কয়েকটা কথা বলিব। কৃষ্ণনগরে একজন আসিষ্টাণ্ট সাহেব ছিলেন। তাঁহার নাম ব্যক্ত করার আবশ্যক নাই। তাঁহার নিকট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলেক্টর সাহেব বিচারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী ও খাজনার মোকদ্দমা অর্পণ করিতেন। সেই সময়ে খাজানা আদায়ের জন্য পূর্ব্বকালের হপ্তম পঞ্চম কানুন

প্রচলিত ছিল, ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। খাজানার এই সকল মোকদ্দমাকে সরাসরী মোকদ্দমা বলিয়া লোকে বলিত। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিকট নথী-পাঠ করিতে ও হুকুম লিখিতে ফৌজদারী হইতে ফৌজদারীর পেস্কার উমাকান্ত বসু ও সরাসরী মোকদ্দমার জন্য কলেক্টরীর মোহরের ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় নিযোজিত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার শুনানীর সময় উমাকান্ত এবং সরাসরী মোকদ্দমার শুনানীর সময় ব্রজগোপাল আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন বিলাতের ডাক প্রতি সপ্তাহে আসিত না, পক্ষান্তে আসিত। বিশেষত ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ছিল না, সুতরাং একটা ডাকের দিন মারা গেলে পুনরায় পোনর দিবস অপেক্ষা না করিলে বিলাতে পুনরায় চিঠি পাঠানর সুযোগ হইত না। এই নিমিত্ত বিলাতি ডাকের দিবসে সাহেবেরা সকলেই বিলাতে চিঠি-পত্র লিখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন এবং এমনও কখন কখন ঘটিত যে হাকিমেরা সেই দিবস কাছারীর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া কেবল পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐরূপ এক বিলাতি ডাকের দিবস এই আসিষ্টাণ্ট সাহেব কাছারিতে আসিয়া বিলাতী পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাছারীর কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য যে আমলা উপস্থিত থাকে, তাহাকে ডাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে চাপরাসিকে হুকুম দিয়া মাথা গুঁজিয়া পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইলেন। সেই তলব মতে কলেক্টরীর মোহরের ব্রজগোপাল এজলাসে আসিয়া খাড়া হইল। সাহেব ঘাড় তুলিয়া তাহাকে দেখিলেন না, কিন্তু ব্রজগোপালের কাগজ-পত্র নাড়া চাড়ার শব্দে বুঝিতে পারিলেন, যে আমলা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা বুঝিয়া তিনি সেই ভাবেই "পড়ো" বলিয়া হুকুম করিলেন। ব্রজগোপাল তদনুযায়ী এক খাজানার মোকদ্দমার নথী পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে সাহেবের চিঠি লেখাও চলিতে লাগিল। কিন্তু সাহেবের মন কেবল চিঠি লেখাতেই নিবিষ্ট। আমলা কি ছাই ভস্ম পড়িতেছে তাহা তাঁহার কর্ণে কেবল মাত্র স্পর্শ করিতেছ কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু সকল এমনই স্পন্দহীন যে তদ্দ্বারা ব্রজগোপালের উচ্চারিত শব্দ-গুলি অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাছারী ঘরে টু-শব্দটি নাই কেবল এক দিকে ব্রজগোপালের নথী পাঠের গড়গড়ানী শব্দ, আর এক দিকে সাহেবের কলমের চড়চড়ানী শব্দ; এই দুই শব্দ বক্রিম

বাবুর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লিখিত "উজ্জ্বলে মধুরে" মিলনের ন্যায় মিলিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে ব্রজগোপালের নথী পাঠ করা সমাপ্ত হইল, কিন্তু সাহেবের পত্র লেখার বিরাম নাই। আমলা চুপ করিল দেখিয়া সাহেব পুনরায় বলিলেন "পড়ো" আমলা উত্তর করিল যে "খোদাবন্দ তামাম হুয়া।" তাহাতে সাহেব সেই রূপ ঘাড় গুঁজিয়া কলম চালাইতে চালাইতে বলিলেন যে "আচ্ছা লিখো হুকুম, তিন মাস ফাটক, আওর দশরূপিয়া জরিমানা, না দেয় ত আর ১৫ রোজ ফাটক বা-জিঞ্জীর।" ব্রজগোপাল হুকুম শুনিয়া স্তম্ভিত, খাজানার মোকদ্দমায় চোরের শাস্তি; কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, এবং সাহেবকেও ত্যক্ত করিতে সাহস করিল না, এমনাবস্থায় সে এক হস্তে নথী আর এক হস্তে কলম লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বাদে সাহেব হুকুম দস্তখত করার মনস্থে নথীটা লইবার নিমিত্ত এক হস্ত প্রসারণ করিবায় আমলা অবকাশ পাইয়া বলিল যে "খোদাবন্দ ইয়ে সরাসরী মোকদ্দমাকা নথী হেয়।" এই কথা শুনিয়া তখন সাহেব ঘাড় তুলিয়া আমলার প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং কোন্ আমলা নথী পড়িতেছিল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন যে "ও তোম্ ব্রজগোপাল হেয়, হাম জান্তা, তোম উমাকান্ত, আচ্ছা লিখো, মোকদ্দমা ডিসমিস।"

হোষ্টন এবং স্কিনর নামক দুই জন সিবিলিয়ান ছিলেন, ইহাঁদিগকে লোকে "পাগলা" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহার মধ্যে হোষ্টন সাহেব উচ্চ বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি আমাদের এক কালের বড় লাট লর্ড ড্যালহৌসীর জ্ঞাতি অথবা কুটুম্ব হইতেন। সেই নিমিত্ত তিনি নীচ বংশোদ্ভব সাহেবদিগকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্গের প্রথম ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবকে তিনি "ফিতা ফেরোষকা লড়কা" অর্থাৎ ফিতা বিক্রেতার পুত্র বলিয়া তুচ্ছ করিতেন। হোষ্টন নিজে যেমন বড় ঘরের লোক, তেমনই এ দেশীয় ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার অধীনে চাকরী খালি হইলে অগ্রে বেগের গাঙ্গুলী তার পরে ফুলের মুখুটি প্রভৃতি কুলীনকে নিযুক্ত করিতেন এবং কায়স্থের মধ্যে বসু, ঘোষ, মিত্র পাইলে অন্য কাহাকেও দিতেন না। বিক্রমপুরের লোকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেই স্থানের লোকেরা লেখা পড়ায় বড় মজবুত। আমলাদিগের কাহারও কোন পীড়া হইলে শ্রীফল

ছিল—তাহার নিকট সর্ব্বৌষধ মহৌষধ। ব্যামোহের কথা উপস্থিত হইলেই তিনি "বেল খাও" "বেল খাও" বলিয়া পরামর্শ দিতেন এবং নিজেও অনেক বেল ধ্বংশ করিতেন। হেষ্টিন কৃষ্ণনগরে কলেক্টর হইয়া আসিলেন। গ্রীষ্মকালে কাছারীর বাহিরে বৃক্ষতলায় বসিয়া কাছারী করিতেন এবং সকলকে পাগড়ী ও চাপকান ইত্যাদি পোষাক পরিয়া কাছারী আসিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন যে বাঙ্গালিরা বাড়ীতে কেবল ধুতি চাদর পরিয়া থাকে অতএব সেই পরিচ্ছদে তাহারা কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ করিবে না। কাছারীর আসল কাজ তিনি কিছুই করিতেন না, কিম্বা করিতে পারিতেন না। কেবল আজ এক ঘর হইতে আর এক ঘরে কেরাণীখানা ও কল্য এজলাসের মেজটা উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বদিকে স্থানান্তর করা ইত্যাদি মিথ্যা কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। লর্ড ড্যালহৌসী এই হেষ্টিন সাহেবকে এক বিভাগের কমিশনর করিবাছিলেন কিন্তু রেবিনিউ বোর্ড হেষ্টিনের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ডকে এমন তিরস্কার করিয়াছিলেন যে কোন সিবিলিয়ানের প্রতি পূর্ব্বে এমন কটু বাক্য কেহ প্রয়োগ করে নাই। লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই যে "It is an unparallelled presumption on the part of the Board" অর্থাৎ "বোর্ডের ইহা অনির্ব্বচীয় গোস্তাকী।"

স্কিনর সাহেব হেষ্টিনের ন্যায় তত অকর্ম্মা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পেটে পেটে নষ্টামি ছিল। তিনি ঢাকায় থাকনাবস্থায় এক দিবস কাছারী আসিয়া লাট সাহেব আসিয়াছেন বলিয়া আমলাদিগকে কাছারী বন্ধ করিতে বলিলেন। আমলারা অবাক। তাহারা কহিল যে এমন বৃহৎ ব্যাপার পূর্ব্বে কিছু মাত্র সংবাদ নাই, বিশেষ লাট সাহেব আসিলে তোপধ্বনি হইবে, তাহাও হইল না,—ইহা কেমন কথা ? তাহাতে স্কিনর সাহেব উত্তর করিলেন, যে "তোম্‌লোক্ পাগল, গবর্ণর লাট সাহেব নেহি, হাম্‌রা লাট সাহেব, হামরা মেম সাহেবকা ভাই।" স্কিনর সাহেব পরে ঢাকায় মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, তখন পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকাতে আমলারা প্রাতঃকালে সাহেবের কুঠিতে যাইয়া থানা সকল হইতে আগত রিপোর্ট পাঠ করিয়া শুনাইত। স্কিনর সাহেবের কুঠীর যে কামরায় এইরূপ রিপোর্ট শুনানি হইত তাহাতে একবার তন কলীচুণ ফিরান হইয়াছিল। চুণ ফিরান

হইলে পরে যে দিবস পুনরায় সেই ঘরে সাহেবের বৈঠক হইল, সেই দিবস সাহেব রিপোর্ট শুনিবার সময় একজন অতি কৃষ্ণবর্ণ আমলাকে ডাকিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে স্বয়ং দাঁড়াইয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া তুড়ি দিতে দিতে সেই আমলাকে "চলো চলো" বলিয়া দেয়ালে যে পর্য্যন্ত তাহার মুখ না ঠেকিল, সে পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেলেন। দেয়ালের চূণ আমলার মুখে লাগিয়া বিকৃত হইল, দেখিয়া স্কিনর সাহেব উচ্চৈস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে একজন চাপরাসী সঙ্গে দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন, যে পথের লোকও তাহাকে দেখিয়া হাসিবে। শেষে স্কিনর সাহেব কৃষ্ণনগরের জজ হইয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া বিচার করা যেমন তেমন, আমলাদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছিলেন। কাছারীর সম্মুখে বৃক্ষের উপরে কাক কিম্বা অন্য কোন পক্ষী ডাকিতে পারিত না। এক দিন কয়েকটা কাক সেই বৃক্ষের উপরে বসিয়া কা কা করিয়াছিল বলিয়া তিনি "নাজির হামকো খুন কিয়া, নাজির হামকো খুন কিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাছারী ঘর ফাটাইয়া দিয়াছিলেন এবং অবশেষে নাজীরকে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ২৫৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। উকীলদের বক্তৃতা করিবার সময় জজ সাহেব মুখ বিকৃতি করিয়া তাঁহাদিগকে ভেঙ্গাইতেন। তাঁহার সেরেস্তাদার সে কালের বৃদ্ধ একটি ভদ্র লোক ছিলেন, তিনি খিড়কীদার পাগড়ী ও জামাজোড়া পরিয়া কাছারী আসিতেন। এক দিন স্কিনর সাহেব সেরেস্তাদারকে খাসকামরায় নির্জ্জনে পাইয়া সেরেস্তাদারের কোমর ধরিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত খেমটানাচ নাচিয়াছিলেন। আর এক দিন সেরেস্তাদারকে তিনি তাঁহার কুঠিতে কোন কার্য্যের নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেরেস্তদার হাতার বাহিরে পালকী রাখিয়া পদব্রজে হাতার মধ্য দিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। স্কিনর সাহেব তাহা দেখিয়া শীঘ্র তাঁহার কুঠির সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রহিলেন। বুড়া সেরেস্তাদারের মাথার উপরে সেই বৃষ্টি যতক্ষণ পড়িয়াছিল ততক্ষণ সাহেব দরজা খুলিলেন না, বৃষ্টি শেষ হইলে চাপরাসী দ্বারা সেরেস্তাদারকে কাছারী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এইরূপ স্কিনর সাহেবের কত কাহিনী আছে, বলিতে হইলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যায়, অতএব ক্ষান্ত রহিলাম।

এই প্রবন্ধ এখনই আমার সংকল্পের অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে অতএব কেবল মাত্র আর একটি ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিব। কৃষ্ণনগরে স্কোন্স নামক একজন জজ আসিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুবিচারক তেমনই অতি নম্র প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি যথার্থই দেব প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যে অল্পকাল কৃষ্ণনগরে জজিয়তি করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একটি অতি নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মোকদ্দমা এই স্কোন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্ব ভূমি একজন জমিদার বাজেয়াপ্ত করার নিমিত্ত আদালতে নালিশ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যক্রমে তাহা স্কোন্স সাহেবের হস্তে পড়িয়াছিল। যে দিবস উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব হয়, সেই দিবস ব্রাহ্মণটি প্রথম হইতে গলবস্ত্র হইয়া জজ সাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সাহেব ব্যক্ত করেন যে তিনি শেষ কাছারীতে অর্থাৎ টিফিনের পরে এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মণটি তাহা শুনিয়া কাছারী ঘরেতেই রহিল। টিফিনের সময় দেখিল যে তিনি আহারের পরে একটি গ্লাসে করিয়া শেরী সরাব পান করিলেন এবং ইচ্ছা হইলে আবও পান করিবার নিমিত্ত খানসামা সরাবের বোতলটা মেজের উপরে রাখিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কখনও সুরা বা সরাব দেখে নাই, লাল রঙ্গের জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইল যে উহা সরাব। টিফিনের পরে কাছারী পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সাহেব ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে এখন তিনি তাঁহারই রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল যে "দোহাই সাহেব আজ আমার মোকদ্দমার রায় লিখিবেন না, কল্য কিম্বা অন্য যে দিন ইচ্ছা প্রাতে লিখিবেন।"

সাহেব—কেন, অদ্য নিষ্পত্তি করিলে তোমার কি আপত্তি আছে ?

ব্রাহ্মণ—সাহেব বেজার না হয়েন, তবে বলি।

সাহেব—না আমি বেজার হইব না, তুমি নির্ভয়ে বল।

ব্রাহ্মণ—সাহেব তুমি যে এই মাত্র সরাব খাইলা, আবও দেখিতেছি খাইবা, সরাব খাইলে নেশা হইবে ; তখন কি লিখিতে কি লিখিবা, হয় ত আমার সত্য মোকদ্দমাটি নষ্ট করিবা। আমি দেখিয়াছি আমাদের

গ্রামে একজন ভদ্রলোক মদ খাইয়া তাহার মাতাকে শালী বলিয়া গালী দিয়াছিল; অতএব সাহেব মাপ কর, অদ্য অন্য কার্য্যে হস্ত ক্ষেপণ করিয়া আমার মোকদ্দমায় ক্ষান্ত থাক।

সাহেব—ইহা সে প্রকার শরাব নহে, ইহাতে আমরা মাতাল হই না, বরং ইহাতে আমাদের মস্তিষ্ক আরও পরিষ্কার হয়—

ব্রাহ্মণ—আমার পরিষ্কারে কাজ নাই সাহেব, যাহা আছে তাহাই ভাল,—আপনি আজ ক্ষান্ত থাকিয়া কাল আমার মোকদ্দমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সাহেব—না অদ্যাই করিব।

ব্রাহ্মণ—দোহাই সাহেব, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই ভূমিটি ভোগ করিয়া আমি একটি টোল চালাই, তাহা হারাইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া আমার বড়ই ভরসা হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি পরমেশ্বর আমাতে বৈমুখ হইলেন।

সাহেব—না তোমার কিছু ডর নাই, আমি সুবিচারই করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণ—সাহেব নেশা হইলে আপনি তাহা কখনই পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ সাহেবকে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল কারণ ব্রাহ্মণ ত শেরী কিম্বা অন্য ভাল শরাবের গুণ অবগত ছিল না, সে জানিত যে সকল সরাবই এক প্রকার, শরাব খাইলে হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের ন্যায় মাতাল হইয়া বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। সাহেব ব্রাহ্মণের অকপটতায় রোষ না করিয়া বরং আমোদিত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বারম্বার তাঁহাকে ত্যক্ত করাতে তিনি তাহাকে কাছারীর বাহিরে লইয়া যাইতে নাজিরকে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণ বাহিরে যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সাহেবের নিকট পুনরায় যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাজির তাহা করিতে দিল না। অবশেষে প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহাকে ডিক্রী দিলেন। ডিক্রীবাক্য শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই হস্ত উঠাইয়া বলিল যে "সাহেব তোমার জয় জয় কার, তোমার গঙ্গালাভ হউক।" আমিও বলি যে পাঠকগণ, যাঁহারা সহিষ্ণুতার সহিত আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাঁহাদেরও জয় জয় কার এবং গঙ্গালাভ হউক।

মুসলমান রাজত্বে হিন্দুর প্রভুত্ব।

রাজা রতনচাঁদ।

মোগল রাজত্বকালে কি শাসন কার্য্যে, আর কি সৈনিক বিভাগে, হিন্দুরা অতি প্রধান প্রধান পদ পাইতেন। আকবর জাহাঙ্গীরের সময় মানসিংহ তোড়লমল্ল প্রভৃতির কথা অনেকেই জানেন। সাজাঁহা, ঔরঙ্গজেবের সময় রাজকীয় কর্ম্মচারী পদে হিন্দুর প্রভুত্ব একটু খর্ব্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, হিন্দুরা আবার রাজ্যের সকল বিভাগেই প্রধান পদ পাইয়াছিলেন, এবং প্রভূত ক্ষমতা চালাইয়া ছিলেন।

রাজা রামসিংহ, রাজা দলপৎ, আম্বেরের জয়সিংহ, ও বিজয়সিংহ, যোধপুরের যশোবন্ত সিংহ ও অজিৎ সিংহ, রাজা মোহকম সিংহ (ক্ষত্রিয়), রাজা রাজসিংহ (জাঠ), চূড়ামণ জাঠ, ছেবিলরাম নাগর, রাজা শোভাচাঁদ, কাপুরচাঁদ শেঠ, হীরারাম, রাজা জয়সিংহ সেওয়াই, রাজা প্রতাপসিংহ বুঁদেলা, মলহররাও, রাজাভকত মল্ল, রায় নারাত্তম দাস, রাজা রতনচাঁদ প্রভৃতি শত শত হিন্দু শাসন ও সৈনিক বিভাগে উচ্চপদস্থ থাকিয়া রাজকার্য্যে প্রভুত্ব উপভোগ করিয়াছিলেন। আমরা অদ্য রতনচাঁদের কথা বলিব।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের শেষে ঔরঙ্গজেব শাহলীলা সম্বরণ করেন। দিল্লীর তক্ত লইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ রণরঙ্গে বিবাদ করিতে লাগিলেন। মহম্মদ আজেম এবং মহম্মদ মোয়াজেম উভয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা সম্রাট বলিয়া অভিষিক্ত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র কমবখ্শ দক্ষিণ দেশ দখল করিলেন। সুলতান মোয়াজেমই ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহের এক পুত্র আজিম উষাণ; তৎপুত্র করীমদ্দীন, বেদারবখত, ওয়ালাজা, ফিরোক সিয়ার প্রভৃতি। মইজদ্দীন (জেহান্দর শাহ), খুজিস্তা আখ্তর, (জেহান শাহ), রফিউল কাদর প্রভৃতি ও বাহাদুর শাহের পুত্র। বাহাদুর শাহ প্রথমে আগ্রার যুদ্ধে তদীয় ভ্রাতা মহম্মদ আজেমকে পরাভূত করেন। সেই যুদ্ধে আজেমের মৃত্যু হয়। তাহার পর কম্‌বখশেরও সেই দশা হয়। তিনিও পরাভূত ও হত হন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বৎসর পরে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। মইজদ্দীন আপনার তিন

ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া জেহান্দর শাহ নামে সম্রাটপদবী গ্রহণ করেন। ফিরোক সিয়ারও সেই পদ লাভার্থ চেষ্টা করিতে থাকেন। সৈয়দ বংশীয় দুই জন সম্ভ্রান্ত সুবাদার তাঁহার সহায়তা করেন। একজনের নাম সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ, আর অন্যজন তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে আজমীরে আবদাল্লা খাঁ নামে একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপান্বিত সৈয়দ ছিলেন। সৈয়দেরা পয়গম্বর মহম্মদের বংশজ বলিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ মান্য। রাজপুত জাতি মধ্যে উদয়-পুরের রাণারা যেরূপ সম্ভ্রান্ত, মুসলমান মধ্যে সৈয়দ বংশীয়েরাও সেইরূপ। আজমীরের সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ মিঞা খাঁ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিঞা খাঁর পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে (দ্বিতীয়) আবদাল্লা খাঁ ও হোসেন আলি খাঁ মহা-প্রতাপান্বিত ছিলেন।

বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র আজিম উষাণ ঔরঙ্গজেব পাতশাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। আজিম উষাণ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা এবং আলা-হাবাদের পাতশাহ প্রতিনিধি ও সেনাপতি ছিলেন। আবশ্যক হইলে যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি বিচ্ছেদ পাতশাহের অনুমতি না লইয়াই তিনি স্বয়ং করিতে পারিতেন। এখনকার মত তখনও বাঙ্গালার রাজস্ব অন্য সকল সুবার অপেক্ষা অধিক ছিল। আজিম উষাণের অধীনে,—জাফর খাঁ বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার দেওয়ান অর্থাৎ রাজস্বের অধ্যক্ষ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন;—সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ বেহারের সুবাদার, এবং সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ আলাহাবাদের সুবাদার ছিলেন। আগ্রার যুদ্ধে হোসেন আলি খাঁ এবং আবদাল্লা খাঁ আজিম উষাণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, যুদ্ধের পর আজিম উষাণ স্বীয় পিতা বাহাদুর শাহের সঙ্গে বহি-লেন; বাহাদুর সাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বেহারের ও আলাহাবাদের স্বাধীন সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। জাফর খাঁ বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার সুবাদার হইলেন। ইহার পর বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে জেহা-ন্দর শাহ তক্ত দখল করেন। ইহার পূর্ব্বেই আজিম উষাণের মৃত্যু হইয়া ছিল। তাঁহার পুত্র ফিরোকসিয়ার পূর্ব্ব হইতেই রাজমহলে ছিলেন।

জেহান্দর শাহ সম্রাট হইয়াই ফিরোকসিয়ারকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য জাফর খাঁকে আদেশ করিলেন। জাফর খাঁ ইতস্তত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ—ফিরোকসিয়ারকে অভয় দান

পূর্ব্বক পাটনাতেই তাঁহাকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং আলাহাবাদে ভ্রাতা আবদাল্লা খাঁর সহিত সম্মিলিত হইয়া জেহান্দর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আগ্রায় দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হইল। সৈয়দ দ্বয় ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। হোসেন আলি খাঁ মূর্চ্ছিত, পতিত, দলিত, প্রায় নষ্ট-প্রাণ, হইয়াছিলেন। জেহান্দর শাহ পলায়ন করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিবসে ফিরোকসিয়ার সিংহাসনারোহণ করিলেন। আবদাল্লা খাঁ উজীর, এবং হোসেন আলি খাঁ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। দুই ভাই এখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। রতনচাঁদ আবদাল্লা খাঁর অধীনে নায়েব-উজীর হইলেন। সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে অর্থাৎ বন্দোবস্তের বিষয়ে, জমার সেরেস্তায়, এবং হিসাবের দপ্তরে, রতনচাঁদ বহুদিন ধরিয়া একা কর্ত্তা ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সেই কথাই বলা যাইতেছে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধান্য হইতেই রতনচাঁদের প্রাধান্য। সেইজন্য সৈয়দগণের পূর্ব্ব ইতিহাস এত বিস্তারে বলা গেল।

সৈয়দ দ্বয় এবং রতনচাঁদ এক্ষণে অন্যান্য আমীর ওমরাব চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। আমীর জুম্‌লা সম্রাটের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। তিনি কত ষড়যন্ত্র করিলেন, অবশেষে তাঁহাকেই পাটনার সুবাদারিতে যাইতে হইল, আর হোসেন আলি খাঁ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে দাক্ষিণাত্যে যাইবার আদেশ পাইলেন। স্বয়ং সম্রাটও এখন উভয় ভ্রাতার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের প্রধান মুসলমান ইতিহাস লেখক—মীর গোলাম হোসেন খাঁ। তাঁহার মত ইতিহাস লেখক দুর্ল্লভ। তথাপি তিনি যেন রতনচাঁদের উপর একটু চটা চটা। রতনচাঁদের বৃত্তান্ত তাঁহার গ্রন্থ সৈর-উল-মুতক্ষরীণ হইতে সংগৃহীত হইল। সুতরাং ইহাতে রতনচাঁদ-চরিত্রের গুণের অপেক্ষা বরং দোষের ভাগই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তা যাউক, মুসলমান সময়ে হিন্দুর আধিপত্যের কথা আমরা বলিতেছি মাত্র—রতনচাঁদের সাফাই করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আজি কালি মহরমের সময়, বা কোন হিন্দু পর্ব্বাহের সময় হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর বিবাদ হইতে শুনা যাইতেছে। তখনও হইত। ফিরোকসিয়ারের রাজত্বের প্রথম বৎসরে গুজরাটের আহমেদাবাদে হোলির পর দিন এইরূপ ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। এক মুসলমানের বাড়ীর সংলগ্ন এক হিন্দুর বাড়ীতে সেই হিন্দু হোলির উৎসব করিতেছিল। মুসলমান আপত্তি

করে। হিন্দু বলে, যে আপনার বাড়ীতে সকলেই রাজা; মুসলমানের আপত্তি সে গ্রাহ্যই করে না। পরদিন হজরৎ আলির তিরোভাবের বার্ষিকী-ক্রিয়ার দিন। মুসলমান দীন দুঃখীদিগকে গোমাংস বিতরণ জন্য একটি গাভী আনিয়া আপনার বাড়ীতে হত্যা করিল। আকৃত্ত কুণ্ড বাধিয়া গেল; হিন্দুরা ক্ষেপিয়া উঠিল, গোহত্যাকারীকে না পাইয়া তাহার চৌদ্দ বৎসরের পুত্রকে হত্যা করিল। মুসলমানেরা হাজার হাজার পাঠান ফৌজের সহায়তা লইয়া তুমুল করিয়া তুলিল। কাজী সাহেব ভিতরে ভিতরে তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সুবাদার দাউদ খাঁ প্রকাশ্যত হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া মহা হাঙ্গামা চলিল। মুসলমানেরা সম্রাটের নিকট তিন জন উকীল প্রেরণ করিলেন। রতনচাঁদ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইতিহাস লেখক বলেন, একজন প্রসিদ্ধ দরবেশের মধ্যবর্ত্তিতায় ইঁহাদের কারামোচন না হইলে, রতনচাঁদের হস্তে ইঁহাদের যে, কি দুর্দ্দশা হইত, তা কে বলিতে পারে?

এই সময়ে রাজা রতনচাঁদের অসীম ক্ষমতা হইয়াছিল। যদিও সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই পৃথক্ পৃথক্ প্রধান কর্ম্মচারী বা দেওয়ান ছিলেন, তথাপি রাজা রতনচাঁদ সকল বিভাগের হিসাবই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইহতি সাম খাঁ খালিসা দপ্তরের দেওয়ান ছিলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্ব সচিব। অথচ তাঁহার বা রায় রায়াঁর আপন আপন দপ্তরে অণুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। রাজা রতনচাঁদ স্বহস্তে রাজস্বের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি কোটি কোটি টাকার হিসাব অতি অল্প সময় মধ্যে নিকাশ করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল। সেই জন্যই তাঁহার ক্ষমতা; আর সেই জন্যই, কেহ তাঁহাকে আঁটিতে পারিত না। ইহার পর, রাজা রতনচাঁদ সরকারি খাস খামার সমস্ত একাএক বিলিবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, খালিসা দেওয়ান এবং রায়রায়াঁ উভয়েই উত্যক্ত ও অপমানিত হইয়া এক সঙ্গে পদ ত্যাগ করিলেন। মহা হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল। ইহার পরেই, এনায়েৎউল্লা খাঁ নামক একজন পুরাতন সুদক্ষ কর্ম্মচারী মক্কায় হজ্র্ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহ পাতশাহদের আমলে অতি সুখ্যাতির সহিত নানা বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট দেখিলেন, যে তিনি নিরপেক্ষ এবং দক্ষলোক; রাজা রতনচাঁদের সেচ্ছাচারিতা দমনের জন্য তিনি তাঁহাকে

প্রধান সচিব আবদাল্লা খাঁর অধীনে তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে রতনচাঁদ এবং এনায়েতউল্লা উভয়েই অসন্তুষ্ট হইলেন। দুই জন জইণ্ট নায়েব উজীরে বিশেষ ঘর্ষণমর্ষণ চলিতে লাগিল।

সম্রাট্ ফিরোকসিয়ারের জীবন চরিত—ফিরোকসিয়ার নামা—লেখক য়েকলাস খাঁ এই বিষম বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি হিন্দু সন্তান, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখনকার সভা পণ্ডিতের মত ছিলেন। তিনি মধ্যবর্ত্তিতা করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যে রাজা রতনচাঁদ এবং এনায়েৎউল্লা খাঁ সেবেস্তা ভাগাভাগি করিয়া কার্য্য করিবেন। কেহ কাহারও কার্য্যে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। এনায়েৎউল্লা খাঁ প্রথমে উজীর আবদাল্লাখাঁর সহিত পরামর্শ না করিয়া সম্রাটের নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন না, আর আবদাল্লাখাঁ এখন হইতে স্বয়ং একটু পরিশ্রম করিয়া সকল কার্য্য কর্ম্ম দেখিবেন এবং সপ্তাহে অন্তত দুই দিন, বার দিয়া প্রাসাদে বসিবেন, সকলের অভিযোগ শুনিবেন, ও প্রতীকার করিবেন। কিছুদিন এই ভাবে চলিল বটে, তাহার পর আবদাল্লা খাঁ আবার বিলাসিতায় পূর্ব্ববৎ নিমজ্জিত হইলেন, এবং রাজা রতনচাঁদ ও এনায়েৎউল্লা খাঁ আপন আপন ইচ্ছামত যে যে স্থলে পারিলেন, কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

এনায়েৎউল্লা খাঁ সাম্রাজ্যের হিন্দু প্রজার উপর বিধর্ম্মির মাথট কর বা জিজিয়া কঠোরতর ভাবে স্থাপনের জন্য এবং প্রাসাদস্থ পারিপার্শ্বিকেরা যে বিপুল বৃত্তি উপভোগ করিতেছিল, তাহা কোন স্থলে কমাইবার জন্য, অন্য স্থলে একেবারে সেই বৃত্তি লোপ করিবার জন্য, সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা রতনচাঁদ প্রমুখ হিন্দু কর্ম্মচারীরা এবং বৃত্তিভোগী বহুতর মুসলমান এই উভয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উজীরের নিকট অভিযোগ করিলেন। উজীর আবদাল্লাখাঁ বড়ই বিরক্ত হইলেন। ইহাতে উজীর আবদাল্লাখাঁ এবং এনায়েৎউল্লা খাঁ—উভয়ের মধ্যে মহা মনোবাদ চলিল। ক্রমে প্রকাশ্য বিবাদ উপস্থিত হইল। এক্ষণে সেই কথা বলা যাইবে।

খাস খামারের একজন হিন্দু ইজারদারের অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছিল। এনায়েৎউল্লা তাঁহাকে নজরবন্দীতে রাখিয়াছিলেন, রাজা রতনচাঁদ অনেক করিয়াও তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারেন নাই। রক্ষীদিগকে বশ করত, ইজারদার পলায়ন করিয়া রাজা রতনচাঁদের ভবনে আশ্রয় লইলেন। রতনচাঁদ তাঁহাকে অভয় দিলেন। এনায়েৎউল্লা সম্রাটকে সেই বিষয় জানাই-

লেন, এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রাসাদ-রক্ষক ফৌজদিগকে ইজ্জাবদারকে আনয়নার্থ রাজা রতনচাঁদের ভবনে প্রেরণ করিলেন। রতনচাঁদের অনুচরেরা রক্ষকদিগকে বাধা দিল, আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। সম্রাট মহাক্রুদ্ধ হইয়া নায়েব উজীরকে বরখাস্ত করিতে উজীরকে আদেশ করিলেন। উজীর আবদল্লা কার্য্যত সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন না।

ক্রমেই দুইটি স্পষ্ট দল হইল, একটি প্রবল পরাক্রান্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ, আর একটি আলস্য-জীবন খোদ সম্রাটের পক্ষ। সম্রাটের শত্রু চূড়ামণ জাঠকে আবদাল্লা খাঁ প্রশ্রয় দেওয়াতে এবং রাজা রতনচাঁদকে কর্ম্মচ্যুত না করাতে, এই দলাদলির বিবাদ ক্রমে ঘনীভূত হইল। দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ সুবৃহৎ সৈন্য লইয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা রতনচাঁদ, জাফর খাঁ প্রভৃতি প্রকাশ্যত অভিগমন করিয়া তাঁহার দল বলের সহিত যোগদান করিলেন। হোসেন আলি খাঁ দিগ্বিজয়ী আক্রমণকারী বীরের ন্যায় রাজধানীতে মহা সমারোহে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতি অল্পক্ষণ থাকিয়া সম্রাটকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া গেলেন। সভাসদেরা সকলেই মহা বিরক্ত হইল।

তিন চারি দিন মধ্যে রাজধানীতে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। ভারতের বিশাল রাজধানীর ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত বন্ধ হইল। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্যশিবিরের মত সর্ব্বত্রই দিবারাত্র কেবল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, ঘোটকের হ্রেষা, হস্তীর আস্ফালন এবং সেনানীর গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। কে কাহার দিকে যুদ্ধ করিবে বুঝিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অস্ত্রপাত, রক্তপাত, প্রাণপাত হইতে লাগিল।—কেন হইল, কাহার ইষ্টের জন্য, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্রাট ফিরোকসিয়ার অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও এক দল সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। উজীর আবদাল্লা খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া প্রাণে রক্ষা করিলেন।

সমশুদ্দীন রফি অদ্‌দের্জ্জাৎ মহাবল সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ উজীর কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। (ফেব্রুয়ারি ১৭২০) পর দিন, প্রকাশ্য দরবারে নবশাহ অধিষ্ঠিত হইলে, রাজা অজিৎসিংহ এবং রাজা রতনচাঁদ হিন্দু প্রজাদিগকে জিজিয়া-কর হইতে একেবারে অব্যাহতি দান জন্য সম্রাট সমীপে যুক্তকরে আবেদন করিলেন। তাঁহাদিগের এই সঙ্গত প্রার্থনা

গ্রাহ্য হইল। আকবর শাহের সময় অম্বের রাজ মানসিংহের অনুরোধ ক্রমে একবার এই জিজিয়া-কর উঠিয়া যায়। আবার ঔরঙ্গজেব শাহ বিধর্ম্মীর উপর বিদ্বেষ বশত জিজিয়া প্রচলিত করেন। সেই অবধি চলিতেছিল; এনায়েৎ উল্লা খাঁ এই অসন্তোষকর কর, আরও কঠোরতর করিবার চেষ্টা করাতে সমগ্র হিন্দু প্রজার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজা অজিৎ সিংহ এবং রাজা রতনচাঁদের সানুনয় এবং সাগ্রহ প্রার্থনায় নব শাহ সমশুদ্দীন জিজিয়া উঠাইয়া দেওয়াতে, হিন্দু প্রজাদের মহা প্রিয় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্বয়ের জয় জয়-কার সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। আমরাও অজিত-রতনের জয় গান করিতেছি—তখন যদি তাঁহারা ঐ কর ঐরূপ অনুনয় অনুরোধে উঠাইয়া না দিতেন, হয়ত তাহা হইলে, আমাদিগকে সেই কর এখনও বহন করিতে হইত। মুসলমান রাজত্বের দোহাই দিয়াইত দরিদ্র দোহন লবণ-কর এই বিপুল সাম্রাজ্যে এখনও চলিতেছে।

এই বিপ্লবের পর, সাম্রাজ্যের সকল বিভাগেই সৈয়দগণের অনুকূল-কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন। রাজা রতনচাঁদ কার্য্যত অনেক দিন হইতে রাজস্বের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, এখন পদগৌরবেও সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তাঁহার অধীনে দিয়ানৎ খাঁ রাজস্বের তত্ত্বাবধারক এবং রাজা ভক্তমল সৈনিক ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ হইলেন।

দুই মাস পরে জ্বালা যন্ত্রণায়, সিংহাসনচ্যুত ফিরোকসিয়ারের অপঘাত মৃত্যু হইল। তিন মাস কয়েক দিন পর সিংহাসনাধিষ্ঠিত শাহ রফিঅদ দর্জ্জাতের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল। তাঁহার অনুজ রফিউদ দৌলা দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার কিছু পরেই আগ্রার সুবাদার ঔরঙ্গ-জেবের এক পৌত্র নিকোসিয়ারকে আগ্রার কেল্লায় সম্রাট বলিয়া অভিষিক্ত করিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্য আগ্রা আক্রমণ এবং নিকোসিয়ারকে বন্দী করিলেন। ইহার পরেই রফিউদ্দৌলারও ক্ষয়-রোগে মৃত্যু হইল। জেহান শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ নামে পাতশাহী তক্তে অভিষিক্ত হইলেন। সচরাচর ইতিহাসে ফিরোকসিয়ারের পরেই মহম্মদ শাহ ভারতের সম্রাট বলিয়া ধরা যায়

যদিও মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথমেই আমীর জুম্লা দানাধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাজস্ব সম্বন্ধে রাজা রতনচাঁদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণই রহিল। এমন কি বিধর্ম্মীতে কখন যে সকল ক্ষমতা পায় নাই, সেরূপ ক্ষমতাও

তাঁহার ছিল। এই সময়ে তিনি সুপারিস করিয়া নগর সমাজ সকলে কাজী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অবশ্যই এরূপ প্রভুত্বে বিরক্ত হইতে পারেন। এক দিন রতনচাঁদ, এইরূপ একজন স্ব-নিয়োজিত কাজীকে উজীরের নিকট আনিয়াছিলেন। সেই সময় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান উজীরের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দিকে ফিরিয়া উজীর সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনি দেখুন! আমাদের রতনচাঁদ কাজী সৃষ্টি করিতেও পারেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পদ সকলেও সুপারিস করিয়া লোক দেন।" সম্ভ্রান্ত মুসলমান উত্তর করিলেন, "হজুরালি সত্য বলিয়াছেন, রাজা সাহেব ঐহিক বিষয় ব্যাপার শেষ করিয়া, এখন বোধ হয়, ধর্ম্মে মতিগতি দিয়াছেন।" এইরূপ ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, শ্লেষে সঙ্কেতে, যিনিই যাহা বলুন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহই রাজা সাহেবকে আঁটিয়া উঠিতেন না।

আলাহাবাদের সুবাদার চিবিলরাম নাগর মহম্মদ শাহ পাতশাহকে কর দিতে স্বীকার করিলেন না। হোসেন আলিখাঁ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্য যাত্রা করিলেন। হঠাৎ চিবিলরামের মৃত্যু সংবাদ আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সমাচার আসিল যে চিবিলরামের জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজা গিরিধর বাহাদুর আলাহাবাদের সুবাদারি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং দুর্গ সংস্কার করিতেছেন। হোসেন আলি খাঁ আলাহাবাদ অবরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন বটে কিন্তু রাজধানীর নিকট হইতে বহুদূরে যাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। আগ্রার কেল্লা অধিকারের পর যে সকল রত্ন কাঞ্চন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া উভয় ভ্রাতা মধ্যে ভিতরে ভিতরে মহা মনোবাদ যাইতেছিল। রতনচাঁদ বিশেষ চতুরতা সহকারে এই সকল মনোবাদের কথা সাধারণে অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা দিল্লীর তক্তে ক্রমান্বয়ে সম্রাট বসাইয়া পুত্তল ক্রীড়া করিতেছিলেন—দেখ! রত্ন কাঞ্চনের মায়া, আজি তাঁহারাই মণি-কাঞ্চনের জন্য আপনাদের মধ্যের মণি-কাঞ্চন যোগ ভাঙ্গিতে প্রস্তুত!!

মহম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে, রাজা গিরিধর সন্ধি করিতে প্রস্তুত। রতনচাঁদ তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে সম্রাটের দূতভাবে আলাহাবাদে গেলেন। ত্রিবেণীর পূতবারি স্পর্শ করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি বন্ধন হইল। রাজা গিরিধর বাহাদুর আলাহাবাদের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার সুবাদারিতে চলিয়া গেলেন। আলাহাবাদ সৈয়দ পক্ষদের করগত হইল।

আলাহাবাদ করগত হওয়াতে পূর্ব্বদিকে কিছু শান্তি হইল বটে, কিন্তু দক্ষিণে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল! মহম্মদ শাহের নূতন বন্দোবস্তে নিজাম-উল মুলুক মালব দেশের সুবাদারি পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে পরাক্রান্ত সৈয়দদ্বয়কে অপদস্থ করিতে না পারিলে, সাম্রাজ্যের মঙ্গল নাই; তাঁহার নিজের কি অন্য কাহারও কল্যাণ নাই। নিজাম উল মুলুক সুতরাং প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রতনচাঁদ পরামর্শ দিলেন যে নিজামকে একেবারে দক্ষিণাত্যের সুবাদারিতে প্রেরণ করিয়া নির্ব্বাসিত করাই ভাল।

আবদাল্লাখাঁ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। ও দিকে নিজাম, রাজা রতনচাঁদ এবং অজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক আপনাকে অপমানিত বোধে, আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যত বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বত্রই নিজাম উল মুলুক জয়ী হইতে লাগিলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়মধ্যে এইরূপ স্থির হইল, যে উজীর আবদাল্লা খাঁ রাজধানীতে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিবেন, আর হোসেন আলি খাঁ নিজামকে দমনার্থ সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে যাত্রা করিবেন। ফতেপুর শিক্রি হইতে দুই সহোদরে ছাড়াছাড়ি হইল। ইহ জন্মে উভয়ে আর দেখা হয় নাই। আগ্রার ৫০ ক্রোশ দক্ষিণে যখন স্কান্ধাবার পৌঁছিয়াছে, তখন ভয়ানক ষড়যন্ত্রে হোসেন আলি খাঁ মীর হাইদরের হস্তে হত হইলেন। ষড়যন্ত্রীদের সহিত সৈয়দ হোসেন আলির ভাগিনা খীরেং খাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল। খীরেৎ সম্মুখ যুদ্ধে হত হইলেন। হোসেন আলি খাঁর দেওয়ান মোহকম সিং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাজা রতনচাঁদ যুদ্ধক্ষেত্রে সমরসজ্জায় ছিলেন। আবদাল্লা খাঁর নিকট এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিয়া আপন শিবিরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মোগলেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পাল্কী হইতে টানিয়া বাহির করিল গুরুতর প্রহার করিল, এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করিয়া হিঁচড়িয়া লইয়া গিয়া প্রধান ষড়যন্ত্রী মহম্মদ আমীন খাঁর নিকট হাজির করিল। আমীন খাঁ রতনচাঁদকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করত বন্দী করিয়া রাখিলেন।

আবদাল্লা ভ্রাতৃশোকে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি বাহাদুর শাহের এক পৌত্র মহম্মদ ইব্রাহীমকে সম্রাট করিয়া মহম্মদ শাহের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭২১ সালের কার্ত্তিক মাসে হোসেনপুরের নিকট উভয় সৈন্য মহা আস্ফালন করিতে করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সুতীক্ষ্ণ তীর-যোগে, বন্দুকের জ্বলন্ত গুলি প্রয়োগে, উভয় দলের সম্মুখ যোদ্ধারা পরস্পরকে অভিবাদন করিতে লাগিল। এই সঙ্কট সময়ে, উভয় সৈন্যদলের সমক্ষে, মহম্মদ শাহ রতনচাঁদের উপর বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন। ঘাতুক রতনচাঁদের কাঁচা মাথা সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করিল, আর তাঁহার দেহ সম্রাটের হস্তী সেই সৈন্য-সমারোহ-মধ্যে পদে দলন করিতে লাগিল। রাজা রতনচাঁদের কাটা মুণ্ড সেই জীবন্ত শ্মশানে বল্লমের মুখে করাল মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। রাজা রতনচাঁদের প্রভুত্বপূর্ণ জীবন এইরূপে শেষ হইল। ২৪শে অক্টোবর ১৭২১।

দুই দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর আবদাল্লা খাঁ এবং তাঁহার আর এক ভ্রাতা নজিমদ্দীন আলি খাঁ বন্দী হইলেন। মুহম্মদ শাহ মহা সমারোহে দিল্লী প্রবেশ করিলেন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে অর্ল অব্ ওয়ারিক্ যেরূপ শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যশালী, লোকবলে বলীয়ান, পদমর্য্যাদায় গরীয়ান এবং প্রভুত্ব সম্পন্ন ছিলেন, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারত ইতিহাসে ততোধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। ওয়ারিক King-maker ছিলেন, অর্থাৎ রাজা বানাইতেন, সৈয়দ

আবদাল্লা খাঁ পাতশাহ বানাইতেন। রাজা রতনচাঁদ এই দুই সম্রাট সৃষ্টি-কারী সৈয়দের প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি অতীব প্রভুভক্ত ছিলেন, সম্পদে, বিপদে, শ্মশানে, সমর-ক্ষেত্রে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে কখন পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারাও রতনচাঁদকে কখন পরিত্যাগ করেন নাই। বড় বড় মুসলমান আমীর ওমরারা ও সম্রাট স্বয়ং, রতনচাঁদের জন্য, সৈয়দদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে অনুরোধ, অনুমতি করিয়াছেন—সৈয়দরা সমগ্র সাম্রাজ্যের অপ্রিয় হইয়াছেন, তবু রতনচাঁদকে ত্যাগ করেন নাই। এদিকে, রতনচাঁদ নিতান্ত স্বজাতিবৎসল ছিলেন; তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য স্বজাতি-পক্ষপাতিত্বে পরিণত হইয়াছিল। তদানীন্তন মুসলমান সকল সহজেই একটু বিধর্ম্মী-দ্বেষী ছিলেন, তাহার পর একজন বিধর্ম্মী তাঁহাদের সরকারে কর্ম্মচারী হইয়া তাঁহাদের উপরই জাতিবৈর সাধন করে—এ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিবেন কেন? সুতরাং সৈয়দদের নিতান্ত অনুগত অনুচর ব্যতীত সকলেই রতনচাঁদের বিরুদ্ধ ছিলেন—মহা মহা বীর-বৈর রথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত রতনচাঁদকে নিয়তই থাকিতে হইত। রতনচাঁদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রাজস্বের কার্য্যে তাঁহার মত দক্ষলোক অতি অল্পই ছিল, হিসাব নিকাশে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার এই দক্ষতার উপরি এক পদ, এবং সৈয়দ মহাপুরুষদের মহা স্নেহের উপর অন্য পদ স্থাপন করিয়া, অচল অটলভাবে রোড্‌স্ দ্বীপস্থ ধাতুময় মহামূর্ত্তির মত বিরাজ করিতেন, ভারত সাম্রাজ্যের সহোর্ম্মি মালা তাঁহার পদপ্রান্তে ক্রীড়া করিত, সম্পদ বিপদ পূর্ণ ঘটনারূপী অর্ণবপোত সকল পদতল বাহিয়া বলিয়া যাইত। রাজা রতনচাঁদ স্বীয় কার্য্যে অচল অটল ছিলেন। ভারতের রাজস্ব বার্ত্তা তাঁহার নখ-দর্পণে ছিল, সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

রতনচাঁদের ভয়ঙ্কর মৃত্যু-বিধানেই বুঝিতে পারা যায়, রতনচাঁদের কি প্রভূত প্রভুত্ব ছিল, এবং সম্রাট প্রভৃতি তাঁহাকে কত ঘৃণা করিতেন। রতনচাঁদ মুসলমানদের মহা অপ্রিয় অথচ ক্ষমতায় মহাপুরুষ না হইলে, মহম্মদ শাহ কিছু তাঁহাকে বলিদান দিয়া হোসেনপুরের মহা সমর আরম্ভ করিতেন না। রতনচাঁদ মহাপুরুষ ছিলেন—আর হিন্দুদের মহোপকারী ছিলেন। অজিৎসিংহ সহায়ে অনুরোধ অনুনয়ে তিনি জিজিয়া মাথটকর ভারত হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, দুঃখী দরিদ্র হিন্দু অনেকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই—এবং এই শোষক শাসক রাজপুরুষদের সময়ে আমাদিগকে সেই মাথটকর মাথা পাতিয়া বহিতে হইতেছে না। আমরা সেই মহাপুরুষের মহা কীর্ত্তির কথার পুনরুল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিলাম।

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪। { ১১শ সংখ্যা।

বাঙ্গালার শেঠবংশ।

২।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ তাঁহার জীবদ্দশাতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে, ফতেচাঁদ জগৎশেঠের পৌত্রেরা গদীর উত্তরাধিকারী হইলেন। বাদশাহের সনন্দের মর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ মাতাব রায় "জগৎশেঠ" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, ও কনিষ্ঠ স্বরূপচাঁদ "মহারাজা" উপাধি লাভ করিলেন। স্বরূপচাঁদের পূর্ব্বে কেহই শেঠদিগের মধ্যে মহারাজা উপাধি লাভ করেন নাই। ফতেচাঁদের সময়ে শেঠদিগের অতিশয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। ইংরাজের লিখিত কাহিনী হইতে অবগত হওয়া যায়, এই সময়ে জগৎশেঠদিগের গদীতে, দশ কোটি টাকা খাটিতেছিল। সৈয়র মতক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন বলেন, "শেঠেরা এই সময়ে এক কথায়, এক কোটী টাকা বাহির করিয়া দিতে পারিতেন।" মুরশীদাবাদ অঞ্চলে আজও জনশ্রুতি মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ভাস্কর পণ্ডিত যে সময়ে শেঠেদের গদী লুণ্ঠন করিয়া অনেক টাকা লইয়া যান, সেই সময়ে লোকে বলাবলি করিয়াছিল, "যাহারা ইচ্ছা করিলে, টাকা দিয়া ভাগিরথীর উপর সুতীর নিকটে, বাঁধ বাধিয়া তাহার স্রোত বন্ধ করিতে সমর্থ, সেই শেঠদিগের এই সামান্য অপচয়ে কিছুই ক্ষতি হইবে না।" উল্লিখিত ঐতিহাসিক সত্য ও এই সমস্ত জন

প্রবাদ, যে কেবল শেঠবংশের তৎকালীন অতুল ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বহুদূর বিস্তৃত কারবার বলিয়া নানাবিধ উপায়ে শেঠদিগের অর্থাগম হইত। আর্য্যাবর্ত্তের সকল স্থলেই প্রায় তাঁহাদের গদী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যান্য সকল গদী অপেক্ষা মুরশীদাবাদের গদীই সর্ব্ব প্রধান—সর্ব্ব কার্য্যের কেন্দ্র স্থল ছিল। বাঙ্গালা বিহারের সমস্ত রাজস্ব, চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া জমীদারেরা জগৎশেঠদিগের গদীতে পাঠাইয়া দিতেন। এই সমস্ত টাকা দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য জগৎশেঠ উপযুক্ত বাটা ও কমিশন পাইতেন। ইহা ভিন্ন টাকা কর্জ্জ দেওয়াতেও তাঁহাদের কম লাভ হইত না। তাঁহাদের গদীতে সকল প্রকার খাতকই জুটিত।* লক্ষপতি লক্ষ টাকার প্রার্থী হইতেন, আবার সামান্য লোকেও, স্বাভিলাষ মত স্বল্প মুদ্রা কর্জ্জ পাইত। মুরশীদ কুলীখাঁ যে পুণ্যাহের নি[illegible]রিয়া যান, সেই নিয়মানুসারে, পুণ্যাহের সময়, জমীদারেরা নিজে উপস্থিত হইয়া বা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা শেঠদিগের গদীতে খাজানার টাকা জমা দিতেন ও হিসাব পরিষ্কার করিতেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই শেঠদিগের নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন।† কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন—"The rupees

* হাইকোর্টের প্রাচীন রেকর্ডের মধ্যে আমি কয়েক খানি জগৎশেঠদিগের গদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খত দেখিয়াছি। কমলউদ্দিন খাঁ নামক একব্যক্তি শেঠদিগের চুঁচুড়ার গদী হইতে, এক খত দ্বারা টাকা কর্জ্জ লইতেছে। টাকার সংখ্যা ঠিক কত, তাহা আমার মনে নাই, বোধ হয়, পাঁচশতের অধিক হইবে না। এই খতগুলি, একখানি ফুলস্কাপ কাগজের অষ্টমাংশ পরিমিত ক্ষুদ্র খণ্ডে, বাঙ্গালা ভাষায় "এত টাকা কর্জ্জ লইলাম, এই হিসাবে সুদ দিব" এই প্রকারে কয়েকটি কথা লেখা আছে। খতের উপরিভাগে কমলউদ্দিনের নামের মোহর, ও পর পৃষ্ঠে আর একটি অপরিস্ফুট মোহরের (বোধ হয় শেঠদিগের) ছাপ রহিয়াছে। এই খতগুলি মহারাজা নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমার সময় সুপ্রীমকোর্টে দাখিল হইয়াছিল। ও এই কমলউদ্দিন, উক্ত আদালতে তাঁহার নামে চক্রান্তের অভিযোগ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে বর্ত্তমান বৎসরের ভারতী দেখুন।

† "The French had many friends at the court of the Nabob, amongst others the Seths Mootabroy (Mahatab Ray) and Roopchund (Swarup Chand) to whom the Government of Chundernager was indebted for a million and a half of rupees"

Vide.—Orme's History Vol. ii p. 138.

of the Hindu banker, equally with the sword of the English Colonel contributed to the over' throw of the Mehomedan power in Bengal." বস্তুত এই কথা অবিশ্বাস করিতে আমরা আদৌ অগ্রসর হই না। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এই কথায় যথার্থতা বিশ্বাস করিতে, অগ্রসর হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পূর্ব্বে, ইংরাজদিগের সহিত শেঠদিগের অতি অল্প ঘনিষ্ঠতাই ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে, ইংরাজদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বর্দ্ধিত হয়। হলওয়েলের লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়, যে তিনি সেরাজের রাজত্বকালে, ইংরাজের উপর নবাবের ক্রোধ উপশান্ত করিবার জন্য জগৎশেঠদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছেন। বস্তুত এই সময়ে নবাব সরকারে শেঠদিগের প্রাধান্য থাকাতে তাঁহাদের দ্বারা ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার হই[illegible] ইহার পর সেরাজের অত্যাচার যতই বৃদ্ধি হইয়া উঠে ততই তাঁহার উপর দেশের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরাজের অধঃপতনের পথ সরল করিবার জন্য শেঠেদের সহিত, ইহার পর ইংরাজদিগের ঘনিষ্ঠতা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল।—এই সংযোগের শোচনীয় ফল আমারা পরে বিবৃত করিতেছি।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অতিশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। শেঠদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা তিনি বিশেষ রূপে জানিতেন—সেরাজের উদ্ধত-প্রকৃতি ও কলুষিত স্বভাবও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জগৎ শেঠকে সেরাজের সহায়তা করিতে ও সেরাজকে শেঠদিগের উপদেশ মান্য করিয়া চলিতে অনুরোধ করিয়া যান। সেরাজউদ্দৌলা তাঁহার মসনদে বসিবার সময় হইতে বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির উপদেশ সাধ্যমতে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।* কিন্তু তাঁহার নিজ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার

---

* "The celebrated family of Setts of Muxadavad who by merchandise and banking had acquired the wealth of princes and often aided him (Aliverdi), in his trials, were largely admitted to share in his counsels, and to influence the operations of his Government. Aliverdi had recommended the same policy to Suraj and that Prince, had met at first with no temptation to depart from it."

Vide Orme's Hindustan Vol. ii P. 53 & Mill vii P. 239.

পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি যাই কোন অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যে হাত দিতে যাইতেন, শেঠেরা অমনি তাহাতে বাধা দিতেন বলিয়া তিনি ক্রমশ তাঁহাদিগের ও বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির উপদেশ-বাক্যের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই নবাব কলিকাতার ইংরাজদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সসৈন্যে মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া আসিলে, তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। কলিকাতা আক্রমণের প্রারম্ভেই ড্রেক-প্রমুখ মন্ত্রী-সমাজ কাপুরুষের ন্যায় জাহাজে করিয়া পলায়ন করিলেন। কলিকাতায় পুনঃপ্রবেশ করা তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত—কারণ, রাজা মাণিকচাঁদ তখন নবাবের উপ[illegible]ক্রমে কলিকাতা শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট সাহেব [illegible]পায়ে নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তখন ইংরাজের স্বপক্ষে কোন দরখাস্ত বা প্রস্তাব লইয়া নবাবের নিকট উপস্থিত করে, কাহার সাধ্য? যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা অনেক স্থলেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসিতেন। সুতরাং ইংরাজেরা অন্য উপায় না দেখিয়া, এই সময়ে শেঠদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ২২শে জুন কলিকাতা দখল করা হয়—ইহার পর ২২শে আগষ্ট তারিখে আমরা দেখিতে পাই—পলায়মান প্রেসিডেণ্ট ও কৌন্সিল, পলতার নিকট একখানি জাহাজ হইতে শেঠদিগকে সম্মানসূচক পত্রাদি লিখিতেছেন। এই পত্রে নবাবের দরবারে ইংরাজদিগের স্বপক্ষে কার্য্য করিবার জন্য শেঠদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। পলতা হইতে চিঠি পত্রাদি প্রথমে প্রথমে ইংরাজের প্রধান আড্ডা কাশীমবাজারে পৌছিত, এবং তথা হইতে মুর্শীদাবাদে শেঠদিগের নিকট অতি গোপনে পাঠান হইত। যাঁহারা সাহস করিয়া এই প্রকার চিঠিপত্রাদি লইয়া যাইতেন, তাঁহাদের সহিত ইংরাজ অর্থ সম্বন্ধে বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিতেন। আমরা দেখিতে পাই সুবিখ্যাত উমিচাঁদ একবার এই সময়ে ইংরাজদিগের হইয়া পত্রাদি জগৎ শেঠের নিকট হইয়া গিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার নবাবদিগের মধ্যে যাঁহারা জগৎ শেঠকে চিনিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারাই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। সরফরাজ খাঁ জগৎ শেঠের প্রতি অত্যাচার করিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহারই ক্রোধ

বক্ষিতে সরাজ্য নষ্ট হইলেন। সেরাজেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। যৌবন-মদোন্মত্ত, উদ্ধতপ্রকৃতি, নবাব সমস্ত কার্য্য স্থিরভাবে ও প্রশান্তচিত্তে করিতে পারিতেন না বলিয়া, চারি দিকে তাঁহার শত্রুদল অবসর পাইয়া গোপনে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। অনেকে বলেন এবং ইতিহাসেও † এ কথা প্রকাশ যে, সেরাজ পশুপ্রবৃত্তি চালিত হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতেন বলিয়া, সময়ে সময়ে নররাক্ষসের ন্যায় প্রজাবৃন্দের উপর কুব্যবহার করিতেন বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিষম চক্রান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা, করিয়া দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যদি সেরাজ এই চক্রান্ত সূচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে, অকারণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া জগৎ শেঠকে প্রকাশ্যরূপে অবমাননা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান আদৌ হইত না। শেঠেরা তাঁহার সহায় থাকিলে কোন চক্রান্তই ততদূর বিরুদ্ধ কার্য্যকর হইতে পারিত না। কি কারণে বাধ্য হইয়া জগৎ শেঠকে সেরাজ অপমান করেন, মুদ্রিত ইতিহাসে একথা আজও অপ্রকাশিত। আমরা নিম্নে সেইটি প্রকাশ করিলাম।

বাঙ্গলার কোন নবাবের মৃত্যুর পর নূতন নবাব গদীতে উপবিষ্ট হইলেই তাঁহার স্বপক্ষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সুবাদারি পবোয়ানা ও সনন্দ আনান হইত। যতদিন মোগল বাদশাহগণ প্রতাপশালী ও ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন, ততদিন এই প্রকার সনন্দ আনাইতে কোন প্রকার বিলম্ব ঘটিলে বা অবহেলা করিলে, মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কিন্তু যখন তাঁহারা হীন-প্রতাপ হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন এই বিষয়ে ক্রমশ অনাস্থা-প্রদর্শন করা হইতে লাগিল।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সেরাজের মস্নদে বসিবার সময় অবহেলা করিয়াই হউক, বা বিস্মৃতি জন্যই হউক, এই প্রকার সনন্দ আনান হয় নাই। সনন্দ আনাইবার সহিত টাকা কড়ির সম্পর্কই কিছু অধিক—সুতরাং ইহার ভার জগৎশেঠদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইত। সেরাজের মস্নদে বসিবার অব্যবহিত পরেই পুর্ণিয়ার নবাব, দিল্লী দরবারের জন কয়েক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহায়তায়, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সনন্দ আনান হয় নাই বলিয়াই পুর্ণিয়ার নবাব এই বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই অতর্কিত বিপৎপাতে, যুবক-নবাব অতিশয় ভীত হইয়া সেনানী মীরজাফরকে, তাঁহার দমন জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু নবাবের প্রাসাদে এই সময়ে একটি মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সৈন্য প্রেরণ করিতে পরোয়ানা দিয়াই সিরাজ জগৎশেঠকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার মসনদে বসিবার পূর্ব্বে কেন যে দিল্লী হইতে "ফারমান" আনান হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। জগৎশেঠের প্রত্যুত্তরে নবাবের সন্তোষ হইল না—তিনি এই অবহেলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, তাঁহার সমস্ত প্রজা ও সওদাগরদিগের নিকট হইতে, জবরদস্তিতে তিন কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য জগৎশেঠকে আদেশ করিলেন। জগৎশেঠ বুঝিলেন—এ প্রকার পীড়ন দ্বারা অর্থ শোষণ করা নিতান্ত অসম্ভব—সুতরাং তিনি নবাবকে, মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। হিতে বিপরীত হইল—,নবাব ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, জগৎশেঠের মস্তকে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়া বেগ[illegible]লে প্রবেশ করিলেন। এই আঘাতে, নিরীহ জগৎশেঠ কেন—সেরাজের রাজলক্ষ্মী পর্য্যন্ত কম্পিতা হইলেন। রুদ্ধ সিংহের ন্যায়, জগৎশেঠ সেই কারাগারে নির্জ্জনে আবদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি বলিয়া গিয়াছিলেন— "মির্জ্জা মহম্মদ (সেরাজের প্রকৃত নাম) শেঠদিগকে, কখন ভ্রমেও অপমান করিও না—শেঠেরাই আমার এই প্রশস্ত রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপক—ব্যবসায়ী ইংরাজদিগকেও অনুগ্রহ দেখাইও—অন্তত তাহাদিগকে অকারণে উৎপীড়ন করিও না। ইহার অন্যথায় তোমার রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইবে, ও তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" বৃদ্ধের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া সেরাজ প্রজ্বলিত অনলে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। জগৎশেঠকে, সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অপমানিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ঘোরতর প্রতিহিংসানল জ্বালাইয়া দিলেন—তাহারই দিগন্তব্যাপিনী জলন্ত-শিখায়, পরিণামে তাঁহার ধ্বংস সাধন হইল। ইতিহাসের এই কঠোর সত্য দেখিয়া, আমাদের মনে—বাঙ্গালার কবির অমৃতোপম লেখনী প্রসূত—জগৎশেঠের মুখ-নিঃসৃত ভয়ানক প্রতিজ্ঞা বাক্যের স্মরণ হয়। আমরা যেন শুনিতে পাই জগৎশেঠ বলিতেছেন—

"যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ—

প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।"

জগৎশেঠকে এইরূপে প্রকাশ্য দরবারে অপমান করিয়াই সেরাজ ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাকে কারাবরুদ্ধ করিয়া অন্য কোন প্রকার গুরুতর শাস্তির আয়োজন করিতে লাগিলেন। মীর্জাফর পূর্ণিয়ার নবাবকে দমন করিতে যাইতেছিলেন—তিনি পথিমধ্যে এই ভয়ানক ঘটনা শুনিয়া মুর্শীদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জগৎশেঠকে কারামুক্ত করিবার জন্য নবাবকে অনেক অনুরোধ করিলেন—কিন্তু নবাব কিছুতেই নরম হইলেন না। শেঠদিগের নিজ রক্ষিত দুই সহস্র সেনা ছিল, যদিও এই সমস্ত সেনা, নবাবের অধীনস্থ বলিযাই উক্ত হইত, তথাচ, প্রকৃত পক্ষে তাহারা শেঠদিগের দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। ইয়ার লতিফ্ নামক একজন মুসলমান, এই সমস্ত সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিত। এই দুই সহস্র সৈন্যের সহায়তায় জগৎশেঠকে নবাবের কারাগার হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিবার জন্য, গোপনে মন্ত্রণাবস্ত হয়। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবে ভাবিয়া, সে যুক্তি পরিত্যাগ করা হয়। কিয়ৎকাল পরে নবাবের ক্রোধোপশম হইলে, তিনি জগৎশেঠকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দেন।

উদ্ধত প্রকৃতি সেরাজ এই সময়ে অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণতায় চড়াইলেন। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী নরদেহধারী রাক্ষসের ন্যায় হইয়া উঠিল। যখনই শুনিতেন, কোন ব্যক্তির ঘরে অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, তখনই বরকন্দাজ পাঠাইয়া তাহাকে লুঠিয়া আনিতেন। জল মধ্যে জনপূর্ণ নৌকা নিমজ্জন, ও গর্ভিণীর গর্ভ বিদারণ করিয়াও মধ্যে মধ্যে কৌতুক দেখা হইত। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, বাঙ্গালার বড় বড় দিকপালেরাও নবাবের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইলেন, কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায় কোথায় ?

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিলেও চলে না—জাতি কুল মান প্রভৃতি সমস্তই রসাতলে যায়—সুতরাং বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, প্রভৃতি স্থলের জমীদারেরা একত্রিত হইয়া—সেরাজের অত্যাচার নিবারণার্থ উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য মুর্শীদাবাদে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মহারাজ মহেন্দ্র নিজামতের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার দ্বারা প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতে পারে—ভাবিয়া তাঁহারা সমস্ত

দুঃখ কাহিনী ও অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর করিলেন। মহারাজ মহেন্দ্রও নবাবের জ্বালায় জর জর হইয়াছিলেন, এতদিন তিনি সাহস করিয়া নবাবের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সহযোগীদিগের বল পাইয়া তিনি এবারে নবাবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অত্যাচার কাহিনী তাঁহাকে শুনাইতে উপস্থিত হইলেন। সেরাজের অত্যাচারে দেশের জমীদারগণ ও সাধারণ প্রজাগণ, কি প্রকার অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন ও প্রাত্যাহিক নূতনবিধ অত্যাচারের সূচনায় তাঁহারা নবাবের কতদূর বিরুদ্ধাচারী হইয়া দাঁড়াইতেছেন এই সমস্ত কথা বিশেষ করিয়া শুনান হইল। কিন্তু যৌবন-মদ-মত্ত, বল-দর্পিত, বঙ্গেশ্বর সে কথা কাণেও তুলিলেন না। মহারাজ মহেন্দ্রসিংহ সুতরাং নিরুপায় হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। সেরাজকে রাজ্যচ্যুত না করিতে পারিলে, তাঁহাদের আর নিস্তার নাই, ইহাই তাঁহাদের বিশেষ প্রতীতি হইল। কিন্তু সেরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অনুষ্ঠান নিরাপদে ও অব্যাহতভাবে হইবার স্থান কোথায়? অনেক বিবেচনার পর জগৎশেঠের প্রহরীবেষ্টিত, প্রাসাদের নিভৃতকক্ষ মন্ত্রণাস্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

প্রাচীন কাগজপত্র, দেখিয়া যত দূর জানা যায়—তাহাতে বোধ হয়, রাজা রাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কুমার কৃষ্ণদাস, মীরজাফর আলি, ও জগৎশেঠকে লইয়াই, তাঁহার নিভৃত কক্ষে মন্ত্রণা-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রথম সভায় মহারাজ মহেন্দ্র সিংহ সভার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"আমরা এতদিন ধরিয়া এই সুবায় চাকরী করিয়া আসিতেছি, বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সময়ে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এই অপরিণত বয়স্ক, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, সুবাদারের হস্তে আমাদের জাতীয় গৌরব ও সম্মান নিষ্কলঙ্কিত রাখা, বড়ই দায় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদের সময় আপনারা কি উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন?" মহেন্দ্রসিংহ নিস্তব্ধ হইলে—রাজা রামনারায়ণ বলিলেন দিল্লীতে দূত পাঠাইয়া সুবাদারকে বাদশাহের পরোয়ানা দ্বারা বরখাস্ত করাইয়া নূতন সুবাদার নিয়োগের চেষ্টা করা হউক।" কিন্তু রাজা

রাজবল্লভ এ প্রস্তাবের কার্য্যকারিতার সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া ইহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন 'মুসলমান বাদশাহ—যে বাঙ্গালার মসনদে মুসলমান ভিন্ন হিন্দু সুবেদার নিযুক্ত করিবেন, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। সুতরাং বর্ত্তমানে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেও ভবিষ্যতে নূতন সুবাদার হইতে আবার এ প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে। এ কষ্ট যাহাতে একেবারে উন্মূলিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।" সকলেই এই নিভৃতকক্ষে স্ব স্ব মনোভাব এই প্রকারে প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেবল বৃথা বচসা ভিন্ন—কাজের কোন সুবিধা হইল না। জগৎশেঠ এই সময়ে প্রস্তাব করিলেন—"নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের সকলের অপেক্ষা কৌশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি—তাঁহাকে আনাইলেই সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবে।" জগৎশেঠের কথায় সকলেরই চৈতন্য হইল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আনিতে উকীল পাঠান হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে সামান্য প্রয়োজন ভাবিয়া স্বীয় দেওয়ান বাবু কালীপ্রসাদ সিংহকে প্রেরণ করেন, কালীপ্রসাদ বাবু ফিরিয়া গিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত করাইলে—নদীয়াধিপতি মুর্শীদাবাদে জগৎশেঠের প্রাসাদে উপস্থিত হন। এইবারের মন্ত্রণায় সমস্ত বিষয় স্থির হইয়া গেল।

ইউরোপীয় জাতির সহায়তায় সুবাদারকে রসাতলে পাঠাইবার মন্ত্রণাই সর্ব্ব-বাদী-সম্মত হইয়া গৃহীত হইল। তখন চন্দননগরের ব্যাপারের দরুণ ইংরাজ জাতির গৌরব ফরাসী অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা ইংরাজদিগের সহায়তাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন "আমি ইংরাজদিগের স্বভাব চরিত্র বেশ জানি, আমাদের ন্যায় তাহারাও নবাবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছে। আমি অনেকবার কলিকাতায়, কালীঘাটে ভবানী দর্শনে গিয়াছি সেই উপলক্ষে কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে, দুই তিন বার দেখিয়াছি। ড্রেকের সহিত আমার দ্বিভাষীর দ্বারা কথোপকথন হইয়াছিল। তাহাতে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ প্রতীতি হইয়াছে যে, ইংরাজেরা সাহসী, সমরকুশল, সত্যবাদী, ও আমাদের ন্যায় মুসলমান শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ।" যাহা হউক সেই নিভৃতকক্ষে, গুপ্তমন্ত্রণা সভায় এই স্থিরীকৃত

২

হইয়া গেল যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইংরাজদিগের গবর্ণরের সহিত এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন। †

ইহার পর কি হইল—ইতিহাসভক্ত পাঠক তাহার সমস্তই জানেন। সুতরাং সে সমস্ত কথার পুনরুক্তি করিয়া প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। পলাশীয় প্রশস্ত-ক্ষেত্রে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গেশ্বর

---

† পলাশী-যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইব, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইবার উদ্দেশে তাঁহাকে—"রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। বাজপেয়ী অগ্নিহোত্রী, হিন্দু-মহারাজার পক্ষে এ উপাধি যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ইংরাজ গবর্ণর লর্ড ক্লাইব—মহারাজকে আরও সম্মান দেখাইবার জন্য পলাশীযুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি কামান—উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এই সকল কামান নাকি আজিও কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে বিদ্যমান আছে।

বাজপেয়ী মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের সহিত, শেঠদিগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ, রাজা রামকৃষ্ণের আমলেও কৃষ্ণনগরে আমরা জগৎশেঠের নাম শুনিতে পাই। জগৎশেঠ এই সময়ে কোন কারণ বশত কৃষ্ণনগরে আসিলে—মহারাজ রামকৃষ্ণ পরম সমাদরে, বহুব্যয় করিয়া অতিথি সৎকার করেন। মহারাজা রামকৃষ্ণের বরাবরই উঁচু নজর ছিল, যে সময়ে শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমন করিতে আরঙ্গের, স্বীয় পৌত্র কুমার আজিম ওসানকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন, সেই সময়ে (বিদ্রোহ শান্তির পর) বাঙ্গালার সমস্ত রাজা, বাদশাহ পৌত্রকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে গমন করেন। বাঙ্গালার অনেক রাজা আজিম ওসানের দরবারে গিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে জাঁকজমক করিলে ঐশ্বর্য্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহারা দুই একটি অনুচর লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেরূপ নীচতা দেখাইতে পারিলেন না। তিনি বহুল অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রকৃত রাজার ন্যায় কুমার আজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আজিমওসান রামকৃষ্ণকে সেই প্রকার ভাবে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার মধ্যে এই একটি রাজার মতন রাজা দেখিলাম। আর যাঁহারা আসিয়াছেন, ইহাঁকে দেখিলে তাঁহাদের সম্মান করিতে ইচ্ছা হয় না।" বলা বাহুল্য মহারাজা রামকৃষ্ণের সহিত কুমার আজিম-ওসানের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে। এই রামকৃষ্ণই বহুব্যয় করিয়া শেঠ-দিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেঠদিগের নিকট কি প্রকার সম্মান পাইতেন তাহা উপরেই দেখিতে পাইবেন।

পথের ভিখারী হইয়া নিহত হইলেন। বাঙ্গালার শেষ মুসলমান ভূপতির সহিত,—যবনের রক্ত-পতাকা চিরকালের জন্য বাঙ্গালার মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত হইল, ও ভূপতি পরিবর্ত্তনে, বাঙ্গালার অদৃষ্ট-চক্র বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইল। বণিকবেশী-ইংরাজ দেশীয় দিক্‌পালগণের সহায়তায়,—দেশের শাসন কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার কোমল-বক্ষে, ব্রিটানিয়ার সিংহ-চিহ্নিত পতাকা প্রোথিত করিলেন।

ইংরাজ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে মীরজাফর আলি খাঁকে, বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। পলাশীযুদ্ধের সাত দিবস পরে, (৩০ জুন, ১৭৫৭) শেঠেদের বাটিতে সকলের দেনা পাওনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ইংরাজের সহায়তা করিবার জন্য যে চক্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অসম্ভাবিতরূপে সিদ্ধিলাভ করাতে চক্রান্ত-লিপ্ত সকল ব্যক্তিই কোন না কোন প্রকারে কিছু লাভ করিলেন। জগৎশেঠের বাটিতেই লর্ড ক্লাইব উমিচাঁদকে, "লোহিত সন্ধিপত্রের" (Red Treaty) মর্ম্মকথা খুলিয়া বলেন। এই-স্থানেই আশায় বঞ্চিত হইয়া উমিচাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শেঠেরা এই চক্রান্তে লিপ্ত থাকিয়া বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হইয়া ছিলেন কি না—তাহার কোন কথাই শুনা যায় না।

মীরজাফরের রাজত্ব আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদেরও বাঙ্গালার মধ্যে প্রতাপ বাড়িতে লাগিল। শেঠেদের প্রতাপও এই সময়ে একমাত্রায় চড়িয়া উঠিল। শেঠেদের নিকট ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই অনেক প্রকারে সাহায্য পাইয়া আসিতেছিলেন, ও ভবিষ্যৎ উপকারের প্রত্যাশাও রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আমরা শুনিয়াছি, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীরজাফর আলি কলিকাতায় ইংরাজদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই সময়ে জগৎ-শেঠ ও অন্যান্য দেশীয় প্রধানগণ নবাবের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নবাব চারি দিবস কলিকাতায় ছিলেন, এই সময়ে তাঁহার ও জগৎশেঠের পরিচর্য্যার জন্য কোম্পানীর—তহবিল হইতে, প্রায় অশী হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। এই চারিদিনে, তখনকার সেই অপরিণত শোভা-যুক্ত কলিকাতা নৃত্য-গীত, ও কোলাহল পরিপূর্ণ হইল, রাত্রিতে কোম্পানীর বড় বড় বাড়ী ও দুর্গ উজ্জ্বল আলোক-মালায় আলোকিত হইল। নবাবের ও তৎসম্মিলনে জগৎশেঠের বস্ত্র প্রাকারও উত্তমরূপে পতাকাও কুসুমমালায়

সুশোভিত হইল। যাহা হউক ইংরাজের অভ্যর্থনায়, বঙ্গেশ্বর ও জগৎশেঠ অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। প্রাচীন সরকারী কাগজ হইতে জানা যায় একা জগৎশেঠের পরিচর্য্যাতেই প্রায় ১৮০০০, টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

রুচি ও রস।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ। (চণ্ডী দাস।)

সুরুচি সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কুরুচি নিয়ত নিন্দনীয়। সুরুচি কু-রুচির অনুপাত অনুসারেই সভ্য অসভ্য সমাজ। যাঁরা সংসারের সকল বিষয়েই ভেদাভেদ জ্ঞান শূন্য, তাঁদের পক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমি মুনি ঋষি বা পশুপক্ষী সমাজের কথা পাড়ি নাই। মানুষ মানুষীর সমাজই আমার কথার লক্ষ্য।

সভ্য সমাজের প্রধান কৃতি সাহিত্য। সাহিত্যের সুন্দর শরীরে সুরুচি শোভনীয় স্বর্ণালঙ্কার, কুরুচি কদর্য্য বিস্ফোটক—অতি কুৎসিত ব্যাধি। শরীর ধারণে ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্য এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন।

কুরুচি কুৎসিত ব্যাধি বটে। কিন্তু সুরুচিও স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিলে, একটা প্রকাণ্ড রোগে পরিণত হয়। বিষ সুধায় না হউক, সুধা বিষে পরিণত হয়। কুরুচি সুরুচি না হউক, সুরুচি কুরুচির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া বিষম ব্যাধি হইয়া দাঁড়ান। যখন সুরুচি রোগ, তখন আর তিনি সুরুচি নহেন; তখন তিনিও কুরুচি বটেন। তখন সুরুচি কুরুচি উভয়ই এক শ্রেণীস্থ। উভয়ে,—বহু যোজন দূরে থাকিয়াও,—এক। তখন উভয়ই, রোগ। স্বদেশীয় সাহিত্যের সুন্দর অঙ্গে আজি এই উভয় বিধ রুচি-রোগই বিদ্যমান।

কিন্তু এখনকার রুচি বিকারের আন্দোলন করা আপাতত আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য আরও একটু ' সাধারণতন্ত্র" গোছের। সুরুচি কুরুচি এই কথা দুইটা অবশ্য খুব সহজ। কিন্তু যেমন সহজ তেমনি ' গোলমেলে '। যে কথাটা যত সহজ, সেইটাই আবার তত জটিল। সরলকে জটিল করা, দোষই হউক, আর গুণই হউক, আমাদের নিজেরই বটে। মানুষ দার্শনিক ' জীব। ' দর্শনের ঝোঁকে

নিজের অস্তিত্বেই নিজে সন্দিহান। পিতৃ পিতামহ ত পরের কথা। বিশেষত "ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি" এটা মহাজন উক্তিও বটে। তোমার যেটা 'সু' আমার সেটা 'কু' আমার যেটা 'সু' তোমার সেইটাই আবার 'কু', রুচি সম্বন্ধে এ কথাটা অনেক বিষয় অপেক্ষা, অধিক শুনা যায়। রুচি লইয়া লাঠালাঠি গণ্ডগোলটা খুবই চলে; আবার সেটা তত আশ্চর্য্যও নয়। এখন কথা এই যে সুরুচি কুরুচির লক্ষণ কি? 'লক্ষণা' করা আদৌ সহজ নয়, তাহা জানি। তাহাতে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাই। আমার আপাতত তাহা সংগ্রহ নাই। অথচ বিষয়টাতে গরজও বিশিষ্ট রূপ আছে। তাই উপরি উক্ত কবিদ্বয়কে উপস্থিত করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের ও ভানুসিংহের দুইচারিটা কবিতার এক আধ বিন্দু 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করিয়া দেখিব, যদি রুচি রহস্য কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত হয়। রুচিরাজ খোলাসা ফরদা যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, একপ আশা করা অবশ্য ভ্রম। তবে—কিনা "আশা বৈতরণী নদী" আর "মুনীনাঞ্চ ও মতিভ্রম"।

এখন রুচি-রস দুয়ে জড়াইয়া একটা ভাব হয়। রস মাত্রেই অবশ্য রুচির সমান অধিকার আছে। তবে শৃঙ্গারেই যেন তাঁর অত্যাচারটা কিছু বেশী বেশী। 'শৃঙ্গার' রাজ্যের যেখানে সেখানেই রুচি বাহাদুরের নিজ আবাদী 'খাস-খামার'। তাই তথায় তাঁহাকে একটু সহজে পাইব বলিয়া, আর তাঁহার নিজ মুর্ত্তিতে পাইব বলিয়া, আমাদের এই প্রবন্ধটা উক্ত অকথনীয় রস রাজ্যের ভিতর দিয়াই লইয়া যাইব। পরন্তু সেই জন্যই উপরে বড়ু চণ্ডীদাস কৃত উক্ত রসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উদ্ধৃত করিয়াছি। করিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি, ভগবানই জানেন। তবে আমি কেবল এই টুকুমাত্র জানি যে, যাহা করিয়াছি তাহা যেমন এক পক্ষের নিকট পাপ, যাহা করিতে যাইতেছি, তাহাও তেমনি অপর পক্ষের নিকট পাপ বলিয়া প্রতীত হইবে। দ্বিবিধ পাপ দুই দিকে। এ দুটানায় আপনারা আমাকে রক্ষা করুন।

প্রাচীনেরা অমার্জ্জিত রুচি, আর নবীনেরা মার্জ্জিত রুচি—এই একটা কথা সময়ে সময়ে সাহিত্যের বাজারে উঠিয়া থাকে। কিন্তু কথাটার কোন পক্ষে কত মূল্য, কেহ বড় 'জমা খরচ' কাটিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় না। একটা জমা খরচ কেটে দেখিলে উভয় পক্ষেরই "নগদ হাওলাত"

বাহির হইতে পারে। ফলে প্রাচীন কবি মাত্রেই অশ্লীল ও অদাকাব বায়রণ-শেলিব ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র মাত্রেই সতীত্বের শ্বেতপদ্ম, এ কথা কথাই নয়। ববং আনকোবা আধুনিক ইংবাজী নবিশেব অশ্লীলতার অন্তঃসলিল স্রোত সময়ে সময়ে অনেকদূব গিয়া গড়াইয়া পড়ে। এবং তাহা বমাল সমেত 'পাকড়া' কবে দেওয়াও যাইতে পারে।

অশ্লীলতা প্রাচীনাই হউন, আর নবীনাই হউন, পদার্থ একই বটেন। তবে প্রাচীনায় নবীনায় খুব প্রভেদ আছেই,—নাই কে বলিবে? প্রাচীনা ত কুৎসিতা বটেই. কিন্তু নবীনা কুৎসিতা হইলেও নবীনা; নবীনাব কুরূপ. কে তত ঠাওর কবে দেখে? প্রাচীনা অশ্লীলতা কু-অভ্যাস বশত সর্ব্বদাই অনুচ্চারণীয় কথা উচ্চাবণ কবেন,—নবীনা তাহা কবেন না। নবীনার ভাষা বিলক্ষণ বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত, সংস্কৃতেব উপর ইংবাজী বার্ণিস। কিন্তু সেই ভাষাব ভিতব এমনতব ভাবে ভাব সাজান, যে প্রাচীনার দুই দশ কাহন কদর্য্য কথা তাহাব নিকট প্রায কিছুই নয়। প্রাচীনাব অকথনীয কথা গুলা কাণ দিয়া আসিয়া কাণ দিয়াই বাহিব হইয়া যায়, কিন্তু নবীনার অভদ্র কটাক্ষভবা ভাবের হুল বক্ত কুম্ভে, মবমেব মধ্যে বিঁধে। প্রাচীনা ও নবীনাকে একবাব একত্রে বসাইয়াই দেখা যাউক না ব্যাপাবটা কি!

প্রাচীনা অশ্লীলতা,—এই স্থলে আব মূর্ত্তিমতী কবিব না। মনে করুন, ভারতচন্দ্রেব 'পতিনিন্দাব' মূর্ত্তি আপনাবা একবাব অপার্য্যমানে ধ্যান করিলেন। বলা বাহুল্য উহা নেহাত কুরুচিকব, নেহাত কদর্য্য, অভদ্রোচিত। কিন্তু কাণ দিয়া আসিয়া, কাণকে অবশ্য একটু ক্লেশ দিয়া, কাণ দিয়াই বাহিরে চলিযা যায়। "কাণেব ভিতব দিয়া মবমে পশে না।" কিন্তু নবীনাকে দেখুন,—

নবীনা অশ্লীলতা।

আয় পাখী, আয বুকেপ
কপোলে আমাব মিশারে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে!
বড দুঃখ মনে বনেব বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না!
এমন কপোল অমিয়-মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না!

প্রতিপাখা তোর উঠেনি শিহরি ?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না ?
নাচ্ নাচ্ তালে তালে
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে !

নবীনার এ গীত মিষ্ট, সুন্দরও বটে। ইহার চমৎকারিণী সাধুভাষার ত কথাই নাই। কিন্তু সুমিষ্ট সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিণী সাধুভাষার ভিতর কি বিষম বিষভরা ! তাহা মহাশয়রাই বুঝুন। যাঁরা না বুঝেন, তাঁদের বুঝাইয়া আর পরকাল খাইবার দরকার নাই। সুমিষ্ট সুন্দর নহিলে কি আর ভাল করে সর্ব্বনাশ হয় ?

প্রাচীনা নবীনার আরও এক-চিত্র পাঠক একত্রে দেখুন। কিন্তু ক্ষমা করিবেন।

প্রাচীনা। রাধাকৃষ্ণ রচে রাস মণ্ডলের মাঝে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে সাজে॥
হেম মাঝে মাঝে যেন চুণী মরকত।
গোবিন্দ সহিতে গোপী সাজিলা তেমত॥
পরস্পর প্রেম করি পসারিয়া বাহু।
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু॥
অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হইল চন্দনের ফোঁটা॥
অধরে উড়িল কার তাম্বুলের রাগ।
খঞ্জন লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ॥

আর না। পরন্ত — • * *

নবীনা। তোরা খেলা কর,—তোরা খেলা কর
কামিনী কুসুমগুলি !
কভু পাতা মাঝে, লুকায়ে মুখ,
কভু বায়ু কাছে খুলে দে বুক—

মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্‌ কভু নাচ্‌
বায়ু কোলে দুলি দুলি!
দুদণ্ড বাঁচিবি—খেলা তবে খেলা,
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা শ্রান্ত প্রাণ
তেয়াজিবি ভাবনা ভুলি!

উপরের রচনাটি অবশ্য বেজায় উলঙ্গিনী কিন্তু নীচেরটিই বা কম কিসে? বরং শেষোক্তের আধ-ঢাকা অঙ্গ অধিক অনিষ্টকর নয় কি?

সেকালের অশ্লীলতা খোলা খেঁউড়। একালের অশ্লীলতা ঢাকা খেঁউড়। খোলায় লোকের ঘৃণা, ঢাকায় লোকের আদর। কাজেই শেষোক্তের অনিষ্টকারিতা অধিক। সে কালের অশ্লীলতা অমার্জ্জিতা অশিক্ষিতা সুতরাং এখন আর মনোহারিণী ও অনিষ্টকারিণী নয়। তাহার কাল দিন, বহুদিন ফুরাইয়াছে। একালের অশ্লীলতা বিলাতী বৈজ্ঞানিক ব্রুসে মাজা, দিব্য আধ ঘুমন্ত, আধফুটন্ত, চাকচিক্যশালিনী, সুন্দর বসনাবৃত উলঙ্গিনী, কাযেই তাহার অনিষ্ট-কারিতা অধিক। আমার বোধ হয় একালের অশ্লীলতায় বিলাসিতাও কিছু বেশি বেশি। যাহাতে মানুষের মনে বিলাসিতা বাড়ায় তাহাই অনিষ্টকর, তাহাই কুরুচিকর ও কুরস।

বলা বাহুল্য আমি প্রাচীন কবিদিগের কুরুচি সমর্থন করিতেছি না। কুরুচি মাত্রই অসমর্থনীয়, সর্ব্বথা নিন্দনীয়। যাঁরা প্রাচীন ও পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের নাম শুনিতেই অর্থশূন্য গৌরবে গর্ব্বিত হয়েন, তাঁরা গিয়া পুরাতন আবর্জ্জনা ঘাঁটকাইয়া পুরাতন অশ্লীলতার জয়পতাকা উড়ান। আমার সে বাহাদুরীর আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি কেবল এই বলিতে চাই, যে প্রাচীন মাত্রেই অশ্লীল এবং নবীন মাত্রেই রুচিবান, একথা কথাই নয়, এ কথার কোন অর্থই নাই। রুচি-রসের আদালতে কেবল প্রাচীনেরা ধরা পড়িবেন, আর নবীনেরা বেকসুর খালাস পাইবেন, ইহা নেহাত অন্যায়।

কুরুচি কুরস অশ্লীল আবর্জ্জনা তখনও ছিল, এখনও বিলক্ষণ আছে। তবে তাহাদের প্রকৃতি ও পরিমাণের ইতর বিশেষ থাকিতে পারে বটে। অশ্লীলতার আবর্জ্জনা তখনও ছিল, এখনও আছে, এবং, আশঙ্কা করি, পরেও থাকিবে। থাকার যে সব কারণ, তাহা অনেকের দ্বারা অনেক বার উক্ত ও পুনরুক্ত হইয়াছে। পুনরুক্তির 'পুনশ্চপাঠ' আমি আর নাই

লিখিলাম। তবে যাঁরা লোকশিক্ষক, সমাজ ও সাহিত্যের অধিনায়ক, তাঁরা স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিলে চলে না। স্রোত ফিরান বা স্রোতের বিপরীতে সংস্কার-নৌকা চালান তাঁহাদের কায। সে কায তখনও ছিল, এখনও আছে, চির দিনই থাকিবে।

ভানুসিংহ হয় খুব পুরাতন, না হয় 'আনকোরা নূতন'। ভারতচন্দ্র নূতনও নহেন, পুরাতন ও নহেন,—দুয়ের মাঝামাঝি। কিন্তু নূতন পুরাতন লইয়া আমার কথা নয়,—কথা হইতেছে রুচি-রস লইয়া। অতএব ভারত-চন্দ্রে ভানুসিংহে—এখন সেই কথাই হউক।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পড়েন নাই, এমন বাঙ্গালী নাই, অথবা যিনি ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তিনি বাঙ্গালী নহেন। পরন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতির সহিতও বঙ্গের বালকবৃদ্ধ পরিচিত। রায়-গুণাকরের সহিত আলাপ করেন নাই, অথচ বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় হইয়াছে,—এমন লোক কে আছেন! কিন্তু ভানুসিংহকে চিনেই বা কয়জনে! তাঁহার কয়েকটা ক্ষুদ্র পদের সহিত অতি অল্প লোকেরই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে! ভারত-চন্দ্র বৃহৎ, ভানুসিংহ ক্ষুদ্র। ভারতচন্দ্র সর্ব্বজনপরিচিত, ভানুসিংহ অপরি-চিত, অল্পলোক-বিদিত। ভারতচন্দ্র ঐশ্বর্য্যশালী, নানা ধনরত্নের অধীশ্বর। ভানুসিংহের সম্বল কয়েক গাছি পুষ্পমালা। ভারতচন্দ্র প্রমোদ উদ্যানে মনোহর সরোবর; ভানুপ্রভাতের শিশিরবিন্দু। অতএব এতদুভয়ে তুলনা কোথায় সম্ভবে? কোথাও সম্ভবে না, কেবল সুরুচি কুরুচির সুরস কুরসের প্রভেদ কি, প্রভেদ কত, তাহা দেখাইবার স্থলে সম্ভবে। ভারতচন্দ্রের সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে যে রস রুচিদোষে বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়াছে, ভানুর দুই চারিখানি ক্ষুদ্র চিত্রে তাহার সুন্দর স্ফূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। কারণ এই যে ভারত কু-রুচি; ভানু সু-রুচি। ভানু যে প্রেমে পবিত্রতা-পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখেন, ভারত সেই প্রেমে বানর বানরীর বিকৃত বিলাসোচ্ছ্বাস লিখেন। ভানু রসিক ও প্রেমিক, ভারত অনেক স্থলে রসিক,—প্রায় কোন স্থলেই প্রেমিক নহেন। তাই 'অন্নদা-মঙ্গল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রসমঞ্জরী' পর্য্যন্ত আদি রসের অসংখ্য চিত্রে, প্রণয়ের পূরা ছবি, আদতও উত্তম ছবি, বোধ হয়, এক-খানাও উঠে নাই; আর ভানুর কয়েকটা মাত্র পদে, প্রণয়ের প্রতিকৃতি প্রায় পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

ভানুসিংহের পদ কয়টি, মহাজন কবিদের ন্যায়, রাধাকৃষ্ণের সেই পুরাণ লুকান প্রেম বিষয়ক। রাধা প্রেম-গত-প্রাণা, শুদ্ধ-চারিণী, পবিত্রা, আদ্যাশক্তির অবতার। কিন্তু এ সকল হইলেও কৃষ্ণের সহিত ঠাকুরাণীর সাংসারিক সম্বন্ধটা বড় বিশুদ্ধ নয়। সাংসারিক সম্বন্ধে আয়ান-পত্নী রাধা, কৃষ্ণের মাতুলানী। অতএব সে হিসাবে রাধা 'লোক-ধর্ম্মের' চক্ষে কেবল অসতী নহেন; অসতী অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়া।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় প্রথম কল্পে খুব লুকান ছাপান হইয়াও, বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে সাধ্বী, সতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সতী। বিদ্যা, সুন্দরের কেবল প্রণয়িনী ও প্রেমাভিলাসিনী নহেন,—বিদ্যা, সুন্দরের স্ত্রী, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম-পত্নী। কিন্তু রাধিকা কি? রাধিকা প্রণয়িনী—কৃষ্ণের; পত্নী—আয়ানের। অতএব আমবা বলিতে রাধা যে 'সংসার-ধর্ম্মের' নিকট বিদ্যা সতী, রাধিকা কলঙ্কিনী। এখন দেখুন, রুচির 'মারপ্যাঁচে' আমাদের এই কবিদ্বয়ের একজন অসতীকে ও অপর সতীকে কিরূপ সাজাইয়াছেন। ভানুসিংহ এই লৌকিকী অসতীকে পবিত্র পদ্মে পরিণত করিয়াছেন, আর ভারতচন্দ্র সতী-সাধ্বী বিদ্যাবতী বিদ্যাকে অতি সামান্যা বিলাসিনী খেমটা-ওয়ালী করিয়া ছাড়িয়াছেন। একে একে উভয় চিত্রই দেখাইতেছি।

প্রণয়ী সুখ-শয্যায় গাঢ় নিদ্রিত। প্রণয়িনী তথায় উপস্থিত, শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট কিম্বা শায়িত, কিন্তু জাগরিত;—প্রণয়-পাত্রের শয্যা উপাদানের জন্য স্বীয় উরু বা অঙ্গ পাতিয়া দিয়াছেন। প্রণয়ী প্রগাঢ় নিদ্রায় সুখ-শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন, হয়ত কচিৎ সুমিষ্ট স্বপ্নও দেখিতেছেন, মুখমণ্ডলে মনের মধুর ভাব মৃদু মৃদু ভাসিয়া উঠিতেছে,—ওষ্ঠ-দুখানিতে ঈষদ হাসির হিল্লোল ফুটিতেছে। প্রণয়িনী, সেই সুষুপ্তির শান্তি, সেই শান্তির স্বপ্ন এবং সুখ, আর সেই মুখ আর সেই মুখখানির মৃদু মধুর হাসি, আর সেই হাসির গতি-প্রকৃতি-স্থিতি,—নিস্তব্ধে নীরবে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন। সে 'ভাবনা' কি স্বাভাবিক ও সুন্দর!—সে অবস্থা ও অবস্থিতি টুকু কেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর! সে ভাবনায় কতই ভাব! সে ভাবনায় ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান, সুখ-স্মৃতি-আশা, বাৎসল্য বিলাস,—কত উঠে কত ফুটে,—কে বলিবে? প্রাণের একার্দ্ধ নিদ্রিত, অপরার্দ্ধ জাগরিত,—এক অপরে মিলিত হইয়া অথচ অপরের অন্তরালে থাকিয়া অপরকে দেখিতেছে। এই

অবস্থা ও অবস্থিতি টুকু চিত্রকর ও কবি-কলমের বিশেষ উপযোগী, বড় বাঞ্ছনীয় সামগ্রী. তাহাও কি আর বলিতে হয়? প্রণয়ের বস্তু এত নিকটে যে বক্ষের উপর; আবার এত দূরে যে নিদ্রা ও স্বপ্নের রাজ্যে। একান্ত নৈকট্য ও একান্ত দূরত্ব একত্রে গলাগলি যুগপৎ বিদ্যমান। উভয়ের অপূর্ব্ব মিলন। এ মিলন—প্রেমের সহিত প্রেমের, একত্রে যোগ; অতএব অতি বিশুদ্ধ বিলাসময় সম্ভোগ। সে সম্ভোগ সুস্বাদুও স্বাস্থ্যকর, মনোহর ত বটেই। নৈকট্যে,—মিলন; মিলন সুস্বাদু। দূরত্বে,—বিরহ, বিরহ স্বাস্থ্যকব। মনোহর উভয়ই। দেখা যাইক 'ভানুঠাকুরের' তুলিতে চিত্র খানি কেমন উঠিয়াছে,—কতটুকু ফুটিয়াছে;—

গহির নীদমে বিবশ শ্যাম মম,
অধরে বিকশত হাস,
মধুর বদনমে মধুর ভাব অতি
কিয়ে পায় পরকাশ!
চুম্বনু শত শত চন্দ্র বদন রে
তবহুঁ ন পূরল আশ,
অতি ধীরে মম হৃদয়ে রাখনু
নহি নহি মিটল তিয়াষ।
শ্যাম! সুখে তুহুঁ নীদ যাও পহু
মঝু এ প্রেমময় উরসে,
অনিমিখ নয়নে সারা রজনী
হেরব মুখ তব হরষে।
শ্যাম! মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন্ স্বপন অব্ দেখ ত মাধব,
কহবে কোন্ হমায়!
এ সুখ স্বপনে মৈক কি দেখত
হরষে বিকশত হাসি?
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেম-ঋণ রাশি!

জনম জনম মম, প্রাণ পূর্ণ করি
থাক হৃদয় করি আলা,
তুঁহক পাশ রহি হাসয়ি হাসয়ি
সহব সকল দুখ জ্বালা।
বিহঙ্গ, কাহতু বোলন লাগলি ?
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল, তব
শীতল জোছন-ধারা।
তারা-মালিনী মধুরা যামিনী
ন যাও, ন যাও বালা,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
আনলি বিরহক জ্বালা!
হমার সারা জীবন জনি ইহ
রজনী রহত সমান,
হেরয়ি হেরয়ি শ্যাম মুখচ্ছবি
প্রাণ ভইত অবসান!

প্রণয়ের অণু পরমাণু স্তরগ্রন্থি সন্ধিস্থল দেখাইবার জন্য, এ ললিত পদ বিশ্লেষণ শিলে গুঁড়া করিতে যাওয়া, মূঢ়তা মাত্র। পাঠক সহজেই দেখিতে পাইবেন এই অঙ্গুলী পরিমিত পদটিতে প্রেমের কি অতুল ভাব বৈভব, কি বিপুল বৈচিত্র। প্রথম স্তরে প্রীতি বিস্ময়, প্রশংসা; দ্বিতীয়ে মোহ চাঞ্চল্য, তৃতীয়ে ধৈর্য্য ধীরতা; চতুর্থে সাধ সোহাগ; পঞ্চমে ভক্তি কৃতজ্ঞতা; ষষ্ঠে আশা প্রার্থনা; সপ্তমে বাৎসল্য স্নেহ; অষ্টমে বিলাস; নবমে আত্ম-সমর্পণ,—শান্তি। সকল স্তরে প্রতি অক্ষরেই প্রাণের সমান উচ্ছ্বাস, প্রণয়ের স্বাভাবিক বিলাস। উচ্ছ্বাস বিলাস উহার সর্ব্বত্রই আছে, তদুভয়ের বিকৃতি নাই!

ভানুসিংহের নায়ক নায়িকার যেরূপ 'অবস্থা ও অবস্থিতির' চিত্র আমি আপনাদিগকে উপহার দিলাম, ভারতচন্দ্রের নায়ক নায়িকার ঠিক সেইরূপ 'অবস্থা ও অবস্থিতির' চিত্র মহাশয় নিজেই স্মরণ করুন। না হয় কার্য্যানুরোধে আমিই একটু স্মরণ করিয়া দিতেছি। কিন্তু আগেই বলিয়া রাখিতেছি, অপরাধ লইবেন না।

বিদ্যার নিদ্রিত অবস্থায়,

সুন্দর।

এক দিন দিবাভাগে, কবি বিদ্যা অনুরাগে,
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কবাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া,
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥
রজনীর জাগরণে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে * *, সুন্দর চঞ্চল অতি,
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ.——— ———

আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া কায নাই। যতটা করা গিয়াছে, তাহাই প্রচুর,—তাহাই 'পেনাল কোডে' একটা অতিরিক্ত ধারা সংযোজিত করিয়া দিতে সমর্থ। পাণ্ডিত্য পূর্ণ সুন্দরের এই পশুত্ব, বিলাসবতী বিদ্যারও অসহ্য। বিদ্যা—

আতিবিতি ঘরে যায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
অভিমানে উপজিল মান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম,
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেট মুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥

'সামান্যার' পক্ষেও ইহা স্বাভাবিক। অতএব বিদ্যাবতী বিদ্যার ত কথাই নাই। কিন্তু বিদ্যার এ বড়াই বৃথা। তাঁহার অত্যাচারও অকথনীয়।

ভানু ঠাকুরের ও রায গুণাকরের উপবি উদ্ধৃত চিত্রদ্বয়ের পরস্পর তুলনা করিয়া এই খানে একটু রুচি-রসের বিচার করিয়া লউন। কাহার কবিত্ব কত, সে বিচাব কবিতে হয় করুন; কোন্ চিত্রে কুরুচি ও কোন্‌টিতে সুরুচি, তাহা ত বলিবেনই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 'রস' কোন্‌টিতে? গুণাকরের চিত্র কুরুচির কদর্য্য কর্দ্দমে লেপা, কিন্তু তাহাতে রস কোথায়?

নিংড়াইলেও ত পড়ে না; নিংড়াইলে কেবল কুৎসিত কাদার দুর্গন্ধ বাহির হয়। গুণাকরের গুণপনা কবি-কৌশল উহাতে থাকিতে পারে, না আছে এমত নয়। কিন্তু কুরুচিতে উহার কৌশল কবিত্ব সবই মাটি করিয়াছে।

পুনশ্চ উপরি উক্ত উভয় কবির, সম অবস্থা ব্যঞ্জক আরও এক আধ চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া রুচিরসের খেলা দেখা যাউক।

বর্ষা এসেছে। আকাশে 'নবীন মেঘের' ক্রীড়া আরম্ভ হয়েছে। বিজুলী 'চমকিছে'। বজ্র কড় কড় ডাকিছে। বড় আঁধার, 'বাদল'ও বিলক্ষণ। ভানু ঠাকুরের রাধাকে আমরা পাঠকের সম্মুখে অগ্রে ধরিতেছি।

সজনি গো———

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা

আঁধার যামিনী রে।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব

অবলা কামিনী রে।

উন্মদ পবনে যমুনা উছলত

ঘন ঘন গরজত মেহ।

দমকত বিদ্যুত বজ্রনিনাদ ত

থরহর কম্পত দেহ।

ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

বরখত নীরদপুঞ্জ।

ঘোর তমস তরু তাল তমালে

নিবিড় তিমির ঘন কুঞ্জ।

বোল ত সজনী এ দুরুযোগে

কুঞ্জে নিরদয় কান

দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত

রাধা রাধা নাম।

সজনি——

মোতিম হারে, বেশ বনা দে

সিঁথি লগা দে ভালে।

উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম

বাঁধহ মালতমালে।

নয়নে অঞ্জন রঞ্জন সম্বর
অলত লগা দে পায়।
একল যাওব যঁহি রে বাঁশী
রাধা রাধা গায়।
হিয়া-মাঝ সখি প্রেম দীপতহ
আঁধা মে ক্যা হয় ডর লো?
শ্যামক ছোড়য় রাধা কয়সে
একলি রহবে ঘর লো।
বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর!
ঐছন কুঞ্জে আসিও না তুঁহু,
মিনতি করত হতভাগী,
মাধব! কাহ তু পাওব দুঃখ রে
দুখিনী হমার লাগি?
সহলি রে গঞ্জন দেশ বিদেশে
ভইলি রে কলঙ্কভাগী!
যাও যাও পহু, মথুরা নগরে
মিটবে সব সুখ আশ।
জনম জনম তুঁহু সিংহাসন পরি
করহ সুখে পহু বাস।
দূরদেশ রহি, লোকমুখে হম
শুনইব তুয়া যশগান,
দূরদেশ রহি, মহিমা শুনি তব
ধন্য মানাইব প্রাণ!
বিসরো মাধব গোপিনীজনকো
বিসরো ময়কো শ্যাম,
বিসরো মাধব, পীরিতি লীলা—
সুখ-বৃন্দাবন ধাম।

অতঃপর মহাশয়রা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকে লউন। বিদ্যা 'বারমাস' বিনাইয়া, বর্ষা বাদলের কথা তুলিতেছেন,—

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা- আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব • • • জাগাইয়া॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধবে ডরে জলদের ডাকে॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকি।
শুনিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর থরথরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥

মনে রাখা চাই, যে আমাদের কথাটা হইতেছে,—রুচি ও রস দুয়ে জড়াইয়া। রুচি বা রস পৃথক ভাবে লইয়া নয়। রস বিলাসের উচ্ছ্বাসেই যে সুরুচিকে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা নয়। প্রত্যুত সুরুচি সরিয়া দাঁড়াইলে বিলাস রসের উচ্ছ্বাস হয়ই না। রস হইতে রুচি, (অবশ্য সুরুচি) বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে,—তাহা একটা বিভীষিকা। রস-বিলাসের উচ্ছ্বাসে সুরুচিকে সরিয়া দাঁড়াইতে হয় না, প্রত্যুত সুরুচির প্রভায় রস উছলিয়া পড়ে, তাহা উপরি উদ্ধৃত ভানুর বর্ণনায় দেখুন। উক্ত বর্ণনার প্রথম স্তবকে প্রমোদ, দ্বিতীয়ে প্রেম। প্রথম স্তবকে প্রধান আসন প্রমোদের, দ্বিতীয়ে উহা প্রেমের। ভাসা ভাসা দেখিলে প্রথম স্তবকে প্রমোদেরই প্রধান আসন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা এক রতি বাড়াইলেই দেখা যায়, যে প্রেমই সোহাগ করিয়া প্রমোদকে উচ্চ আসনে বসাইয়া, ক্ষণেক তাহার চপলতার সহিত ক্রীড়া করিতেছে,—তাহার লীলা-লাবণ্য-ভঙ্গী লইয়া 'একটু

বুঝ করিতেছে। প্রমোদের সহিত প্রেমের এ ক্ষণিক ক্রীড়াটুকু, সাহিত্যে বা সংসারে কেমনতর তরল মিঠে মিঠে জোৎস্নাময়,—তাহা মহাশয়রা নিজেই বুঝুন, অন্যে আর কি বুঝাইবে! প্রথম স্তবকে প্রেমে আর প্রমোদে 'সই-স্যাঙ্গাতের' খেলা; দ্বিতীয়ে প্রেমের পরম রমণীয় মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র পূজা না করিয়া কোন পাষণ্ড থাকিতে পারে! এক দিকে প্রেমের অতলস্পর্শিনী প্রগাঢ়তা, অপর দিকে হালকা পাতলা প্রমোদ সেই প্রগাঢ়তা দ্বারা পরিচালিত, সর্ব্বদা বিশুদ্ধীকৃত; ভানুর কবিতায় প্রমোদ প্রেমের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে; কাজেই রসোচ্ছ্বাসের চূড়ান্ত হইয়াছে। হওয়ার কারণ সুরুচির প্রভা। কবি ভানুসিংহ কবি ভারতচন্দ্রের ন্যায় শুদ্ধ 'রসিক লোক' নহেন, তিনি সুরুচিবান এবং নিজে প্রেমিক,—জানেন, কি প্রণালীতে প্রমোদ প্রেমের সহিত খাপে ও প্রেম প্রমোদের সহিত খাপে,—জানেন, কিরূপে রুচি রসে সামঞ্জস্য করিতে হয়। ভারতচন্দ্র কবি,—ভানুসিংহ অপেক্ষা বড় দরের কবি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং খুব রসিক লোকও বটেন। 'রসিক লোক' তার আর কথা? "মল্লিকা ফুলের পাখা অগরু মাখিয়া নিদাঘে বাতাস" দেওয়া বড় সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে। ভারতচন্দ্রের যে দুই চারি ছত্র কুরুচির নমুনা বলিয়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও তাঁহার কত লিপি-নৈপুণ্য, কত চটুল-চতুরতা! কিন্তু সে যাহাই হউক, ভারতচন্দ্র যাহাই হউন তিনি রুচিবান নহেন এবং আমি বিবেচনা করি, তেমন প্রেমিকও নহেন। ভাবোচ্ছ্বাস-বর্ণন-পটু, চরিত্র-সুচিত্র-ক্ষম হইয়াও তিনি জানেন না, কিরূপে রস প্রবাহে রুচির নৌকা চালাইতে হয়, জানেন না, কিরূপে প্রেম দ্বারা প্রমোদকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়। ভারতচন্দ্র অনুধাবন করেন নাই যে রুচি-বিরহিত রস রসই নহে, যদি তাকে রস বল, সে রস বড় নোংরা। ভারতচন্দ্র অনুধাবন করেন নাই, যে প্রেম বাদে যে প্রমোদ, তাহা পৌর স্ত্রীর নহে, পরকীয়ারও নহে,—তাহা বিলাসিনী বেশ্যার। ভারত এই অননুধাবনাতেই তাঁহার সাধ্বী সুশিক্ষিতা শুদ্ধচারিণী বিদ্যাকে বিলাসিনীতে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যায় কেবল মাত্র বিলাসেরই বিকাশ, প্রমোদেরই পরাক্রম,--অস্বাভাবিক বিকাশ আত্যন্তিক পরাক্রম দেখিতে পাই।

এখন আর একবার 'মনে করিয়া দিই' যে আমাদের কথাটা কেবল ভারতচন্দ্র ও ভানুসিংহকে লইয়া নয়, কথাটা রুচি ও রস লইয়া। সুরুচি

ও কুরুচি একই অবস্থায় একই দ্রব্য কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ভোগ করে, ভারত ও ভানুর উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা কয়টি অবলম্বন বা উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, সাহিত্যামোদী পাঠক লক্ষ্য করিবেন। লক্ষ্য করিবেন, সুরুচি কুরুচিতে প্রভেদ কিরূপ, আর প্রভেদ কেন? লক্ষ্য করিবেন, রুচি হীন হইলে, রসের রসত্ব কতটা থাকে, আরও লক্ষ্য করিবেন, রসের সহিত রুচি কেমন খাপে। কথাটা হইতেছে এই যে 'রুচির' নাম শুনিয়া পলাইবার প্রয়োজন হয় না; 'রুচি' মানে একটা 'শুষ্ক কাষ্ঠ' রস-কস-হীন বিশ্রী বিবর্ণ বিভ্রাট নয়; প্রত্যুত রুচিতেই 'রস', রুচি রসকেই অগ্রসর করে। কথাটা খুব মোটা কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত দেশ কাল পাত্র দিন দিন এমনই হইয়া উঠিতেছে, যে, মোটা কথাগুলাও অনেকে সাফ ভুলিয়া যাইতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের হঠাৎ এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে, কে ভাবিয়াছিল। সুদিনের পরেই দুর্দ্দিন, সেই জন্য আরও আক্ষেপ অধিক।

দুর্ভাগ্য বশতই ভারতচন্দ্র 'প্রণয়কে' 'প্রমোদ' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই ভুল বুঝাতেই, বোধ করি তাঁহার রুচি-বিভ্রাট, তাঁহার সাধ্বী গুণবতী বিদ্যা অত-বিলাসিনী, তাঁহার কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ও বাঙ্গালীর বিশেষ প্রিয় পদার্থ হইয়াও, কিয়ৎ পরিমাণে কুকাব্য।

দাম্পত্য প্রেমটা ভারতচন্দ্রের দিনে কিছু হালকা জিনিসের মধ্যে গণ্য ছিল। সে জিনিসটাকে তিনি আরও হালকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তুলিবার কারণ অনেক থাকিতে পারে। অনেকের মধ্যে একটা কারণ আমার এই বোধ হয়, যে নিয়ত প্রবাস বাস হেতু রায় গুণাকর যুবা অবস্থায় পত্নী-সহবাস সুখে বঞ্চিত ছিলেন। সে স্বাস্থ্যকর সহবাসের উপকার তিনি সম্যকরূপে প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেই উপকার সেই সহবাস-সহায়তা না হওয়াতেই তাঁহার হৃদয়বৃত্তির সুকুমার ভাগের নির্ম্মল অংশ ভাল করে বিকাশ হইতে পায় নাই। কাযেই পত্নীকে সাধারণত প্রমোদিনী বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। পত্নীত্বের আর আর অংশ,—যে অংশগুলি প্রধান, পবিত্র ও উচ্চ, যাহা সংসারে স্বর্গের ছায়া, যাহা ধর্ম্মে পরম প্রবর্ত্তক, যাহা কাব্যে বিশেষ উপযোগী, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করেন নাই; তিনি যে করিয়াছিলেন, অন্তত তাঁহার কাব্যগুলি পড়িয়া এমন বোধ হয় না।

কিন্তু এস্থলে একটি কথার উল্লেখ করা আমার নেহাত কর্ত্তব্য। 'কথাটি

ভারতের নিজের চরিত্র ও নীতি-নিষ্ঠা সম্বন্ধে। তাঁহার কাব্যে কুৎসিত বিলাস স্রোত অবিরত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি নিজে বিলাসী বা প্রমোদ-পরায়ণ লোক ছিলেন না। ভারতচন্দ্র ইষ্ট নিষ্ঠ সন্ধ্যাহ্নিক-পূত স্বধর্ম্মপরায়ণ সুব্রাহ্মণের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। যৎকালে ব্যভিচার পুরুষের পক্ষে বড় একটা নিন্দনীয় বা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং পুরুষোচিত বলিয়া অনেক সময়ে গ্রাহ্য হইত, তৎকালে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। ভারতচন্দ্র তৎকালের সর্ব্ব প্রধান কবি ও সর্ব্বাগ্রগণ্য 'সুরসিক'। রসিকতার ও কবিতার প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। রাজসভার অত্যুজ্জ্বল রত্ন, রাজ-সহচর, রাজানুগৃহীত কৃতী ব্যক্তি। এক দিকে এই। আর এক দিকে তিনি প্রবাস-বাসী দীর্ঘকাল পত্নীর পবিত্র সঙ্গ বিবর্হিত। কিন্তু তথাপি রায়গুণাকর ব্যভিচার-পরায়ণ ছিলেন না, বিলাসীও ছিলেন না। রায়গুণাকরের মত চরিত্র বল এখনকার দিনে দুর্লভ। এখন আমরা অনেকে 'সুরুচির' 'সভ্য সুচিক্কণ সন্দর্ভ' লিখি, কিন্তু চরিত্র হয়ত খুব কদর্য্য। ভারতচন্দ্রের তা ছিল না। তাহার বিপরীত ছিল।

গুণাকরের কাব্যের সুললিত অঙ্গে কুরুচি কুৎসিৎ ক্ষত। সে ক্ষত কাটিয়া সাফ করিবার উপায় নাই। অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ অস্ত্র-চালনা নিপুণ উপযুক্ত ডাক্তারেও বোধ করি, তাহা পারেন না। ক্ষতোপরি অস্ত্র চালাইতে গেলে শরীর কাটা পড়ে, শরীরের সজীবতা ধ্বংশ হয়। অতএব গুণাকরকে সাহিত্য জগতে জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহাকে ক্ষত সমেতই রাখিতে হইবে। ইহা আক্ষেপের বিষয়, কিন্তু অপরিহার্য্য।

রুচি রসের কথা পাড়িয়া কোন কথার পর কোন কথা বলিয়া, কি প্রমাণ করিতে কি সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিয়াছি, তাহার সূক্ষ্ম হিসাব রাখি নাই। এখন "জমা খরচ" কাটিয়া হিসাব মিলাইতেও অপারগ। তবুও একটা কথার 'সংক্ষেপ সমাহার' প্রয়োজন। সে কথাটা 'বড়ু বামুন' চণ্ডীদাসের,—যেটা এই প্রবন্ধের সকলের উচ্চে উদ্ধৃত করিয়াছি। 'বড়ুর' উক্তি বঙ্কিমের বর্ণনায় ব্যাখ্যা করি।

'বড়ু' বলেন শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।

কেন ? তাহা অবশ্য কেবল 'রসিকভক্ত বৃন্দ' জানেন। আমরা যতটুকু জানি, তাহা শুনুন,—

নরেন্দ্র। সূর্য্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। * * সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! * * আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।

(চন্দ্রনাথ বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, নবজীবন, ২৮ সংখ্যা, ২৩০—৩১ পৃষ্ঠা।)

সব রসের সার 'শৃঙ্গার' এই জন্য যে সকল রসই তাহাতে আছে। যাবতীয় রস প্রবাহ 'শৃঙ্গার' সাগরে যাইয়া মিশিয়াছে, একত্রিত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া এক হওয়াই "মধুর রস"। এই জন্য মধুর রসকে মিষ্ট বা মিশ্রিত রস বলে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কপাল কুণ্ডলা।

১।

কাপালিক প্রতিপালিতা কাননবাসিনী কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতা। বালিকাটিকে যেন প্রকৃতি দেবী সযত্নে বুকে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা—প্রকৃতির কন্যা সন্তান, অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যা ও কাপালিকের প্রতিপালিতা। কপালকুণ্ডলায় মাতৃ অংশ প্রবল। প্রকৃতি স্নেহময়ী—কপালকুণ্ডলাও স্নেহময়ী, তবে অদৃষ্টবাদ পূর্ণ দেবতা ভক্তি কপালকুণ্ডলা অধিকারী ঠাকুর ও কাপালিকের নিকট হইতেই পাইয়াছে—প্রকৃতি মাতা তাহাতে প্রতিকূলতা করেন নাই। এই মূল কথাটি মনে রাখিলেই আমরা 'কপালকুণ্ডলা'কে বুঝিতে পারিব।

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্য গ্রন্থকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগে, তাহার কাননচর কুমারী জীবন প্রকটিত হইয়াছে। অন্য

ভাগে, মনুষ্য-লোকে সমাগত নবোঢ়ার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—শেষ ভাগে তাহার সমাজ সংসর্গে যতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহার পরিণতি ও পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি আমাদিগের এ সমাজের ভাষা দ্বারা বর্ণনা করাও অসাধ্য। কপালকুণ্ডলা যে অর্থে যাহা বুঝিত, আমরা সে অর্থে তাহা বুঝি না। কপালকুণ্ডলার অভিধান স্বতন্ত্র এবং আদ্যন্ত এই অভিধান স্বতন্ত্র রাখিতে পারাতেই কবির অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ স্বভাব সন্তান, কই আর ত কোথাও দেখিতে পাই না? দেখাইবে মিরন্দাকে? মিরন্দাও অপূর্ব্ব সৃষ্টি বটে, কিন্তু যে বালিকা কাননাভ্যন্তরে প্রতিপালিতা হইয়াও স্বামীর সহিত খেলিবার সময় 'You play me false my lord' বলিতে পারিল, তাহার সহিত কি আমাদিগের এই 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনা হয়? দেখাইবে শকুন্তলাকে? কই, শকুন্তলায় ত কপালকুণ্ডলাত্ব দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। শকুন্তলা তপস্বিনী বটে, কিন্তু মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই সম্যক অভিজ্ঞ। কপালকুণ্ডলা কবির সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ চরিত্রে, এরূপ সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখিতে পাই না। ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াও আমাদিগের ভয় হইতেছে, পাছে কোন্ অযত্ন বিন্যস্ত কথায় বা বিশেষণে কবির বহুযত্ন নির্ম্মিত সেই অলৌকিক সৃষ্টি নষ্ট করিয়া ফেলি। কপালকুণ্ডলা 'বুঝিতে—এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কপালকুণ্ডলার জগৎ—কপালকুণ্ডলার অভিধান—আয়ত্ত না হইলে, কপালকুণ্ডলা বুঝা যায় না।

কপালকুণ্ডলার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ এক দিন 'সন্ধ্যালোকে সেই গম্ভীর-নাদী সাগরোপকূলে।' যখন আমরা নবকুমারের সহিত অনন্যমনে সময়-পরিমাণ-বোধ-রহিত হইয়া জলধি শোভা সম্ভোগান্তর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীর-নাদী বারিধি তীরে, সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণী সম্বদ্ধ; সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতে-

ছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়।"

সেই মূর্ত্তি সেই কালের সেই প্রকৃতির সহিত যেন এক সুরে গাঁথা। নবকুমার এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। "রমণীও নবকুমারের ন্যায় স্পন্দহীন, অনিমেষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।" নবকুমারের ন্যায় রূপবান যুবক এই কপালকুণ্ডলার প্রথম নয়ন-পথে পড়িল। কপালকুণ্ডলা যে নবকুমারের রূপে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা বুঝিও না—প্রকৃতি শিশুর ন্যায় রূপে আসক্তি আর কাহার আছে? তবে রূপে আসক্তি জনিত যে একটা লজ্জা আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাও, কপালকুণ্ডলায় তাহা ছিল না। তাহা থাকিতে পারে না। একটি সুন্দর ফুল দেখিলেও, কপালকুণ্ডলা যেরূপ তদ্দিকে চাহিয়া থাকে, নবকুমারের প্রতি সে ঠিক সেইরূপেই চাহিয়াছিল। এই দৃষ্টিতেই কবি প্রথমে তাহার প্রকৃতি বুঝাইয়া দিলেন। সেই রূপ, সেই অবেণী সম্বদ্ধ কেশভার, সমস্তই যেন প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত।

স্নেহময়ী কপালকুণ্ডলার আরও একটি পরিচয় এখানে পাইলাম। পরিচয়টি কিছু নূতন নহে। প্রকৃতি প্রতিপালিতা রমণী-হৃদয়ে যে, স্নেহ অপর্য্যাপ্ত থাকিবে, তাহাত না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। কপালকুণ্ডলা মৃদুস্বরে বলিলেন "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" সে ধ্বনি 'যেন হর্ষ বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি রহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগর নাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল।" বেসুরা হৃদয়তন্ত্রীর সুর মিলাইতে এরূপ রমণীর এরূপ কণ্ঠস্বরের এইরূপই ক্ষমতা বটে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার অন্তর্দ্ধানই বা কি সুন্দর! 'এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে (নবকুমার) দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে সম্মুখে কুটীর "নবকুমারের ন্যায় আমরাও ভাবিলাম—একি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়া মাত্র।"

কিরূপ করিয়া যে, কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিলেন—এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। কপালকুণ্ডলার প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা তাহার মাতৃ উপাদান দেখিতে পাই। সেইরূপ করিয়া নবকুমারকে কাহার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করাতে, সেইরূপ করিয়া তীরবৎ বেগে ছুটিয়া যাওয়ায়, সেইরূপ করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে খড়্গহস্তে বন্যদেবীর ন্যায় নবকুমারের নিকট চলিয়া আসাতে, তাহার হৃদয়খানি, তাহার কার্য্যপ্রণালী অতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তৎসম্বন্ধে অধিক বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া এক দেবালয়ে গমন করিল। দেবালয়ের অধিকারী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। কপালকুণ্ডলা নবকুমার সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে নিষেধ করিল। এই স্থলে আমরা কপালকুণ্ডলার কথাগুলি শুনিতে পাইলাম। এরূপ চরিত্র লইয়া খেলা করা সহজ কথা নহে। প্রকৃতির কন্যাকে লোকালয়ের ভাষা কহাইয়া চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা অতি সাবধান, অতি শিল্পনিপুণ কারিকরের কার্য্য। আমরা নিম্নে অধিকারী ও কপালকুণ্ডলার সমগ্র কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দেখাইতে চাহি, আমাদিগের মহাকবি কিরূপ কৌশলে এ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার যেমন হৃদয়খানি, তেমনি কথার প্রণালী, তেমনি কার্য্যাবলী। কপটতার চিহ্নও ইহাতে নাই। অধিকারী বলিলেন "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি, যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?"

এরূপ কথায় অন্য হইলে কিরূপ উত্তর করিত, সহজেই অনুমান করা যায়। "কবে আমি তোমার ভিক্ষা অবহেলা করিয়াছি, যে আজ আমাকে এরূপ কহিতেছ?" এইরূপই কোন একটা কথা বলিতে যাইত। বাক্যরচনায় অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা কিন্তু তাহা বলিল না। সে অধিকারীর কথার উত্তরমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। যেটুকু এখানে তাহার বলার দরকার, কেবলমাত্র সেই টুকুই সে বলিল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর উচ্ছ্বসিত

হৃদয়ের প্রশ্নোত্তরে কুন্দনন্দিনীর মত অতি ছোট খাট একটি জবাব করিল। সে বলিল 'করিব না।' কপালকুণ্ডলা কি ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর করিতে পারে? অধিকারী বলিল। 'আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।' কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিল 'কেন?' অধিকারী বলিল, 'গেলে তোমার রক্ষা নাই।" আবার কপালকুণ্ডলা কপালকুণ্ডলার ন্যায় উত্তর কবিল, "তাহা ত জানি।" অধিকারী বলিল, 'তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?' কপালকুণ্ডলা বলিলেন 'না গিয়া কোথায় যাইব?'। অধিকাবী বলিলেন 'এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তবে যাও।'

"কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী বলিলেন, 'মা কি ভাবিতেছ?'।

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত, এখন যাইতে বল কেন?

ইহা পড়িয়া আমরা কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথাও জানিতে পাবিলাম। অধিকারীর নিকটে কপালকুণ্ডলা সংসাব-সম্বন্ধেও দুই একটি কথা শুনিয়াছে। যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষেব সহিত যাওয়া যে অন্যায়, এ কথা প্রথমে তাহার মনে হয় নাই, অধিকারীই তাহাকে এ জ্ঞানটি প্রদান করিয়াছেন। অধিকারী তাহাব নিকটে পবম পূজ্য,—এ কথা তাহার অন্তরের সহিত ঐক্য না হইলেও, কপালকুণ্ডলা কথাটি ভুলে নাই। আজ অধিকারীকে তদ্বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুনিয়া কপালকুণ্ডলা সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া ছিল। অধিকাবী যথারীতি উত্তব করিয়া কপালকুণ্ডলাকে লইয়া ঘটনার শুভাশুভ পরীক্ষা জন্য দেবী পদে অর্ঘ্য দিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারী এখন তাঁহার বৃদ্ধবয়সোচিত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিলেন "এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীবে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

দেখিলে পাঠক কপালকুণ্ডলাকে? এমন বিমুগ্ধা বালিকা-যুবতী আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

একটি ষোড়শী যুবতীর মুখে ঐ কথা সুন্দর নয় কি? কথাটি শুনিয়া প্রাচীন অধিকারীও বিস্মিত হইয়া ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বিবাহ স্ত্রীলোকের এক মাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে। জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে জানিতেন—তাই তাঁহার উপযোগী উত্তরই প্রদান করিলেন। বলিলেন 'জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।'

"অধিকারী মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন সকলই বুঝিলেন। বলিলেন, "তাহাই ঠিক।"

তবু কাপালিককে ত্যাগ করিয়া যাইতে কপালকুণ্ডলার মন সরিতেছে না। "তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিতেছেন?" অধিকারী এ কথারও উত্তর করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে তাহার সতীত্বনাশের আশঙ্কা বুঝাইয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহাই বা কতদূর বুঝিল জানি না—বোধ হয় ভাল বুঝিল না; অথবা স্বভাবপ্রদত্ত জ্ঞান হইতে ঐটুকু বুঝিল। বুঝুক আর নাই বুঝুক, অধিকারীর কথায় সে স্বীকৃত হইল। বলিল 'বিবাহই হউক।' অধিকারী ঘটকালি করিয়া যথাশাস্ত্র এ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। 'গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।' ছায়াময়ী গোধূলিতে বিবাহ কপালকুণ্ডলারই উপযোগী।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা দেবীর পদে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন—অর্ঘ্য গৃহীত হইল না। "কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভীতি পরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমা-চরণ চ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন," অধিকারী বলিলেন "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। * * * অতএব নিঃশব্দে চল।"

কপালকুণ্ডলা তাহাই করিলেন। অধিকারীর বিদায় গ্রহণকালে কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। "পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ সে বিদায় হইতেছে।"

কপালকুণ্ডলার জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। এখন একবার কপালকুণ্ডলার এই কুমারী জীবনটি পর্য্যালোচনা করা যাউক।

কপালকুণ্ডলা 'বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ ও তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।' এ কথা অধিকারী কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন—আমরা জানি না। যদি কপাল-কুণ্ডলার মুখে শুনিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, কপালকুণ্ডলার তখন এ সকল কথা বুঝিবার বয়স হইয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মুখে, তাহা হইলে কি একদিনও তাহার মাতাপিতার কথা শুনিতাম না? বা মাতাপিতা তাহার অজ্ঞানাবস্থায় মৃত হইয়া থাকিলে, তাহার প্রতিপালিকার কথা শুনিতাম না? যে কপালকুণ্ডলা কাপালিককে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কুণ্ঠিতা হইল, অধিকারীর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে, অশ্রুজলে সিক্তা হইল, স্নেহময়ী সেই কপালকুণ্ডলার কি এরূপ বিস্মৃতি সম্ভবে? আমরা অনুমান করি, অধিকারী ইহা অন্যসূত্রে অবগত হইয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিয়া থাকিবেন। কপালকুণ্ডলা তাই এ কথা জানিতেন; কিন্তু সংসার-চরিত্র অবগত না থাকাতে, সে সকল কথা তাঁহার হৃদয়স্থ হইতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলার সমগ্র চরিত্র এই একটি কথার উপর নির্ভর করে। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে কপালকুণ্ডলা এ সকলই জানিত ও বুঝিত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাহার হৃদয়খানিতে যেন একটি দুঃখের বা সংসার-বৈরাগ্যের স্রোত প্রবাহিত ছিল। নীরব প্রকৃতি কপালকুণ্ডলা তাহা কদাচ ব্যক্ত করিত না—সেগুলি লুক্কায়িত রাখিতে তাহার ক্ষমতাও ছিল। এই দুঃখের ভারে প্রপীড়িত থাকাতেই তাহার পর দুঃখ কাতরতা, তাহার গম্ভীরতা, পরোপ-কারেচ্ছা এত বলবতী হইয়াছিল। সংসারের সুখ, নবকুমারের প্রণয়, এই জন্যই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই কি বঙ্গীয় বিধবা-রমণীর ন্যায় কপালকুণ্ডলা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও আজীবন একটি বার হাসিল না—সেই দুঃখ-পরিমল বক্ষে করিয়া প্রান্তর মধ্যস্থিত কুসুমটির ন্যায় অনাঘ্রাতা হইয়া প্রকৃতির কোলে বিলীন হইল। এইরূপ ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা কপালকুণ্ডলার কুমারীজীবনে যেন কবির এই অভিপ্রায়টি স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাই, আমরা ধরিয়া লইলাম, যে কপালকুণ্ডলা ইহা জানিত না বা বুঝিত না। কপালকুণ্ডলা প্রায় নির্জ্জনেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিহঙ্গিনীর ন্যায় কপালকুণ্ডলা স্বাধীন-ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিত। এইরূপ অবস্থায়, স্বভাবজ সমস্ত গুণই

তাহাতে বিকশিত হইয়াছিল ; হৃদয়ে স্বাধীনভাব, সরলতা, পরদুঃখ-কাতরতা, সার্ব্বভৌমিক স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি সঞ্জাত হইয়াছিল। তাহার উপর, কপালকুণ্ডলা, কাপালিকের নিষ্ঠুরাচরণ প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিত ; স্নেহে তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইত ; অধিকারী স্নেহময় ; তাঁহার উপদেশে—সেই স্নেহ উছলিয়া উঠিত।

এদিকে আশৈশব বনচারিণী বলিয়া কপালকুণ্ডলার স্বাধীনতার আসুরক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে কিছুতেই, আমাদিগের সামাজিক রমণীবৃন্দের ন্যায় সমাজ-নিয়মাধীনা হইয়া একমাত্র স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিল না। এই আসুরক্তি ও সেই স্রোত—অদৃষ্টবাদ ও ভৈরবীভক্তি—যুক্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করিল। এই অঙ্কুরের ফলই তাহার ভবিষজ্জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।——

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিকে নিম্নবর্ণিত অবস্থায় নিম্নবর্ণিত রূপে দেখিতে পাইলাম।

"কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়ন-প্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপাকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল ; মুখ গম্ভীর হইলই অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহে না—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, 'ওকি হইতেছে?' মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।"

এবারে আমরা কপালকুণ্ডলাকে রূপবিমুগ্ধ নবকুমারের চক্ষে দেখিলাম না—রূপাভিমানিনী, জগতে অতুলনীয়া রূপবতী মেহের উন্নিসার প্রতিদ্বন্দ্বিনী.

গর্ব্বিতা মতিবিবির চক্ষে তাহাকে দেখিলাম। এ রূপ দেখিয়া সে অভিমানিনীও মুগ্ধা হইল—আপনার অলঙ্কার রাশি আত্মশরীর হইতে মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইয়া দিল। রূপ বর্ণনা, রূপের প্রভাব বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল। কিন্তু কেবল ইহা দেখাইতে আমরা উপরোদ্ধৃত অংশ উদ্ধৃত করি নাই। ইহাতে দেখাইবার আরও জিনিস আছে। সেটি বিমুগ্ধা মতির মোহ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার সেই অপূর্ব্ব ঈষৎ বিস্মিত ভাব, আর তাহার পর সেইরূপ করিয়া তাঁহার গাত্রে অলঙ্কার রাশি পরাইবার কালে, কপালকুণ্ডলার সেই বহু অর্থযুক্ত তুষ্ণীম্ভাব। এই স্থলে কবির কাব্যকৌশল অতি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। "মতির ভাব দেখিয়া কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।" এই 'কিছু' কথাটির মধ্যে যে কত কথা রহিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আর, যখন মতিবিবি অলঙ্কারগুলি পরাইতে লাগিল, কুন্দপ্রকৃতি কপালকুণ্ডলা কিছুই বলিতে পারিল না—বলার ইচ্ছা হইল না, বলার আবশ্যকতাও বোধ করিল না। কপালকুণ্ডলা স্নেহ চিনিত, কিন্তু অলঙ্কার চিনিত না—কপালকুণ্ডলা অনুভব করিতে পারিত, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা জানিত না। কপালকুণ্ডলা কথার অর্থ বুঝিত—কিন্তু ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। তাই কপালকুণ্ডলা কিছু বলিল না। সে মতির ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল, অথবা হইল না।

এ সব কার্য্যে যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই—নিঃসম্পর্ক ভাবে চুপ করিয়া রহিল। কবির হাতে কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বজায় রহিল।

পথে যাইতে যাইতে কিরূপে যে কপালকুণ্ডলা সেই অলঙ্কার রাশি ভিক্ষুককে বিতরণ করিল, তাহা পাঠকবর্গ এস্থলে একবার স্মরণ করুন। দেখিতে পাইবেন, কপালকুণ্ডলা কেন এখানে অবিচলিত ছিল। 'গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?' 'আর ভিক্ষুক দৌড়িল'কেন' এই দুইটি কথায় তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। অলঙ্কারের সহিত মানুষের মনের যে কি সম্বন্ধ, তাহা কপালকুণ্ডলা জানিবে কিরূপে?

এখন আবার আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নবকুমারের গৃহে সদ্যাগতা কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতে চাহি। কপালকুণ্ডলা বেশি কথা বলে নাই—কিন্তু সে যে কথাগুলি বলিয়াছে, তাহা আমরা উদ্ধৃত না করিয়াই থাকিতে পারিতেছি না।

কপালকুণ্ডলা এখন মৃণ্ময়ী নামে অভিহিত হন, এই মৃণ্ময়ী ও তাঁহার

ভ্রাতৃজায়া শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের বাড়ীতে প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া কথোপ-কথন করিতেছে।

"শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?"

"মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া (কপালকুণ্ডলাকে আমরা আর আর কখন হাসিতে দেখি নাই) শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া হইলেন।

"শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে ?"

"মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

'শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

"মৃ। কেন থাকিব না ?

"শ্যা। কেন দেখিবি ? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান ?

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'না'।

"শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

"মৃ। তাতে কি ?

"শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

"মৃ। সে কি ?

"শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সে পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,—

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস, খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
"কপালে সিঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার, কানে তোর দিব যোড়াদুল॥
"কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া, রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
"সোণার পুতলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল, চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?

"শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?

"মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

"শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল, প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, 'ফুলের কি? তাহা বলিতে পারি না। কখন ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।' শ্যামা কুলীনপত্নী*।

* *

'মৃণ্ময়ী কথার কোন উত্তর দিলেন না।

"শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা—তাই যদি না হইল;—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?

"মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

"শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে মৃণ্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, 'এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?'

"মৃ। উপায় নাই।

"শ্যা। তবে করিবে কি?

"মৃ। অধিকারী কহিতেন, 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

"শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?'

"মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।'

"শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্ম শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন, যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাতদেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।'

"মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

এই উদ্ধৃত অংশে কপালকুণ্ডলার সেই সরল প্রকৃতি—সংসার-জ্ঞান-শূন্যতা, স্বাধীনভাবে বনবিচরণেচ্ছা, পাষাণে অঙ্কিত রেখাবলীর ন্যায় তাহার চিত্ত-বদ্ধ অদৃষ্টবাদ—যেন মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে। মৃণ্ময়ী তাহার পূর্ব্ব-জীবন কিছু মাত্র বিস্মৃত হইতে পারে নাই। হিজলি পরিত্যাগ কালে কালিকার পাদপদ্ম হইতে সেই ত্রিপত্রচ্যুতি কপালকুণ্ডলার হৃদয়খানি যুড়িয়া একটি গাঢ় কালা ছায়া অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বুকভরা কেবল সেই কথা। কাপালিক ও অধিকারী প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার পক্ষে তাহা ভুলিবার কথাও নহে। কপালকুণ্ডলা বুঝি সর্ব্বদাই সেই কথা ভাবিত। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করিতে কই, তাহাকে ত কখন শুনি নাই? কপালকুণ্ডলার সে স্বভাব নহে। বিশেষ দুঃখ প্রকাশের ভাষাও তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল না। অতিরঞ্জিত বাক্যাবলীদ্বারা ভিন্ন এ জগতে কাহার দুঃখ কে প্রকাশ করিয়া থাকে? কপালকুণ্ডলা তাহা পারিত না। আর বোধ হয় কপালকুণ্ডলাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিতে 'তাহাতে সুখ!' তাই কপালকুণ্ডলা সেই ঘোর, অতি ঘোর মসীবর্ণ দুঃখের রাশি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই হউক, বা তাহার স্বভাব গুণেই হউক, হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় আলি-ঙ্গনে নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার শেষের কথা গুলি যেন উজ্জ্বলা-ক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সংসারজ্ঞানশূন্যতা তাহার সেই 'না' 'তাতে কি' 'সে কি?' এই ক্ষুদ্র কথাগুলিতে যেন সহস্রমুখ হইয়া প্রকাশ করি-তেছে। "মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?" এই কথাটি অতি গভীর ভাব ব্যঞ্জক। এটি যেন কপালকুণ্ডলার মন্থিত চিন্তার্ণবের একটি অতি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস—বাস্তবিকই ত। মনে কর সকলই হইল, তাহা হইলেই বা তাহার কি সুখ? যখন শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ'—মৃণ্ময়ী আবার তেমনই ভাবে উত্তর করিল। 'লোকের দেখে সুখ; ফুলের কি?' কপালকুণ্ডলা যদি আমা-দিগের মতন হইত, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা বুঝিতে পারিত। লোকের যে ফুটন্ত ফুল দেখিয়া সুখ জন্মে, তাহা জানিতে পারিলে, ফুলেরও সুখ হয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা পদ্মাবতী নহে—এ কথা সে বুঝিত না।

শ্যামাসুন্দরী যখন কপালকুণ্ডলায় সুখ কি, জানিতে চাহিলেন, তিনি বলিলেন। 'বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

প্রকৃতি-পালিতা কানন-বিহারিণী বিহঙ্গিনীর মতই কথা বটে। কথাটির সরলতাই বা কি বিস্ময়কর!

গোপীগীতি।

শ্যাম দরশনে তোরা কে যাবিলো আয়,
নিকুঞ্জে বিরাজে আজি বাঁকা শ্যাম রায়।

(শ্যামের) শিরেতে মোহন চূড়া,
পিন্ধন সুপীত ধড়া,
করে বাঁশী মনোহরা বাজিছে অধরে,
চরণে নূপুর চারু রুণু রুণু করে।

গলে দোলে বনমালা,
রূপেতে কানন আলা,
বাঁশীরবে ব্রজবালা আকুলিত মন,
শ্যামেরে ভেটিতে চলে নিকুঞ্জ কানন।

(আহা) কিবা সে বাঁশীর গান,
শ্রবণে অবশ প্রাণ,
যমুনা বহে উজান, বাঁশীর কারণ।
পড়েছে অনঙ্গ রতি শ্যামেরি চরণ।

রাধা বিনোদিনী বামে
বসেছে বঙ্কিম ঠামে,
শ্যাম-দরশন-কামে অবশ পরাণ,
দেহ মন প্রাণ রাধা শ্যামে করে দান।

অই যে বাজে বাঁশরী,
কেমনে ধৈরয ধরি,
মরি মরি, হরি হরি, কি করিব হায়!
চেয়ে দেখ ব্রজবালা যামিনী যে যায়।

(আহা) বৈরাগ্য বাঁশরী বাজে,
সদাই হৃদয় মাঝে,
কি কাজ সংসার কাজে, কৃষ্ণকাছে যাই,
প্রাণের বেদনা যত শ্রীকৃষ্ণে জানাই।

কুঞ্জতীর্থে চল সবে,
হরি সনে দেখা হবে,
আয়ু রাতি পোহাইবে, কেন রে হেলায়।
সাজ গো সজনি বৃন্দ সাজ গো ত্বরায়।

সংযমাদি অলঙ্কার
পর অঙ্গে যে যাহার,
বিশ্বাস-অঞ্জন আর পর লো নয়নে।
রাধকৃষ্ণ প্রেম-গীতি গাও সযতনে।

আয়, সব সহচরি,
হৃদি-সাজি যত্ন করি,
ভকতি কুসুমে ভরি, চল লো সুছাঁদে,
ভুলাতে পারিব ফুলে সেই কালাচাঁদে।

ধর্ম্মের-পশরা শিরে,
ভ'রে কৃষ্ণনাম—ক্ষীরে
চল লো যমুনা তীরে হরি দরশনে,
প্রেমের যমুনা সদা বহে সে চরণে।

মায়া হিংসা দুঃস্বনার,
জটিলা কুটিলা প্রায়,
বিদলিব বামপায়, কিবা ভয় মনে ?
সংসাব-আয়ান ঘোষে না হেরিব নয়নে।

সে যে নপুংসক জাতি,
ত্যজিলে যাবে না জাতি,
শ্যাম নামে মোবা মাতি, সে বাঙ্কিবে কেমনে।
বৈবাগ্য-বাঁশবী-বব শুনেছি যে শ্রবণে।

প্রতিবেশী বিপু ছয়,
তা'দেব না কবি ভয়,
যদ্যপি কলঙ্ক হয়, তাহে কেন ডবিব ?
শ্যাম কলঙ্কিনী নাম সুখে শিবে ধবিব।

সাধনাব অন্ধকাব—
ভয় নাহি কর' তা'ব
হৃদাকাশে জ্যোৎস্না ভাব, হবি অনুবাগ।
শ্রীকৃষ্ণ দেখাবে পথ—বনভূমি ভাগ।

ক্ষমাধৃতি সহচরী,
লও সবে সঙ্গে করি,
শ্রীদাম সুবল মরি,—শমদম দু'জনে,
প্রেম ভক্তি মতী-গোপী রক্ষিবে গো যতনে।

কোথা হে মুবলী-ধাবি,
মধুসূদন হে কংসারি !
রসিক রাসবিহারি বাধিকাবমণ !
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপিকা জীবন !

কোথা হে বৈকুণ্ঠ-পতি,
অগতি জনের গতি,
ওহে নাথ সংহতি বৈকুণ্ঠ ভুবন !
প্রাণনাথ হৃদিনাথ জীবন-জীবন !

বল সবে হরি হরি,
হরি বলে যাত্রা করি,
হরি দেখাবেন হরি—গোপিকা বল্লভ
হৃদে লয়ে ধন্যা হয়ে যাপিব জীবন।

পানিপতের যুদ্ধ।

অবতরণিকা।

কুরুক্ষেত্র একপক্ষে হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান, অপর পক্ষে হিন্দু-গৌরবের সমাধি-ক্ষেত্র। মহারাজ কুরু মহাযজ্ঞ সমাধান করিয়া ঐ পুণ্য তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন. তাঁহার বংশ-তিলকেরা ঐখানে জ্ঞাতি-বিরোধ উপলক্ষে মহা সমরাহবে ভারত রাজশ্রী আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভারতের ভবিষ্যৎ দাসত্ব শৃঙ্খলের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধেই ভারতের গৌরবের অবসান। কুরুক্ষেত্র—গঙ্গা সরস্বতীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। আধুনিক কুরুক্ষেত্র তীর্থ অম্বালা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বিজয়ী দুরাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্বের ইহা সাক্ষী স্বরূপ। কিন্তু পূর্ব্বকালে কুরুক্ষেত্রের সীমা আরও অধিক বিস্তৃত ছিল। অম্বালা পানিপত প্রভৃতি নগর পূর্ব্বকালের কুরুক্ষেত্রের সীমা মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। কিম্বদন্তি আছে যে, অম্বা কুন্তীদেবীর বাসস্থান নিরূপিত হওয়ায় অম্বালয় (অপভ্রংশে অম্বালা) নগর স্থাপিত হয়। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে কুরুক্ষেত্রের সীমা প্রায় হরিদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পরে ঐ ক্ষেত্রের নানা স্থানে বসতি হওয়াতে এক্ষণে গ্রাম নগরাদি উদ্ভূত হইয়াছে। পানিপত নগর অম্বালা ও দিল্লির প্রায় মধ্যে অবস্থিত।

দিল্লি হইতে প্রায ৪০ ক্রোশ দূবে প্রাচীর বেষ্টিত ঐ নগর বারম্বাব মহা হত্যাকাণ্ডেব সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ভাবতেব অদৃষ্ট পরীক্ষক ৪টি প্রধান যুদ্ধ পানিপতেব বহিঃস্থিত কুরুক্ষেত্রে সজ্ঘটিত হয়। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে এই দারুণ ক্ষেত্রেই মহারাজ পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও বন্ধনের সহিত ভাবত-স্বাধীনতা চিবকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যবন পদাশ্রিত হইয়াছে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবব শাহ এই ক্ষেত্রে দিল্লীশ্বব ইব্রাহিম লোদিকে পরাজয কবিয়া মোগল সম্রাজ্য স্থাপন কবেন। ইহার প্রায ৩০ বৎসর পবে ঐ ক্ষেত্রে বালক আকবর শাহেব সেনাপতি বৈবাম খাঁ আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হেমকে ঘোব রণে পবাজয় পূর্ব্বক ঐ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢরূপে স্থাপন এবং হিন্দুব ও ভাবতবাসী পাঠানগণেব আশা চিবোন্মূলিত কবিয়াছিলেন। মোগল সম্রাজ্যের গৌববালোকে উত্তর ভাবতবর্ষে প্রাচীন হিন্দু গৌববের চিহ্ন মাত্র, অবশিষ্ট রহিল না। কেবল মাত্র বাজপুতানায় কয়েকজন ক্ষত্রিয রাজপুরুয মোগল সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে চিব-নির্ব্বাণেব পূর্ব্বে হিন্দু প্রদীপ একবাব উজ্জল ভাবে জ্বলিয়া উঠিযাছিল। মহারাষ্ট্রীযদিগেব জাতীয উত্থানের মহাগুরু শিবজী হিন্দুধর্ম্ম নিপীড়ক নৃশংস ঔবঙ্গজেবের সময়েই অভ্যুদিত হযেন। তাঁহার পৌত্র সাহু রাযেব রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব পেশবা বাজীবাও অগ্রসারী কল্কী অবতার স্বরূপ উত্থিত হইযা মুসলমানদিগকে বিপর্য্যস্ত কবিযা তুলিযাছিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে অকালে বাজীবাওযেব মৃত্যু না হইলে আধুনিক ভারতেতিহাস অন্যরূপে সঙ্গঠিত হইত সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বলজী রাও পেশবা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু রাজকার্য্যে প্রভূত দক্ষতা ও কার্য্যকুশলতা গুণে ভূষিত হইয়াও বণানভিজ্ঞতা হেতু বিজয়ী পিতার সম্ভ্রম সম্যক রক্ষা কবিতে পাবেন নাই। মহারাষ্ট্র প্রভুত্ব অধিকতর বিস্তৃত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সিন্ধিযা, হুলকব, গৈকোয়াড়, ভোঁসলা প্রভৃতি সেনাপতিগণ স্ব স্ব প্রধান হইতে লাগিল, এবং তাহাদের পবস্পরেব মধ্যে দ্বেষ হিংসা উপস্থিত হওযায অচিবাৎ ঐ জাতীয় প্রভুত্বব পতন লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। যাহা হোক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাবাষ্ট্র জাতীয় সমিতি বাহ্যত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য এখন ইহাঁদেব সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু উত্তব ভাবতে তখন পর্য্যন্ত ইহাঁবা

সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সেনাপতি দস্যুর ন্যায় আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত মাত্র, কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের মৃত্যু হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্য একবারে মস্তক শূন্য হইল। এই সময়ে শীকেরা পঞ্জাবে অভ্যুত্থান করিয়া মাতৃভূমি মুসলমানগণের দুঃশাসন হইতে মুক্ত করিবার যত্ন করিতেছিল। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গুরুগোবিন্দ সিংহ ঔরঙ্গজেবের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া শীকদিগকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় শোণিত দানে মাতৃভূমির দাসত্ব কলঙ্ক প্রক্ষালনের আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহামন্ত্র এক্ষণে সফলোন্মুখ। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সুযোগ সমাগম বুঝিয়া উত্তর ভারতাধিকারে যত্ন করিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানেরা একদিকে মহারাষ্ট্র অপরদিকে শীক এই দুই যন্ত্রপাটের মধ্যে নিষ্পেশিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। বোধ হইল, বুঝি বহুকাল দণ্ডভোগস্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের পর, দেবতারা পুনরায় হিন্দু সন্তানের প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে যবন-শৃঙ্খল,—বিধাতার নির্ব্বন্ধ,—কে খণ্ডাইবে ?। পশ্চিম আকাশে সহসা ধূমকেতুর আবির্ভাব হওয়াতে হিন্দুদিগের সুখস্বপ্ন একেবারে চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল। কান্দাহার নিবাসী আহমদ শাহ, আবদালি বা দুরানী নামক জাতীয় সম্প্রদায়ের সামান্য অধিনায়ক মাত্র ছিলেন, কেবল বুদ্ধি ও রণকৌশলে সমস্ত কাবুল দেশের এক মাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাটদিগের দুর্ব্বলতা দৃষ্টে তাঁহার স্বভাবতই ভারতের উপর লোভ জন্মিল। ১৭৪৮ সালে তিনি সুযোগ পাইয়া পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৭৫৬ সালে দিল্লীশ্বর আলমগীরের অবাধ্য মন্ত্রী গাজিউদ্দীন তৎপ্রদেশ পুনর্জ্জয় করিবার মানসে আক্রমণ করিলে, আহমদ শাহ দুরানী ক্রোধান্ধ হইয়া প্রত্যাগত হইলে, গাজিউদ্দীন বিনা যুদ্ধেই তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু দুরানী শাহ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া নগর লুণ্ঠন এবং বাদশাহের নষ্টাবশিষ্ট ধন সম্পত্তি অপহরণ করিলেন। মথুরা নগর পর্য্যন্তও লুঠিত হইল। পরে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী সাহরণপুর অঞ্চলের রোহিলা জায়গীর-দার নজীবুদ্দৌলা নামক একজন কর্ম্মদক্ষ বীরপুরুষকে নাম মাত্র বাদশাহের উজীর নিযুক্ত করিয়া, ভারত শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি পুত্র

তৈমুর শাহকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই সময়ে পেশবা বালজীবাওর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব রাও (বা রঘুনাথ বাও) দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মালব প্রদেশে মহারাষ্ট্র পতাকা রোপণ করিতেছিলেন; ক্ষমতা লোলুপ গাজিউদ্দীন তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিল, এবং তৎপ্রেরিত মহারাষ্ট্র সৈনার সাহায্যে নজীবদ্দৌলাকে দূরীকৃত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া বসিল। এ দিকে পঞ্জাব প্রদেশে দুরানী শাহের বিপক্ষ আদিলাবেগ নামক দিল্লীশ্বরের একজন পূর্ব্ব কর্ম্মচারী রাঘব রাওকে তৎপ্রদেশ জয় করিবার জন্য আহ্বান করিল। রাঘব আনন্দে অগ্রসর হইয়া সহজেই তৈমুর শাহকে দূরীকৃত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন। বহুশতাব্দী পরে লাহোরে আবার হিন্দু শাসনকর্ত্তা স্থাপিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় জয় পতাকা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সদর্পে উড়িতে লাগিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলোর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইল। উত্তর ভারতবাসী মুসলমান সর্দ্দারেরা এতদিন পরস্পর কলহ ও আত্মবিচ্ছেদে নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সাধারণ শত্রু হিন্দুর প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিয়া, অসহ্য বোধে, একবার মাত্র মনোবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া গাঢ় একতাবন্ধনে বলসঞ্চয় পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র বলোচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইল। এই একতা সংস্থাপনের একমাত্র ভিত্তি নজীবুদ্দৌলার অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্য কুশলতা। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পঞ্জাবের পশ্চিম সীমাস্থ পর্ব্বতবাসী বহুসংখ্যক রোহিলা নামক পাঠানেরা, সপরিবারে আসিয়া বিশাল রোহিলখণ্ডে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। উপযুক্ত সর্দ্দারের দ্বারা নীত হওয়ায় অতি অল্পকাল মধ্যেই রোহিলারা প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে বেরেলি প্রদেশের জায়গীরদার হাফিজ রহমত খাঁ এবং ফরেক্কাবাদের জায়গীরদার আহমদ খাঁ বঙ্গশ প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়াছিল। নজীবুদ্দৌলা এই সমস্ত মুসলমান সর্দ্দার এবং লক্ষ্মৌ অধিপতি নবাব সুজাউদ্দৌলাকে,—নানা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক দুরানী শাহের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুর গৌরব উচ্ছেদের জন্য একত্র সমবেত করিয়াছিল। নজীবের পক্ষে ইহা সামান্য সুখ্যাতি নহে। ফলত নজীবুদ্দৌলাই শেষ হিন্দু অভ্যুত্থানের কাল স্বরূপ। কেবল মুসলমানদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ও অবাধ্যতা বশত তৎসম্পাদিত একতা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। পানিপত

ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র গৌরব অস্তমিত হইলে, মুসলমানেরা ঐ একতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হওয়ায়, শীঘ্রই পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিয়া সকলেই অল্পকাল মধ্যে য়ুরোপীয় বণিকদিগের পদানত হইল। কিন্তু নজীব সে দোষে দোষী নহে। সেই ঘোর স্বার্থান্বেষণ সময়ে এক মাত্র নজীবুদ্দৌলা একতার পরম হিতকর ফল উপলব্ধি করিয়া হিন্দু প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করিয়া অল্পদিনের জন্য মুসলমান নামের গৌরব রক্ষা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত সময়ে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আহমদ শাহ দুরানী কাবুল হইতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই রাঘব রাও দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে দত্তজী সিন্ধিয়া রক্ষক ছিলেন। নজীবের সহিত দত্তজীর অনেক যুদ্ধ হইল, অবশেষে দত্তজী দুরানী শাহ কর্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রণে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধ অবশেষে পাণিপত ক্ষেত্রে অবসান হইল। দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় এই যুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধ। মুসলমানদিগের পক্ষে একজন মাত্রও হিন্দু সেনাপতি দৃষ্টিগোচর হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে একজন মাত্র মুসলমান সেনাপতি ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র, জাতীয়ভাবের তাহাতে লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না।

ইতিহাস লেখকেরা প্রায় অতীত বিষয়ের প্রসঙ্গ যথাশ্রুতি মত লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। স্বচক্ষে ঘটনা দর্শন পূর্ব্বক বিবৃত করা, প্রায় অধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু এই পানিপতের যুদ্ধবৃত্তান্ত সেরূপ নহে। নবাব সুজা-উদ্দৌলার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া যাবদীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম পণ্ডিত কাশীরাজ বা কাশী-রাও। তিনি মহারাষ্ট্রবাসী এবং এই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সন্ধি বিগ্রহে বিশিষ্টরূপে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং তল্লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ বিশ্বাসের যোগ্য। ঐ প্রবন্ধ পারস্য ভাষায় লিখিত এবং এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। ১৭৯৯ সালে Asiatic Society' Researches. Vol. III. গ্রন্থে উহার ভাবাংশ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, এবং প্রাপ্য হইলেও সকলের উহা পাঠ করিবার সুবিধা নাই। এ কারণ উহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। ভরসা করি পাঠকের মনোরঞ্জন হইতে পারে।

পানিপতের যুদ্ধ।

(পণ্ডিত কাশীরাজ প্রণীত পারস্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত)

পণ্ডিত প্রধান বলজীরাও দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কি রাজা, কি প্রজা, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান বিচক্ষণতা ও সৌভাগ্যের সৌরভ বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি স্বভাবত বিলাসী ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে কখন প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন হইতে হয় নাই। যত দিন তাঁহার পরিবারবর্গ মধ্যে মনোমিল বিদ্যমান ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও ভাওয়ের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঐ সময় মহারাষ্ট্র রাজসংসারে রামচন্দ্র সিন্ধবী নামক জনৈক অসাধারণ কার্য্যক্ষম প্রতিভাশালী বিজ্ঞ কর্ম্মচারী বর্ত্তমান ছিলেন। সদাশিব তাঁহার নিকট রাজ্যশাসন, রাজকোষের সুব্যবস্থা স্থাপন ও সৈন্য পরিচালন প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্যপ্রণালী অতি যত্নের সহিত সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যূষ হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহে তাঁহার বিরাম ছিল না। তাঁহার অভিজ্ঞতা, কার্য্যকুশলতা, এবং বিজ্ঞতা এরূপ তীক্ষ্ণ প্রতিভান্বিত ছিল, যে কেহই তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে পারিত না। এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার দক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকিত। দাক্ষিণাত্যের এবং অন্যান্য প্রদেশের অনেকানেক প্রয়োজনীয় ব্যাপার তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

১৭৫৮ সালে হিন্দুস্থান * জয় করিবার অভিপ্রায়ে এক মহতী সেনা সংগৃহীত হইল। রঘুনাথ রাও সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। মলহর রাও হুলকার, জঙ্কজী সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সরদারগণ দলবল সহিত রঘুনাথের সহিত মিলিত হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা পরম

---

* ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত—হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্য। নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যাগিরির উত্তরাংশ হিন্দুস্থান পদবাচ্য।

উৎসাহের সহিত হিন্দুস্থানে দিগ্বিজয় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বত্রই বিনা আয়াসে জয়লাভ করিয়া বিজিত প্রদেশ সকল মহারাষ্ট্র রাজ্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা লাহোর ও শাদোলার নিকট পর্য্যন্ত পৌছিলেন। এই খানে তাঁহাদের, আহম্মদ শাহ দুরানীর নিযুক্ত জেহান খাঁ প্রমুখ মুসলমান সেনাপতিগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইল। মুসলমান সেনাপতিগণ আটকের অপর পার্শ্বে পলাইতে বাধ্য হইল। পঞ্জাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু অল্প দিন পরে রঘুনাথ রাও সৈনিকদিগের বেতন অনেক বাকি পড়িয়াছে দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন।

রঘুনাথ রাও প্রত্যাগমন করিলে সদাশিব রাও এই দিগ্বিজয়ের হিসাব নিকাশে জানিতে পারিলেন, যে রাজকর পিশকস্ প্রভৃতি আদায়ের অপেক্ষা ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে ৮০ লক্ষ টাকার অধিক সৈনিকদিগের বেতনে বাকী পড়িয়াছে। ঐ হিসাব নিকাশ লইয়া সদাশিব ও রঘুনাথ রাওয়ের মধ্যে বচসা উপস্থিত হইল। সদাশিব রঘুনাথকে অনেক কটূক্তি করিলেন, 'রাজকোষে ধনের পরিবর্ত্তে ঋণ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নিজের উত্তম সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছ'—ইত্যাদি কথা বলিয়া উপহাসও করিলেন। রঘুনাথ উত্তর করিলেন, 'বৃথা কটূক্তির প্রয়োজন কি? আগামীবারে স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সাধ্যমত কৌশল প্রদর্শন করিবেন এবং কত লাভ করিতে পারেন দেখা যাইবে।' যাহা হৌক, বালজী রাও মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ কথঞ্চিৎ মিটাইয়া দিলেন। ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বালক ও অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলেন।

পর বৎসর হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা পুনরায় স্থিরীকৃত হইলে, রঘুনাথ সেনাপতিত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক বলিলেন, 'যাহারা রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহারাই এ কার্য্যে ব্রতী হৌক।' সদাশিব বিরক্ত হইলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বয়ংই যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন না, মহারাষ্ট্রীয় পুরাতন প্রথানুসারে বালজী রাওয়ের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র বিশ্বাস রাওকে নাম মাত্র সেনাপতি পদে বরণ করিয়া, সঙ্গে লইলেন। অনতিবিলম্বে প্রভূত মহারাষ্ট্রীয় সেনা বহির্গত হইল। কিন্তু নর্ম্মদা পার হওয়ার পর সদাশিবের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি এখন হইতে আপনার প্রভুত্ব এরূপ নূতন ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে যাঁহাতে সকলেরই বিরক্তি উৎপন্ন হইল। সৈন্য ব্যয় ও রাজকর সংগ্রহাদির

হিসাব পবিদর্শনে এবং সমুদয় রাজকার্য্যেই তিনি আত্মম্ভবিতা ও অবিমৃশ্য-কারিতা দেখাইতে লাগিলেন। মলহর রাও প্রভৃতি সরদারগণের হিন্দুস্থান সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞতা থাকিলেও এবং তৎপ্রদেশস্থ প্রজালোকেব ঐ সকল সবদারগণেব প্রতি বিশ্বাস, ভয় ও ভক্তি থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে মন্ত্রণা কার্য্য সমিতি হইতে অপসৃত কবিয়া দিলেন। ফলত কেবল নিজেব মন্ত্রণামত কার্য্য কবিতে লাগিলেন।

সেরঙ্গা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সদাশিব হিন্দুস্থানেব সমস্ত প্রধান প্রধান সবদারগণেব নিকট দূত প্রেরণ কবিলেন, এবং হিন্দুস্থান প্রদেশেব শাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা কবিবার অভিপ্রায়ে তাহাদেব বন্ধুতা ও সহকারিতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে নিমন্ত্রণ কবিলেন। অন্যান্য বাজার ন্যায় অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাব নিকটও একজন দূত মহামূল্য বস্ত্র ও রত্নাদি উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইয়া নিবেদন কবিল যে, যখন সদাশিব রাও তাঁহাব নিকটবর্ত্তী হইবেন, তিনি সুজাউদ্দৌলাকে আনয়ন করিবার জন্য নারুশঙ্করকে প্রেরণ কবিবেন। নবাব মিষ্টবাক্যে প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন; কিন্তু মনে মনে স্থিব কবিষা রাখিলেন যে, যতদিন উভয় পক্ষের জয় পবাজয় অনিশ্চিত ততদিন কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। পরে ফলদৃষ্টে স্বার্থ বুঝিয়া বিজয়ী পক্ষ অবলম্বন কবিবেন।

এদিকে আহমদ শাহ দুবানী জওজী সিন্ধিযাকে বণে পবাজয় কবিয়া অনুপ সহব জেলায গঙ্গাতীবে শিবিব স্থাপন কবিয়া ছিলেন। স্বীয সেনাপতি জেহান্ খাঁ মহাবাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পবাজিত ও দূবীভূত হওয়ায় তিনি প্রতিহিংসা সাধন মানসে ভাবত আক্রমণ করিয়া ছিলেন। এইখানে তিনি নজীব উদ্দৌলা নামক বোহিলা সর্দ্দাবেব সহিত মিলিত হইলেন। জওজী সিন্ধিয়ার সহিত নজীব উদ্দৌলাব সংগ্রাম সংঘটন হয়। ঐ যুদ্ধে জওজী নিহত হইলে, নজীব উদ্দৌলা মহাবাষ্ট্রীয়গণের প্রতিহিংসা ভয়ে ভীত হইয়া দুর্রানী শাহেব সহিত কায়মনোবাক্যে মিলিত হইলেন, এবং নিজকোষ হইতে দুবানী সৈন্যেব অতিবিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহেব ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভারতবর্ষ জয়েব জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দুরাণী শাহ হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। নজীব উদ্দৌলার যুদ্ধবিদ্যা ও কার্য্য-দক্ষতা বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি ছিল। ফরক্কাবাদের বোহিলা সরদার ও পাঠান অধিবাসীগণ তাঁহাব অনুবোধে দুরানী শাহের সহিত মিলিত হইল।

সদাশিব, দাক্ষিণাত্যের সৈন্য সমূহ ছাড়া মালব, ঝাঁসী প্রভৃতি স্থান হইতে যথা সম্ভব সহকারী সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। নারুশঙ্কর প্রভৃতি এক একজন আমিনকে ঐ সহকারী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া ছিলেন। চম্বল সহরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি জাঠদিগের সর্দ্দার রাজা সূর্য্যমলের নিকট মিলন প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সূর্য্যমল প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন যে, এতাবৎকাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহার সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্য মলহর রাও এবং সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং যদি উপস্থিত সময়েও ঐ সর্দ্দার দ্বয় মধ্যবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মিলিবার কোন আপত্তি নাই। কাযেই সদাশিবকে উক্ত সর্দ্দার দ্বয়ের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিতে হইল। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে সূর্য্যমল আগ্রানগরে ভাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কি পদ্ধতিতে যুদ্ধ নির্ব্বাহ করা উচিত, এই বিষয়ে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। সূর্য্যমল বলিলেন "মহাশয়, আপনারা হিন্দুস্থানের প্রভু, আপনাদের বল সম্বল সকলই অপরিমিত, আমি সামান্য জমীদার (কৃষক) মাত্র, তথাপি আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে পরামর্শ দিব। যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিতেছি তাহাতে যোদ্ধাদিগের স্ত্রী পরিবারগণ এবং আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত দ্রব্য সামগ্রী ও বড় ভারী ভারী তোপ সকল সঙ্গে থাকিলে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।"

"আপনাদের যোদ্ধাগণ হিন্দুস্থানের যোদ্ধৃবর্গ অপেক্ষা লঘু হস্ত সত্য কিন্তু দুরানী যোদ্ধাগণ আপনাদের অপেক্ষাও লঘু হস্ত। অতএব অতিরিক্ত দ্রব্য সামগ্রী, লোক জন প্রভৃতি চম্বলনদের অপর পার্শ্বে আপনাদের নিজ অধিকার ঝাঁসী বা গোয়ালিয়রে সুরক্ষিত করিয়া যতদূর সম্ভব খোলসা হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া পরামর্শ সিদ্ধ। অথবা আমার অধিকারস্থ দিগ-কুণ্ডের বা ভরতপুর প্রভৃতি বৃহদ্দুর্গের মধ্যে যে কোন একটি দুর্গ আপনাদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। সেই স্থানে অতিরিক্ত দ্রব্য সামাগ্রী ও লোক জন রক্ষা করুন। আমি আমার সমগ্র সৈন্যের সহিত আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইতেছি। এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলে, আপনার পশ্চাৎ-দেশ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, কিরূপ ফল হয় তাহা অনুভব করিতে পারিবেন. এবং সৈন্যদিগের প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে কোন

প্রকার আশঙ্কা থাকিবে না। শত্রুগণ কখনই এতদুর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না, আর হইলেই বা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহারা সকলেই ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, কিছুই করিতে পারিবে না।”

মলহর রাও প্রভৃতি সর্দ্দারগণ সকলেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন “বড় বড় তোপ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা সম্রাটের পক্ষেই সাজে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্যগণ লুণ্ঠনোপজীবী, তাহাদের চিরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। আর হিন্দুস্থান তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি নহে অতএব ঘটনাক্রমে অকৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনও কিছু তাহাদের পক্ষে লজ্জাকর নহে। সূর্য্যমলের পরামর্শ নিতান্ত যুক্তি যুক্ত, কেন না শত্রুগণের কোন একটা স্থির দৃঢ় আবাস ভূমি নাই, সুতরাং এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হইবে। অতএব বর্ষা সমাগম পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কাল কাটানই শ্রেয়ঃ। তৎকালে দুরানী সৈন্যগণ এদেশে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, নিশ্চয় স্বদেশাভিমুখে পলান করিবে।”

নিখিল মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণই এই মতের পোষকতা করিল কিন্তু সদাশিব স্বীয় সৈন্যগণের সাহস ও দক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন “আমা অপেক্ষা কত শত নিকৃষ্ট পুরুষেরা দিগ্বিজয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আমি তাহাদের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়াও কেবল আত্মরক্ষায় তৎপর হইয়া কাপুরুষ-সুলভ নিন্দা ভাজন হইতে পারিব না। বার্দ্ধক্য বশত মলহর রাওর বীর্য্য লুপ্ত হইয়াছে, সূর্য্যমল কৃষক বৈত নয়, তাহার পরামর্শ তৎসদৃশ বুদ্ধি ও কৌলীন্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী, তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর লোকের গ্রাহ্য নহে।”

সূর্য্যমল শিবির পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে না পারে এজন্য সদাশিব এক দল সৈন্য প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত রাখিলেন। ইহাতে সূর্য্যমল ভীত হইল ; ভরসার মধ্যে প্রধান সর্দ্দারগণ তাঁহার সহিত এক মতাবলম্বী। মলহর রাও তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, ব্যস্ত হইয়া কোন কার্য্য করিবার আবশ্যকতা নাই, আপাতত ভাওকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিবিরে থাকা বিধেয়, পরে অবসর ও অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিলেই চলিবে।

অতঃপর সদাশিব দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিয়াই বাদশাহের আবাস দুর্গ বেষ্টন পূর্ব্বক তোপ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দুরানী শাহের প্রধান মন্ত্রী ও শাহবুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র

য়াকুরালি খাঁ দুর্গ মধ্যে সেনাপতি ছিল। সদাশিব তাহাকে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি পাঠাইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধ নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, য়াকুব আলি শাহবুন্নিব পরামর্শ লইয়া এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে মধ্যস্থ রাখিয়া সদাশিবের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। সদাশিব বিশ্বাস রাওব সহিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং বাদশাহের যে কিছু সম্পত্তি পাইলেন, হস্তগত করিলেন। সভা গৃহের রৌপ্য নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত চন্দ্রাতপ ভগ্ন করিয়া তাহা দ্বারা ১৭ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত করিলেন। এই প্রকার আরও অনেক অনেক কার্য্য করিলেন। তাহাতে সকলের মনেই এইরূপ সন্দেহ হইল, যে তিনি স্ববিপক্ষ সমুদয় হিন্দুস্থানী সর্দ্দারকে পদচ্যুত করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। এবং দুরানী শাহ স্বদেশে প্রস্থান করিলে পর বিশ্বাস রাওকে দিল্লী সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন। সত্য হৌক মিথ্যা হৌক, এই জনরব নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট পৌছিল।

দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সদাশিব দিল্লী ও তাহার চারিদিকে ১২ ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া স্বীয় সৈন্য সংস্থাপন করিলেন, স্বয়ং দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আহমদ শাহ দুরানী অনুপসুহবের নিকট ছাউনিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। নজীবুদ্দৌলা চারিদিকের যাবদীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিল। কোন এক দিন দুরানী শাহ বলিলেন, "দেখ নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রভৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, তিনি বাদশাহের প্রধান উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন নিতান্ত আবশ্যক। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইলে, বিষম ফল উৎপন্ন হইবে। তাঁহার প্রচুর সৈন্যের সহিত আগমন করিবার কিছু আবশ্যক নাই, কতিপয় মাত্র অনুচরের সহিত মিলিত হইলেও, আমাদের পক্ষে অনেক বল সঞ্চয় হইবে। পূর্ব্বে আমি যখন ভারত আক্রমণ করি, সুজাউদ্দৌলার পিতা সফদর আমার গতিরোধ পূর্ব্বক আমার পরাজয়ের প্রধান কারণ হইয়াছিলেন। সম্ভবত সুজাউদ্দৌলা আমাকে সন্দেহ করিতে পারেন ও ভীত হইয়াও থাকিবেন। এ কারণ যাহাতে তিনি বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন না করেন, এরূপ চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সত্বর করা কর্ত্তব্য। এই রহস্য দূত বা পত্র দ্বারা সম্পাদন করা অপেক্ষা যদি নজীবুদ্দৌলা স্বয়ং অল্পমাত্র অনুচরবর্গের সহিত সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক এইরূপ অনুরোধ করেন, তা হ'লে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা।"

আহমদ শাহ দুরানী ও তাঁহার উজীর শাহ বুলি খাঁ নজীবুদ্দৌলার হস্তে লিখিত সন্ধিপত্র এবং স্বনামাঙ্কিত কোরাণ গ্রন্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। নজীব দুই হাজার অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া তিন দিন অবিশ্রান্ত ভাবে গমন করত গঙ্গার উপকূলে মিন্দিঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ সময় সুজাউদ্দৌলা স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সহসা নজীবুদ্দৌলার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ভদ্রোচিত অতিথি সৎকার করিতে বাধ্য হইলেন। নজীব তাঁহাকে দুরানী শাহ লিখিত সন্ধিপত্র দেখাইল এবং অশেষবিধ সাহস-ব্যঞ্জক ও উদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া উপস্থিত বিপদ যে মুসলমান সাধারণের ইহা বিশদরূপে বুঝাইল। সে বলিল "যখন সদাশিব রাও আমার শত্রু তখন আর আমার নিরাপদ কোথায়? আপনারও উচিত যে বিপদ সন্নিকট অবগত হইয়া যথা-কালে আত্মরক্ষায় তৎপর হওয়া এবং অন্যতর পক্ষ আশ্রয় করা। তবে আপনার অবিদিত নাই যে ভাও মুসলমান মাত্রেরই স্বাভাবিক শত্রু, তাহার ক্ষমতা থাকিলে আপনার আমার বা অন্য কোন মুসলমানের নিস্তার নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বত্র বলীয়সী বটে, তথাপি আমাদের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমি আপনার সহিত বন্ধুভাব অনুরোধে অবস্থার স্বভাব জ্ঞাপনের জন্য এতদূর আসিয়াছি, এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। আপনার মাতা বেগম আমাদের উভয়কেই পরামর্শ দিবার উপযুক্ত পাত্রী, তাঁহার এবং আপনার অপর পরিবারবর্গের সহিত উপস্থিত বিষয় পরামর্শ করিয়া, যাহা সদ্যুক্তি হয় স্থির করুন।"

দুই তিন দিন বিবেচনার পর সুজাউদ্দৌলা সিদ্ধান্ত করিলেন যে মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ বা উপযুক্ত নহে। আর নজীবুদ্দৌলার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দূতকে অগ্রাহ্য করিয়া দুরানী শাহের বন্ধুতা অবহেলন করাও মঙ্গলময় নহে। তাহা হইলে দুরানী শাহ এবং রোহিলাগণ সাধ্যমত তাঁহার উপর অত্যাচার করিবে। কিন্তু কোন পক্ষ জয়ী হইবে তাহাও অনিশ্চিত সুতরাং অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিলেই সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা। অবশেষে তিনি নজীবের পরামর্শ মত দুরানী শাহের পক্ষ অবলম্বন করাই স্থির করিলেন। তিনি স্বীয় রমণীবর্গকে লক্ষ্ণৌ প্রেরণ করিলেন এবং রাজা বেণী বাহাদুরকে তাঁহার অনুপস্থিতি

স্থানে সুবাদার বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দুরানী শাহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আহমদ শাহ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান পুরঃসর গ্রহণ করিলেন। এবং মুখেও বলিলেন তিনি তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় মনে করেন। দুরানী শাহ বন্ধুত্বের নানাবিধ পরিচয় প্রদর্শন পূর্ব্ব বলিলেন যে এত দিন কেবল তোমার অপেক্ষা করিতেছিলাম, এখন অবিলম্বে মহারাষ্ট্রীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। সুজাউদ্দৌলার শিবিরে কোন প্রকার গোলযোগ বা দাঙ্গা হঙ্গামা না হয়, এজন্য তিনি দুরানী সৈন্যগণকে নিষেধ করিলেন এবং কেহ সেরূপ কার্য্য করিলে প্রাণদণ্ডের হুকুম জারি করিলেন। আরও প্রচার করিয়া দিলেন যে নবাব সফদরজঙ্গ, অহমদ শাহের বংশের আত্মীয়, নবাব সুজা তাঁহার পুত্র, ইহাঁকে তিনি স্বীয় পুত্র হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। প্রধান উজীর সাহবুদ্দি খাঁ যিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত ছিলেন, তিনিও সুজাউদ্দৌলাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া সম্বোধন এবং যার পর নাই সমাদর করিতে লাগিলেন।

দুরানী সৈনিকেরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক গোঁয়ার এবং অদম্য ছিল। আহমদ শাহের হুকুম প্রচারিত হইবার পরেও একবার তাহারা নবাব সুজার শিবিরে অযথা গোলমাল করিয়াছিল। শাহ শুনিবামাত্র দুই শত দুষ্ট লোককে বন্দি করিয়া প্রত্যেকের নাসিকায় তীর দ্বারা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া উষ্ট্রের ন্যায় ভাবে নবাব সুজার শিবিরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, তাহাদের প্রাণদণ্ড বা মার্জ্জনা নবাব সুজার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। নবাব সুজা তাহাদের মার্জ্জনা পূর্ব্বক মুক্ত করিলেন। তৎপরে আর তাঁহার শিবিরে দুরানী সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

অতঃপর বর্ষা থাকিতেই দুরানী শাহ অনুপসহর হইতে শিবির ভাঙ্গিয়া দিল্লীর অপর তীরে সাহডেরা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় শিবির সন্নিবেশ তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল. কিন্তু যমুনা তখনও গভীর ও দুস্তরণীয়।

সদাশিব সন্ধি ও বন্ধুতা স্থাপনাকাঙ্ক্ষায় ভবানীশঙ্কর পণ্ডিত নামক জনৈক আরঙ্গাবাদ নিবাসী বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নবাব সুজার নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন "মহাশয়, আপনার সহিত মহারাষ্ট্রীদিগের শত্রুতার কোন কারণ নাই, প্রত্যুত মহাশয়ের পিতা নবাব

সফদর জঙ্গকে আমরা পূর্ব্বে প্রভূত সাহায্যই করিয়াছি, তবে আপনি শত্রুং সহিত মিলিত হইলেন কেন? আপনাকে এতদিন যে আমরা আমাদেব সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করি নাই, সে কেবল আপনাকে কোন কষ্ট না দিবার অভিপ্রায়ে। এক্ষণে আমাদের সহিত আপনার মিলিত হওয়া আবশ্যক; না হয়, অন্তত শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করাও উচিত। এবং কোন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সম্ভ্রান্ত অনুচর আমাদেব শিবিরে অবস্থান জন্য প্রেরণ করুন"।

নবাব সুজা স্বীয় অনুচর রাজা দেবী দত্তকে ভবানীশঙ্করের সহিত পাঠাইলেন। দেবীদত্ত দিল্লীনিবাসী একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার পিতা সৈয়দদিগের প্রভুত্বকালে বাদশাহ সরকারে কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি স্বয়ংও অনেক দিন মহম্মদসাহ বাদশাহের কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। আমিও (এই প্রবন্ধের রচয়িতা পণ্ডিত কাশীরাজ *) এই সঙ্গে প্রেরিত হইলাম। নবাব সুজা আমাকে ডাকিয়া ভবানীশঙ্করের সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। উভয়েই এক দেশস্থ ও এক জাতি হওয়ায় শীঘ্রই বন্ধুত্ব উৎপন্ন হইল। ভবানীশঙ্করের পত্রে আমার অবস্থা অবগত হইয়া সদাশিব আমাকে এক পত্র পাঠান, কিন্তু শিরোনামায় উপযুক্ত সম্মানসূচক পদের ব্যবহার হয় নাই বলিয়া আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। সদাশিব স্বীয় মুন্সীব উপর বড় বিরক্ত হইলেন।

রাজা দেবীদত্ত সদাশিবের শিবিরে পৌঁছিলে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, কিন্তু সদাশিব দেবীদত্তের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ভবানীশঙ্করকে এই অভিপ্রায়ে পুনঃপ্রেরণ করিলেন যে, দেবীদত্ত এরূপ গুরুতর সন্ধিবিগ্রহের রহস্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে, অন্য কোন বিশ্বস্ত পাত্র প্রেরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞাপন করুন।

এই সময়ে মলহর রাও এবং সূর্য্যমলের নিকট হইতেও নবাব সুজার নিকট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের জন্য দূত আসিতে লাগিল। নবাব সমস্ত কথা নজীবুদ্দৌলা এবং উজীর বুন্নিখাঁকে জানাইতে এবং তাহাদেরই পরামর্শ মত প্রত্যুত্তরাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধির বিরুদ্ধে নজীবুদ্দৌলা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু উজীরের সন্ধি স্থাপনে অনিচ্ছা ছিল না। এমন কি তিনি প্রকাশ করিলেন যে

* কাশীরাজ নবাব সফদর জঙ্গের সময় হইতে একজন অনুগৃহীত কর্ম্মচারী ছিলেন।

নবাব সুজাব মধ্যস্থালিতে যদি সন্ধি স্থাপন হয়, তো মন্দ হয় না এবং তিনি অনুরোধ করিয়া দুরানী শাহের মত করাইয়া দিবেন। আসল কথা ঐ সময়ে নজীবুদ্দৌলার সহিত তাঁহাব বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

অবশেষে নবাব, খোজা অনুচর মহম্মদ য়াকুব খাঁর প্রমুখাৎ এই মর্ম্মে মহারাষ্ট্রীয়দের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "আমার সহিত আপনাদের বন্ধুতা চিরকাল অনবচ্ছিন্ন আছে স্বীকার করি, কিন্তু এক্ষণে আপনাদেব সহিত মিলিত হওয়ার কোন উপায় দেখি না, উচিত বলিয়াও বোধ হইতেছে না। তথাপি আমি সর্ব্বদা আপনাদিগকে সাধ্যমত আবশ্যকীয় সংবাদ ও উপদেশ দিয়া বন্ধুতার পরিচয় দিতে যত্ন কবিব। আপাতত যখন আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমাব পরামর্শ এই যে আপনারা চিব অভ্যাসিত লুঠ ফসাদ ইত্যাদি অনিয়মিক যুদ্ধ ভিন্ন অন্য পন্থা অবলম্বন করিবেন না। আব যদি সন্ধিই ইচ্ছা করেন, তাহাব প্রকৃত উপায উদ্ভাবন করা আবশ্যক।"

রাজা সূর্য্যমলকে পত্র দ্বারা, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রস্থান করিতে পরামর্শ দেওয়া হইল। সূর্য্যমলের ইচ্ছাও তাহাই ছিল, তিনি তদ্রূপ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সদাশিব নবাব সুজাকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন "মহাশয়ের আচরণে ও পরামর্শে অনুগৃহীত হইলাম। আপনি যাহা বলিয়াছেন তৎপক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিতেছি। সন্ধির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে দুরানী শাহের সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই। তিনি ইচ্ছামত স্বদেশ ফিরিয়া যাইতে পাবেন। আটকের অপর পার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশ তাঁহাব রাজ্যভুক্ত থাকুক। এ পার্শ্বস্থ প্রদেশ সকল হিন্দুস্থানের সর্দ্দারদের থাকুক, তাহারা আপসে আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবে। যদি দুরানী শাহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হুন, ত তিনি লাহোর পর্য্যন্ত লউন। অবশেষে যদি নিতান্ত আরও অধিক লইবার জিদ করেন ত সরহিন্দ পর্য্যন্তও লউন। বাকী, হিন্দুস্থানের সর্দ্দারগণ আপসে বিভাগ করিয়া লইবেন।" প্রত্যুত্তর লইয়া য়াকুব খাঁ প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু সন্ধি স্থাপনের জন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল না, অতএব কেবল কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে, সূর্য্যমল—(যাঁহার শিবির দিল্লীর ৬ ক্রোশ দূরে বিদর্পুর নামক স্থানে সন্নিবেশিত ছিল)—মলহর রাও এবং অন্যান্য সম্ভ্রাপিত

সর্দ্দারগণের পরামর্শে, শিবির পরিবর্ত্তন ব্যপদেশে সৈন্য সজ্জা সরঞ্জাম ও শিবিরবাহী কুলি প্রভৃতিকে স্বরাজ্যাভিমুখে প্রেরণ করিল এবং যখন অবগত হইল যে তাহারা দশ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে, স্বয়ং সেনাগণ সহিত যাত্রা করিল এবং দ্রুতগতিতে দুই রাত্রি এক দিনের মধ্যে ৫০ ক্রোশ অতিক্রম পূর্ব্বক আপন দৃঢ় দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যখন সদাশিবের নিকট সংবাদ পৌছিল, তখন তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

ভাও সূর্য্যমলের পক্ষ ত্যাগ গ্রাহ্যই করিলেন না, কেবল বলিলেন 'অসভ্য কৃষকের নিকট অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? গুরুতর কর্ম্মের ভার ন্যস্ত হওয়ার পূর্ব্বেই যে চলিয়া গিয়াছে, ইহা বরং মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে।'

বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দিল্লীর ৫০ ক্রোশ দূরে যমুনা তীরে কুঞ্জপুর নামক স্থানে ১০০০০ রোহিলা ছাউনি করিয়াছিল। ঐ স্থান অধিকার না করিলে যমুনা পার হইয়া দুরানী শাহকে আক্রমণ করার সুবিধা হয় না দেখিয়া, সদাশিব পনর হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং ঐ স্থান আক্রমণ করিলেন, তুমুল যুদ্ধের পর স্থান অধিকৃত হইল, রোহিলা সেনাপতি দুলেল খাঁ এবং রক্ষীরা সকলেই বন্দী হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ স্থান লুণ্ঠন করিল। দুরানী শাহ সংবাদ পাইয়া কুঞ্জপুর রক্ষার জন্য ও রোহিলাদিগকে সাহায্য করিতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তখন পর্য্যন্ত দুস্তরণীয় থাকায় কৃতকার্য্য হন নাই।

বর্ষা শেষ হইল। দশহরার পূর্ব্বদিন দুরাণী শাহ শিবিরের সম্মুখে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া এক উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন সর্ব্ব সমেত ২৪ দস্তা (বা রেজিমেণ্ট); প্রতি দস্তায় ১২০০ অশ্বারোহী; উহার মধ্যে ৬ দস্তা দুরাণী শাহের কলেবাঁ নামক গোলামগণ কর্ত্তৃক গঠিত। তিনি ভিন্ন প্রধান সেনাপতিগণের নাম ১ উজির শাহবুলিখাঁ, ২ জেহানখাঁ, ৩ শাহপছন্দখাঁ, ৪ নাসিরখাঁ বেলোচী, ৫ বরখোর্দ্দারখাঁ, ৬ উজির উল্লাখাঁ কাজলবাস, ৭ মোরাদখাঁ। এতদ্ভিন্ন নিম্নশ্রেণীস্থ অনেকানেক সর্দ্দার ছিল।

দুই হাজার উষ্ট্র উপস্থিত; প্রত্যেকের উপর দুই আরোহী এবং একটি জম্বুরুখ নামক বৃহৎ কামান। ৪০টা তোপ ছিল, তদ্ভিন্ন উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বহুসংখ্যক হতবনাল নামক ছোট বন্দুক ছিল।

অন্যান্য সর্দারগণের সহিত যে সৈন্য ছিল, তাহার তালিকা—

	অশ্বারোহী	পদাতি	তোপ	নানাপ্রকার Rockets.
১ নবাব সুজাউদ্দৌলা	২০০০	২০০০	২০	
২ নজীবুদ্দৌলা	৬০০০	২০,০০০ রোহিলা	০	বহুসংখ্যক
৩ দুন্দীখাঁ ও হাফিজ রহমতখাঁ	৪০০০	১৫,০০০ রোহিলা	কয়েটা	
৪ আহমদ শা বঙ্গশ	১০০০	১০০০	ঐ	
	১৩০০০	৩৮০০০		

দুরানীশাহের সৈন্য লইয়া সর্ব্বসমেত ৪১৮০০ আশ্বারোহী, ৩৮০০০ পদাতি ও ৭০ কিম্বা ৮০টা তোপ হইবে।

আমি বিশেষ অনুসন্ধানে অর্থাৎ দপ্তর হইতে এবং বসদ সররবাহ-কারগণের নিকট হইতে বিশেষ তদন্তে মুসলমান নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা উক্ত প্রকার অবগত হইয়াছি। অনিয়মিত সৈন্য (Irregular) উহার চতুর্গুণ হইবে। ঐ অনিয়মিত সৈন্যদিগের অস্ত্র শস্ত্র অপর দুরানীদিগের অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট ছিল না; নিয়মিত সৈনিকেরা শত্রুগণের ছত্রভঙ্গ করিলে, তরবারি হস্তে তাহাদের আক্রমণ করিয়া সম্যক পরাজয় করা ইহাদের কার্য্য ছিল। দুরানীরা সকলেই বলিষ্ঠ এবং তাহাদের অশ্বগণ তুর্কীস্থান সম্ভূত। ক্রমিক ব্যায়ামে তাহাদের স্বাভাবিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পরিদর্শনের দুই দিবস পরে কুচের হুকুম হইল।

ও দিকে সদাশিব কুঞ্জপুর অধিকার করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য পরিদর্শনে নিম্নোক্ত বল সংখ্যা অবগত হইলেন, যথা—

১। ইব্রাহিম খাঁ গার্দীর অধীনে ২০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ পদাতি এবং ৪০টা তোপ, পদাতি সকলেই বন্দুকধারী এবং য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত।

২।	খাস্‌পায়গা নামক সরকারী সেনা	৬০০০ অশ্বারোহী।
৩।	মলহর রাও হুলকারের অধীনে	৫০০০ ঐ
৪।	জণ্ডজী সিন্ধিয়া	১০০০০ ঐ
৫।	আমাজী গৈকোয়াড়	৩০০০ ঐ
৬।	যশবন্তরাও পোয়ার	২০০০ ঐ

৭।	শমশেব বাহাদুব	৩০০০	অশ্বারোহী।
৮।	বলজী জাদুন	৩০০০	ঐ
৯।	রাজা বেটল সুদেব	৩০০০	ঐ
১০।	সদাশিবের শ্যালক ও প্রধান পরামর্শদাতা বলবন্তরাওর	৭০০০	ঐ
১১।	বিশ্বাসরাওর নিজ পায়গা	৫০০০	
১২।	অন্তজী মানকেশরের অধীনে	২০০০	

এতদ্ভিন্ন আবও অনেক দল ছিল; সকল স্মরণ হয় না। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫হাজাব অশ্বারোহী ও ১৫ হাজার পদাতি অবস্থিতি করিতেছিল। প্রায় ২ শত তোপ এবং অগণ্য শুতরনল এবং আসমানগোলাও ছিল।

উদ্ভট কথা।

ষষ্ঠ শাখা।

আমরা পঞ্চমশাখায় দেখাইয়াছি যে, "ক্রমে যুরোপীয় পণ্ডিতেবা বিশ্বাস করিতেছেন, যে জড়শক্তি ছাড়া কোনরূপ জড়েতর শক্তিব লীলাখেলা ইহ জগতে দেখা গিয়া থাকে। তাঁহারা Psychic force বা আত্মশক্তি নামে সেই অপর শক্তির নামকরণ করিয়াছেন। আমাদেব দেশে বহুকাল হইতেই পণ্ডিত অপণ্ডিত সকল শ্রেণীব লোকেবা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ ছিল; পাশ্চাত্য প্রবল জড়বিজ্ঞানের তবঙ্গে একটু কমিতেছিল মাত্র। এখন মনে হয় আবার যুরোপের এই নূতন তরঙ্গেব অভিঘাতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

আমরা ইহাও বলিয়াছি, "আত্মশক্তিব উন্নতি এবং স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য হিন্দুদিগের নানা পন্থা আছে। সাধারণত সেইগুলিকে যোগ-পন্থা বলে। হঠযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—যোগ নানা প্রকার। হঠযোগ, হঠ শব্দে বল, প্রথমে শরীরের উপর, নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপব, বল করিতে শিখিতে হয়; সুতবাং হঠযোগ অর্থে কস্‌রৎ, কস্‌রৎ কবিতে করিতে মনের উপরও আয়ত্তি হইতে থাকে।" যুরোপের একটা নূতন তরঙ্গের অভিঘাতে, এইরূপ যোগেব উপর বঙ্গবাসীব হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে; শতক-

গুলি লোক বালক-যুবা-বৃদ্ধ হঠাৎ যোগ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এটা বড় সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না।

যোগে হোক, রোগে হোক, গুরূপদেশে, বা জ্ঞান বিকাশে হোক, আত্মার অস্তিত্বে এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে ভাল। আত্মজ্ঞানই মনুষ্যত্বের মূল। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে যত চেষ্টা করিতে পার, কর; কিন্তু সেই চেষ্টা প্রকৃত চেষ্টা হইতেছে কি না—তাহা বেশ করিয়া দেখিতে হইবে। সমাজের বা সম্প্রদায়ের প্রকৃত নেতা থাকিলে, কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করা মন্দ নয়; সে সময় হুজুগে পড়িয়া সাধারণ লোকে প্রকৃত পন্থায় নীত হয়, কিন্তু আমাদের সমাজে এখন সেরূপ নেতা নাই; চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আপন চরিত্রের পরিচালক—আমাদের দেশী বা বিদেশী হুজুকে পড়িলে চলিবে না।

আগে আগে পথ দেখাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যান এমন সহযাত্রী নায়ক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের না থাকিলেও, পশ্চাৎ হইতে শত শত মুনিমানব আমাদিগকে নিয়ত পন্থা বলিয়া দিতেছেন। জ্ঞানের উচ্চতর শাখায়, অধ্যাত্ম তত্ত্বের গূঢ় হইতে গূঢ়তম বিভাগে, ধর্ম্মের উদার, উন্নত, বিস্তৃত বিশ্বোদর পন্থায়—আমাদের যত উপদেশদাতা ও পথপ্রদর্শক আছেন, এমন কাহারও নাই। আমরা কল্পতরুর মহতী ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত। ফল ভোগ করিতে পারিলে, অমর হইতাম।

মনু, ব্যাস—কপিল, পতঞ্জলি—শাণ্ডিল্য, জৈমিনি—ইহাঁরা যে কেবল ভারতবাসীর জন্য সূত্র-শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন—এমন কথা আমরা বলি না। তাহা হইলে তাঁহাদের অবমাননা হয়। তাঁহারা অনন্ত কালের অনন্ত জগৎবাসীর উপর কৃপা করিয়া, অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন, ধর্ম্মের অনন্ত আকর সুগম করিয়াছেন; তথাপি এখনও আমরা যে, জ্ঞানে হোক, ভ্রমে হোক, তাঁহাদিগকে আমাদের আপনার বলিয়া মনে করি,—তাঁহারা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্ত শ্রেণীর গুরু হইলেও, আমাদের দুর্গা-দালানে তাঁহাদের পাঠশালা বলিয়া, তাঁহাদিগকে 'আমাদের' খাস গুরু মহাশয় বলিয়া, ঘরের মাষ্টার বলিয়া বিশ্বাস করি,—ইহাই আমাদের পরম লাভ। পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণের উপর আমাদের এখনও আপনার বলিয়া বিশ্বাস, আস্থা, আদর আছে বলিয়াই—এখনও আমাদের আশা আছে। কিন্তু আমাদের মহাপুরুষদের উপদেশ আমরাই যদি নিয়তই অবহেলা করি—তাহা হইলে আমাদের মত অভাগা আর কে আছে বল?

দেশে যোগ শিক্ষার তরঙ্গ উঠিয়াছে—অথচ এ বিষয়ে মহাপুরুষেরা যে মূল উপদেশ দিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই বলিলেও চলে। সকল যোগের মূল—শাস্ত্রের কথায়—চিত্তশুদ্ধি—তাহাকেই এখনকার কথায় বলে—নির্ম্মল চরিত্র। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার উন্নতির মূলেই চরিত্র বল আবশ্যক,—কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে চরিত্রের নির্ম্মলতা, পরিষ্কৃতি, শুদ্ধি, স্বচ্ছতা,—একান্ত আবশ্যক। মুনি ঋষি প্রণীত সামাজিক ব্যবহারে, দণ্ড শাসনের ব্যবস্থায়, কোন কোন স্থলে বিসম্বাদ আছে, সেই সকলের জন্য প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞ মীমাংসকের সিদ্ধান্ত আবশ্যক হয়—কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির ঐ মূল ব্যবস্থায় কোন বিসম্বাদ নাই, সকলেই এক বাক্যে এক ভাবে বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মূলত চিত্তশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। সহজ সরল বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই, ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়।

আজি কালি গীতা-শাস্ত্রের বহুল প্রচার হইতেছে। গীতায় ঐ মূল কথা—এক বার নয়, দুই বার নয়, পুনঃ পুনঃ নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—

> ন কর্ম্মণা মনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি॥

স্বামীর টীকা দেখুন,—

অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মণি কর্ত্তব্যানি; অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানা নৈষ্কর্ম্মং জ্ঞানং নাশ্নুতে নপ্রাপ্নোতি। ননু চৈত মেব প্রব্রাজিনোলোক মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজ্যন্তীতিশ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্ব শ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষোভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসাদেব জ্ঞান শূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥

সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধির জন্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত, বর্ণাশ্রমের উচিত যে সকল কর্ম্ম তাহা করাই কর্ত্তব্য, কেননা চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিতে আছে যে এই (মোক্ষ) লোক ইচ্ছা করিয়া প্রব্রাজকেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, ইহাতে সন্ন্যাস মোক্ষের সাধন বলিয়া বুঝা যায়, তবে যদি সন্ন্যাসেই মোক্ষ হইল, তবে আর কর্ম্ম

কেন? এইরূপ আশঙ্কা নিবারণের জন্যই পরে বলা হইয়াছে যে—কেবল সন্ন্যাসে সিদ্ধি পাওয়া যায় না অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে জ্ঞান শূন্য সন্ন্যাসে মোক্ষ পাওয়া যায় না।

ধ্যানযোগের বিশেষ প্রকরণ শুনিয়া যোগাভ্যাস বড় কঠিন বলিয়া অর্জ্জুনের ধারণা হইল; বলিলেন—"আপনি যেরূপ যোগের কথা বলিলেন, সেরূপ ক্ষেপ-ক্ষোভ-শূন্য ভাবে দীর্ঘকাল মনস্থির করা অসাধ্য" ইত্যাদি। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "স্বভাবত চঞ্চল মন সংযমন করা বড় কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে বৈরাগ্য—কি না বিষয় বিতৃষ্ণা এবং অভ্যাস—কি না পুনঃ পুনঃ সাধনা—এই দুইটি দ্বারা তাহা হইতে পারে। কিন্তু যে অসংযতাত্মা সে কখন যোগ পায় না, যে আত্মবশ করিয়াছে, সে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে যোগ পায়।"

এইখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মনঃসংযম এবং আত্মসংযম দুইটি পৃথক্ পদার্থ। যার আত্মসংযমন হইয়াছে, সেই প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিলে মনঃসংযম করিতে পারে। সুতরাং যোগাভ্যাসের জন্য প্রথমে আত্মসংযম একান্ত আবশ্যক।

মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্রে, যোগশিক্ষার ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ নিগূঢ় উপদেশ সকল আছে। তাহাতে যোগাঙ্গ সকলের এইরূপে ক্রম নির্দ্দেশ হইয়াছে।

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ। ক্রমে ক্রমে সাধনা করিতে হয়।

তাহার পরের দুইটি সূত্রে যম কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই কয়টি—যম।

এতে জাতি-দেশ কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌম মহাব্রতম্।

ঐগুলি জাতি, দেশ, কাল, সময়—এ সকল নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌম মহাব্রত—সর্ব্বাবস্থায় একান্ত অনুপালনীয়। অর্থাৎ অহিংসা সাধন করিতে হইলে, কেবল রবিবারে মাছ মাংস খাইব না, কাশীতে জীব হত্যা করিব না, গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করিব না, এরূপ করিলেই হইবে না—কোন স্থলেই কাহারও হিংসা করিতে পারিব না। সত্যপালন করিতে হইলে,—বিবাহের যোজনা

করিতে বা কাহারও প্রাণরক্ষা করিতে মিথ্যা বলিব, এরূপ করিলে হইবে না, সকল অবস্থাতেই সত্য বলিতে হইবে। সেইরূপ অস্তেয় বা পরদ্রব্যের অপহরণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ সকলগুলিই সার্ব্বভৌম ভাবে যাজনা করিতে হইবে।

যমের পর নিয়ম।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ।

শৌচ, (বাহ্য এবং অন্তশুদ্ধি), সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় (মন্ত্রাদি জপ) এবং ঈশ্বরে প্রণিধান (সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ)—এইগুলি নিয়ম।

এই যম, নিয়মের পর—আসন—কিনা স্থির ভাবে উদ্বেগ রহিত হইয়া অবস্থিতি—তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর প্রাণায়াম। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রবাহ রোধ করিতে শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর—প্রত্যাহার ইত্যাদি।

সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে—যোগী শ্রেষ্ঠ পতঞ্জলির মতেও যোগের মূল—যম নিয়মাদি। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য প্রভৃতি সার্ব্বভৌম মহাব্রত সকল পালন করিতে ক্রমে অভ্যাস না করিলে, যোগের ভিত্তিপত্তনই হয় না।

ফলকথা এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রেরই এক মত। সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ইতিহাস এবং সাধারণ যুক্তিও—ঐ শাস্ত্রোপদেশেরই সমর্থন করে। তবে আমরা নাকি শাস্ত্র, ইতিহাস, যুক্তি কিছুই মানি না, কাজেই আমরা সকল বিষয়েই ঘোরতর বিড়ম্বিত হইতেছি।

যম নিয়মাদির কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া যোগী হইবার বাসনায় কোন প্রকার কসরৎ বা রেচক কুম্ভকাদি করা ঘোরতর বিড়ম্বনা। ইহাতে অনেক লোক বিষয়ী থাকিয়াও বিষয় ব্যাপারে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন, দুই দশ জন উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছেন। এইরূপ হঠকারিতার সম্যক্‌রূপ নিবারণ শীঘ্র আবশ্যক।

আমরা আত্মশক্তিতে দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসবান্ হই—ইহাই আমাদের প্রার্থনা—আত্মোন্নতির উদ্দেশে আমরা আত্মশুদ্ধির জন্য যত্নবান হই, ইহাই আমাদের প্রার্থনা—কেবল 'যোগেযাগে' হঠাৎ যোগী হইব এরূপ ধারণায় বিড়ম্বিত না হইয়া, আমরা যাহাতে যম নিয়মাদির ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া নষ্ট মনুষ্যত্ব পুনর্লাভ করি—তাহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নবজীবন।

৩য় ভাগ। } আষাঢ় ১২৯৪। { ১২শ সংখ্যা।

বাঙ্গালার শেঠ বংশ।

৩।

নূতন নবাব মীর জাফরের সহিত জগৎশেঠের প্রথমত সদ্ভাব সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ তাহা কার্য্যগতিকে অপনীত হইল। জগৎশেঠ, মসনদে বসিবার সময় নবাবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে তাহার বিশেষ প্রতিফল পাইলেন। মীর জাফরের সহিত নানা কারণে ক্রমশ তাঁহার অকৌশল বাধিয়া উঠিল। জাফর, অর্থসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট যখন যে প্রকার দাবি করিতেন, জগৎশেঠ তখনি সাধ্যমতে সেই দাবি পূরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু এই সময়ে নবাবের দাবি দাওয়া এতদূর অসম্ভব মত বৃদ্ধি পাইল যে, শেঠেরা তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নানা কারণে জাফরের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে জগৎশেঠ, বৃদ্ধ মাতা ও অন্যান্য পরিবার বর্গকে লইয়া তাঁহাদের প্রধান তীর্থ পরেশনাথে যাইবার মানস করিলেন। নবাব তাঁহাদের রক্ষার্থে দুইসহস্র সৈন্য দিলেন। শুভদিনে জগৎশেঠ মুরশীদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, নবাবের নিকট হইতে পরোয়ানা আসিল—"তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না—শাহাজাদার সহিত নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহারা চক্রান্ত করিয়াছেন, ও তাহাতেই উত্তেজিত হইয়া শাহাজাদা (পরে বাদশাহ) বেহার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ কথায় নবাবের দৃঢ় বিশ্বাস

হইয়াছে, সুতরাং এই প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাঁহারা নবাবের আজ্ঞায় অবরুদ্ধ হইলেন।” জগৎশেঠকে অবরুদ্ধ করিতে নবাব অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই—ভাবিয়া ছিলেন, যে দুই সহস্র সৈন্য তাঁহাদের সঙ্গে আছে, তাহা হইতেই কার্য্য সমাধা হইবে। কিন্তু নবাবের বাসনা বিফল হইল ও কার্য্য-স্রোত ভিন্ন দিকে বহিল। শেঠেরা এই বিপৎ পাতে আকুল না হইয়া—প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব-বলে অর্থ প্রলোভন দেখাইয়া নবাবের সেই অর্থ লোলুপ দুই সহস্র সৈন্য হস্তগত করিলেন। এ সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইল, তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া মুরশীদাবাদে শেঠেদের গদি ও ঘর বাড়ী লুণ্ঠনের চেষ্টা দেখিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার এই কার্য্যের বিরুদ্ধাচারী হইলেন বলিয়া তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে ইংরাজের মধ্যস্থতায় এ বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।*

১৭৬০ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবরে মীরজাফর রাজ্যচ্যুত হইলেন। তাঁহার জামাতা মীরকাশেম আলি খাঁ মসনদ অধিকার করিলেন। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে এই সময় হইতেই জগৎশেঠেদের নবাব সরকারে প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কাশেম আলি খাঁ অতিশয়, স্বাধীন প্রকৃতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মীরজাফরের ন্যায় অসার ছিলেন না বটে—কিন্তু আলিবর্দ্দীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও সেরাজের উগ্র প্রবৃত্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি ইংরাজদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—নানা কারণে ইংরাজের সহিত তাঁহার অকৌশল বাধিয়া উঠিল—এবং যুদ্ধ অপরিহার্য হইল। ইংরাজের সহিত লড়াই বাধিবার পূর্ব্বেই, সর্ব্ব অনর্থের মূল ভাবিয়া তিনি শেঠদিগকে বন্দী করিয়া মুরশীদাবাদে রাখিলেন। এই সময়ে ইংরাজের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল †, সুতরাং ভাবি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ও শেঠদিগের বিপ্লবকারী ক্ষমতা

---

* *Vide*—Malcolm's Life of Lord, R Clive. vol I & II

† এই সময়ে ইংরাজ দিগের সহিত শেঠেদিগের সংস্রব কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বিশেষ প্রতিপন্ন হয়।

" Received a letter from the Chief and Council at Dacca, under date the 5th Instant, requesting an immediate supply of money or to permit them to take up money from Jogut Set's house, otherwise the Company's investment will be at a stand,

অনুভব করিয়া নবাব তৎকালের জগৎশেঠ মাতাবচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে—আবদ্ধ করিয়া প্রথমে মুরশীদাবাদে ও তৎপরে মুঙ্গের দুর্গে লইয়া যান। ইংরাজ হইতে জগৎশেঠকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে তিনি অনেকাংশে নিরাপদ হইবেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজেরা নবাবের এই অন্যায় ও অসম্ভাবিত কার্য্যে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গবর্ণর সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া জগৎশেঠ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নবাবকে এক যুক্তি-যুক্ত পত্র লিখিলেন। সে পত্রের কি ফল হইল—পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন।

শেঠদিগের প্রতি মীর কাশিমের এই প্রকার সন্ধি-বিগর্হিত ও অযৌক্তিক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া কলিকাতার তৎকালের গবর্ণর নবাবের কার্য্যে বাধা দিতে, অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলেন। নিম্ন লিখিত পত্র খানি হইতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার ২৪শে এপ্রেলের (১৭৬৩) পত্রে কাশেম আলি খাঁকে লিখিতেছেন "আমি এই মাত্র আমিয়ট সাহেবের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে মহম্মদ তকি খাঁ ২১ এ তারিখের রাত্রে জগৎশেঠের ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদের বাটীতে সজোরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছে। তকি খাঁকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিয়াছে, এইরূপ করিতে সুবাদারের আদেশ হইয়াছে। আমি এই ঘটনা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যখন নবাব সাহেবের সহিত, ইংরাজদিগের সন্ধিবন্ধন হয় ও যখন বঙ্গেশ্বর প্রথমে মসনদে আরোহণ করেন, তখন একদিন রাত্রে আমি, জগৎশেঠ ও আপনি একত্রে বসিয়া কি কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় নবাবের স্মৃতি বহির্ভূত হইয়াছে। তখন এই কথা হয়, যে জগৎশেঠেরা বংশ মর্য্যাদায় ও ধন গৌরবে ও রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে বরাবরই বাঙ্গলায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন; ভূত পূর্ব্ব সুবাদারগণকে ইঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন; বর্ত্তমানে আপনার শাসনকালে যাহাতে তাঁহারা সেই

---

their treasury being reduced so low that they have not sufficent for the monthly expences ,

Vide—**Proceedings of the Council at Calcutta—dated—10th. March. 1760.**

প্রকার প্রভুত্ব, সম্মান, ও সুখ সম্ভোগ করিতে পান, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যাহাতে এই জগৎশেঠের তিলমাত্র অনিষ্ট হইবে, এরূপ কার্য্যে আপনার তিলমাত্র সহানুভূতি থাকিবে না। সন্ধির এই অংশটিতে আপনাকে মনোযোগ দিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছিল। ইহার পরও নবাব সাহেবের সহিত আমার যখন মুঙ্গের দুর্গে সাক্ষাৎ হইল, তখনও আমি এই সমস্ত কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ছিলাম ও আপনিও শেঠেদের প্রতি কোন প্রকার অনিষ্টজনক কার্য্য করিবেন না, একরূপ স্বীকার করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানে এই প্রকারে সামান্য লোকের ন্যায় তাহাদের সহসা আবদ্ধ করাতে শেঠবংশের যথেষ্ট মান হানি হইয়াছে ও ইহাদ্বারা আপনার ও আমাদের মধ্যে সন্ধির সর্ত্তগুলিও ভঙ্গ হইয়াছে ; বাঙ্গলার ভূত পূর্ব্ব কোন নাজিমই তাঁহা-দিগকে এই প্রকার অপমান করিতে সাহসী হন নাই, অতএব আমি আশা করি আপনি জগৎশেঠকে ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা করিবেন।" এই পত্রের যে কোন ফল হইল না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। উদয়-নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব রুদ্ধ সিংহের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধের উত্তেজনায় পাটনার ইংরাজ বন্দীদিগকে নৃশংস রূপে হত্যা করাইলেন। মুঙ্গেরে ফিরিয়া গিয়া জগৎশেঠদিগকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া বধ করিলেন। কেহ কেহ বলেন নবাব অত্যুন্নত দুর্গ প্রাকার হইতে জগৎ শেঠ মাতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

মাতাব রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার জেষ্ঠপুত্র শেঠ কুশলচাঁদ পিতৃপদে অধি-ষ্ঠান করেন। ১৭৬৬ খ্রীঃঅব্দে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম কুশলচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। কুশলচাঁদের খুল্লতাত-পুত্র উদয়চাঁদও পিতার ন্যায় মহারাজ উপাধিতে শোভিত হন। মহারাজা স্বরূপচাঁদ ও মাতাবরায় জগৎশেঠ যেমন ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে, একত্রে, সৌভ্রাত্রতায় আবদ্ধ হইয়া কারবারাদি চালাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের পুত্রেরাও তদ্রূপ করিয়া ছিলেন। মাতাব রায়ের গোলাপচাঁদ নামক আর এক পুত্র ছিল। এই গোলাপচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র মিহিরচাঁদ মীরকাশীমের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মুঙ্গেরে ছিলেন। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশেম আলি খাঁ অযোধ্যা প্রদেশে গিয়া রোহিল্লাদের শরণাপন্ন হন। এই সময়ে তিনি, গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদকে সঙ্গে করিয়া রোহিলখণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন।

পরে জাফর আলি খাঁ পুনরায় গদীতে আরোহণ করিলে তিনি এই দুইটি বালককে ফিরিয়া দিবার জন্য বাদশাহের ও অযোধ্যার নবাবকে অনুরোধ করেন। অবশেষে বহুল পরিমাণে নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া মীর জাফরের সহায়তায় গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদ স্বাধীনতা লাভ করিয়া মুরশীদাবাদ ফিরিয়া আইসেন। এই সময়ে শেঠদিগের কারবারের গতি অতি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কুশলচাঁদ এই সময়ে স্বীয় সংকটাপন্ন অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া লর্ড ক্লাইবকে এক পত্র লেখেন। ক্লাইব এই পত্রের উত্তরে যে প্রকার কর্কশ ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জগৎশেঠের নিকট দুঃসময়ে উপকৃত, পলাশী বিজেতার উপযুক্ত উত্তর নহে। ক্লাইব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—আপনারা বোধ হয় জানেন, মৃত জগৎশেঠ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে আমি কতদূর সম্মান প্রদর্শন করিতাম। সেই সম্মান আমি বরাবর আপনাদেরও দেখাইয়া আসিতেছি। তাঁহারা ইংরাজের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন আপনারা সেরূপ করিতে ক্রমশ কুণ্ঠিত হইতেছেন, দেখিতেছি। রাজ-কোষের সমস্ত অর্থ বর্ত্তমান বন্দোবস্তমতে তিনটি চাবি দ্বারা রক্ষিত না হইয়া কেবল আপনাদের নিকট জমা হইতেছে *। তাহা ছাড়া আমি শুনিলাম আপনি, বাঙ্গলার জমিদারগণের নিকট হইতে আপনার পিতৃদত্ত ঋণ সমুদায় আদায়ের জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ইহাতে প্রচুর রাজস্ব না আসাতে কোম্পানির ও নবাবের ক্ষতি হইতেছে। আপনারা বলিয়াছেন আপনাদের অবস্থা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে কিন্তু আমি আজও আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ধনী বলিয়া বিবেচনা করি। এ প্রকারে অর্থ পিপাসা পরিতৃপ্তি করিতে চেষ্টা করিলে, আপনারই অসুবিধা হইবে। ক্লাইব এই প্রকারে শেঠদিগের পত্রের উত্তর দিলেন বটে কিন্তু ইহার পরবৎসরেই তাঁহাকে শেঠদিগের গদী হইতে—দেড়লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব, ইংরাজদিগের হইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানি লাভ করেন। যদিও এতদিন ইংরাজেরা প্রকারান্তরে বাঙ্গালার, সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন—তথাপি এই সময় হইতেই—

* মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের এই সময়ে এই প্রকার বন্দোবস্ত হয় যে সাধারণ কোষাগারে তিনটি চাবি থাকিবে। একটি ইংরাজের, একটি নবাবের ও একটি জগৎশেঠের।

প্রকৃতরূপে তাঁহারা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রকৃত ঈশ্বর হইযা দাঁড়াইযা-ছিলেন। ইংবাজেরা এতদিন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে, জীবন ব্যাপিনী চেষ্টা করিতেছিলেন, আজ তাহার ফল ফলিল। বাঙ্গলার দেওযানী গ্রহণ করিয়াই লর্ড ক্লাইব, অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক জগৎশেঠ কুশলচাঁদকে, তাঁহার "সরফ্" বা Banker, নিযুক্ত কবেন। ইহার পর কুশলচাঁদ, নবাবের প্রধান মন্ত্রী সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হন। যে তিন জন যোগ্য ব্যক্তি, একযোগে—পরামর্শ করিযা বাঙ্গালার নবাবের রাজকার্য্যে-সহাযতা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কুশলচাঁদ জগৎশেঠ রাজ্যের আয় ব্যয প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরাজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধ্যে নবাবের প্রভুত্ব কমিতে লাগিল। ক্রমশ তিনি ইংরাজের ক্রীড়ার সামগ্রী হইযা উঠিলেন। নবাবের দুর্দ্দশার সময হইতেই শেঠদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। ফতেচাঁদ হইতে যেমন শেঠগণ উন্নতির উচ্চসীমায় আরোহণ করেন, কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর হইতে সেইরূপ তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী পতন আরম্ভ হয়। লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদের অবনতির অবস্থা দেখিযা তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা—বার্ষিক মাসহারা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—কুশলচাঁদ সদর্পে ও ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন—"এক লক্ষ টাকা (খুব কম করিযা ধরিলে)—আমার নিজের মাসিক খরচ। ইহা ভিন্ন আমার এই বৃহৎ পরিবার ও তদুপযুক্ত সম্মান বজায রাখিযা চলিতে হইবে। আমার ঐ তিন লক্ষ টাকার কোন প্রয়োজনই নাই।" ইহা হইতে উপলব্ধি হয—যে কারবারের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শেঠদিগের বহুব্যযিতার বৃদ্ধি পাইযাছিল। বাঙ্গলার ধনীসন্তা-নেরা অপব্যযিতা দ্বারা যে প্রকারে মহাপতনের, সুগভীর তলদেশ স্পর্শ করিয়া থাকেন—শেঠেরাও সেই উপায অবলম্বনে ক্রমশ অবনতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে ছিলেন। *

* অপব্যয়িতা ভিন্ন শেঠদিগের অবনতির আরও কযেকটি কারণ আছে। পরেশনাথের দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণার্থ তাঁহারা প্রচুর অর্থ ব্যয করিযাছিলেন। ইহাতেও তাঁহাদের কোষাগার অনেকটা শূন্য হইযা পড়ে। ইতিহাস হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় ছিযাত্তরের মন্বন্তরের পর বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পূর্ণরূপে, পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, শেঠদিগের অনেক ক্ষতি

পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কুশলচাঁদ যদিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই তথাপি—পরেশনাথ পাহাড়ের অধিকাংশ জৈন মন্দির আজও তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে। পরেশনাথ পাহাড়ে আজকাল যে সমস্ত, বড় বড় মন্দির দেবালয, ও "গুম্‌টী" দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই কুশলচাঁদের নির্ম্মিত। ইহাদিগের মধ্যে খোদিত সংস্কৃত লিপিগুলি পাঠ করিলে তাহার মধ্যে "কুশলচাঁদের" ও অন্যান্য জগৎশেঠ দিগের নাম পাওয়া যায়। পরেশ-নাথের এই সমস্ত, দেবালয়ের কতকগুলির ব্যয় শেঠেরা নিজ তহবিল হইতে, এবং কতকগুলি বা মুরশীদাবাদের বণিকসমিতি "পঞ্চায়েৎ" করিয়া চালাইয়া থাকেন।

ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে কুশলচাঁদের সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হরকচাঁদকে উত্তরাধিকারি নির্ব্বাচন করিয়া যান। ইংরাজেরা দিল্লীর সহায়তা না লইয়া স্বাধীনভাবে এই সময়ে—হরকচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। হরকচাঁদ প্রথমত অতিশয় অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন—কিন্তু পরে তাঁহার অন্যতম খুল্লতাত, গোলাপচাঁদের মৃত্যুর পর, বহুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। শেঠবংশের মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে জৈন ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। যদিও জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয—তথাপি, পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্মপরিত্যাগ করাতে—হরকচাঁদ প্রথমে, স্বজাতীয়দের রোষাগ্নিতে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মান, বংশগৌরব ও পদমর্য্যাদার গুণে পুনরায় তিনি

হয। পরে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস—১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন বন্দোবস্তমতে, খালিসার (Goverment Treasury) সমস্ত সম্পর্ক, কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন,—সেই সময হইতে শেঠেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব কার্য্যে বঞ্চিত হইলেন। ইহাও তাঁহাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু শেঠেরা এই সমস্ত কথা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—কুশলচাঁদ জগৎশেঠ—নানাকারণে তাঁহাদের ভাণ্ডারের সমস্ত ধন ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে, সে কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই-জন্য তাঁহাদের এই প্রকার অবনতি আরম্ভ হয়। Statistical Acct of Bengal. By W. W. Hunter.

সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হন। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অনেক সংকুলোদ্ভব বিত্তশালী জৈন,—শেঠদিগের বাটীতে নিজ কন্যাদির বিবাহ দিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিত।

হরকচাঁদের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন সম্বন্ধে একটি বিশেষ কারণ ছিল—শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজে পোষ্য পুত্ররূপে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। পোষ্য-পুত্রের দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই সম্পত্তির অপব্যয় হইয়া থাকে। তিনি নিজের সম্বন্ধেও সভ্যজগতের দৈনন্দিন ঘটনাবলী দেখিয়া, একথা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার পরিত্যজ্য সম্পত্তি যাহাতে, পোষ্য-পুত্রের হস্তে না যায়, ইহাই তাঁহার প্রধান ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি নিজে এপর্য্যন্ত নিঃসন্তান। দুই তিন বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তথাপি পুত্রলাভে সক্ষম হন নাই—জৈনমতে অনেক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। এই ঘোর নিরাশার অবস্থায় একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। তাঁহার পরামর্শমতে উপযুক্ত যাগ যজ্ঞাদি দ্বারায় পুত্রলাভ হওয়াতে, কৃতজ্ঞ হরকচাঁদ—স্বেচ্ছায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হন।

হরকচাঁদের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্র, ইন্দ্রচাঁদ, এবং বিষ্ণুচাঁদ, পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারা উভয়েরই তুল্যাংশে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়েন। জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রচাঁদ, ইংরাজদিগের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। *হরকচাঁদের সময় হইতেই, উপাধি প্রদান সময়ে বাদশাহের* সম্মতি ও সাহায্য লওয়া একবারে উঠিয়া গিয়াছিল সুতরাং ইংরাজেরা স্বয়ং ইন্দ্রচাঁদকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে, ইন্দ্রচাঁদ, বহু অর্থব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক ইংরাজাদি লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া ছিলেন। ইঁহার সময় হইতেই শেঠেরা সম্পূর্ণ রূপে দুরবস্থায় পতিত হন। ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ চাঁদ গদীতে আরোহণ করেন। ইন্দ্রচাঁদের পর আর কাহাকেও জগৎশেঠ উপাধি দেওয়া হয় নাই। এই সময় হইতেই ইংরাজ এই প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দ চাঁদ অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও অমিত ব্যয়ী পুরুষ ছিলেন। অনেক সময়ে কুপ্রকৃতির উত্তেজনায় তিনি অধিকাংশ পৈত্রিক রত্নালঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ সঙ্কুলান করিতেন। ইংরাজের নিকট হইতে ইনিই বাৎসরিক ১২০০০ টাকা পেন্সন

প্রসাদ লাভ করেন। হায়! শেঠদিগের এই সময়ে কি অধঃপতনই হইয়াছিল—! পূর্ব্বে কুশলচাঁদকে বাৎসরিক তিনলক্ষ টাকা-বৃত্তি স্বরূপ লওয়াইতে লর্ড ক্লাইব সক্ষম হন নাই,—কিন্তু তাঁহার বংশধর গোবিন্দচাঁদ, বাৎসরিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রার জন্য কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ হইলেন। ফতেচাঁদের সময়ের উন্নতির অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অধঃপতনের অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের চক্ষে জল আসে।

গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য পুত্র, কৃষ্ণচাঁদ শেঠবংশের উত্তরাধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচাঁদের সময়ের কোন কথাই বলিবার নাই। এই সময়ে দয়ালু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, ১২০০০, টাকার মসহারার অনর্থক ব্যয়ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা, বাৎসরিক ৮০০০, টাকায় কমাইয়া দিয়াছিলেন। যে ফতেচাঁদ গদী হইতে, বর্গীর দ্বারা বিশলক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হইলে বলিয়া ছিলেন—"যাইতে দাও বিশলক্ষ বইত নয়"—আজ তাঁহার বংশধরদিগের এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম দেখিলে, সকল হৃদয়বান ব্যক্তিরই মর্ম্ম দুঃখ পীড়িত হইয়া পড়ে।"

যদিও এই সময়ে শেঠবংশের এই প্রকার মহাধঃপতন হইয়াছিল—তথাপি, তাঁহাদের সম্মানার্থ মুরশীদাবাদের নাজিমের প্রত্যেক সাধারণ কার্য্যে বা প্রকাশ্য দরবারে—তাঁহার নিজ দক্ষিণ পার্শ্বেই চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে—শেঠদিগের জন্য উন্নত, কারুকার্য্য খোদিত, গদী রাখা হইত।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধচরিত।

শাক্য সিংহের বৈশালীগমন—মগধ প্রবেশ—রাজগৃহে বাস—বিম্বিসার রাজার সহিত সাক্ষাৎ—পুনর্ব্বৈশালীগমন—এবং পুনরাগমন।

"ইতি হি বোধিসত্ত্বো লুব্ধক-রূপায় দেবপুত্রায়
কাশিকানি বস্ত্রাণি দত্ত্ব তস্য সকাশাত কশায়াণি বস্ত্রাণি
গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রব্রজ্যাং লোকানুবর্ত্তনাং উপাদায়
সত্ত্বানুকম্পার্থং সত্ত্বপরিপাচনার্থম্॥"

ললিত বিস্তর।

ভগবান শাক্যসিংহ রাজা, রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয় কোনরূপ অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, ও কোনরূপ ক্ষোভ বা বেদনা তাঁহাকে আঘাত করে নাই, তথাপি তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না—সন্ন্যাসী হইলেন। রাত্রিকালে পৌরবর্গ প্রসুপ্ত হইলে তিনি যে ছন্দকের সাহায্যে গৃহ বহির্গত হইয়াছিলেন, রাত্রি-প্রভাতে তিনি তাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক কাঁদিতে কাঁদিতে শাক্য পুরাভিমুখে গমন করিল—শাক্যসিংহ এখন একক। সঙ্গে কিছুই নাই, তথাপি নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। রাজপরিচ্ছদ পরিহিত ছিল, তাহা তিনি এক ব্যাধকে দিয়াছেন, ব্যাধের নিকট হইতে গৈরিক রঞ্জিত কৌপীন বস্ত্র লইয়া পরিধান করিয়াছেন। মস্তকে সুন্দর কেশ ছিল, তাহাও ছিন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকানুবর্ত্তন লোকহিত ও জ্ঞান লাভ উদ্দেশে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন।

কপিলবস্তু নগর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদক্ষিণ ষট্ যোজন পথ অতিক্রমের পর মৈনেয় দেশের অনুবৈনেয় নামক ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। সেই স্থানে তিনি ছন্দককে বিসর্জ্জন দেন এবং কথিত প্রকারে সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করেন। সেদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি শাকিয়া নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার দ্বারা মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরপি পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। পর দিন পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আলয়ে মাধ্যাঃ

হ্নিক ভক্ষণ নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপর দিন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত মধ্যাহ্ন কালে রৈবতঋষির আশ্রমপ্রাপ্ত হইলেন। সে দিবস রৈবতাশ্রমে অতিবাহিত হইল। তৎপরদিন ত্রিমদণ্ডিনামক রাজপুত্রের গৃহে ভিক্ষা লাভ করিয়া বৈশালীনাম্নী * মহানগরীতে গমন করিলেন। যে সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ বৈশালী গমন করেন, সেই সময়ে সেই নগরে আরাড় কালাম নামক জনৈক খ্যাত্যাপন্ন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এই সন্ন্যাসীর তিন শত শিষ্য ছিল। ভগবান বোধিসত্ত্ব নগর মধ্যে গমন করিতেছিলেন, ধর্ম্ম গুরু আরাড় কালাম তাহা দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত মোহিত, ও পরিতৃপ্ত হইয়া শিষ্য বর্গকে বলিলেন, দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অদ্ভুত আকৃতি। অনন্তর তিনি ভগবানকে আহ্বান করিলেন, ভগবান তৎসমীপগামী হইলেন।

বুদ্ধদেব আরাড়কালামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কিছুদিন তৎসন্নিধানে বাস করিলেন, কিন্তু অভিলষিত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। আরাড় কালাম আকিঞ্চন্যব্রত শিক্ষা দিতেন, বা স্বেচ্ছা বিহার সিদ্ধিসাধন উপদেশ করিতেন; বুদ্ধ-দেব তাহা অল্প দিবসেই অধিগত করিলেন। একদা তিনি গুরু আরাড় কালামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আপনি কি এতাবৎ ধর্ম্মই জানেন? অধিক জানেন না? গুরু প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এই পর্য্যন্তই জানি, অধিক জানি না। শুনিয়া ভগবান বলিলেন, আমিও আপনার ঐ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিয়াছি।

অনন্তর আরাড় কালাম বলিলেন, আইস এক্ষণে আমরা দুই জনে এই সকল শিষ্য অনুশাসন করিব।

কিছুদিন গেল, বুদ্ধ ভাবিলেন, আরাড়ের এ ধর্ম্ম নির্ব্বাণিক নহে, অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের উপায় নহে। এক্ষণে সম্যক্ দুঃখ বিনাশের জন্য অন্য কোন গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব। সর্ব্বোত্তর ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিব। এইরূপ চিন্তার পর তিনি বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া মগধে আগমন করিলেন।

তখন মগধের রাজধানী বা প্রধান নগর রাজগৃহ, রাজার নাম বিম্বিসার,

---

* বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পশ্চিম গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। এই নগর এক সময়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার আধুনিক নাম বিসার, উহা বৈশালীর অপভ্রংশ মাত্র।

নগবের প্রান্ত সীমায় পাণ্ডবশৈল; * একক অসহায সর্ব্ব-পবিত্যাগী শাক্য-সিংহ নির্জ্জন বাস মনোনীত করিয়া এই পাণ্ডবশৈলের পার্শ্বপ্রদেশে আশ্রয় করিলেন।

একদা তিনি ভিক্ষার্থ বাজগৃহ মহানগবে প্রবেশ কবিলে, নগব-বাসী জনগণ তাঁহার অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল। এই অপরূপ রূপ অদ্ভুত সন্ন্যাসী যাহাব যাহাব নেত্র পথে পতিত হইলেন,তাহাবা আব নয়ন ফিবাইযা অন্যদিকে নিঃক্ষেপ কবিতে সমর্থ হইল না। সকলেই একদৃষ্টে মোহনীয সন্ন্যাস মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। গৃহীব গৃহকার্য্য গেল, পথিকেব গন্তব্য স্থানে যাওবা হইল না, বণিকের ক্রয় বক্রয বন্ধ হইল, নাবীগণ চিত্রাপিত রূপিণী হইল। কেহ মনে কবিল, দেবরাজ ইন্দ্র আগমন কবিযাছেন, অন্যে মনে কবিল—দেবপুত্র; অপবে মনে কবিল—বৈশ্রবণ, কেহ কেহ বিবেচনা কবিল, পর্ব্বতবাজ বিন্ধ্যেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

বাজা বিম্বিসাব শুনিলেন, নগবে এক অপরূপ রূপ ভিক্ষুক আগমন কবিয়াছে। অত্যুচ্চ প্রাসাদ তল হইতে ভিক্ষুকেব তাদৃশ জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিযা বাজাব নয়ন মন মুগ্ধ হইল। তিনি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান কবিলেন, এবং পার্শ্বস্থ বক্ষী পুরুযকে জনান্তিকে বলিযা দিলেন, দেখ, এই পুরুষ কোথায যায।

অনন্তব লব্ধভিক্ষ শাক্যসিংহ পাণ্ডব শৈলাভিমুখে গমন কবিলে বিম্বিসাবেব প্রেরিত পুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহাব পশ্চাৎগামী হইল, অনন্তব সে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া সংবাদ দিল, "ভিক্ষুক পাণ্ডবশৈলে বাস কবে।"

পবদিন প্রাতে বাজা বিম্বিসাব পবিজন বর্গেব সহিত পাণ্ডব শৈলে গমন করিলেন। দেখিলেন, দেবরূপী বোধিসত্ত্ব গুহা সমীপে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট আছেন। বাজা ভক্তি সহকাবে অঙ্গ-নমন পূর্ব্বক তাঁহাব চবণ বন্দনা কবিলেন, পবে বিবিধ কথাব উত্থাপন কবিলেন, কবণান্তে প্রস্তাব কবিলেন, আপনি আমার এই বাজ্যগ্রহণ করুন, কবিয়া এই স্থানেই সুখে কালাতিপাত করুন।

---

* বাজগৃহ এক্ষণে বাজগিব নামে খ্যাত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন মহানগবেব বিবিধ ধ্বংশ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বাজগিব পাহাড়েব দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যে রত্নগিব নামক পাহাড় আছে, বুদ্ধের সময়ে সেই পাহাড় পাণ্ডবশৈল নামে পরিচিত ছিল।

শাক্যসিংহ বলিলেন, মহারাজ। আপনি চিরায়ু হউন, চিরকাল রাজ্য-পালন করুন, আমি শান্তি-কামনায় ইষ্টতম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।

পরে মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বলিলেন,——

" পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাৎ তে

* * * * *।

ভবহি মম সহায়ু সর্ব্বরাজ্যং।

অহু তব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্‌ক্ষ্ব কামান্ ॥

আপনাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার এই সমুদায় রাজ্যের সহায় হউন। আমি আপনাকে প্রচুরতর কাম্যপ্রদান করিব, আপনি তাহা ভোগ করুন।

মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে

মাভূয় তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।

পরম সুকুমার তুভ্যকায়ঃ

ইহ মম রাজ্যে বসাহি ভুঙ্‌ক্ষ্ব কামান্ ॥

আপনি আর এই জন শূন্য বনে থাকিবেন না। তৃণাসনে বসিবেন না। ভূমি বাস পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীর অতি সুকুমার—অতি কোমল। আমার এই রাজ্যে বা রাজসিংহাসনে বসুন এবং কাম ভোগ করুন।

বুদ্ধ বলিলেন,——

" স্বস্তি ধরণীপাল তেস্তু নিত্যং

ন চ অহং কামগুণেভিরর্থিকোস্মি।"

হে ধরণীপতে! তোমার কুশল হউক, আমি কামগুণের প্রার্থী নহি।

" কামং বিষ-সমা অনন্ত-দোষা

নরকে প্রপাতন প্রেত তির্য্যক যোনৌ।

বিদুভির্ব্বিগর্হিতা চাপ্য নার্য্যকামাঃ

জহিত ময়া যথ পক্কখেট পিণ্ডং॥"

কাম বিষতুল্য, কামের অশেষ দোষ, কামই মনুষ্যকে নরকে পতিত করে, প্রেত যোনিতে ও তির্য্যক যোনিতে নিপতিত করে, কাম অতি অশ্রেষ্ঠ অপদার্থ—তজ্জন্য জ্ঞানীলোক উহার নিন্দা করিয়া থাকেন এবং আমিও

উহা ব্যাধান্নের ন্যায় অথবা প্রতিদোষ দুষ্ট পশুমাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি।

" কাম ক্রমফলা যথা পতন্তি
যথা ইব অভ্র বলাহকা ব্রজন্তি।
অধ্রুব চপলগামি মারুতং বা
বিকিরণ সর্ব্বশুভস্য বঞ্চনীয়াঃ॥ "

কাম বৃক্ষফলের ন্যায় গলিত বৃন্ত হয়, কাম চঞ্চল বায়ুগামী মেঘের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া যায় এবং সমুদায় মঙ্গলের প্রতারক।

" কাম সলভমানা দহ্যন্তে তথাপি
লব্ধা ন তৃপ্তি বিন্দয়ন্তি।
যদা পুরে অবশস্য তজ্জয়ন্তে
তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোর কামা॥ "

কাম লব্ধ না হইলে শরীর, মন দগ্ধ করে, লব্ধ হইলেও পরিতৃপ্ত কর হয় না। কাম যখন পূর্ণ বা বেগবান হয়, তখন তাহার জয় করা যায় না। কাম যখন অজেয় হয়, তখন তাহা মহৎ দুঃখ জন্মায়, কাম অতি ভয়ানক।

" কাম ধরণিপাল যে চ দিব্যাঃ
তথ অপি মানুষ কাম যে প্রণীতাঃ।
একু নর লভেতি সর্ব্বকামাং
ন চ সো তৃপ্তি লভতে ভূয় এষঃ॥ "

হে মহারাজ! কাম দিব্য ও মানুষ (স্বর্গলোকের ও মনুষ্য লোকের) অনুসারে অনেক, কিন্তু একজনকেও ঐ সকল কাম লাভ করিতে এবং তদ্দারা পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায় না।

যে তু ধরণিপাল শান্তদান্তাঃ
আর্য্যানাশ্রব ধর্ম্মপূর্ণ সংজ্ঞাঃ
প্রজ্ঞ বিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তাঃ।
ন চ পুনকাম কাম গুণেযু কাচি তৃপ্তিঃ॥ "

হে ভূপাল! যাহারা শান্ত, দান্ত, আর্য্য, যাহারা আশ্রব হইতে অর্থাৎ কর্ম্মাশয় হইতে বিমুক্ত, ধর্ম্ম পূর্ণ, সম্যক্ জ্ঞান যুক্ত, প্রজ্ঞাবিৎ, তাহারাই তৃপ্ত হয়, তৃপ্তি লাভ করে, অন্য নহে। কামে কিছু মাত্র বা কোনরূপ তৃপ্তি নাই।

" কাম ধরিণি পাল সেবমানা
পুরি মহু ন বিদ্যতি কোটি সংস্কৃতস্য।
লবণ জল যথাহি নব পিত্বা
ভূয তৃষ্ণ বর্দ্ধতি কাম সেবমানে ॥ ,,

হে ধরণীপতে। কোটি কোটি বিদ্যা থাকিলেও কাম সেবকের কাম সমাপ্ত হয় না। যেমন লবণাক্ত জল পান করিলে মনুষ্যের পিপাসা পূর্ণ হয় না, নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত অধিক পিপাসা হয়, কাম ভোগও সেইরূপ।

" অপিচ ধরণিপাল পশ্য কায়ং
অধ্রুব সংসারকু দুঃখ যন্ত্র মেতৎ।
নবভির্ব্রণমুখৈঃ সদা স্রবন্তং
ন মম নরাধিপ কাম ছন্দরাগঃ ॥ "

আরও দেখুন, মহারাজ। এই শরীর নিতান্ত অধ্রুব, অসার ও কুৎসিত। ইহা একটি দুঃখের যন্ত্র। সর্ব্বদা'ই ইহার নবদ্বার স্রবিত হইতেছে; হে নর-নাথ! কামে আমার অনুরাগ নাই।

" অহমপি বিপুলান্ বিজহ্য কামান্
তথ পিচ ইস্ত্রি সহস্রান্ দর্শনীয়ান্।
অনভিরণভবেষু নির্গতোহহং
পরমশিবাঃ ববোধি প্রাপ্ত কামঃ ॥ "

আমি বিপুল ভোগ সাধক মহারাজ্য (কাম) এবং সহস্র সুন্দরী নারী পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতম বোধ উপার্জ্জনের ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছি।

রাজা বিম্বিসার সন্ন্যাসীর বাগ্বিন্যাসে মোহিত হইলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে ও কোন দিক্ হইতে আসিয়াছেন? আপনার জন্মস্থান কোথায়? আপনার পিতার নাম কি? মাতার নাম কি? আপনি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? আপনি কি রাজা? হে সন্ন্যাসিন্! অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা আমাকে বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন,—মহারাজ! বোধ হয় আপনি শাক্যদিগের রাজা ও রাজধানী কপিল বস্তু নগরের কথা শুনিয়াছেন। তাহা পরম সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। তাহার অধিপতি রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। আমি সেই স্থান হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।

শুনিবামাত্র রাজা বিম্বিসার উৎফুল্ল নয়নে ও হাস্য বদনে বলিলেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। ভাগ্য ক্রমেই আজ আপনার দর্শন পাইলাম। যাঁহা হইতে আপনার জন্ম হইয়াছে, আমরা তাঁহারই। এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ও আমার এই পরিজন সমুদায় আপনার শিষ্য। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি বোধি প্রাপ্ত হইলে, আমাকে দর্শন দিবেন এবং অনুগ্রহ করিবেন। হে প্রভো! হে ধর্ম্ম-স্বামিন্! আমার দ্বিতীয় অভিলাষ এই যে, কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া আমাদিগকে সু'চরিতার্থ করুন।

রাজা বিম্বিসার এইরূপে ভিক্ষুবেশী বুদ্ধদেবের সন্দর্শন লাভ করিয়া এবং বক্তব্য শেষ করিয়া পুনরপি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, অনন্তর স্বভবনে গমন করিলেন।

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান শাক্যসিংহ রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় দীর্ঘকাল রাজগৃহে বাস করিয়া ছিলেন। বুদ্ধের রাজ গৃহ বাস কালে,' বৈশালী নগরীতে ঘোরতর মারীভয় হইয়াছিল। জনৈক সন্ন্যাসীর পরামর্শে ও বশিষ্ঠ বংশীয় জনগণ কর্ত্তৃক তিনি মারীভয় বিনাশার্থ বৈশালী নগরে নীত হইয়া ছিলেন এবং বিম্বিসারও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। বৃত্তান্তটি শুনিতে ভাল লাগে, এজন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গল্পের দ্বারা তাৎকালিক লোকের বিশ্বাসের বিষয় জানা যায়।

"হিম গিরির ক্রোর পর্ব্বতে কুণ্ডলা নামে এক যক্ষিণী থাকিত। তাহার এক সহস্র পুত্র হইয়াছিল। যক্ষিণী মৃতা হইলে তাহার পুত্রেরা বৈশালীতে আসিয়া অলক্ষ্যে তদধিবাসীগণের তেজো হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে তদ্দেশের লোক ক্রমে সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরিতে লাগিল। যখন তাহারা দেখিল, অমানুষ ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে, ঔষধে তাহার উপশম হইতেছে না, তখন তাহারা দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। যখন তাহাতেও উপশান্ত হইল না, তখন তাহারা কাশ্যপ পূরণ নামক জনৈক ঋষিকে আহ্বান করিল। কাশ্যপ পূরণ বৈশালীতে আসিলেন কিন্তু মারক নিবৃত্তি হইল না। পরে পরিব্রাজক গোশালীর পুত্রকে আনা হইল, তিনিও মারক নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর কাত্যায়ন গোত্রীয় কুমুদ মুনিকে আনা হইল। তিনিও বিফল প্রযত্ন হইলেন। অনন্তর কেশকম্বল নামক জনৈক

সন্ন্যাসী আগমন করিলেন, তিনিও কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এইরূপে নিগ্রান্থ প্রভৃতি অনেক মুনি ঋষির সমাগম হইল অথচ মরক নিবৃত্ত হইল না। এই সময়ে দেববাণী হইল, এ সকল লোকের দ্বারা মরক নিবৃত্ত হইবে না। ভগবান বুদ্ধ বিম্বিসারের প্রার্থনায় রাজগৃহে বাস করিতেছেন, তাহারই পদস্পর্শে বৈশালী দেশের সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হইবে, অমানব ব্যাধি নিবৃত্তি হইবে।

তৎকালে বৈশালীদেশে যে সকল ভদ্র বংশ বাস করিতেছিল, সে সকল বংশ লেচ্ছবী ও বাসিষ্টাহ এই দুই শ্রেণীতে বিখ্যাত ছিল। লেচ্ছবীদিগের রাজার নাম তোমর। বাসিষ্ট বংশের কোন রাজা ছিল না। লেচ্ছবি রাজ তোমর দেববাণী শ্রবণের পর বহুযত্নে রাজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারও ভগবান্ বুদ্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন।

মহাবস্তুগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজগৃহ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত যে সুপ্রশস্ত পথ ছিল, তাহা উত্তমরূপে সিক্ত, সৃষ্ট ও সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি মণ্ডপ সংবিধান অর্থাৎ পটমণ্ডপ বা বাসোপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৈশালী দেশের লেচ্ছবীরাও বৈশালী হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত ঐরূপ সংবিধান করিয়াছিল। অনন্তর ভগবান গঙ্গাতীর্থে গমন পূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন। নৌকার দ্বারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক দিন বাস করিলেন। অনন্তর লেচ্ছবি ও বাসিষ্টগণ পরিবৃত হইয়া বৈশালীদেশে গমন করিলেন *। বুদ্ধের আগমনে বৈশালীদেশ সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব হইল এবং মরক ভয়ও নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন এবং মহাবস্তুগ্রন্থেও লিখিত আছে, বুদ্ধদেব

---

* রাজগৃহের উত্তরে পাটনার নীচে গঙ্গানদী। সেই গঙ্গার পশ্চিম পারে অন্যূন ৬।৭ ক্রোশ দূরে বৈশালী নগর ছিল, ইহা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে অনুমতি হয়। মহাবস্তু গ্রন্থের ও ছত্রবস্তু প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে, "অথ ভগবান অনুপূর্ব্বেন বৈশালী মনুপ্রাপ্তঃ।" অনন্তর ভগবান পূর্ব্বদিকের বিপরীত দিক্ আভিমুখ্যক্রমে গমন করিয়া বৈশালীদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, বৈশালীনগর রাজগৃহ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে ব্যবস্থিত ছিল।

বৈশালী গমন করিয়া নরক ভয় নিবারণার্থ স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া স্থির করা যায় যে, পূর্ব্বে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল লোকেরই স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া নরক ভয় নিবারণার্থ যে স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন, পাঠক বর্গের সুগোচরার্থ আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভগবানং দানি বৈশালীয়ে সাভ্যন্তরে বাহিরায়ে স্বস্ত্যয়নং করোতি। স্বস্ত্যয়ন গাথাং ভাষতি।

নমোস্তু বুদ্ধায় নমোস্তু বোধয়ে
নমো বিমুক্তায় নমো বিমুক্তয়ে।
নমোস্তু জ্ঞানস্য নমোস্তু জ্ঞানিনো
লোকাগ্র শ্রেষ্ঠায় নমো করোথ॥

যানীহ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্যানি বা যানি চ অন্তরীক্ষে।
সর্ব্বানি বা আত্তমনানি ভূত্বা
শৃণ্বন্তু স্বস্ত্যয়নং জিনেন ভাষিতম্।

ইমস্মিং বা লোকে পরস্মিং বা পুনঃ
স্বর্গেষু বা যং রতনং প্রণীতং।
ন তং সমং অস্তি তথাগতেন
দেবাতি দেবেন নরোত্তমেন॥

ইমং পি বুদ্ধে রতনং প্রণীতং
এতেন সত্যেন সু স্বস্তি ভোতু
মনুষ্যাতো বা মনুষ্যাতো বা
* * * *
যং বুদ্ধশ্রেষ্ঠো পরিবর্ণয়েং শুচিং
সমাহু আনন্তরিয়ং সমাধিং।
সমাধিনো তস্য সমো ন বিদ্যতে
* * * *

ইদং পি ধর্ম্মে রতনং প্রণীতং
এতেন সচ্চেন সু স্বস্তি ভোতু।
"মনুষ্যতো বা অমনুষ্যতো বা"
* * * *

ইত্যাদি। *

লিখিত আছে, ভগবান এই স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিলে বৈশালীদেশের সমস্ত উপদ্রব শান্ত হইয়াছিল। তথায় তিনি কতিপয় অহ বাস করিয়া, পুনর্ব্বার তিনি মাগধে আসিয়াছিলেন।

শ্রীরামদাস সেন।

---

* মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণ দেখুন। এই ঘটনা। অর্থাৎ বৈশালী গমন ও তদ্দেশের মরক নিবারণ যদিও শাক্যসিংহের বুদ্ধ হইবার পরে হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই, তথাপি কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা এতৎ স্থলে প্রকটিত করা হইল।

বেদিয়াজাতি ও বেদিয়া চোরের কথা।

——*০—+০*—০*——

য়ুরোপে এবং এদেশে।

নানা বিষয়ের নিমিত্ত নদিয়া জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রদেশ ছিল। আদৌ কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্যকর বায়ু। খড়িয়া নদীর নির্ম্মল জল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণনগরের সরভাজা। নবদ্বীপের মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিত মণ্ডলী। শান্তিপুরের বস্ত্র। গড়ের ঘী। ফুলিয়ার মগুরী। রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী। উলার পাগল। হিঙ্গলীর তামাকু। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। সিমহাটীর খজ্জা। কাচড়াপাড়ার বৈদ্য। উলাশীর বাঁন। এই সকল নিমিত্তই নদীয়া জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এইক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ অবস্থান্তর হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জ্বর; এখন কলিকাতা হইয়াছে স্বাস্থ্যকর। খড়িয়া নদীর জল স্থানে স্থানে শুখাইয়া গিয়াছে। রাজার কেবল নাম মাত্র ঠাট আছে। অনেক স্থানের মোদকেরাই এক্ষণ সর-ভাজা প্রস্তুত করিতে পারে। একদিকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে চতুষ্পাঠী পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যও প্রায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র কেবল শান্তিপুরের কেন বঙ্গদেশের সমুদয় তাঁতিকুলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গড়ের ঘৃতে আর পূর্ব্ববৎ সৌরভ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সম্মুখে কৌলীন্য মর্য্যাদার মস্তক নত হইয়াছে। পিনাল-কোডের শাসনে পাল-চৌধুরী দিগের সেকালের প্রাদুর্ভাব নাই। জ্বরে উলা ছারখার হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ফেলিয়া এখন আর কেহ বৈদ্যের নিকট যায় না, এবং থিয়েটর এবং নাটকের সম্মুখে লোকের নিকট আর বানের গীত ভাল লাগে না। এক দিকে যেমন কৃষ্ণনগর জেলা সুলোক এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্যদিকে এই জেলায় বদমায়েসের ও চোর ডাকাতেরও অভাব ছিল না। দারোগার কাহিনীতে কৃষ্ণনগর জেলার গোপজাতীয় মনুষ্যদিগের সাধারণ চরিত্রের কথা বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে আর এক প্রকার বদমায়েসের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। এই প্রবন্ধে কৃষ্ণনগর জেলার সিন্ধাল চোরের কথা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি।

সিন্ধাল চোর সর্ব্বত্রই সকল জাতীয় মনুষ্যমধ্যে আছে, কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার কয়েক খানি গ্রামের সমুদায় অধিবাসীরা যেমন এই কার্য্যে রত এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর অনেক দেশে বেদিয়া জাতির বাস আছে। ইহাদের আদি বৃত্তান্ত এমন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন যে ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা এখনও কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারেন নাই। স্বভাব প্রকৃতিও ইহাদের সকল-স্থানে একই প্রকার দৃষ্টি হয়। নানাস্থানে ভ্রমণই ইহাদের সকলের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহারা স্থির হইয়া এক স্থানে থাকে না। অদ্য এখানে কল্য আর এক স্থানে চলিয়া যায়, সেই জন্য ইহাদের মধ্যে ঘর দুয়ার তৈয়ার করার রীতি নাই। চর্ম্মের কিম্বা অতি সামান্য বস্ত্রের অনুচ্চ শিবিরের মধ্যে ইহারা জীবন যাপন করে। ঐ শিবির সকল এমন হালকা, যে তাহা অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহাদিগকে জিপ্‌সী এবং ইউরোপ খণ্ডের কোন স্থানে জিঙ্গারী, কোনও স্থানে জিমরী প্রভৃতি নামে ইহারা খ্যাত। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান ব্যবসায় এবং সেই নিমিত্ত ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক কঠিন আইন বিধিবদ্ধ আছে। যদিও ইহারা যখন যে দেশে অবস্থিতি করে তখন সেই দেশের ভাষা অবলম্বন করে তথাপি ইহাদের নিজের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে, উহা কেবল উহারাই বুঝিতে পারে, দেশের অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। ইহাদের আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক দেশে এক এক জন রাজা আছে এবং তাহাদের সামাজিক বিষয়ে সেই রাজার মীমাংসাই অলঙ্ঘনীয়। চুরি করার স্বভাবটা ইহাদের এমন মজ্জাগত যে ইংলণ্ডের কোন গ্রামে কিম্বা পল্লীতে নূতন এক দল জিপ্‌সী আসিলে অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়ে। লোকের হংস, কুক্কুট, মেষ শাবক ও ছাগ ছাগী এবং বাগিচার ফল প্রভৃতি সর্ব্বদায়ই এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এবং চুরি বিদ্যায় ইহারা এমন পটু এবং ইহারা এমন বেমালুম চুরি করিতে পারে, যে তাহাদের হস্তে চোরা মাল আবিষ্কার করা পুলিসের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। কেবল দ্রব্য কিম্বা পশু পক্ষী অপহরণ করিয়া জিপ-সীরা শান্ত থাকে না, সুবিধা পাইলে অধিবাসীদিগের শিশু বালক বালিকাও চুরি করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করে যাঁহারা ইংরাজিতে সর ওয়াল্‌টার স্কট সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ গাই ম্যানরিং প্রভৃতি নবেল পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের

নিকট এই জাতীয় লোকের বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে না, কারণ ঐ সকল পুস্তকে জিপ্‌সীদিগের প্রচুর বর্ণনা আছে।

চুরি ভিন্ন জিপ্সীদিগের আর এক বিদ্যা আছে; তদ্দ্বারা তাহারা সভ্য ইংলণ্ডেও বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহারা বলে যে মনুষ্যের কর (কোষ্ঠী) দেখিয়া তাহারা সেই ব্যক্তির অদৃষ্টের ফলাফল ব্যক্ত করিতে পারে। সভ্য ইউরোপ খণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে স্বামী শীকার একটি প্রধান রোগ এবং সেই উদ্দেশে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা তাহারা করিতে প্রস্তুত না হয়। জিপ্সীরাও মহিলাদিগের এই প্রবৃত্তি জানিয়া প্রচার করে যে তাহারা যুবতীর করস্থিত রেখা দেখিয়া বলিতে পারে যে সেই মহিলার মনোমত স্বামী জুটিবে কি না এবং সেই নিমিত্ত কুমারীরাও ঝাঁকে ঝাঁকে জিপ্সীদিগের নিকট কর (কোষ্ঠী) দেখাইতে যায়। অনেক কৃত-বিদ্য মহিলা বলেন যে তাঁহারা জিপ্সীদিগের কথায় বিশ্বাস করেন না, কেবল তামাসা দেখিবার জন্য করকোষ্ঠী দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ফল কথা এই যে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শীঘ্র একটি সুন্দর এবং ধনবান স্বামী পাওয়ার কথা জিপ্সীর মুখে শুনিলে, সেই মহিলার হৃদয় যে আহ্লাদে পুলকিত না হয়, এমন কখনও বোধ হয় না। পক্ষান্তরে জিপ্সীদিগের গণনায় যে কিছু সার নাই এমন কথা বলাও দায়। যাহারা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে জোসেফাইন নাম্নী মহিলা নেপোলিয়ানকে তাঁহার যুবা বয়সে প্রণয় পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বালিকাবস্থায় এক জিপ্সী তাঁহার কর দেখিয়া বলিয়াছিল যে জোসেফাইন এক সময় রাজ্ঞী হইবে কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ফলেও জোসেফাইনের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে বিবাহ করেন, এবং নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফাইনও রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। কিন্তু জোসেফাইনের গর্ভে পুত্রসন্তান না হওয়াতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার এক রাজকন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন। জিপ্সী যখন জোসেফাইনের কর দেখিয়া গণনা করিয়াছিল তখন নেপোলিয়ানের সহিত জোসেফাইনের আলাপ পরিচয় ও ছিল না এবং নেপোলিয়ানের সম্রাট হওয়ারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। বরং সেই সময় ফ্রান্সদেশ যে আর কখনও রাজার শাসনাধীন হইবে না, তাহাই সেই দেশের অধি-

বাসীদিগের স্থির বিশ্বাস ছিল। ঘটনার এত দীর্ঘকাল পূর্ব্বে একজন জিপ্সী কি প্রকারে জোসেফাইনের অভাবনীয় অদৃষ্ট ঠিক্ ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া ইউরোপ খণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকার বোধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করেন না। কিন্তু যাঁহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই তাঁহারা নির্ব্বাক্। এইরূপ শত সহস্র ঘটনায় জিপ্সীদিগের কথার উপরে ইউরোপ খণ্ডের মহিলাদিগের বিষম আস্থা হইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়া সম্বন্ধে আমি এই স্থানে আর একটা সত্য উপন্যাস পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ব্যক্ত করিব। অনেক জিপ্সী স্ত্রীলোক ইউরোপের অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় সুন্দরী হইয়া থাকে এবং তাহারই একজন সুলক্ষণা যুবতীকে দেখিয়া ইঙ্গেবিদেশের এক জন বড় ঘরের যুবক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই যুবকের পদমর্য্যাদা ধন এবং সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে ইউরোপের যে রাজার ঘরে ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে চাহিলে, রাজারা তাহাকে কন্যা দিতে অসম্মান বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু কেমনই তাহার মস্তিষ্কের ঝোঁক যে কেবল সেই জিপ্সী যুবতীর প্রতিই তাঁহার মন ধাবিত হইল। কিন্তু ইহার এক রহস্য এই যে এই যুবক, যাহার পাণি-গ্রহণ করিলে তাহার স্বদেশের লক্ষ লক্ষ নারী আপনাকে কৃত কৃতার্থ বিবেচনা করিত, তাহাকে বিবাহ করিতে সেই জিপ্সী কন্যা বা কন্যার পিতা মাতা প্রথমে কেহই সম্মত হইলেন না। কিন্তু যুবক তাহাতে হতাশ না হইয়া বহু কষ্টে এবং জিপ্সী-কন্যার পিতা মাতাকে অনেক ধন দিয়া এবং কন্যাকে সুখভোগের লালসা দেখাইয়া, পরিণামে আপন অভীষ্ট-সিদ্ধি করিল। বিবাহ করিয়া যুবক তাহার সখের স্ত্রীকে হীরা মুক্তায় ভূষিত বহুমূল্যের পোষাকে সজ্জিত করিয়া সম্রাটের দরবারে লইয়া যাইয়া পরিচিত করিয়া দিল ও গৃহে যাহাতে যুবতীর মনস্তুষ্টি ও সুখ-স্বচ্ছন্দ হয় তাহা করিতে ব্যয়ের ত্রুটি করিল না। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল যুবক যুবতীকে লইয়া অতিবাহিত করিল কিন্তু তাহার পরেই জিপসীর মনের ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশ সে আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস করিতে আরম্ভ করিল। মফস্বলে এক পর্ব্বতের উপরে তাহাদের যে এক গৃহ ছিল সেই গৃহের গবাক্ষ দিয়া সমস্ত দিন কেবল দূরস্থিত শৈল মালার

শোভা দৃষ্টি করিত। তাহার স্বামী তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কতরূপ কত চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাহাকে উল্লাসিত করিতে পারিত না। সর্ব্বদাই ম্লান বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস-ত্যাগ করিত এবং কেহ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিত যে কি জন্য তাহার মন এমন করে, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে না। অবশেষে এক দিবস সে নিরুদ্দেশ হইল। কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা কেহ আর অনুসন্ধান করিতে পারিল না। তাহার স্বামী স্বয়ং নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল; দূত, চর চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইল না। তাহাকে হারাইয়া সেই যুবক এক প্রকার পাগলের ন্যায় হইল। বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্জ্জনে বসিয়া কাল কাটাইত। এই ঘটনায় ৩।৪ বৎসর পরে স্বামীর নিকট সংবাদ আসিল যে রুসিয়ার এক প্রান্তে এক দল জিপ্সীর সঙ্গে সেই যুবতীকে তাহার কয়েক জন প্রজা দেখিয়া আসিয়াছে। স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল এবং তাহার সঙ্গে পুনরায় তাহার গৃহে যাইতে সাধ্য সাধনা করিল। কিন্তু যুবতী কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল যে এক স্থানে স্থির হইয়া থাকা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। বিবাহের পরে প্রথম কয়েক মাস রাজসভা নৃত্য-গীত নাট্যশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাহার বিলক্ষণ আনন্দ ভোগ হইয়াছিল বটে কিন্তু পরে তাহাতে তাহার বিরক্তি জন্মিয়া উঠিল। গৃহস্থ লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা তাহার ভাল লাগিল না। গৃহ এবং প্রাসাদ—কারাগার ও অঙ্গের অলঙ্কার—শৃঙ্খল বিশেষ বোধ হইত। তখন তাহার জাতীয় স্বাধীনতার নিমিত্ত তাহার প্রাণ কান্দিতে আরম্ভ করিল। সেই মফঃসলের অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া যখন সে পর্ব্বত ও জঙ্গল দেখিত, তখন পূর্ব্ববৎ জঙ্গলে যাইয়া ক্রীড়া করিতে ও পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে আর এক শৃঙ্গ ভ্রমণ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইত। ইহা নিবারণ করার জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না। অবশেষে সেই গ্রামে এক দল জিপ্সী দেখিয়া মনের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, এত ধন দৌলত এবং সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে তাহার কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হয় নাই বরং সে এক্ষণে সুখেই আছে। স্বামী তথাপি তাহাকে অনেক অনুরোধ করিল কিন্তু তাহা সে শুনিল না। স্বামী অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া ও যুবতীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া পিস্তলের গুলী খাইয়া আত্মহত্যা করিল। জাতীয় ধর্ম্মে

এমনই একটু গুরুত্ব আছে যে জিপ্সী নারীও অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া তাহা অবলম্বন করে, কেবল পারি না আমরা হতভাগা বাঙ্গালী। জাতীয় ধর্ম্মটা যেন আমাদের চক্ষের বিষ, ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচি।

এই ত গেল ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়াদিগের কথা। ভারতবর্ষেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে বয়েদ বলে। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে কয়েকটা করিয়া টাটু ঘোঁড়া থাকে এবং সেই গুলা উহাদের তাঁবু এবং দ্রব্যাদি বহন করে। বালক বালিকারা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ঘোঁড়া চড়িয়া বেড়ায়। বয়েদদিগেরও স্বতন্ত্র ভাষা আছে, কিন্তু অন্যের সহিত হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বেশ বলবান এবং যুবতীরা দেখিতে কুৎসিতা নহে। প্রকাশ্যে ইহাদের কোনও দল কবিরাজী, কোনও দল ভোজবাজী করিয়া ফিরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অপহরণ করাই ইহাদের মুখ্য ব্যবসা। পথি মধ্যে নিরাশ্রয়ী একাকী পথিক পাইলে কিম্বা ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিলে, ইহারা অম্লান চিত্তে আক্রমণ করিয়া যত দূর পারে, লুট পাট করিয়া স্থানান্তর চলিয়া যায়। ইহাদের যে কি ধর্ম্ম তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেখিতে ইহাদিগকে মুসলমান বোধ হয়, কিন্তু ইহারা মুসলমান নহে। ইহারা অত্যন্ত সুরাপেয়ী। হস্তে কিঞ্চিৎ পয়সা হইলেই, প্রথমে শুঁড়ি খানায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা পথের পার্শ্বস্থ গ্রামের হাঁস মুর্গী ও ফল তরকারী অপহরণ করিয়া আহারের যোগাড় করে। কিছু হস্তগত করিতে না পারিলে, অবশেষে ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে।

কিন্তু হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের বেদিয়াদিগের অপেক্ষায় বঙ্গদেশীয় বেদিয়ারা অনেক সভ্য হইয়াছে। প্রকৃত বাঙ্গালী বেদিয়াদিগের মধ্যে উহাদের জাতীয় পরিভ্রামক স্বভাব এককালে অন্তর্হিত না হইয়া থাকিলেও, বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এইক্ষণে বেদিয়ারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া চাস আবাদ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রমশ তাহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মী শ্রীও প্রকটিত হইতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গে বেদিয়ারা মৃত্তিকায় বাস করে না, জলের উপরে নৌকার মধ্যে বাস করে। নৌকাই ইহাদের ঘর বাড়ী এবং নৌকাতে ইহাদের জন্ম মৃত্যু হয়। নৌকাতে

সাংসারিক সকল দ্রব্য থাকে। প্রত্যেক বেদিয়ার এক এক খানা পৃথক নৌকা আছে। দরিদ্র হইলে অন্তত এক খানা ডিঙ্গিতে ইহারা বাস করে। বেদিয়া যে পর্য্যন্ত পৃথক নৌকা করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে না এবং কেহ তাহাকে কন্যাও দেয় না। এই বেদিয়ারা স্ত্রী পুরুষে নৌকা বায়। যাঁহারা পূর্ব্ব বঙ্গের নদী দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে বেদিয়ার নৌকায় বেদিয়ানী হাল ধরিয়া বসিয়া কিম্বা খাড়া হইয়া আছে, স্বামী তাহার দাঁড় কিম্বা গুণ টানিতেছে। নৌকার ছাপরের উপরে খাঁচার মধ্যে হাঁস মুর্গী কবুতর এবং কোনও নৌকায় পোষা বানর ও বকরী বান্ধা থাকে। ছাপরের ভিতরে বালক বালিকারা খেলা করে এবং নৌকার ছাপর এমন শক্ত করিয়া এবং যত্নের সহিত প্রস্তুত করা, যে তাহা হইতে বালকেরা বাহির হইয়া জলে পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। বর্ষা কালে পূর্ব্ব বঙ্গে প্রতি বৎসর অনেক বালক বালিকা জলে ডুবিয়া মরে, কিন্তু বেদিয়ারা ২৪ ঘণ্টা জলেরই উপরে বাস করে অথচ তাহাদের মধ্যে ঐরূপ ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। শুখা কালে নদীর ধারে এক এক স্থানে নৌকা লাগাইয়া বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা দুই তিন জনে দল বদ্ধ হইয়া গ্রামের মধ্যে গৃহস্থ দিগের নিকট সূচ সুতা ছুরী কাকুই প্রভৃতি মনিহারি দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে যায়। ইহাদের পুরুষেরা সর্প খেলাইয়া কিম্বা ভোজবাজীর তামাসা দেখাইয়া, পয়সা উপার্জ্জন করে। কোনও কোনও স্থানে বেদিয়ারা অনেকে ধনাঢ্য হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি যে বরিশালে এক জন বেদিয়ার লক্ষাধিক নগদ টাকার মহাজনী কারবার আছে এবং জনরব এই যে সে একবার প্রচার করিয়াছিল, যে যদি কোন ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থের বালক তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাকে লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বেদিয়াদিগের যাহার যে ব্যবসা থাকুক, সকলের মধ্যেই চুরি করা কার্য্যটা পাপ বলিয়া পরিগণিত নহে। যখন দেশেতে পুলিসের শাসন শিথিল ছিল তখন অনেক বেদিয়ারা নৌকায় চুরি ও ডাকাতী করিত। এখনও বোধ হয় সুযোগ পাইলে তাহারা, ঐ কার্য্য করিতে ছাড়ে না।

বর্ষাকালে যখন দেশের খাল বিলে জল আইসে, তখন এই বেদিয়াদিগের উৎসব ও আনন্দ কার্য্য করিবার সময় হয় এবং তাহাদের বিবাহ সাদীও এই ঋতুতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোনও বিবাহ উপস্থিত হইলে নানাদিক হইতে

এক নির্দিষ্ট বিলের কিম্বা খালের ধারে সেই সম্প্রদায়ের সকল বেদিয়ার নৌকা আসিয়া একত্রিত হয়। বেদিয়ার মর্য্যাদা এবং উপলক্ষ বিবেচনায় এক এক বিবাহে এক শতেরও অধিক নৌকা সমবেত হয় এবং ১০।১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে মৃত্তিকার উপরে উঠিয়া স্ত্রী-পুরুষে গীতবাদ্য ও নৃত্য করে। এই সময় ইহাদের মধ্যে অনেক সরাপ খরচ হয়। সকল নৌকার আগা পাছা নূতন সিন্দুর এবং অন্যান্য রঙ্গ দিয়া সুসজ্জিত করে এবং মাস্তলের উপরে নানা প্রকার নিশান উড্ডীয়মান হইতে থাকে। উৎসবের কয়েক দিবস ধরিয়া ইহাদের কাহারও কোন কার্য্য থাকে না, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমোদে মত্ত হয়। স্ত্রীলোকে নূতন বস্ত্রাভরণ পরিয়া সকলের সম্মুখে নৃত্য করে এবং তাহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক ও তবলা বাজায়। উৎসবান্তে সকলে ছত্র ভঙ্গ হইয়া যাহার যে স্থানে ইচ্ছা চলিয়া যায়। মৃত্তিকার সহিত এই সকল বেদিয়ার দুই সময় ভিন্ন আর কখনও কোন সংস্রব হয় না। কেবল বিবাহের উৎসবে ও মরিলে গোর দিতে মাটির আবশ্যক হয়, কিন্তু যে স্থানে এই দুই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা তাহারা মূল্য দিয়া ক্রয় করে, কারণ অন্যের মাটিতে তাহা হওয়া রীতি নাই সুতরাং টাকা দিয়া ক্রয় না করিলে মাটি নিজের মাটি বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই দুই উপলক্ষে ভূম্যধিকারীরা বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করে। ধনবান বেদিয়া হইলে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জমীদারকে দিয়া সন্তুষ্ট করে। বিবাহের উৎসব বা গোর দেওয়া হইয়া গেলে এই ভূমির সহিত বেদিয়ার আর কোন দাবী কিম্বা সম্বন্ধ থাকে না সুতরাং জমীদারের ইহা একটি বিলক্ষণ রোজগারের পন্থা হয়। বেদিয়াদিগের মধ্যে আর এক রীতি আছে যে তাহারা কখনও মৃত্তিকার উপর শয়ন করে না, যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁশের একটা সামান্য মঞ্চ করিয়া নৌকার ছাপরের ন্যায় এক আবরণের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, সেই মঞ্চের উপরে শয়ন করে। জালিয়াদিগের মধ্যে যেমন জালো, মালো, কৈবর্ত্ত, তিয়র প্রভৃতি অন্তর্জাতি আছে, সেইরূপ এই নৌ-বেদিয়াদিগের মধ্যেও বেদিয়া, বেবাদিয়া, সান্দার প্রভৃতি জাতি আছে কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সাদী চলে কি না, তাহা আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

পূর্ব্ব বঙ্গের নৌ-বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা যেমন নৌকা বায়, এমন প্রথা কেবল চীন রাজ্যে ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে প্রচলিত নাই। চীনদেশেও

অনেক বৃহৎ নদী আছে এবং নদীর উপরে ভেলা বান্ধিয়া ও নৌকার উপরে বহু-সংখ্যক লোকের বাস। সেই রাজ্যে সাম্পান নামক এক প্রকার নৌকা আছে, তাহা স্ত্রীলোকে বাহিয়া থাকে। যুবতী স্ত্রীলোকে সুসজ্জিত হইয়া সেই সাম্পান নৌকা চালায় এবং সৌখিন চিনানী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য সাম্পান পাইলে, অন্য কোন নৌকা কিম্বা যান ব্যবহার করে না। কিন্তু চীন রাজ্যের সাম্পানের সহিত পূর্ব্ব বঙ্গের বেদিয়ার নৌকার এই একটি প্রভেদ আছে, যে সাম্পান উপার্জ্জনের জন্য চালান হয়, তাহাতে চড়ন্দার প্রভৃতি উঠাইয়া চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা পয়সা রোজগার করে। পূর্ব্ব বঙ্গের বেদিয়ার নৌকা তাহাদের ঘর বাড়ী এবং তাহাতে তাহারা বাস করা ভিন্ন অন্য নৌকার ন্যায় চড়ন্দার কিম্বা মাল বোঝাই করিয়া ব্যবসা করেনা। সাম্পান চালক চিনানী পূর্ব্ব বঙ্গের ন্যায় বেদিয়া জাতীয় স্ত্রীলোক কি না, তাহা আমি জানিনা এবং চীন রাজ্যে বেদিয়া জাতির কোন শাখা আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু যে স্থলে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের সকল বিভাগেই এই জাতির বসতি দেখিতে পাওয়া যায়; সে স্থলে চীন দেশে বেদিয়া জাতি একবারে না থাকা, বড় সম্ভবপর বোধ হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদিয়া জাতির এক বিশেষ স্বভাব এই যে তাহারা পরিভ্রামক কিন্তু কেবল কৃষ্ণনগর ও বারাসত জেলাতে এই ভাবের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। নদীয়া জেলার কাগজপুকুরিয়া থানার এলাকায় বেলিয়া বিষহরি প্রভৃতি কয়েক খানা গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামে বেদিয়ার বাস। এই সকল বেদিয়ারা গৃহস্থ এবং হিন্দু মুসলমান প্রজার ন্যায় ইহারা ঘর বাড়ী বানাইয়া তাহাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করিয়া আসিতেছে এবং অনেকে চাস আবাদও করিয়া থাকে। দেখিতে এবং চাল চলনে হিন্দু মুসলমানের সহিত ইহাদের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে এই বেদিয়ারা না হিন্দু, না মুসলমান। হিন্দুর ঠাকুর দেবতা মানে এবং পক্ষান্তরে মুর্গীও আহার করে। কিন্তু ইহারা গোমাংস ভোজী নহে। অন্যান্য বেদিয়াদিগের ন্যায় ইহাদেরও এক গুপ্ত ভাষা আছে, কিন্তু সাধারণত তাহারা বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহার করে। জমিদার এবং তালুকদারের ইহারা অত্যন্ত আজ্ঞাবহ। যাহাদের ভূমিতে ইহারা বাস করে তাহাদিগকে ইহারা খুব সম্মান করে। কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল বেদিয়ানী "বাতের বেম ভাল করি, দাঁতের পোকা বাহির করি" বলিয়া মিষ্ট স্বরে রাস্তায়

রাস্তায় ডাকিয়া কিম্বা ভানুমতীর বাজী দেখাইয়া বেড়ায়, তাহারা এই সকল স্থায়ী বেদিয়ার দলভুক্ত নহে। কৃষ্ণনগরের বেদিয়ারা যদিও অন্যান্য প্রজার ন্যায় প্রকাশ্যরূপে কার কারবার করে, তথাপি ইহাদের প্রধান ব্যবসা সীঁধ চুরি। এই কয়েক গ্রামের বেদিয়ারা প্রসিদ্ধ চোর এবং ইহাদের এই স্বভাব রাজপুরুষদিগের নিকটও অবিদিত ছিল না, সেই কারণে পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুম ছিল যে, যখন কোন বেদিয়ার নিজ গ্রাম হইতে স্থানান্তর গমন করার প্রয়োজন হইবে, তখন সে তাহার নিজ থানায় উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশে কোন্ স্থানে যাইবে, তাহা থানার দৈনিক বহিতে লিখাইয়া যাইবে, তাহা হইলে থানার কর্ম্মচারিরা সেই স্থানের পুলিসের নিকট লিখিলে, তাহারা ঐ বেদিয়ার উপরে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। আর এক নিয়ম ছিল যে, বেদিয়ারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তাহারা নিকটস্থ ফাঁড়ি কিম্বা থানা ঘরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিবে এবং থানার রোজনামচা বহিতে বেদিয়ার নাম, প্রভৃতি সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ফাঁড়ি কিম্বা থানাঘরে পৌঁছিতে না পারিলে যে গ্রামে বেদিয়ার বাস করিতে হইবে, সেই গ্রামের চৌকিদার এবং মণ্ডলকে তাহার আত্মপরিচয় দিয়া বাস করিবে। আমি যখন কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালিতে ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে দুই একজন বেদিয়া আসিয়া ঐরূপ থানাঘরে রাত্রিতে বাস করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত। ইহারই এক ব্যক্তির নিকট তাহারা কি প্রকারে চুরি করে তাহার অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বহুদিনের কথা হইল সকল কথা আমার ভাল করিয়া স্মরণ নাই, যাহা কিছু মনে আছে, তাহা এই স্থানে বিবৃত করিব। বেদিয়ার বর্ণনা তাহার কথার ভঙ্গিতে লিখিলাম।

"আমাদের প্রধান ব্যবসাই চুরি, লোকে আমাদের ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা মিথ্যা কথা বলি না। আমরা বলি যে আমরা "ছুরি কাঁচির ব্যবসা করি," কিন্তু ছ-শব্দটি এমন মৃদুভাবে উচ্চারণ করি যে তাহাতে ছুরির স্থলে শ্রোতা চুরিই শুনে। নানা প্রকার চুরির মধ্যে সীঁধ চুরিই আমাদের প্রধান অবলম্বনীয় এবং অনায়াসে যাহাতে আমরা সেই কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের পুস্তক লেখা আছে। আমরা বাল্যকাল হইতে সীঁধ কাটিবার বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের বৃদ্ধলোকে বালকদিগকে শিশুকাল হইতে এই বিদ্যায় অভ্যস্ত করে। এক নিয়মে শিক্ষা প্রাপ্ত হও-

যাতে আমরা সীঁধ দেখিয়া বলিতে পারি, যে তাহা বেদিয়া না অন্য কোন আত্মীয়ের হস্তাক্ষর। আমরা নিজ গ্রামে কিম্বা নিজ থানার এলাকায় কখনই এবং পারিলে নিজ জেলাতেও চুরি করি না। শীত ঋতুর আগমনে আমরা দলে দলে বঙ্গদেশের নানা দিকে চলিয়া যাই এবং বর্ষার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসি। ইহাতে আমাদের এক এক দলের এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং সেই সেই দলের নিকট সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থার সংবাদ সংগ্রহীত থাকে। আমরা গ্রাম হইতে অনেকে একত্র হইয়া নিষ্ক্রান্ত হই না, কারণ তাহা হইলে পুলিসের সন্দেহ হয়। এক আধ জন করিয়া ক্রমে ক্রমে গোপনে বাহির হইয়া এক নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকি। আমরা কেবল চুরি বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হই এমন নহে, কোনও স্থানে ধৃত হইলে পুলিসের হস্তে যন্ত্রণা পাইয়া একরার না করি, তজ্জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেও আমরা অভ্যস্ত হইয়া থাকি, এমন কি, আমাদের এক এক জন নির্দ্দয় গুরু লোহা পোড়াইয়া আমাদের শরীর দগ্ধ করিয়া দেখে, যে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি কি না। আমরা সোনা রূপার অলঙ্কার নগদ টাকা ও মোহর ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য চুরি করি না। তামা পিত্তল কাঁসার তৈজস পত্র কিম্বা কোনও প্রকার বস্ত্র আমরা স্পর্শ করি না কারণ এই সমস্ত বস্তু গোপন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমাদের মহাজন আছে, তাহাদিগের নিকট আমরা অপহৃত মাল আনিয়া দাখিল করিলে, তাহারা আমাদিগকে সোনার ভরি ১০ টাকা ও রূপার ভরি ৷৵০ আনা হিসাবে দেয়। আমরা যদি কখনও আলস্যবশত বাড়ীতে বসিয়া থাকি, যথা সময় চুরি করিতে বাহির না হই, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে উত্তেজনা করিয়া বাড়ী হইতে চুরি করিতে পাঠাইয়া দেয় এবং বৎসরের মধ্যে আমাদের টাকার প্রয়োজন হইলে ইহারা কোনও প্রতিভূ না লইয়া আমাদের যত টাকার আবশ্যক, তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করে, কারণ আমরা তাহাদের রোজগারে পুত এবং আমরাও মহাজনের সহিত কোন প্রবঞ্চনা কিম্বা চাতুরি করি না।

"সীঁধ কাটা, চুরি করা, ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিক্ষা পাওয়া ভিন্ন অধিকন্তু আমাদের নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে শিখিতে হয়। হিন্দু প্রধান গ্রামে যাইয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসী, মুসলমানের গ্রামে যাইয়া ফকির মোল্লা মুস্কিল আসান প্রভৃতি সাজিতে হয়। তদ্ভিন্ন অনেক ছদ্মবেশ করিতে আমরা

জানি। কথনও আমরা সাপ খেলাই, কথনও বানর নাচাই, কথনও দৈবজ্ঞ সাজিয়া লোকের শুভাশুভ গণনা করি। ইহা সকলই আমাদের চুরির উপকরণ স্বরূপে আবশ্যক হয়। আমরা যথন চুরি যাত্রায় বাহির হই তথন আমাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে দুই তিন জন করিয়া আমাদের জাতীয় শঠ এবং চতুরা স্ত্রীলোক থাকে তাহারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করে এবং যে প্রকারে তাহা করে, তাহা আমি পরে ব্যক্ত করিতেছি। আমরা যথন গ্রাম হইতে বাহির হই, তথন আমরা বলি যে অমুক জেলায় আমরা গরু কিম্বা ছাগল কিনিতে যাইতেছি, কিন্তু আমরা যদি পূর্ব্বে যাই তবে দক্ষিণের নাম করি, এইরূপে লোকের নিকট মিথ্যা বলিয়া আমরা বাটী হইতে চলিয়া যাই। পথে আহারের নিমিত্ত আমাদের নিজের কিছু মাত্র ব্যয় করিতে হয় না কারণ পথিমধ্যে যে সকল স্থানে অতিথি সেবা আছে তাহা আমরা জ্ঞাত থাকিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই, অভাবে অন্তত ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করি। কার্য্য ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া হাট বাজারে কোন এক জন-শূন্য স্থানে বাসের জন্য স্থান নির্ণয় করি। আমরা জানি যে প্রত্যেক গ্রামে বদমায়েস এবং চোর আছে, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে আমাদের সহযোগী করি না এবং কাহারও নিকট উপযাচক হইয়া গ্রামের কোন সংবাদ অবগত হইতে চেষ্টা করি না।

আমাদের দুই প্রকার কার্য্য-প্রণালী আছে তাহার এক প্রণালী এই যে আমরা সকল সময়ে সকল গ্রামে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হই না। এক বৎসর আমরা কয়েক থানা গ্রামের কেবল সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সেই যাত্রায় সেই স্থানে ১০।১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া অধিবাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেও আমাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না এবং গ্রামে চুরি না হইলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহও করে না। এক বৎসর এইরূপ কেবল সংবাদ আহরণ করিয়া তাহার দুই এক বৎসর পরে সেই স্থানে আমাদের কার্য্য করিতে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। যথন অমারা চুরির মানসে সেই স্থানে পুনরাগমন করি তথন আমরা লোকের সহিত অধিক আলাপ না করিয়া ৫।৭ দিবসের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাই। চুরি করার মনস্থে গ্রামে উপস্থিত হইলে আমাদের বিবেচনায় ছদ্মবেশ ধারণ করা উচিত, তাহা ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে লক্ষিত গৃহের চতুর্দ্দিকে সেই বেশ উপযোগী কার্য্য উপলক্ষ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। যথা আমাদের স্ত্রীলোকেরা বৈষ্ণবী সাজিলে পুরুষেরা

দৈবজ্ঞ নচেৎ সাপুড়িয়া হইয়া সেই পল্লীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে চেষ্টা করে। গ্রামের যে পুষ্করিণী কিম্বা দীঘিতে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা স্নান করে, স্নানের সময় আমাদের ছদ্মবেশা বৈষ্ণবীরা হাত মুখ ধুইবার কিম্বা অন্য কোন ছুতা করিয়া সেই ঘাটে যাইয়া কোন্ বৌয়ের কিম্বা ঝিউড়ির অঙ্গে অধিক অলঙ্কার তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখে; পরে সেই বৌয়ের স্নান সমাপ্ত হইলে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় এবং তাহার সহিত এক সময়ে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বৌ কিম্বা ঝিউড়ি কোন ঘরে যায় তাহা দৃষ্টি করে। আমাদের জানা আছে যে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের একটি স্বভাব এই যে, ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিয়া তাহারা কাপড় ছাড়িবার জন্য আপন আপন শয়ন ঘরে প্রবেশ করে। ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীরা সেই কক্ষ নির্ণয় করিলে পরে পুরুষেরা অর্থাৎ আমরা সেই ঘরের পিছাড়া অনাবৃত কি না এবং গৃহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত কি খোলা, বেষ্টিত হইলে কোন্ দিকে কয়টা দ্বার ইত্যাদি সমুদয় আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত যত্নের সহিত ঠিক করি। যে ঘরে কচি শিশু, পীড়িত কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তি শয়ন করে, তাহাতে আমরা চুরি করিতে চেষ্টা করি না। যে ঘরে চুরি করিব বলিয়া স্থির করি তাহার পুরুষ লম্পট কি না এবং সে কোন সময়ে ঘরে আসিয়া শয়ন করে তাহাও আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক। এই রূপে সকল বিষয়ের সুবিধা দৃষ্ট হইলে যে রাত্রিতে চুরি করিব তাহার পূর্ব্বেই কোন্ স্থানে আসিয়া অপহৃত মাল গোপন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া রাখি। মাঠ কিম্বা জঙ্গলের অগম্য স্থানে যেখানে বিষ্ঠা অথবা শ্মশানের বস্ত্র কিম্বা শয্যা খণ্ড থাকে সেই স্থানই আমরা এই কার্য্যের নিমিত্ত মনোনীত করি। যে রাত্রিতে চুরি করি তাহার পর দিবসেই আমরা সেই গ্রাম হইতে পলায়ন করি না কারণ তাহা হইলে আমাদের প্রতি অধিবাসীদিগের সন্দেহ হইলে, তাহারা আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে বরং ঘটনার পরে আমাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে দেখিলে সন্দেহের কারণ হয়না এবং সন্দেহ হইলে তল্লাস করিয়া আমাদের নিকট চোরা মাল না পাইলে, আমাদের আরও শ্লাঘার কারণ হয়। যে রাত্রিতে চুরি করিতে হইবে তাহাতে আমরা পারত পক্ষে কখনও অধিক রাত্রে প্রবেশ করিনা। বেদিয়াচোর মাত্রেই সন্ধ্যার পরে কার্য আরম্ভ করে। সীঁধ দিবার ঘরের পিছাড়া যদি অনাবৃত হয়, তাহা

হইলে আমরা নিকটস্থ কোন এক বৃক্ষের বহু পল্লব বিশিষ্ট এক শাখা কাটিয়া আনিয়া সংকল্পিত সিন্ধের ঠিক সম্মুখস্থিত স্থানে এমন করিয়া রোপণ করি কিম্বা লাগাইয়া রাখি, যে তাহার অন্তরালে বসিয়া থাকিলে মনুষ্যের দৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়না। এই রূপ শাখা সংস্থাপনের উপকার এই যে, রাত্রিকালে হঠাৎ কেহ তাহা দেখিলে স্বাভাবিক ঝোপড়া বন বলিয়া বিবেচনা করে অন্য কোন সন্দেহ করে না। ঘরের পিছাড়া অনাবৃত না হইলেও আমরা সুবিধা মতে ঐ রূপ আবরণ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহা পরিত্যাগ করি না কারণ উহার অন্তরালে বসিয়া খুব নিশঙ্ক চিত্তে কার্য্য করিতে পারি। শাখার অন্তরালে সংস্থাপিত হইয়া আমরা তৎক্ষণাৎ সিন্ধ ফুটাইতে আরম্ভ করি। ও দিকে বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থেরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এ দিকে আমরা নির্জ্জনে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সর্ব্বনাশের পন্থায় অগ্রসর হইতে থাকি, পরন্তু যখন বুঝিতে পারি যে, মৃত্তিকার প্রাচীর হইলে কেবল এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাটী কাটিতে, কিম্বা ইটের প্রাচির হইলে কেবল এক খানা মাত্র ইট খুলিতে বাকি আছে, তখন আমরা ক্ষান্ত হইয়া নিবিষ্ট মনে বাড়ীর, বিশেষত ঘরের, মধ্যে কে কি করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করি। ক্রমশ গৃহস্থদিগের আহারাদি চুকিয়া যায়, ঘরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া পান তামাক সেবনান্তে অন্য কোন কার্য্য থাকিলে, তাহা সমাধা করিয়া শয়ন করে। ইতি মধ্যে সমস্ত বাড়ীও নিস্তব্ধ হয়। আমাদের বহিতে লেখা আছে যে, রাত্রের ভাত ঘুমই বড় গভীর ঘুম, শীঘ্র ভাঙ্গে না, অতএব তখনই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার উপযুক্ত সময়। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক চোরে অনেক বিপদ-গ্রস্ত হইয়াছে সুতরাং যাবত পক্ষে আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অবহেলন করি না। যাই ঘরের লোকের নাসিকা ডাকিতে আরম্ভ করে, অমনি আমরা আর বিলম্ব না করিয়া অবশিষ্ট মাটী টুকু কাটিয়া কিম্বা ইষ্টক কয়েক খানা টানিয়া বাহির করিয়া, সিন্ধটা সমাপ্ত করি। নাসিকার শব্দ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের নাসিকা শব্দ শুনিতে পাইলেই সুবিধা নচেৎ এমনও কখন কখন ঘটে যে স্ত্রীটা ভ্রষ্টা, স্বামীর নিদ্রার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহা হইলেই আমাদের মুস্কিল উপস্থিত। কিন্তু এমন ঘটনা অতি বিরল, তথাপি আমাদের কত হিসাব করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহাই আপনাকে বুঝাইবার নিমিত্ত

ইহার উল্লেখ করিলাম। যদি ঘরের লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু আলোক নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অনেক মুর্খ লোকের বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্র-বলে শৃগাল কুকুরের ন্যায় রাত্রি কালে চোরের চক্ষু জ্বলে, নচেৎ কি প্রকারে আমরা অপরিচিত ঘরের মধ্যে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া কোনও জিনিষ পত্র ফেলিয়া না দিয়া অনায়াস নিস্তব্ধে কেবল বহু মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিতে কৃতকার্য্য হই। কিন্তু এইটি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। আসল কথা, এই যে গ্রীষ্মকালে আমাদের নিকট চকমকি ও গন্ধকের দিয়াসলাই* এবং শীতকালে ছোট একটা হাঁড়িতে তুঁষের আগুণ থাকে। এই চকমকি এবং দিয়াসলাইই আমাদের মহা মন্ত্র এবং ইহা দ্বারাই আমরা নিরাপদে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি। সিন্ধ ফুটাইয়া তাহার মধ্যে আমরা প্রথমে মাথা দিয়া প্রবেশ করি না, প্রথমে দুই পা চালাইয়া তদ্দ্বারা সিন্ধের মুখে কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না স্থির করিয়া পরে সমস্ত শরীর চালাইয়া দি এবং ঘরের মধ্যে যাইয়া অন্ধকারে দণ্ডায়মান হইলে উপরিস্থিত কোন দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়া আঘাত পাইবার এবং তাহাতে শব্দ হইবার আশঙ্কা থাকে, অতএব আমরা প্রথমে খাড়া হই না, বসিয়াই থাকি এবং সেই অবস্থায় দিয়াসলাই জ্বালি। সিন্ধের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরে চকমকি ঠুকিয়া একখানা কুল কাষ্ঠের কয়লা জ্বালিয়া হস্তে করিয়া তাহা ঘরের ভিতর আনয়ন করি। সিন্ধের বাহিরে থাকিয়াই গৃহস্থদিগের কথার শব্দে বিছানা সিন্ধের কোন দিকে স্থিত তাহা বুঝিতে পারি এবং দিয়াসলাই জ্বালিয়া সেই অনুমানের বলে বিছানার দিকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছায়া করিয়া বাম হস্তে দিয়াসলাই ধরিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এবং দিয়াসলাই খুব প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে ঘরের সমস্ত দিক নজর করিয়া কোন স্থানে কোন্ বাক্স সিন্দুক কি ভাবে আছে, তাহা নির্ণয় করি। বিশেষ অনেকবার এইরূপ কার্য্য করিয়া তাহাতে আমাদের এমন দক্ষতা জন্মে, যে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আমরা সেই গন্ধকের টিপটিপনী আলো-

---

* পাঠকগণের এই স্থানে স্মরণ রাখা উচিত যে আমার সহিত এই বেদিয়ার যখন কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তখন বিলাতি দিয়াসলায়ের প্রচলন হয় নাই।

কের দ্বারা ঘরের সমগ্র অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি। পরে দিয়াসলাই সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা তাহা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলি এবং তাহার পরে আমাদের আর আলোকের আবশ্যক হয় না। অনেক স্ত্রীলোকের শয়নের পূর্ব্বে অঙ্গের গহনা খুলিয়া বিছানার নীচে রাখিবার অভ্যাস আছে এবং দুই এক সময় আমরা তাহা শব্দে বুঝিতেও পারি। সেই নিমিত্ত আমরা বিছানার নীচে অনুসন্ধান না করিয়া ঘর পরিত্যাগ করি না। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের অঙ্গ হইতে আমাদের অলঙ্কার খুলিয়া লইতে হয় কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া আমরা নাসিকা কিম্বা কর্ণের অলঙ্কার কখনও স্পর্শ করি না, কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকা কিম্বা কর্ণ ছুঁইলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গলার, হাতের, কোমরের এবং পায়ের অলঙ্কার আমরা খুলিয়া কিম্বা কাটিয়া লইতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কার্য্য, বিশেষ পটুতা না জন্মিলে, সকল চোরে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারে না। শীতকালের রাত্রিতে অঙ্গের গহনা খুলিয়া লইতে হইলে নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে হাত দিবার অগ্রে আগুণের হাঁড়িতে আমাদের দুই হস্তই সেঁকিয়া গরম করিয়া লইতে হয়, কারণ তাহা না হইলে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের শরীরে ঠাণ্ডা হাত লাগিলে, তাহার জাগিবার সম্ভাবনা থাকে। বাক্স সিন্দুক বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গি। মাল হস্তগত করা হইলেই বেদিয়া চোর গৃহ পরিত্যাগ করে না। রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া হাঁড়িতে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা আমরা আহার করি, কারণ তাহা না হইলে সেই রাত্রে আমাদের আর আহার জুটিবার উপায় থাকে না। আমরা আহার করিয়া সেই বসুই ঘরে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করি। ইহা আমাদের একটি নিয়ম। আমাদের বিশ্বাস যে এই কার্য্য না করিলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। মাল হস্তগত করিয়া তাহা দিবসের স্থিরীকৃত স্থানে লইয়া যাইয়া গোপন করিয়া রাখি। আমরা এক গ্রামে এক সময়ে কখনও দুই বাড়ীতে চুরি করি না, তবে সহর বাজার ব্যাপক স্থানে তাহা করিয়া থাকি। এইরূপ ৫।৭ গ্রামে কার্য্য করিয়া যদি আমাদের বিবেচনায় পর্য্যাপ্ত টাকার মাল সংগৃহীত হওয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমরা ঝটিতি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করি। বিদেশ হইতে চোরা মাল লইয়া সহসা আমরা আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি না। গ্রামের বাহিরে কোন অপরিষ্কার স্থানে লুকাইয়া রাখি, পরে মহাজনকে তাহা দিবার

সময় হইলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সেই লুক্কায়িত দ্রব্য সকল বাহির করিয়া লইয়া আইসে।"

বেদিয়ার উপরি উক্ত বিবরণ শেষ হইলে পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "ধরা পড়িলে তাহারা কি করে?" "কি আর করিব? মারখাই। প্রথমে যাহাদের বাটিতে চুরি করিতে যাই তাহারা এক পত্তন খুব মারে, পরে প্রতিবাসিরা আসে এবং ক্রমে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মারে, গালি দেয়, এবং কেহ বা গাত্রে থুথু এবং প্রস্রাব করিয়া দেয়। কোনও কোনও গ্রামে অধিবাসীরা তাহাদের নিজের প্রহার প্রচুর শাস্তি বিবেচনা করে এবং থানায় চালান না করিয়া, অমনি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কেহ কেহ পুলিসে না দিয়া থাকিতে পারে না এবং তাহা হইলেই আমাদের বিপদ। গ্রাম বাসিরা চোরকে মারিলেও তাহাদের দয়ামায়া আছে কিন্তু পুলিসের ব্যাটাদের প্রাণে কিছু মাত্র দয়া মায়া নাই। কি প্রকারে একরার করাইবে কেবল তাহাই তাহাদের চেষ্টা এবং তাহা হইলেই তাহাদের খুব খোসনাম হয়।"

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কখনও একরার করিয়াছে কি না? উত্তর "হঁা এক ব্যাটা দারোগার কুহকে পড়িয়া আমি আমার জন্মের মধ্যে একরার একবার করিয়াছিলাম। এক চুরি মোকদ্দমায় আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরে। চুরিটা আমিই করিয়াছিলাম এবং মালও অনেক টাকার বাহির করিয়াছিলাম, দারোগার মনে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে আমিই চুরি করিয়াছি কিন্তু প্রথমে আমি কিছুতেই একরার করিলাম না। দারোগা তাহা দেখিয়া ৬।৭ জন চৌকিদারকে ডাকিয়া একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে হুকুম দিয়া বলিল যে এ ব্যাটাত দেখিতেছি একরার করিবে না, তবে ইহাকে গোর দিয়া প্রাণে মারিব। আমি এই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, যে কেবল ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু সত্য সত্যই চৌকিদার ব্যাটারা দারোগার কথা মতে একটা গভীর খাদ করিয়া আমাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মাটী চাপা দিতে আরম্ভ করিল। দারোগা কেবল 'ফ্যাল মাটী, ফ্যাল মাটী' বলিয়া হুকুম দেয়, আর চৌকিদারেরা আমার নাকে মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি করিয়া, মাটী ফেলিতে থাকে। মাটী যতক্ষণ বুক পর্য্যন্ত ছিল ততক্ষণও আমার মনে কোন ভয় হয় নাই কিন্তু যখন দেখিলাম যে মাটী গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং মাটী ফেলা কমি-

হয় না তখন আমি মনে করিলাম যে ব্যাটারা বুঝি যথার্থই আমাকে জীবন্তে গোর দিয়া মারিবে। কাজেই তখন আমি একরার করিয়া মাল গুলি দারোগাকে দেখাইয়া দিলাম এবং তিন বৎসর মেয়াদ খাটিলাম।" আমি শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে তাহাকে খুব এক পেট আহার দিয়া বিদায় করিলাম। ইহারাই ব্যবসায়ী সিন্ধেল চোর। অন্যান্য অনেক হঠকারী সিন্ধেল চোর আছে বটে কিন্তু তাহারা কোন নিয়ম মতে চুরি করে না। মনে যাহা আইসে তাহাই করে এবং তন্নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদাই ধরা পড়ে।

লুকোচুরি।

গঙ্গার কোলেতে ধীরে স্রোত ভাসি যায়।
 ঢেউ গুলি কুলু কুলু,
 আধ ঘুমে ঢুলু ঢুলু,
 আধই স্বপন গীতি গায়।
কূলে কূলে লাগি লাগি দূরে ধীরি ধায়,
গঙ্গার কোলেরে ধীরে স্রোত ভাসি যায়॥

আকাশের কোলে ধীরে তুলা-মেঘ বয়।
 উঠন্ত ফুটন্ত শশী,
 ছড়ায়ে চন্দ্রিকা রাশি,
 সোহাগের নীরবে হাসায়।
বিশাল আকাশ ভরি হৈম জ্যোতি রয়,
স্বরগ মরত এক—এক ভাব ময়॥

আজি সন্ধ্যা হাস্যময়ী পূর্ণিমা চাঁদিনী।
হাসিভরা মহাশূন্য, প্রফুল্লা মেদিনী।
ফুটন্ত তারকা মাল, ধবল জলদ জাল,
 হাসিছে প্রফুল্লে মধুর হাস,

ঘাসে ঢাকা গঙ্গাকূলে, বঙ্কিম গ্রীবায় দুলে
হাসিছে আধফুল্ল কুশ-কাশ,
সকলি হাসিতে ভরা, হাসিময় সব;
আনন্দ পূরিত এক মহা উৎসব॥

তেমতি হাসিয়ে আনন্দের হাসি,
অই গঙ্গার বেলায়,
জটা-ঘটা-ধারী, প্রকাণ্ড গঠন,
বৃদ্ধ বটের তলায়,
সুকুমার মতি, তরল প্রকৃতি,
ছোট বড় কটি ছেলে,
মিলে ভাই ব'নে, মেতে এক প্রাণে
দেখ, লুকোচুরি খেলে।
কেহ বা দৌড়ায় কেহ বা লুকায়,
কেহ বা হয়েছে চোর,
কেহ পড়ে ভূমে ধূলি লাগে গায়,
কাঁদিয়া করয়ে ভোর।
বট তরুবরে করিয়াছে "বুড়ী"
চোর যবে দূরে ধায়,—
হাঁপাতে হাঁপাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে
আসিয়া ছুঁইছে তায়॥

মন রে—আর কত ছুটিবি রে বল,
চোরের তাড়াতে কেন এত রে বিহ্বল?
গেছে চোর অন্য পথে অন্য দিকে তাড়া দিতে,
এই বেলা ত্বরা করি চল ভাই চল,
বুড়ীর চরণ ধরি হই রে শীতল।
অই দেখ, মাথায় চাঁদনী তাঁর করে ঝলমল,
পাদমূলে কূলে কূলে গঙ্গা কল কল।

কপালকুণ্ডলা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কপাল কুণ্ডলা এখন এক বৎসরের অধিক কাল নব কুমারের গৃহিণী। তাহার বেশ ভূষা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। বাহিরের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে সত্য সত্যই স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। 'মস্তকে কেশপাশ সুনিবদ্ধ কুসুম দাম পরিশোভিত। পরিধানে শুক্লাম্বর—নৈশ আকাশে 'অর্দ্ধ চন্দ্র দীপ্ত অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' গ্রন্থকার বলিতে-ছেন তাঁহার বর্ণ এখনও 'সেই রূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশ প্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে।' পাঠক, বুঝিলে কি এ মলিনতা কিসের? এই একটি কথায় সেই স্বতঃপ্রকাশিত সংসার জ্ঞান শূন্য কুমারি জীবনের সৌন্দর্য্যের সহিত এখন কার যত্ন শোভিত, প্রৌঢ় জীবনের সৌন্দর্য্যের কি পার্থক্যই প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ দু এক কথায় কতক গুলি ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত।

কপাল কুণ্ডলাকে বহির্দৃষ্টিতে ত এই রূপ দেখিলাম এখন একবার অন্ত-র্দৃষ্টিতে তাহাকে দেখা যাউক।

কপাল কুণ্ডলার সেই রূপই পরোপচিকীর্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি শ্যামাসুন্দরীর জন্য দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে কানন হইতে ঔষধ বিশেষ তুলিয়া আনিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার জন্য তিনি একবার তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে আধ আধ ভাবে নিষেধ করিতেছে—সম্পূর্ণ পারিতেছে না, কারণ শ্যামা এখানে স্বার্থান্ধ। শ্যামাসুন্দরী বলিতেছে, " * * * এত রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ ঝির ভাল। দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে? কপাল কুণ্ডলা উত্তর করিলেন 'ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' শ্যামাসুন্দরী বলিলেন 'আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বলিবে।' কপালকুণ্ডলা বলিল 'বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।' শ্যামা পুনরায় বলিলেন 'তাত হবে না কিন্তু তোমাকে

কহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।' কপাল কুণ্ডলা পুনরপি বলিলেন 'এমত অন্যায ক্লেশ হইতে দিও না।' শ্যামা নিরুপায় হইয়া, মনের কথাটা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, 'তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?'

কথা শুনিয়া কপাল কুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, 'ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তাহা হইলে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'

দেখিলে ত পাঠক! কপালকুণ্ডলার আভ্যন্তরিক কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার পরোপকারেচ্ছা, স্বাধীনভাব, সমস্তই অবিকৃত রহিয়াছে, অথচ একটু পরিবর্ত্তনও অবস্থা ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। কপাল কুণ্ডলা কিছু উদ্ধতা বা মুখরা হইয়াছে। এরূপ প্রকৃতির লোককে কোন নিয়মাধীন রাখিতে চেষ্টা করিলেই, এইরূপই ঘটিবে। ইহা কপালকুণ্ডলার দোষ নহে। এ দোষ, তোমাদিগের সামাজিক নিয়মের সহিত তাহার প্রকৃতির স্বাভাবিক বিরোধের। এ কপাল কুণ্ডলা এরূপ ক্ষেত্রে এরূপই হইবেই। এক বৎসরেই কি বিহঙ্গিনী পোষ মানিবে? সোণার হইলেও তাহার নিকট শিকল শিকলই বটে।

কপালকুণ্ডলার ঔদ্ধত্য কেবল যে শ্যামার নিকটেই প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। স্বামী নবকুমারকেও সে ছাড়িয়া কথা কহিত না। কপালকুণ্ডলা রাত্রে যখন ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছিল—নবকুমার তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনিও তখন গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিয়া অতি কোমল ও স্নেহ পরিপূর্ণ স্বরে তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কথা শুনা দূরে থাকুক, অপ্রসন্নতার সহিত তাঁহাকে বলিলেন 'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।' এই নবকুমার কপালকুণ্ডলার পরোপকারেচ্ছা বশত দুরন্ত কাপালিকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ছিলেন। সুতরাং কথাটি তাঁহাকে বড়বাজিল। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। আপত্তি করিলেন না সত্য, কিন্তু অভিমানিনী সর্পিণীর হৃদয়ে কিছু আঘাত করিলেন। বলিলেন 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

"কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।'

এ কি নির্দ্দয়তা নহে? নির্দ্দয়তা বই কি? কিন্তু সে কি করিবে? তাহার স্বেচ্ছাচারিণী প্রকৃতি সংসার বন্ধনে ক্লিষ্ট হইয়া ক্রমে জ্বালাতন হইয়া উঠিয়া ছিল। কর্ম্মে বাধা পাওয়া, তাহার অভ্যাস ছিল না। এখন পুনঃ পুনঃ তাহাকে বাধা দেওয়াতে সে বাধা বিঘ্নকে অনায়াসে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিল। শুধু তাই নহে, সেই জন্য তাহার স্বাধীন স্বভাব ঔদ্ধত্যে পরিণত হইল।

এইরূপে নবকুমারের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কপাল কুণ্ডলা অন্যমনা হইয়া তাহার কুমারী জীবন ভাবিতে ভাবিতে নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরে কিরূপে যে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণ বেশী পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল, তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। যখন ছদ্মবেশী পদ্মাবতীর সহিত কপাল কুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইল, 'উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপাল কুণ্ডলা নয়ন পল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন, কপাল কুণ্ডলা নয়ন পল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?'

আজ আমরা রবির সেই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। কি মনোহর স্পর্শ। বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও আলোকে চন্দ্রমাকেও পরাভূত করে। ইহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও মনোহারীত্বে দিবা রজনী উভয়কে পরাস্ত করে। আর, বঙ্কিম বাবুর ঐ একটি কথা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও অনেক বিস্তীর্ণ বর্ণনাকে বাহুল্যাংশে পরাভব করে। উপরোদ্ধৃত বৃহদাক্ষরে মুদ্রিত কথাটি আমাদিগের আর একদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সেই যে দিন কাননবাসিনী কুমারী কপাল কুণ্ডলা নবকুমার সন্দর্শনে তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি অনিমিক লোচনে নবকুমারের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই দিনকার কথা মনে পড়িল।

কুমারীর সহিত বিবাহিতার, কানন বাসিনী যোগিনীর সহিত সংসার বাসিনী গৃহিণীর, কপাল কুণ্ডলার সহিত মৃণ্ময়ীর—কি অপূর্ব্ব পার্থক্যই দেখিলাম। সত্যই কপাল কুণ্ডলা "কতক দূর গৃহ-রমণীর স্বভাব সম্পন্না হইয়া ছিলেন।' তিনি ব্রাহ্মণ কুমারের প্রশ্নের সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ কুমার কপালকুণ্ডলা নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কপাল কুণ্ডলা তুমি রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ ?" অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপাল কুণ্ডলা অবাক হইলেন কিছু ভীতাও হইলেন সুতরাং সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না। ব্রাহ্মণ-বেশা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছ ?" সহসা কপাল কুণ্ডলা বাকশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ কানন মধ্যে তোমরা দুজনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে ?"

এই এক বৎসর কাল ধরিয়া বিন্দু বিন্দু বাষ্পে যে এক খানি তরল মেঘ সঞ্চিত হইয়া কপাল কুণ্ডলার স্বভাব সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতেছিল সহসা তাহা নিরাকৃত হইল। কপাল কুণ্ডলার প্রকৃতি সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মৃণ্ময়ী আবার কপাল কুণ্ডলা হইলেন। অজ্ঞাত পুরুষের নিকট কোন গৃহ-রমণীর কি এইরূপ কথা সম্ভবে ? কিন্তু কপাল কুণ্ডলা ত গৃহ-রমণী নহে ? মৃণ্ময়ীর এখন মৃত্যু হইয়াছে।

ইহার পরে ভীত হইয়াও কপাল কুণ্ডলা কি রূপে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের বলিবার আবশ্যক নাই। তাহাত কপাল কুণ্ডলারই প্রকৃতি। কপাল কুণ্ডলাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া রাখিয়া যখন ব্রাহ্মণ-বেশা অন্যত্র বিলম্ব করিতেছিল, কপাল কুণ্ডলা কিছু সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। কপাল কুণ্ডলা দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলেন। পথে মনুষ্য পদ ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কপাল কুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণ-বেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভীত হইয়া তিনি আরও দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু গৃহপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কপাল কুণ্ডলা ভিজিতে ভিজিতে যাই প্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন—বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন প্রাঙ্গণ ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে, সাগরতীর প্রবাসী সেই কাপালিক। কপাল কুণ্ডলার জীবনের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এই খানে পরিসমাপ্ত হইল।

বিদ্যুতালোকে কাপালিক মূর্ত্তি দর্শন হইতে, শ্মশানভূমিতে নীত হওয়া পর্য্যন্ত, কয়েকটি ঘটনায় কপাল কুণ্ডলার জীবনের আর একদৃশ্য অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই বিবিধ ঘটনারাশি যেন একই সূত্রে বাঁধা। সেই কাপালিকদর্শন, সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত, লুৎফুন্নিসার সহিত কথোপকথনে কপাল কুণ্ডলার সেইরূপ আত্মত্যাগেচ্ছা, কপালের সেই অদ্ভুত ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শন, তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ, আর নবকুমারের সেই হৃদয় ভাব—সব গুলি মিলিয়া একটি বিচিত্র চিত্র হইয়াছে।

যখন কপাল কুণ্ডলা একাকিনী ঔষধের সন্ধানে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কুমারী জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল। "বালিয়াড়ির শিখরে যে, সাগর-বারি-বিন্দু-সংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালক-মণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল, অমল নীলানন্ত গগন প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল।" এই জাগরিত স্মৃতি লইয়া কপাল কুণ্ডলা যখন দেখিতেছিলেন, নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—তখন নিঃসন্দেহই তাঁহার সেই কাপালিকের কথা মনে পড়িতেছিল। কপালিকের সেই ভয়ানক বীভৎস কাণ্ড মনে করিতে করিতে যখন কপাল কুণ্ডলা এখানেও মৃত্যু সম্বন্ধীয় কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজীবনটি কাপালিকের সহিত একত্রিত হইয়া নিশ্চয়ই তাহার মনে উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বেশী লুৎফুন্নিসার সহিত কথোপকথনে অন্যরূপ ভাবনা আসিয়া এতক্ষণ সেই চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। তাই নিশীথে একাকিনী ঐরূপ করিয়া লুৎফুন্নিসার হস্ত হইতে ভীত চিত্তে পলাইয়া আসিয়া, ঐরূপ তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন বিদ্যুতালোকে কাপালিক মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন—রুদ্ধগতি জল প্রবাহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যে রূপ একেবারে জল রাশি সবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, কপাল কুণ্ডলার সেই চিন্তাগুলি তদ্রূপ বিস্মৃতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার হৃদয় প্রান্তরে প্রবাহিত হইল। "কপাল কুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন।" আমাদিগের কবি এইরূপে ধীরে ধীরে কপালকুণ্ডলার সেই অন্তর্ন্যস্ত বাহ্য-বিস্মৃত চিন্তা দৃষ্টিটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

"কপাল কুণ্ডলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়া

ছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল। কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, তৎকৃত ভৈরবী পূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল।

"পূর্ব্বদিকে ঊষার মুকুট জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল, তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট সাগর হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলেন। তরণী সুশোভিত, তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে। নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রায় গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে, আকাশ মণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণ বৃষ্টিতে ছুটা ছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘ সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক নিরূপণ হয় না, নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন দিকে বাহিবে স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল। গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল, বৃক্ষ প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে এক জন জটা জুট ধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীম কান্ত ঐ নব ব্রাহ্মণ বেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপাল কুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?' অকস্মাৎ কপাল কুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল 'নিমগ্ন কর।' ব্রাহ্মণ বেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, 'আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।' ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

কপাল কুণ্ডলার স্বপ্নের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলে, স্বপ্নের প্রকৃতি সহজেই অনুমিত হয়। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কবি Byron হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'I had a dream, which was not all a dream.'

এই স্বপ্নের পরে মৃণ্ময়ী সম্পূর্ণ কপাল কুণ্ডলা হইলেন।

নিদ্রাহইতে উঠিয়া কপাল কুণ্ডলা ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কুমারের এক পত্র পাইলেন। ব্রাহ্মণ বেশী সন্ধ্যার পরে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ-কুমার, সেই নিবিড় কানন প্রদেশ,—কপাল কুণ্ডলা সেই বনবাসিনী যোগিনী থাকিলেও বুঝি, কদাচ এ সাহস করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত রাত্রির নিদারুণ স্বপ্ন কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টবাদ ভৈরবী-ভক্তি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারে আর একরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কপাল কুণ্ডলা ব্রাহ্মণ বেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। গ্রন্থকার লিখিলেন, "বিজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না তাহাতে সন্দেহ, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপাল কুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না —সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহল-পরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীম-কান্ত-রূপরাশি-দর্শন-লোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ-বন-ভ্রমণ বিলাসিনী সন্ন্যাসী-পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী-ভক্তি-ভাব বিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নি শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।'

যথাকালে কপাল কুণ্ডলার সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। পদ্মাবতী আনুপূর্বিক আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি এখন সপ্ত গ্রামে আসিয়াছেন, সে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। হোমকারীর মনের অভিপ্রায় ও তাহার সহিত পদ্মার সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত সমস্তই কপাল কুণ্ডলা শুনিলেন। কাপালিক যে স্বপ্ন বৃত্তান্ত পদ্মাবতীকে বলিয়াছিলেন, কপাল কুণ্ডলা তাহাও শুনিলেন। স্বপ্নটি এই রূপ,—ভবানী ভ্রুকুটী করিয়া কাপালিককে বলিতেছেন 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্ব পুণ্য সকল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' কিন্তু ক্ষণপরে কাপালিকের প্রতি দয়া প্রকাশে বলিলেন, 'ভদ্র। ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপাল কুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যত দিন না পার, আমার পূজা করিও না।'

'স্বপ্ন শুনিয়া কপাল কুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। চিত্তমধ্যে

বিত্যাচ্চঞ্চলা হইলেন।” নিয়তিচক্র আর এক পাক ঘুবিল। অদৃষ্টজালে কপালকুণ্ডলাকে বেড়িয়া ধরিল। ভৈবরী ভক্তের জীবনের পবিণাম স্থির হইল, অদৃষ্ট বাদীৰ অদৃষ্ট স্থিব হইল।

লুৎফউন্নিসা এরূপ সময়ে কপাল কুণ্ডলাকে কহিলেন “ * * * তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কব।” কপাল কুণ্ডল কহিলেন “কি কবিব।”

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।” কপাল কুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেক ক্ষণেব পর কহিলেন, “স্বামী ত্যাগ কবিয়া কোথায় যাইব?”

লু। বিদেশে—বহু দূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, বাণীব ন্যায় থাকিবে।

“কপাল কুণ্ডলা আবাব চিন্তা কবিতে লাগিলেন। পৃথিবীব সর্ব্বত্র মানস লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকবণ মধ্যে দৃষ্টি কবিয়া দেখিলেন— তথায় ত নবকুমাবকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ উন্নিসাৰ সুখেব পথ বোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন।

‘তুমি আমাব উপকাব কবিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পাবিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীবও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখেব পথ কেন বোধ কবিব? তোমাব মানস সিদ্ধ হউক— কালি হইতে বিঘ্ন-কাবিণীব কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচব ছিলাম, আবাব বনচব হইব।’

পাঠক! বিস্মিত হইলে। যদি কপাল কুণ্ডলাকে ভাল কবিয়া চিনিতে পাবিয়া থাক, বিস্ময়েৰ কোন কাবণ নাই। ইহাই কপাল কুণ্ডলাব প্রকৃতি, ইহাই তাহাব স্বাভাবিক উত্তব। সময়োচিত ত বটেই। এতৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকাব যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“লুৎফ উন্নিসাব সম্বাদে কপাল কুণ্ডলার একেবারে চিত্ত ভাব পবিবর্ত্তিত হইল, তিনি আত্ম বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্ম বিসর্জ্জন কি জন্য! লুৎফ উন্নিসাব জন্য। তাহা নহে।

“কপাল কুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রাসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সংকোচ শূন্য, কপাল কুণ্ডলাও সেই

রূপ আকাঙ্ক্ষায় আত্ম বিসর্জ্জন। কপাল কুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তি-প্রসাদ-প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি অহর্নিশ শক্তি-ভক্তি শ্রবণ দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানু রাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল, ভৈরবী যে সৃষ্টি-শাসন-কর্ত্রী মুক্তি-দাত্রী ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজা ভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পর দুঃখে দুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই জগৎ-শাসন-কর্ত্রী সুখ-দুঃখ-বিধায়িনী, কৈবল্য-দায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপাল কুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন।

"তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার দুঃখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসার মধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে! কদাচিৎ যদি আত্ম-কর্ম্ম দোষে সেই প্রত্যাশা সফলী কৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তাহা হইলেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল। নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসার মধ্যে বদ্ধ মূল, ছাড়িতে চাহিনা। কিন্তু এ সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপাল কুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধন ছিল না। তবে কপাল কুণ্ডলাকে কে রাখে?

"যাহার বন্ধন নাই তাহারই অপ্রতিহতবেগ। গিরি শিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? কপাল কুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতি স্থাপন করিবে? নবীন করি-করভ মাতিলে, কে তাহাকে শান্ত করিবে?"

কপাল কুণ্ডলার চরিত্র ব্যখ্যা, হইল। নবকুমারের প্রতি যে তাহার একাগ্র স্নেহ ছিল না গ্রন্থকার তাহা কপাল কুণ্ডলার কার্য্য দ্বারা বলাইলেন, নিজেও বলিলেন। আমরা ইহার কারণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি! এক জনের প্রতি স্নেহ কেন্দ্রীভূত করিতে, কপাল কুণ্ডলা পারিত না; তাহার হৃদয় সে অধীনতা টুকু সহ্য করিতে শিখে নাই। কপাল কুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা কানন-বাসিনী সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা অপূর্ব্ব রমণী।

"কপাল কুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চ ভূত লইয়া কি হইবে?"

প্রশ্ন করিতে ছিলেন অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতে ছিলেন না; সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চ ভূতের একটা বন্ধন আছে।

"কপাল কুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্য হৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থ প্রত্যক্ষী ভূত বলিয়া বোধ হয়। কপাল কুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়া ছিল। যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল 'বৎসে আমি পথ দেখাইতেছি।' কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশ মণ্ডলে নব-নীরদ-নিন্দিত মূর্ত্তি। গল-বিলম্বিত নর-কপাল-মালা হইতে শোণিত স্রুতি হইতেছে, কটি মণ্ডল বেড়িয়া নর কর রাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধির ধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালা-বিভাসিত, লোচন প্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপাল কুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

"কপাল কুণ্ডলা ঊর্দ্ধ মুখী হইয়া চলিলেন। সেই নব কাদম্বিনী-সন্নিভ রূপ আকাশ মার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখন কপাল মালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখন নয়ন পথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপাল কুণ্ডলা তাহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।"

অদৃষ্ট নেমীর আবর্ত্তন ফুরাইল। কপালকুণ্ডলার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, মানুষের যাহা কিছু তাহা এখন তাঁহার নাই। তিনি এখন যোগিনী শ্রেষ্ঠ। মনের যখন এরূপ অবস্থা, নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, 'কপাল কুণ্ডলে!'

"কপাল কুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। বুঝি মনে ভাবিলেন ভৈরবী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপাল কুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপাল কুণ্ডলা প্রথমে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,—

'তোমরা কে? যম দূত?'

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন,—

'না না পিতঃ তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?' কথা দুইটির সহিত তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাবের ও তাঁহার প্রকৃত স্বভাবের কিরূপ সম

হইল দেখিলে, ইহাকেই নাটকত্ব বলে। যেরূপ কথা গুলির মনোভাবের সহিত মিল আছে, মনোভাবের সহিত আবার ঘটনাবলির সেই রূপই লয় আছে। কপালকুণ্ডলা তাল মান লয় বিশুদ্ধ একটি মনোহর সঙ্গীতই বটে।

"নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন, 'বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।' এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

"কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী ঘন ঘন হাসিতেছে, এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিক-গত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্ট বিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।'

কপালকুণ্ডলা এইরূপে প্রেতভূমে আনীত হইল। কাপালিক যথারীতি ভৈরবীর পূজা সমাধানান্তে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে বলিলেন।

"নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একখণ্ড জলপূর্ণ শ্মশানকলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়াছিল, হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। * দুইজনেরই তাহাতে পদ স্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন * * * নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশু সকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুইজনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল; কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহবা পদ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে, কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প।"

"কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিন্। ভয় পাইতেছ?' এইখানে

---

* এই অন্তিম সময়েও কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের কবি বিস্মৃত হইলেন না। 'হতভাগার কেহ সৎকারও নাই' এই কথাটি কি সুন্দর! করুণ ভাবব্যঞ্জক।

আমরা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কিছু কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। দুই একটি রাগের কথা ছাড়া কপালকুণ্ডলাকে আমরা নবকুমারের সহিত বিবাহিতাবস্থায় কথা কহিতে শুনি নাই। প্রলোভনটি ত্যাগ করায় কবির মনের উপরে আধিপত্য যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি আমি ইহা নিশ্চয়ই পারিতাম না। এমন নায়ক নায়িকা পাইয়া দুইটা প্রণয়ালাপ না করাইয়া কি আমরা থাকিতে পারিতাম! কবি এ পুস্তকখানি লিখিবার সময়ে তরুণ বয়স্ক হইলেও, মনের উপরে তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রকাশে তিনি সম্যক্ অভ্যস্থ দেখিতে পাই। এইরূপ ক্ষমতা লেখকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কবির ক্ষমতা যথেষ্ট থাকিলেও, কপালকুণ্ডলার ন্যায় চরিত্র লইয়া সর্ব্বদা খেলা করা তাঁহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদিগের বোধ হয়, কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের প্রণয়ালাপ সংঘটন করাইলে, কবি তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেন না।

নবকুমার গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, 'ভয়ে, মৃন্ময়ী? তাহা নহে।' কপালকুণ্ডলা সমস্তই বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কাঁপিতেছ কেন?' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে কহিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল সেই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?"

গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া গেলেন যে, কপালকুণ্ডলা এখন নবকুমারের কষ্ট অনুভব করিয়া আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের দুঃখে দুঃখিতা। বিপন্নের প্রতি দয়া দয়ার্দ্র চিত্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আমরা কপালকুণ্ডলাকে কি ভাবে দেখিয়াছিলাম? কোন প্রলয় ঝটিকা পরে প্রকৃতি যেমন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে কপালকুণ্ডলাও তাহাই করিয়াছিলেন। ভয়ে ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি কেবল সেই ভয়ভক্তির নিবতিশয়তার পরিণাম ফল ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু নবকুমারের দুঃখ দেখিয়া আবার তাহা স্বভাবস্থ হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বেও পতিত শবদেহ বেষ্টনে তাহার কিছু স্ফুরণ হইয়াছিল। যেরূপ অগ্নিউৎপাদক প্রস্তর বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্তরবৎ থাকিয়াও দ্রব্যবিশেষের ঈষৎ আঘাতেও অগ্নি উদ্গীরিত

করে, কপালকুণ্ডলার মনেও ঠিক সেইরূপ, শ্মশান দেখিয়া, অসংকৃত শবদেহ দেখিয়া, পরিশেষে নবকুমারের ভ্রমমূলক দুঃখরাশি দেখিয়া, দয়াগ্নি বিভাসিত হইল। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; বুঝি কপাল কুণ্ডলার পরিণাম ভাবিয়া তাহা আরও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। চিরদিন যাহার সহিত একত্র বাস করিয়া আসিয়াছি, তাহাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। কপালকুণ্ডলা ত নবকুমারের পত্নী। অন্য পত্নীর ন্যায় তাহার স্নেহ নাই বা থাকিল, এরূপ অবস্থায় কি সে পাষাণবৎ স্থির থাকিতে পারে?

নবকুমার কহিলেন, 'ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।'

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, 'কাঁদিবে কেন?'

এই স্বরের সহিত লয় রাখিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিলেন 'আবার সেই কণ্ঠ!'

নবকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে মৃণ্ময়ীর পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'মৃণ্ময়ী!—কপাল কুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল, যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহ লইয়া যাই।'

"কপালকুণ্ডলা হাতে ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন 'তুমিত জিজ্ঞাসা কর নাই।' দম্পতির হৃদয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ নদীতে এখন জলোচ্ছাস আরম্ভ হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা একটি আড়লির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা বলিলেন, 'তুমিত জিজ্ঞাসা কর নাই।'

মৃত্যুকালীন কুন্দের সেই ঈষৎ তিরস্কার ব্যঞ্জক, মৃদু, মধুর, স্নেহপরিপূর্ণ কথা শুনিয়াছি, দেসদিমোনার সেই আসন্ন কালীন প্রার্থনাবাক্য শুনিয়াছি, কিন্তু এই কোমল এই মধুর, এই স্নেহপূর্ণ, এত স্বভাব ব্যঞ্জক—কথা ত কখনও শুনি নাই।

"নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ী! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

'কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে

দখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃণ্ময়ি।—না—'এইরূপ উচ্চশব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্র-বায়ু-তাড়িত এক বিষম নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল, অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপাল কুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদী প্রবাহ মধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।'

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্ত, বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল।"

গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইল। যেন আমাদিগের একটি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, যেন সঙ্গীতের বিরতি-ব্যঞ্জক স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আকাশের সহিত লীন হইয়া গেল। যেন প্রিয়জনের শবভস্মকারী শ্মশানাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল!

পানিপতের যুদ্ধ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের পারস্য গ্রন্থ হইতে)

২।

"দশহরার দুদিন পরে অর্থাৎ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর আহমদশাহ শিবির ভঙ্গ করিবার আদেশ করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া দিল্লি হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে বাগপত নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে যমুনার জল অগভীর থাকে কিন্তু তখনও নদী প্লাবিত ছিল, এজন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও পার হইতে পারিলেন না।

অনেকগুলি অশ্বারোহী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরিল। এই বিপদে শাহ ঈশ্বরের সাহায্য কামনায় দুই দিন উপবাসী থাকিয়া ভজনা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে এক অগভীর স্থান আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু তাহা এত অপ্রশস্ত এবং উভয় পার্শ্বে এত গভীর জল সমাকীর্ণ, যে তদ্দ্বারা পার হওয়া বিষম বিপদময় বোধ হইল। যাহা হউক ২৩ শে অক্টোবর সৈন্য পার হইতে আরম্ভ করিল এবং অর্দ্ধ সৈন্য পর পারে পৌঁছিলে দুরানী শাহ পার হইলেন। সমস্ত সৈন্য পার হইতে দুই দিন লাগিল। লোক সংখ্যা অধিক থাকাতে এবং অত্যন্ত ত্বরা বশতঃ বিস্তর লোক প্রাণ হারাইল।

সৈন্য পার হইবা মাত্র দুরানী শাহ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরাও তদভিমুখে অগ্রসর হইল। ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্নে সুমলকা সরাই নামক স্থানে উভয় পক্ষের অগ্রগামী সেনাংশের যুদ্ধ সংঘটন হইল। ২০০০ মহারাষ্ট্রীয় হত হইলে, সন্ধ্যার সময় তাহারা হটিয়া গেল। হত আহত দুরানী সৈন্য প্রায় একহাজার হইবে। যুদ্ধান্তে দুরানীরা শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

পর দিন দুরানী শাহ আরও অগ্রসর হইলেন এবং প্রত্যহ সামান্য প্রকার যুদ্ধ করিতে করিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। এবং এই প্রকারে পানিপতে পৌঁছিলেন। পানিপতের বহিঃস্থিত মাঠে সদাশিব ছাউনি স্থাপন করিলেন। ঐ মাঠ এবং পানিপত নগর ৬০ ফুট প্রশস্ত এবং ১২ ফুট গভীর পরিখাদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দৃঢ় প্রাচীরের উপর তোপ সাজাইলেন। মহারাষ্ট্র সেনার ৪ ক্রোশ দূরে দুরানী শাহ শিবির স্থাপন করিলেন। কুচের সময় প্রতিরাত্রে তাহার ছাউনীর চতুর্দ্দিকে কর্ত্তিত বৃক্ষ মাত্র রক্ষিত হইত, এবার ছাউনি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় রূপে রক্ষিত হইল। তাঁহার ছাউনী ৩ ক্রোশ ব্যাপৃত। শাহের তাঁবু সর্ব্ব মধ্য স্থলে, তাহার বাম দিকে ক্রমান্বয়ে নবাবসুজা ও নজীব উদ্দৌলা রহিলেন, দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে হাফিজ রহমত খাঁ, দুদী খাঁ এবং আহমদ খাঁ বঙ্গশ রহিলেন।

কোরা, করাহ এটোয়া সেকোয়াবাদ বারি প্রভৃতি যমুনার পর পারস্থ মহকুমার কর আদায় এবং দাবাবণ রক্ষাকার্য্যের জন্য গোবিন্দ পণ্ডিত নামে মহারাষ্ট্র সেনাপতি নিযুক্ত ছিল। দুরানী শাহের পশ্চাদ্ভাগে রসদ ও সংবাদ পরিচালন বন্দ এবং যথা সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য সদাশিব

তাহাকে অনুমতি করিয়াছিলেন। গোবিন্দ পণ্ডিত ১০।১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মিরট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, এবং দুরানীদিগের রসদ সংগ্রহ এরূপ বন্ধ করিয়া দিল, যে দুরাণী সৈন্য মধ্যে খাদ্য প্রাপ্তি দুষ্কর হইয়া উঠিল। এমন কি মোটা আটা টাকায় ৪ সের বিক্রীত হইতে লাগিল। সৈনিকেরা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। দুরানী শাহ্ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রধান উজিরের ভ্রাতুষ্পুত্র আতাই খাঁর অধীনে ২ হাজার বাছা অশ্বারোহী সৈন্য ন্যস্ত পূর্ব্বক গোবিন্দ পণ্ডিতের মস্তক ত্বরায় আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আতাই খাঁ আরও ৮।১০ হাজার অনিয়মিক অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রি ৪০ ক্রোশ কুচ করিয়া প্রত্যূষে বজ্রপাতের ন্যায় বেগে গোবিন্দ পণ্ডিতের শিবির আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা নিশ্চিন্ত ছিল হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, গোবিন্দ পণ্ডিত স্বয়ং একটা তুর্কী অশ্বারোহণ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা বশত এবং অশ্বচালনায় ভাল অভ্যাস না থাকাতে, পলাইতে সক্ষম হইল না। দুরানীরা তাহার মস্তক ছেদন করিল। শিবির লুণ্ঠন এবং বহুসংখ্যক পলাইত মহারাষ্ট্রীয়েরপ্রাণ বধ করিয়া আতাই খাঁ চতুর্থ দিবসে শাহের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গোবিন্দ পণ্ডিতের মুণ্ড উপহার দিল। শাহ পরম পরিতুষ্ট হইয়া আতাই খাঁকে মহামূল্য খেলাত যৌতুক দিলেন। এই ঘটনার পর রসদ সংগ্রহে দুরানীদিগের আর কষ্ট পাইতে হয় নাই।

এই দারুণ সংবাদ এবং অন্যান্য অমঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সদাশিব অতিশয় কাতর হইলেন। কিন্তু তিনি গম্ভীরস্বভাব ও দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন, কাতরতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি প্রকাশ পাইল না, বরং ঐ সকল অমঙ্গল ঘটনাকে সামান্য বলিয়া তিনিপ্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ পণ্ডিতের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে সদাশিব ব্যয় সংকুলানের জন্য নারুশঙ্করের নিকট হইতে অর্থ আনয়ন জন্য ২ হাজার অশ্বারোহী দিল্লি পাঠাইলেন। ঐ সৈনিকেরা গোপনে রাত্রিযোগে অব্যবহৃত পথদ্বারা প্রত্যেকে ২ হাজার টাকার তোড়া লইয়া আসিতেছিল। পথে কোন বিপদ ঘটে নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে দিন পানিপত পৌঁছিবে, রাত্রি ঘোর অন্ধকার থাকায় পথভ্রান্ত হইয়া মহারাষ্ট্র শিবির জ্ঞানে একেবারে দুরানী শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দুরাণারা তাহাদের ভাষা দ্বারা শত্রু বলিয়া জানিতে পারিয়া তত্ত্বর

পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সকলেরই প্রাণবধ করিল এবং অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

ছাউনী স্থাপনের দিনেই আহমদ শাহ ছাউনীর সম্মুখে ৩ ক্রোশ দূরে একটি ছোট লাল তাঁবু লাগাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে এইখানে আসিয়া নমাজাদি করিতেন, পরে পুত্র তৈমুর শাহ এবং ৪০।৫০ জন অশ্বারোহী অনুচর সঙ্গে লইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে ছাউনীর সমস্তস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বিপক্ষের ছাউনী পরিদর্শন করিতেন। ফলত সমস্ত বিষয় স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন। এই প্রকারে প্রত্যহ তাঁহাকে ৪০।৫০ ক্রোশ অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে হইত। দ্বিপ্রহর সময়ে হয় উক্ত ছোট তাঁবুতে না হয় ছাউনীতে নিজশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া আহার করিতেন। প্রত্যহই এইভাবে চলিত।

রাত্রিকালে ৫ হাজার অশ্বারোহী বিপক্ষের ছাউনীর দিকে যথা সম্ভব অগ্রসর হইয়া সমস্ত রাত্রি সশস্ত্র জাগরুক থাকিত। কতক সৈন্য ছাউনীর চারিপার্শ্বে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রহরী থাকিত। আমহদ শাহ হিন্দুস্থানী সর্দ্দারগণকে বলিতেন, মহাশয়েরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাউন, আমি সতর্ক আছি আপনাদের কোন বিপদ হইবে না। বাস্তবিক দুরানীশাহের বাক্য অলংঘ্য ভবিতব্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইত। তাঁহার অনুমতি পালন করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব বা ইতস্তত করিতে কাহারও সাহস হইত না।

প্রায় প্রত্যহই উভয় পক্ষ স্ব স্ব সেনা ও তোপ অগ্রসর পূর্ব্বক সমস্তদিন দূর হইতে তোপ চালাইত এবং মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহীগণের সামান্য যুদ্ধও হইত। সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিত। এই প্রকারে তিন মাস অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে তিন বার কিছু গুরুতর কিন্তু আংশিক যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমবার ১৭৬০ সালের ২৯শে নবেম্বর তারিখে প্রায় ১৫ হাজার মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রধান উজিরের শিবির আক্রমণ করিয়া পরাজয়প্রায় করিল, তৎক্ষণাৎ সাহায্য প্রেরিত হইলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা হটিয়া গেল। দুরানীরা তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনেক হত্যা করিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ৪০০০ হাজার লোক হত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বার, ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে নজীবুদ্দৌলা আপন সৈন্য সহিত কিছু অধিক দূর অগ্রসর হইলে

বলবন্ত রাও তাহাকে এমন ঘোরতর রূপে আক্রমন করিল যে ৫০ জন সোয়ার ভিন্ন নজীবের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ঐ সামান্য সংখ্যক অনুচর লইয়া নজীব সাহস সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন,. শীঘ্রই সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল, পুনরায় তুমুল সংগ্রাম বাধিল। এই যুদ্ধে নজীবের ৩০০০ হাজারের অধিক সৈন্য ক্ষয় হয়, এবং নজীবের পিতৃব্য খলিলুন রহমান হত হয়। রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সময় একটা বন্দুকের গুলি লাগিয়া বলবন্তের মৃত্যু হওয়ায়, উভয় পক্ষ আপন আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। তৃতীয় বারের যুদ্ধও ঐ প্রকার তুমুল হইয়াছিল।

এই প্রকারে প্রত্যহই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে হিন্দুস্থানি মুসলমান সর্দ্দারেরা ধৈর্য্য চ্যুত হইয়া জয়-পরাজয়-নিশ্চয়-কর যুদ্ধে নীত হইয়া কষ্টের অবসান করিবার জন্য, দুরানী শাহকে মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু কথা উত্থাপন হইলেই দুরানী শাহ এই বলিয়া বুঝাইতেন "এই সব যুদ্ধকার্য্যের বিষয় তোমরা বিশেষ অবগত নহ, অন্য সমস্ত বিষয়ে তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও, কিন্তু এ কার্য্য আমার ভার, সকল কার্য্যে তাড়া তাড়ি করিতে নাই। আমি যে রূপে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করি স্থির হইয়া দেখ, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আমি অবশ্যই সুপরিণামে নীত করিব"।

মহারাষ্ট্র শিবিরে রসদ পৌঁছিতে না পারে এজন্য দুরানীরা রাত্রিদিন অবহিত চিত্তে প্রহরী ছিল, সুতরাং রসদ ও ঘাসদানার জন্য মহারাষ্ট্র শিবিরে মহা কষ্ট উপস্থিত হইল। এক দিন রাত্রে তাহাদের প্রায় ২০০০০ বিশ হাজার শিবিরানুচর ঘাস ও ইন্ধন সংগ্রহের জন্য কিছু দূর জঙ্গলে গিয়া পড়িয়াছিল। শাহ পছন্দ খাঁ সে রাত্রিতে দুরানী দিগের প্রহরী ছিল। সে ৫০০০ হাজার অশ্বারোহীর সহিত তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া প্রায় সকলেরই প্রাণহত্যা করিল। মহারাষ্ট্র শিবির হইতে ঐ হতভাগ্যগণের সাহায্যার্থ কেহই আসিল না। প্রাতঃকালে দুরানী শাহের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অনেক সর্দ্দারগণে পরিবৃত হইয়া হত্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মৃতদেহের স্তূপ পর্ব্বতাকার হইয়া রহিয়াছে। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে যে কি ঘোরতর শোক ও ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বয়ং ভাও এক্ষণে ভয় এবং নিরাশায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক

হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার।

যখন নবজীবনের অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, বাঙ্গালী চির দিনের দলাদলি ভুলিয়া, প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া, কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সকল প্রকাশের এক মহা অনুষ্ঠান করিতেছেন। একদিকে শশধর তর্ক চূড়ামণি প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত, অপর দিকে বঙ্কিম বাবু প্রমুখ নব্য লেখকাগ্রণীগণ যখন নবজীবনের নিয়মিত লেখক হইবেন, তখন আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের, তুলনায় সমালোচন, এবং বিশদ ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া, কোন্ দেশের শাস্ত্রে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে এমন রাসায়নিক সংযোগ কখনও ঘটে নাই। রাজা রাম মোহন রায়ের সময়ে এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত সংস্কারাভাবে তদানীন্তন নব্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন (পণ্ডিত) সম্প্রদায়ের একতা বন্ধন হয় নাই। উভয় পক্ষের দলাদলিতে ধর্ম্ম বিপ্লবই উপস্থিত হইয়াছিল। বেদান্ত শাস্ত্রের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বচনের অভিনব ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বোদর ভাব বিলুপ্ত হইয়া অনুদার মতেরই পরিপোষণ হইয়াছিল। তাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে রাম মোহন রায়ের সাধু সঙ্কল্পে গুণাপেক্ষা দোষের ভাগ অধিক লক্ষিত হয়। নবজীবনের অনুষ্ঠান পত্র পাঠে লোকের মনে সেরূপ কোন আশঙ্কা জন্মে নাই। কেননা নবজীবনের লেখকগণ খৃষ্টান পাদ্রিগণের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা রাম মোহন রায়ের উত্তরাধিকারিত্ব করিতেছেন না। নবজীবনের লেখকগণকে কেহ বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব নব্য ধর্ম্ম সংস্কারক দলের নেতা বা অনুষ্ঠাতা ভাবে দেখে নাই। নবজীবনের লেখকগণ বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র। শশধর তর্ক চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যে প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয় গ্রাহী হইবে, এবং বঙ্কিম বাবু প্রমুখ সুলেখকগণের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যে সাধারণ হিন্দু বিশেষত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়স্পর্শী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ সকল শ্রেণীর লেখকগণের একত্র সম্মিলনে নবজীবন

যে সকল শ্রেণীর পাঠকের আদরের সামগ্রী হইবে, এ আশা কে না করিয়াছিল? কিন্তু বাঙ্গালার যে তামসী নিশীর আজও অবসান হয় নাই; এখনও বাঙ্গালীর প্রতি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ অপ্রসন্ন। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-নবজীবন প্রাপ্তির এখনও কাল বিলম্ব আছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিশ্বাস, কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় বাঙ্গালীর হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর হইবে না, বরং বদ্ধমূল হইবে। এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী নব্য ধর্ম্ম সংস্কারক-দিগের পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য ভাবের ধর্ম্মান্দোলনেও বাঙ্গালী নবজীবন প্রাপ্ত হইবে না। তাহা হইলে 'বঙ্গদর্শন, 'বান্ধব' 'আর্য্য দর্শন' 'ভারতী' প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রিকা গুলির চেষ্টাতেই সে কার্য্য সম্পাদিত এবং ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, সত্যব্রত সমাশ্রমী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লেখনী চালন ব্যর্থ হইত না। বঙ্গদর্শনের তিরোভাবের পর (কেবল নব্য সম্প্রদায়ের সম্মিলনে) ধর্ম্মসংস্কার জন্য নবজীবনের আবির্ভাবে বিশেষ কোন ফল হইবে না বলিয়াই, সাধারণের বিশ্বাস। পরন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মুখপাত্র কোন পত্রিকাও সে আশা পূর্ণ করিতে পারিবে না। তবে প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায়ের লেখকাগ্রণীগণের রাসায়নিক সম্মিলনে সে আশা পূর্ণ হওয়ায় বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তাই বাঙ্গালি হিন্দু মাত্রেই নবজীবনের অনুষ্ঠান পত্র পাঠে আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সে আশা যেন নিরাশায় পরিণত হইতে চলিল। বাঙ্গালীর সেই চিরন্তন কুপ্রথা দলাদলি এবারেও তিরোহিত হইল না! যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সরল নিরপেক্ষ ভাবে বুঝাইবেন বলিয়া নবজীবনের অনুষ্ঠান পত্রে দেখা দিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীই আজ একটি প্রতিযোগী পত্রের সৃষ্টি করিতেছেন। কোথায় প্রাচীন ও নব্যদলের রাসায়নিক সংযোগে পূর্ণশক্তি সঞ্চার হইয়া বঙ্গে নবধর্ম্ম-যুগের আবির্ভাব হইবে, না—সেই ভট্টাচার্য্য ও শিক্ষিত দলের চির দিনের দলাদলিরই পুনরাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। এ সংযোগে বিয়োগ কেন হইল? সেই তত্ত্ব যথাজ্ঞানে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব বলিয়াই, আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সকলেই জানেন, প্রচার নবজীবনের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন; যুগল সহোদর আজও সেই সৌভ্রাত্র ... মে

বিমুগ্ধ হইয়া একই ভাবে, একই উদ্দেশ্যে জীবন তরী ভাসাইয়াছেন। সুতরাং নবজীবনের কথা বলিতে গেলেই আপনা আপনি 'প্রচারের' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে। এজন্ত পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, আমরা যখনই নবজীবন ও প্রচারের কথা বলিব, তখনই নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি মনে করিবেন। অপিচ আমরা 'নবজীবন' ও প্রচারকে 'এক আত্মা ভিন্ন দেহ' বলিয়াই মনে করি। পাঠকগণও সেই রূপ মনে করিবেন। নচেৎ নবজীবন ও প্রচারকে পৃথক্ ভাবিলে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না। আমরাও নবজীবন হইতে প্রচারকে দূর-সম্পর্কিত ভাবে দেখাইলে গোলে পড়িব।

আমাদের বোধ হয়, প্রচারের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম বাবুর 'হিন্দু ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ এবং তৎপরে নবজীবনে শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা নামক প্রবন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশিত হওয়াতেই প্রাচীন সম্প্রদায় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতের উপর বীত শ্রদ্ধ হন। আবার এই সময়ে প্রচারে ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের সমালোচনে হিন্দু ধর্ম্মের গোড়াপত্তন বুঝাইতে গিয়া বঙ্কিম বাবু প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর বিষ নয়নে পড়েন। এবং ইহার সম সময়ে (নবজীবনের দ্বিতীয় খণ্ডে) রমেশ বাবু ঋগ্বেদের দেবগণ নামধেয় প্রবন্ধ ক্রমশ প্রকাশ করিয়া ঋগ্বেদের অনুবাদের আভাস দেন। পৃথক রূপে মূল সহ ঋগ্বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশেও হস্ত ক্ষেপণ করেন। এই ব্যাপারে প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল। বেদের অবমাননা ও সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীর স্তম্ভ পূরণ করিতে লাগিলেন। ওদিকে বাবু হর প্রসাদ শাস্ত্রী ও সপ্তমে সুর চড়াইয়া তাহার উত্তর গাইতে লাগিলেন, ক্রমে বিবাদ চাগিয়া উঠিল। অনেকে বিবাদ মীমাংসা করিতে গিয়া ঘুসি মারিলেন; ঘুসি খাইলেন, কিন্তু বিবাদ মীমাংসা হইল না। অনেকে মনে করিয়াছিল, এ বিবাদ রমেশ বাবুর বেদানুবাদেই পরিসমাপ্তি হইবে। কিন্তু সেরূপ মনে করা যে ভুল তাহা ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, যে চূড়ামণি মহাশয় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা প্রতিযোগী দল সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন। নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্ম মতের সহিত যে তাঁহার কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই, বঙ্গবাসীতে উহিয়ে ঘোষণাও দিলেন। ব্রাহ্মসম্প্রদায় এই দলাদলির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া রহস্য করিলেও 'নবজীবন'

কি 'প্রচাব' সম্পাদক তাহা গ্রাহ্য কবিলেন না। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের ভ্রম দূর হইল। নবজীবন ও প্রচাবের ধর্ম্মসংস্কারের প্রতিদ্বন্দীতা কবিতে প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র স্বরূপে 'বেদব্যাস' নামক মাসিক পত্রিকাব জন্ম হইল। সকলেই জানেন, পণ্ডিত শশধব তর্কচূড়ামণিব বিশেষ উৎসাহে ও সাহায্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইযাছে এবং তাঁহাব প্রিয়-শিষ্য ভূধব বাবু এই পত্রিকাব সম্পাদকতাব ভাব গ্রহণ কবিয়াছেন। যে 'বঙ্গবাসী' একদিন 'নবজীবন' ও প্রচাবেব ধর্ম্ম মতেব যশোকীর্ত্তন দ্বাবে, দ্বাবে করিযাছিলেন, তিনিও আচার্য্যেব শিষ্য (!!) হইয়া নবজীবন ও প্রচাবেব ধর্ম্মমতের বিকৃত ব্যাখ্যা কবিযা সাধারণ হিন্দুব মনে ভ্রম জন্মানব চেষ্টা কবিতেছেন। এখন বঙ্গবাসীব মতে "বেদব্যাসই একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেব আদর্শ পত্রিকা।'

'বেদব্যাস' হিন্দুধর্ম্মেব আদর্শ পত্রিকা কিনা, সে বিচার এখন আমরা কবিব না। তবে অদ্য আমবা এতটুকু বলিতেছি যে বেদব্যাসেব কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠে পবম সন্তুষ্ট হইযাছি। এমন কি নবজীবনেও সেই ভাবের প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয নাই। বিশেষত বেদব্যাসেব প্রবন্ধ গুলি ইংবেজীব বুকনী বিহীন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায লিখিত। অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা গুলিব ন্যায ইহাব ভাষা খিচুড়ি বাঙ্গালা নয। আজ কাল এই পাশ্চাত্য ভাষাব প্রবল আমদানির দিনে বাঙ্গালা ভাষার মৌলিকতা বক্ষা, অবশ্য প্রশংসনীয। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয এই যে (বঙ্গবাসীব মতে) হিন্দু শাস্ত্রালোচনায অনধিকারী নবজীবনের কোন কোন লোকেব লিখিত প্রবন্ধই 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র পত্রিকাব' গৌবব বৃদ্ধি কবিয়াছে। বাবু চন্দ্রশেখব বসুর 'দেবযান' নামক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায অতুল্য। কেবল চন্দ্রশেখব বসু কেন, বাবু বজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি লেখকের প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশ করিতে যখন ভূধব বাবুব আপত্তি নাই, তখন অবশ্য তাঁহাকে স্বীকাব কবিতে হইযাছে যে বেদব্যাসকে ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীব মুখপত্র কবিলে চলিতেছে না। সকল শ্রেণীব হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওযা বেদব্যাসের যখন উদ্দেশ্য, তখন এইরূপ উদাবতা ভিন্ন গোঁড়ামীতে সে উদ্দেশ্য সফল হওযাব সম্ভাবনা নাই। 'নবজীবন' ও প্রচারেব এ বিষযে উদারতা প্রশংসনীয়। কিন্তু বেদব্যাসের সম্পাদক ও পৃষ্ঠ-পোষকদিগের

মতে সেইটিই নবজীবন ও প্রচারের মুখ্য দোষ। সকল শ্রেণীর লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশ হয় বলিয়া ইহাঁরা 'নবজীবন' ও প্রচারকে 'অহিন্দু' মতের পত্রিকা বলিয়া কটাক্ষ করেন। তাই টাট্‌কা হিন্দুমতের আদর্শরূপে বেদব্যাসের আবির্ভাব। এক ভাবে দেখিতে গেলে বেদব্যাসের উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বেদব্যাসের পৃষ্ঠ-পোষক লেখকগণ উদারতা রক্ষা করিয়া বেদব্যাসের মহত্ত্ব রক্ষা করিলে কোনই আক্ষেপ ছিল না। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য যেন অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না। বেদব্যাসের কয়েকজন প্রধান লেখক গোড়া হইতেই নবজীবন ও প্রচারের প্রবন্ধ বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া বেদব্যাসকে নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দী বলিয়া সপ্রমাণিত ও পরিচিত করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। আমরা এমন বলি না, যে নবজীবন ও প্রচারের কোন প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ হওয়া উচিত নয়। নবজীবন ও প্রচারের অনেক প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ হওয়া উচিত, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। তবে আমরা এই মাত্র বলি যে প্রতিবাদে রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষি না থাকাই ভাল। এবং সেই প্রতিবাদ উদার ও নিরপেক্ষভাবে 'নবজীবন ও প্রচারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা' প্রবন্ধ চূড়ামণি মহাশয়ের অমতে কাটিয়া ছাঁটিয়া নবজীবন সম্পাদক প্রকাশিত করাতে সম্পাদকীয় নীতির অপলাপ হইয়াছে। * প্রোক্ত প্রবন্ধের মতামতে সম্পাদকের

* তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রথমাংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয়। তিনি ভাগ করেন নাই বা ভাগ করিবার অনুমতি দেন নাই। যত খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কাটা ছাঁটা নাই। তাহাতে একটি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মত প্রকাশিত হইয়াছে। বাকি টুকু আমার নিকট এখনও আছে। আমি এখন অভিযুক্ত আসামী সুতরাং আমার সাফাই জন্য যদি সেই অপ্রকাশিত অংশের তিন চারি পংক্তি উদ্ধার করি, তাহা হইলে, বোধ হয়, অন্তত আমার অপরাধবৃদ্ধি হইবে না। প্রবন্ধে আছি, "আর তুমি স্বেচ্ছাচারী মহাপুরুষ মদ্য পান ও কুক্কুট.গোমাংসাদি ভক্ষণ করিবে, অথচ হরি নাম করিবে তাহা হইতে পারে না।" ইত্যাদি। প্রথমে তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীতে আমাদের উপর "কাটা ছাঁটার" অভিযোগ আনেন, এক্ষণে নবজীবনেই সেই অভিযোগে আমাদিগকে অপরাধী স্থির করা হইল। সুতরাং এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে অপরাধের বিচার বলিয়া একটা পদার্থের আবির্ভাবই হইল না!!! . . .

[নবজীবন সম্পাদক।]

সহানুভূতি না থাকিলে, টীকা টীপ্পনিতে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। তাহা না করাতে, চূড়ামণি মহাশয় নবজীবনের সংশ্রব ত্যাগ করায় নবজীবনের একরূপ ক্ষতি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদারের 'শাস্ত্র সমর্থন' প্রবন্ধে নবজীবন সম্পাদক টীকা টীপ্পনি কাটাতে তিনিও বেদব্যাসের শরণাপন্ন হইয়া নবজীবনের উপর বিষম আক্রমণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থার নবজীবন সম্পাদকের দোষেই যে প্রাচীন সম্প্রদায়ের সহিত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা ঘটিতেছে, তাহাই বা কি রূপে বলি? বলিতে দুঃখ হয়, বেদব্যাসের লেখকগণ যেরূপ বিদ্বেষভাবে লেখনী চালনা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্ম মতের প্রকৃত প্রতিবাদ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিয়া একটি প্রতিযোগী দল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বেদব্যাসের আবির্ভাব। বেদব্যাস সম্পাদক ভূধর বাবু সূচনাতেই তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন এবং বেদব্যাসকে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখ পাত্র রূপে পরিণত করিতে দ্বিতীয় বৎসরের বেদব্যাসে ঘোষণা দিয়াছেন।

বেদব্যাসের আবির্ভাবের কারণ আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতবর চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় 'স্বধর্ম্ম ত্যাগ' (বেদব্যাস ৬ষ্ঠ সংখ্যা) প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষের যে সমস্ত মুখ্য কারণ, এবং যে জন্য বেদব্যাসের ন্যায় পত্রিকার আবশ্যক, তাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করায়, হাটে ছাতুর হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় দলাদলির যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই একরূপ 'গাওয়া গান' হইলেও কথাগুলি বড় গুরুতর। আমরা নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণকে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের কথা গুলি বিবেচনা করিয়া বুঝিতে বলি।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নব্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের যে বিদ্বেষের একটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটি নূতন কথা বটে। এবং সেইটিই এ দলা দলির মুখ্য কারণ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের প্রবন্ধের ভাব এই, নব্য সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'শিক্ষিত' বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীকে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, কুসংস্কারাপন্ন গোঁড়া বলেন। আরও কত কি বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তত্তাবৎ প্রাচীন পণ্ডিত সম্প্রদায় এতদিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন।

এখন আর সহ্য হয় না। বাস্তবিক নব্য সম্প্রদায়ের এরোগটি অনেক দিন হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যে এরূপ বলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তত দুঃখিত হন না। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য, হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি কল্পে, সাময়িক পত্রে, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ অবিমৃশ্যকারিতা অমার্জনীয়। নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণেরও যদি এ ভ্রম থাকে, তাহা সংশোধিত হওয়া উচিত এবং সাধারণ নব্য সম্প্রদায় যাহাতে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার না করেন তৎ পক্ষে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাঁহারাই এ দলাদলীর অগ্রণী বলিয়া দোষী হইবেন। অপিচ প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী ও যে আপনাদিগকে পরম পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধ চেতা প্রভৃতি আত্মাভিমানে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়কে শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ধর্ম্মের ষাঁড় মনে করেন সে ভ্রমও তাঁহাদের দূর হওয়া উচিত। এবং প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর দেখা দেখি, বামা, শ্যামা, প্রভৃতি তীর্থ যাত্রিরাও যে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা নানা বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন, তন্নিবারণ চেষ্টা করাও তাহাদেরই উচিত। নচেৎ দলাদলি, গালাগালিতে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য ব্যর্থ হইবে।

সুখের বিষয় এই যে, আমাদের লেখনী ধারণের পূর্ব্বেই নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৩য় খণ্ড প্রচারে) ভগবদ্গীতার ব্যাখার ভূমিকায় 'প্রকৃত শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের অর্থ করিয়া বিজ্ঞতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা মহাশয়ও (বেদব্যাস ৩য় সংখ্যায়) 'উন্নতি ও অবনতির অর্থ' নামক প্রবন্ধে প্রকৃত 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কারক দলের (নব্য ও প্রাচীন দলের) নেতাদ্বয়ই যখন প্রাগুক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন, তখন শিক্ষিতাভিমানী বাবুর দল, এবং পণ্ডিতাভিমানী ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী, আর দলাদলির ঘোঁট করিতেছেন, কেন? এই দলাদলিতে মহা অনিষ্ট আছে, তাহা পণ্ডিতবর চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম বাবুও এ অনিষ্টকারিতার বিষয় অনেকবার বলিয়াছেন। অথচ অনেকেই এ দলাদলির অপকারিতা বুঝিতেছেন না। তাহাতেই আমরা আশঙ্কিত হইয়া বিস্তৃত রূপে এ কথার আলোচনা করিলাম।

এই দলাদলিতে কোন পক্ষের যশোগান বা নিন্দাবাদ করিতে আমরা ওকালতি গ্রহণ করি নাই। আমরা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় তথ্য সকল শুনিতেছি, এবং আরও শুনিব বলিয়া প্রত্যাশা করি। নব্য সম্প্রদায়ের নিকটও আমরা সে বিষয় বিশেষ ভরসা রাখি। কি প্রাচীন কি নব্য আমরা কোন দলেরই গোঁড়া নহি। যাঁর মুখে যতটুকু সার কথা শুনিব, এবং শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, তাঁহাকেই প্রকৃত পণ্ডিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিব। পক্ষান্তরে যাঁর কথায় যতটুকু অসারতা বা গোঁড়ামী দেখিব, অথবা যাঁর কথা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, তাঁহাকেই দূর হইতে নমস্কার করিয়া পলায়ন করিব। সময় স্রোতে গা ঢালিয়া প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীকেও কুসংস্কারাপন্ন কি পরম জ্ঞানী বলিব না; অথবা নব্য সম্প্রদায়কেও শিক্ষা বিভ্রাট'-গ্রস্ত কিম্বা আদর্শ পুরুষ বলিব না। যে দলের যতটুকু গুণ বা দোষ দেখিব, তাহা অম্লান বদনে বলিব। ধর্ম্ম সংস্কারকগণ স্পষ্টত স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতবাসী বিশেষত বঙ্গবাসী মাত্রেরই আজ কাল হিন্দুধর্ম্ম শুনিতে একান্ত পিপাসা জন্মিয়াছে। তখন, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমরা হিন্দু সন্তান,—হিন্দু-ধর্ম্মসংস্কারের এই প্রবল আন্দোলনের সময় দুই একটি কথা বলা বোধ হয় আমাদের অনধিকার চর্চ্চা নহে। যদি প্রাচীন কি নব্য হিন্দু-ধর্ম্মসংস্কারকগণ আমাদের বক্তব্য বিষয়ের কোন ভ্রম দেখিলে, (অবশ্য অনেক ভ্রম থাকিবে) সংশোধন করিয়া না দেন, তবে বুঝিব, কোন দলই হিন্দুধর্ম্ম—প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণকে প্রকৃত ধর্ম্ম-পথ দেখাইতে ব্রতী নহেন। কেবল পাণ্ডিত্য ফলানই উভয় দলের বা দল বিশেষের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীচন্দ্র মোহন সেন।
কনসট, মালদহ।

[নিরপেক্ষ লেখকের এই প্রবন্ধ আমরা নবজীবনের তৃতীয় বৎসরের উপসংহার ভাবে প্রকাশ করিলাম।—নবজীবন সম্পাদক]